পৌরুষের সামাজিক ইতিহাস:

ঔপনিবেশিক বাংলায় ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে, ১৮৮০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

পিএইচ.ডি. উপাধির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

কলা অনুষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কিংশুক দাসগুপ্ত

২০২২

Certified that the Thesis entitled

পৌরুষের সামাজিক ইতিহাস: ঔপনিবেশিক বাংলায় ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে, ১৮৮০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ (Social History of Masculinity: Reconstruction of Brahmacharya in Colonial Bengal, c 1880-1939), Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Samarpita Mitra and Dr. Nandita Banerjee Dhawan and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere.

Counter Signed by the Supervisors

Candidate Signature

(KINGSUK DASGUPTA)
Registration no. AOOHI1100914

(DR. SAMARPITA MITRA)

(DR. NANDITA BANERJEE DHAWAN)

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১ - ২

পরিভাষাকোষ ৩ - ৪

ভূমিকা ৫ – ৫০

প্রথম অধ্যায় : ৫১ – ১১৬

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এবং ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ :
যৌনতার নীতিমালা ও হিন্দু পৌরুষ প্রসঙ্গে, ১৮৮০-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় অধ্যায় : ১১৭ - ১৭৫

হিন্দুর ('ক্ষয়িষ্ণু') দেহ ও সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ :
পৌরুষ, জাতপাত এবং প্রজনন প্রসঙ্গে, ১৯১০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

তৃতীয় অধ্যায় : ১৭৬ - ২৩৯

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের অন্তর্জগৎ ও পৌরুষ :
অনুশাসন, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতি প্রসঙ্গে, ১৯০৫-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ

চতুর্থ অধ্যায় : ২৪০ - ৩০৯

ধাতুদৌর্বল্য থেকে ব্রহ্মচর্য :
শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষ ও যৌনতা প্রসঙ্গে, ১৮৮০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

উপসংহার ৩১০ - ৩১৯

পরিশিষ্ট ৩২০ - ৩২৪

প্রাথমিক সূত্র ৩২৫ - ৩৩১

সাহায্যকারী রচনা ৩৩২ - ৩৪৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি প্রাথমিক আগ্রহটি তৈরি করেছিলেন আমার প্রয়াত পিতা প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত। প্রথমেই তাঁকে স্মরণ করলাম। আমার গবেষণার প্রতি আগ্রহ দেখানোর জন্য, আমার প্রতি ভরসা রাখার জন্য, প্রতিটি প্রতিকূল মুহূর্তে আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বৌদ্ধিক ভাবে আমাকে সমৃদ্ধ করার জন্য এই গবেষণার এক তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা নন্দিতা ব্যানার্জী ধাওয়ানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অধ্যাপিকা সমর্পিতা মিত্রকে যিনি আমার গবেষণার আরো এক তত্ত্বাবধায়কের দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং আমার নিজের গবেষণার প্রতি সর্বদা সমালোচনাত্মক থাকতে এবং নিজের পঠন-পাঠনের পরিধী বিস্তৃত করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে আমার শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বহু সময় তাঁদের পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

অধ্যাপিকা রত্নাবলী চ্যাটার্জী, অধ্যাপিকা ভারতী রায়, অধ্যাপিকা সমিতা সেন, অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্বাণ বসু বহু সময় এবং বহু ভাবে গবেষণার সূচনা পর্বে নানা পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ইতিহাস বিভাগে আমার সহকর্মী ঈশিতা চক্রবর্তী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার গবেষণায় আগ্রহ দেখিয়েছেন, আমার খসড়া পড়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমার কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন, আমার আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। বিদ্যাসাগর কলেজে ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরাও সর্বদা আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি বেশকিছু গ্রন্থাগার এবং মহাফেজখানায় নিজের গবেষণার কাজ করেছি। এর মধ্যে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বিশেষ করে ওখানকার প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকৃপণ সাহায্য আমার কাজকে সহজ করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গ্রন্থাগার এবং ওখানে কর্মরত অশোক আচার্য্যর সাহচর্য ও পরামর্শ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার, নতুন দিল্লীতে নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগার এবং মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের গ্রন্থাগার; সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোসালসায়েন্সেস, ক্যালকাটার গ্রন্থাগার; গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন

ইন্সটিটিউট অফ কালচারের গ্রন্থাগারেও আমি দীর্ঘদিন গবেষণা করেছি। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত কর্মীদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমার বন্ধুদের অনেকেই বর্তমান গবেষণাটি সম্পর্কে নানা পর্যায়ে আগ্রহ দেখিয়েছে, এই বিষয়ে আমার চিন্তা-চেতনাকে তীক্ষ্ণ করতে সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে কিরণ কেসভমূর্তী, নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত, সুধীশ রামপুরতু চম্মনচেরির কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করতে হয়। তা ছাড়া আমার বন্ধুদের মধ্যে তমঘ্ন হালদার, কণিকা শর্মা ও আশিষ গুপ্তা আমাকে বহু দুস্পাপ্য বই পাঠিয়ে সাহায্য করেছে যা আমার পক্ষে দেশে বসে জোগাড় করা সম্ভব ছিলনা। আলাদা ভাবে অরিন্দম দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। উনি আমাকে বহু উপাদানের সন্ধান দিয়েছেন, আর অনবরত আমাকে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। ধন্যবাদ জানাই অনিন্দিতা ভাদুড়িকে যিনি এই লেখাটির *প্রুফ* সংশোধনের কাজটি যত্ন করে করে দিয়েছেন।

আমার নানা পর্যায়ের অসুস্থতায় পাশে থাকার জন্য রঞ্জিতা বিশ্বাসকে এবং গবেষণার শেষ পর্যায়ে কোভিডে আক্রান্ত অবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে দায়িত্বশীল থেকে আমার জীবনকে সুরক্ষিত করার জন্য বন্ধু তথাগতকে আলাদাভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি না। ধন্যবাদ জানাচ্ছিনা কৌস্তুভ, অভিজিৎ, সোহমের সাথে নীলাঞ্জনা, রঞ্জিতা দি আর সুধীশকেও যারা আমার ক্যুয়ার-নারীবাদী ব্যাক্তিগত-রাজনৈতিক জীবন-যাপনকে নৈকট্য আর অন্তরঙ্গতার বিকল্প যৌথতার পরিভাষায় আগলে রেখেছে, *কমরেডের* ভূমিকায় সর্বদা কাঁধে হাত রেখেছে শক্ত করে। শুভ্রজ্যোতি, রৌনক, অনুরাগ, দেবস্নাত আমাকে বহু সময় গবেষণার কাজে সাহাজ্য করেছে; যদিও ওদেরও আমি আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতার বাইরে রাখছি। প্রকৃতি, চৈতালি, সাহেব, আকাশ, মৈত্রেয়ী, অয়ন, বিশাল, একরামুল, প্রিয়াঙ্কা, কাকলি, শতাব্দী আমাকে নিঃশর্ত স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে গেছে, আমার উপর ভরসা রেখেছে। ওদেরও আমি আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতার বাইরে রাখছি। যদিও আমার সকল বন্ধুরা এত বছর ধরে আমার গবেষণা জনিত উদ্বেগ এবং মেজাজের ওঠাপড়ার সম্মুখীন হয়েও আমার সাথে যে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রেখেছে শুধু এই কারণটির জন্যই ওরা আলাদা ভাবে কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারে। আমার মা তপতী দাশগুপ্ত দূরে থেকেও আমাকে অনবরত উৎসাহিত করে গেছেন, আমার কাজের ওপর আস্থা রেখেছেন। মায়া দি আমাকে প্রতিদিনের খাবার জুগিয়ে গেছেন। আর আমার পোষ্য হুতুম সঙ্গ দিয়েছে আমাকে। এরা সকলেই কোনও না কোনও ভাবে এই কাজটার অংশ।

পরিভাষাকোষ

adolescence নবযৌবন/নবযুবকাল

adolescent নবযুবক/যুবতী

adult বয়স্থা

body politic দেহ রাজনীতি

caste জাত/জাতপাত

castist জাতিবাদী

catholicity উদারতা/ প্রসারতা

coercion বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ

companionate marriage সাহচর্যপূর্ণ বিবাহ

counter discourse প্রতিবয়ান

counter-hegemonic প্রতি-আধিপত্যবাদী

demography জনতত্ত্ব/জনসংখ্যাতত্ত্ব

didactic উপদেশমূলক

domination কর্তৃত্ব

dynamic গতিশীল/চলমান

eclectic সারগ্রাহী

egalitarian সমানাধিকারসম্পন্ন

empirical নিরীক্ষণলব্ধ

exclusionary বর্জনমূলক

heterogeneous বিষমসত্ত্ব/ বিষমশৈলিক

heteronormative বিসমনিয়মাত্মক

homogeneous সমসত্ত্ব/ সমরূপী

homo-romantic সম-রোমান্টিকতার

homo-social সম-সামাজিক

horizontal-homosociality আনুভূমিক সম-সামাজিকতা

hypermasculine অতিপুরুষালি

interaction মিথষ্ক্রিয়া

interesting চিত্তাকর্ষক

intersect প্রতিচ্ছেদ

intersection ছেদবিন্ধু/প্রতিচ্ছেদবিন্দু

linear রৈখিক

manual তালিমি কেতাব

martial রণলিপ্সু/সমরপ্রিয়

masculine subject পুরুষালি বিষয়

masculine পুরুষালি

masculinist পৌরুষকেন্দ্রিক

medicalization চিকিৎসাকরণ

militant জঙ্গি

militarism সামরিকতাবাদ

monolythic একশৈলিক

natural leadership স্বাভাবিক নেতৃত্ব’

norm বিধি

normative নিয়মাত্মক

notion প্রতীতি

overlapping অধিক্রমণ

overtone অতিস্বর

paradigm পরিকল্প

pederaty বালমেহন

playful আমোদপ্রবণ

pluralistic অনেকত্ববাদী/বহুত্ববাদী

popular sovereignty গণসার্বভৌমিকতা

problematize সমস্যায়িত

profile পরিলেখ

promiscuous অধিযৌনলিপ্সু / বহুগামী / ব্যভিচারী

prudish অতিশালীন

pseudo-science ছদ্মবিজ্ঞান

pseudo-scientific ছদ্মবৈজ্ঞানিক

public figure বহুল পরিচিত ব্যক্তি

public sphere জনপরিসর

public সর্বজনীন

racial বর্ণভিত্তিক

racism বর্ণবাদ

reception পরিগ্রহ

reflexive আত্মবাচক

renter খাজনাভোগী

semiotic সংকেত তত্ত্ব

sensuous ইন্দ্রিয়পরায়ণ

somatic nationalism দেহগত জাতীয়তাবাদ

stereotype গতে বাঁধা

theme আখ্যানবস্তু

transgression যৌন উল্লঙ্ঘন

unique অনন্য

upper caste উচ্চ জাতি/ সাবর্ণ

vertical-homosociality উল্লম্ব সম-সামসামাজিকতা

watertight জলরোধক

ভূমিকা

যখন দশ বৎসর বয়স তখন আমাদের বাঙলা পাঠ্য পুস্তকে পড়েছিলাম 'যৌবন' অতি বিষম কাল। এই সময় ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। ...জেনেছিলাম ষোল থেকে বত্রিশ পর্যন্ত বয়স যৌবনকাল। আজ তো বত্রিশ ছেড়ে ডবল বত্রিশ পেরিয়েছি (এখন ১৯৬৮ ইং), জিজ্ঞাসা করিতে পারি— ষোল থেকে বত্রিশ কালটার কি এত দোষ?...সমাজের গণিতকার ও জ্যামিতিকারদের চিরদিন বিপদ, ইন্দ্রিয়সমূহ যদি প্রবল না হত, অথবা তাদের প্রাবল্যের যদি একটা 'গ্রাফ' থাকত, তা হলে বোধ হয় এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তাদের সমাজকে বারবার বেসামাল হতে হত না। সমাজ চায় আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনের একটা সাম্যাবস্থা, সমাজধর্মে বাঁধাই করে অনুজের জীবনের একটা 'ভদ্র' সংস্কার তৈরি করা। প্রথমত, তাতে গোল বাধায় যৌবন- 'এই সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল হয়'...একটা প্রশ্ন জাগে— আমাদের শিক্ষা-গবেষকরা কেউ কি আমাদের পাঠ্যপুস্তকের এসব পাঠমালার একটা অনুসন্ধানমূলক ঐতিহাসিক গবেষণা চালিয়ে দেখবেন - কবে থেকে কী ভাবে, কী কী পাঠ ছাত্রদের বইতে বাছাই ও ঝাড়াই হয়ে চলেছে?...অবাক লাগে ভেবে কোথা থেকে ঊনবিংশ শতকের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল এই পাঠ্য-পুস্তকে এই নতুন যৌবন-জুজুর কথা?

যখন ক্লাসে পড়ি তখন বুঝিনি, 'যৌবন অতি বিষম কাল'। তারপর যৌবনের দিকে এগুতে এগুতে গিয়ে পড়লাম বিবেকানন্দের রাজত্বকালে— জীবনকালে নয়। আমাদের বিবেকানন্দ 'কামিনী কাঞ্চন'-বিরোধী রামকৃষ্ণের শিষ্য হলেও জীবন-অভিযাত্রী বিবেকানন্দ। তিনি যৌবনের রাজা বিবেকানন্দ, অভয়মন্ত্রের সেনাপতি বিবেকানন্দ'অভীঃ' মন্ত্রটাই আমাদের স্বদেশি দলের কানে বাজে। শুনেছি স্বদেশীরাওকেউ কেউ তবু মনে করতেন— ইন্দ্রিয় দমন যতই বাড়ানো যাবে, ইংরেজ-দমন ততই অগ্রসর হবে। কিন্তু আমি তাহলে দলছুট।[১]

- গোপাল হালদার

প্রেক্ষাপট

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে, বিশেষত ছয়ের দশক থেকে নয়ের দশকের মধ্যে বাংলায় উপদেশমূলক গ্রন্থ প্রকাশনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখাযায়[২], যেখানে একটি প্রবণতা খুব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এই প্রবণতাটি হল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতা, সদাচার, শুচিতা, শালীনতার মতো বিষয়গুলিকে নতুনভাবে বিবেচনা ও নির্ধারণ করার চেষ্টা। পরিবার, গৃহস্থালি, দাম্পত্য জীবনের মামুলি খুঁটিনাটি পার্থিব বিষয়গুলি

---

১ গোপাল হালদার, *রূপনারায়ণের কূলে*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: এইচ্ এল সাহা, ১৯৭৪), ১০৯-১২।

২ এইক্ষেত্রে জুডিথ ওয়ালস আটের দশকে মূলত মেয়েদের জন্য লেখা এই ধরনের গ্রন্থের সবচেয়ে বেশি প্রকাশনা লক্ষ করেছেন। Judith E Walsh, *Domesticity in Colonial India : What Women Learned When Men Gave Them Advice* (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004), 8, 31.

সম্পর্কে নানা বিচার ও পরামর্শ প্রকাশনার আকারে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠে।[৩] ফলত আলোচ্য সময় থেকে কৈশোর ও যৌবনকালীন জীবন, দাম্পত্য সম্পর্ক, বৈধব্য জীবন, সামাজিক সম্পর্ক এমন সকল বিষয়কে নতুনভাবে নির্ধারিত করার প্রবণতা এক্ষেত্রে নজরে আসে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শুধু উপদেশমূলক গ্রন্থ বা তালিমি কেতাবের মধ্যেদিয়েই এই ধরনের নীতিমালা তৈরি এবং প্রসার পেয়েছে তা নয়। পাশাপাশি তুলনায় সামাজিকভাবে প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জনদের লেখা প্রবন্ধমূলক গ্রন্থাদি, দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রখ্যাত, তুলনায় স্বল্পখ্যাত এবং অনেক সময় অখ্যাত ব্যক্তিদের প্রকাশিত প্রবন্ধ, ডাক্তার-আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ কবিরাজদের প্রকাশিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ও প্রবন্ধ, প্রসিদ্ধ এবং অখ্যাত লেখকদের লেখা গল্প-উপন্যাস, আত্মজীবনী এবং জীবনীর মাধ্যমেও এই ধরনের নৈতিক পাঠ প্রসারের প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষপর্বে মেয়েদের জীবনকে কেন্দ্রকরে এমন বিবিধ নৈতিক বিধি তৈরির প্রক্রিয়া এবং তার সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে ঐতিহাসিকরা অনেকটা আলোচনা করেছেন।[৪] কিন্তু তুলনায় বাংলায় ছাত্র-কিশোর-যুবকদের জীবনকেও এমন নৈতিক বিধিতে আবদ্ধ করার প্রয়াসগুলি নিয়ে আলোচনা সীমিত। এইক্ষেত্রে প্রদীপ বোস জাতীয়তাবাদী প্রতর্কে সন্তানের অনুশাসনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন।[৫] অন্যদিকে শতদ্রু সেন আলোচনা করেছেন শৈশবের রাজনীতিকরণ নিয়ে যেখানে তিনি দেখিয়েছেন শৈশব কীভাবে ঔপনিবেশিক অনুশাসনমূলক নীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় হয়েযায় এবং ভারতীয় এলিট এবং ঔপনিবেশিক মতাদর্শের বিরোধের ক্ষেত্র হয়েওঠে।[৬] কিন্তু ছাত্র-কিশোর-যুবকদের

---

৩ Tanika Sarkar, “Hindu Conjugality and Nationalism in Late Nineteenth Century Bengal,” in *Indian Women : Myth and Reality*, ed. Jasodhara Bagchi (Hyderabad: Sangam Books, 1995), 99; Sudeshna Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947," Unpublished PhD Dissertation (School of Oriental and African Studies London University, 1997), 60.

৪ Partha Chatterjee, “The Nationalist Resolution of the Women’s Question,” in *Recasting Women: Essays in Indian Colonial History*, ed. Kumkum Sanghari and Sudesh Vaid (New Delhi: Kali for Women, 1989), 233–52; Sarkar, “Hindu Conjugality and Nationalism in Late Nineteenth Century Bengal”; Walsh, *Domesticity in Colonial India : What Women Learned When Men Gave Them Advice*; এখানে সুদেষ্ণা ব্যানার্জির আলোচনা কিছুটা ব্যতিক্রমী যেখানে তিনি শুধু মেয়েদের সম্পর্কে নৈতিক বিধি তৈরির প্রচেষ্টাকে নিয়ে আলোচনা করেননি, গার্হস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল পারিবারিক সদস্যের সম্পর্কে নৈতিক বিধি তৈরির প্রয়াসকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947".

৫ Pradip Kumar Bose, “Sones of the Nation: Child Rearing in the New Family,” in *Texts of Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal*, ed. Partha Chatterjee (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995), 118–44.

৬ Satadru Sen, *Colonial Childhoods : The Juvenile Periphery of India, 1850-1945* (London: Anthem Press, 2005).

জীবনকে বিবিধ নৈতিক বিধানের আওতায় আনার প্রয়াস ও ব্যক্তিগত জীবনে সেই বিধিগুলিকে প্রণয়নের প্রচেষ্টাকে প্রাথমিকভাবে লিঙ্গ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস দুর্লভ। বিশেষ করে ছাত্র-কিশোর-যুব সম্প্রদায়কে অনুশাসিত করার এই প্রয়াসগুলির সাথে বাঙালি ভদ্রলোকের পৌরুষের অবধারণার সম্পর্কটি ঐতিহাসিক গবেষণায় এখনও অনুদ্ঘাটিত রয়েছে। আমাদের সন্দর্ভটি এই ক্ষেত্রটির প্রতি আলোকপাত করতে চাইবে। উনিশ শতকের আটের দশক থেকে তৈরি হতে থাকা উক্ত নৈতিক বিধান এবং তার সাথে পৌরুষের সংযোগ হবে এই আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। বিশেষ করে উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে আদর্শ পুরুষের এই নৈতিক ভাষ্যের কেন্দ্রে আমরা ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে অবস্থান করতে দেখি। আমরা যদি এইক্ষেত্রে উপদেশমূলক গ্রন্থগুলির প্রকাশনার একটি হিসেব করি তাহলে দেখতে পাব ১৯০০ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছাত্র-কিশোর-যুবকদের জন্য প্রকাশিত এই ধরনের গ্রন্থের প্রকাশনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়, যার প্রতিটিতেই তাদের ব্রহ্মচর্যচর্চার পরামর্শ দেওয়া হয়।[৭] এমনকী বেশিরভাগ গ্রন্থের শিরোনাম থাকে 'ব্রহ্মচর্য্য'। বাঙালি ভদ্রলোকের কাছে ব্রহ্মচর্য এই দীর্ঘ ষাট বছর সময়কালে আদর্শ পৌরুষের প্রতিরূপ হয়েওঠে। এখানে উল্লেখ্য ব্রহ্মচর্য এইক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন কোনো ধারণা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। ভারতীয় হিন্দু পরম্পরায় এর দীর্ঘ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[৮] কিন্তু আলোচ্য সময়ে ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে নতুন করে নিরূপণ করা হয় এবং ব্রহ্মচর্যের এই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করা সম্ভব। ফলত আমরা আমাদের সন্দর্ভে আলোচ্য সময়ে মূলত ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াকে উদ্ঘাটন করার মধ্য দিয়ে পৌরুষের একটি সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস চালাব।

০ বাঙালি মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, জনপরিসর ও নৈতিক সংহিতা

আমাদের আলোচনার শুরুতে বৈচিত্র্যপূর্ণ যে মাধ্যমগুলির কথা উল্লেখ করলাম, যেখানে ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে পৌরুষের একটি আদর্শ রূপকে নির্ধারণ ও প্রচারের উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়, সেই রচনার বিস্তৃত

৭ Bengal Library Catalogue of Books -এর তালিকা থেকে অনুধাবন করা যায় ১৯০৮ খ্রি. থেকে ১৯৩৯ খ্রি.-র মধ্যে এই বিষয়ক সবচেয়ে বেশি উপদেশমূলক পুস্তক ছাপা হয়। যার মধ্যে বেশ কিছু বইয়ের সাত/আটটি করে সংস্করণ প্রকাশের পরও প্রতি সংস্করণে মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা দুই হাজারের উপর থেকেছে, যার থেকে এই ধরনের বইয়ের চাহিদা এবং বিস্তৃত পাঠকগোষ্ঠী সম্পর্কেও আন্দাজ করা যায়। এই বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যানটির জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৮ Kumkum Roy, *The Power of Gender and the Gender of Power : Explorations in Early Indian History* (New Delhi: Oxford University Press, 2010), 241–50.

দুনিয়া এবং তাদের লেখকদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক পরিলেখ (profile) সম্পর্কে কিছু কথা প্রথমে বলে নেওয়া জরুরি। এইক্ষেত্রে আমরা যদি শুধু কিশোর-যুবক-ছাত্রদের জন্য লেখা উপদেশমূলক পুস্তিকার লেখকদের কথা বিচার করিতাহলে তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক পরিচয়ের সন্ধান পাব। যেমন এই ক্ষেত্রে আনুমানিক ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *ব্রহ্মচর্য বা শিক্ষাজীবন* আর *ব্রহ্মচর্য্য ও বাল্যবিবাহ* এই দুইটি বইয়ের লেখক চট্টগ্রাম নিবাসী অখ্যাতনামা শ্যামাচরণ সেনগুপ্তের কথা উল্লেখ করতে পারি যিনি পেশায় ছিলেন করিরাজ। 'বৈদ্যসম্মিলনী' নামক একটি বৈদ্যজাতিভিত্তিক সংগঠনের সভাপতি, অন্যান্য বেশ কিছু বইয়ের লেখক, *বৈদ্যপ্রতিভা* নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এই তথ্যগুলি বাদ দিয়ে তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায়না।[৯] অন্যদিকে আনুমানিক ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *ব্রহ্মচর্য্য-সাধন* গ্রন্থের দুই অখ্যাত লেখক যোগেশচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র সেনের কথাও উল্লেখ করা যায় যাঁরা দুজনও পেশায় চিকিৎসক ছিলেন।[১০] অন্যদিকে যেমন রংপুর থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *ব্রহ্মচর্য্য বিজ্ঞান* নামক পুস্তকের লেখক ললিতমোহন জ্যোতির্ভূষণ,[১১] তমলুক থেকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *ব্রহ্মচর্য্য* নামক বইয়ের লেখক গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,[১২] ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত *ছাত্রগণের চির-আচরণ ও পরিব্রাজকের উপদেশাবলী* গ্রন্থের লেখক সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[১৩]-এর মতো অসংখ্য লেখকের কথা উল্লেখ করা যায় যাঁদেরপরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিন্তু তাঁরা যে পাবনা, রংপুর, তমলুক, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, নদীয়া, বরিশালের মতো বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার মফঃস্বল শহরগুলিতে বসে এই ধরনের অসংখ্য বই রচনা এবং প্রকাশ করছিলেন তা বইগুলির প্রকাশস্থানের উল্লেখ থেকে অনুমান করাযায়। আবার আমরা *সংযম শিক্ষা বা নিম্নতর সোপান* বইটির লেখক বিশিষ্ট সরকারি আমলা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুহৃদ এবং প্রখ্যাত লেখক চন্দ্রনাথ বসু,[১৪] *Few Thought on Education* বইটির লেখক কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস ব্যানার্জির কথাও উল্লেখ করতে পারি যাঁরা তাঁদের পুস্তকে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালনের উপদেশ

---

[৯] শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত, *ব্রহ্মচর্য বা শিক্ষাজীবন* (চট্টগ্রাম: ১৩২৩); শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত, *ব্রহ্মচর্য্য ও বাল্যবিবাহ,* ১৩২৩।

[১০] যোগেশচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র সেন, *ব্রহ্মচর্য্য-সাধন,* ১৩২৪।

[১১] ললিতমোহন জ্যোতির্ভূষণ, *ব্রহ্মচর্য্য বিজ্ঞান* (রংপুর : ১৩৩১)।

[১২] গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, *ব্রহ্মচর্য্য* (তমলুক : ১৯১৭ খ্রি.)।

[১৩] সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ছাত্রগণের চির-আচরণ ও পরিব্রাজকের উপদেশাবলী* (জলপাইগুড়ি : ১৯২৩ খ্রি.)।

[১৪] চন্দ্রনাথ বসু, *সংযম শিক্ষা বা নিম্নতর সোপান* (কলকাতা : ১৩০৯)। চন্দ্রনাথ বসুর পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য– "চন্দ্রনাথ বসু," ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*-৮৩, চন্দ্রনাথ বসু, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎ, ১৩৫৮), ৮-৩১; করুণাময় মজুমদার, *চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: ১৯৬০)।

দেন।[১৫] এছাড়া উল্লেখ করতে পারি উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে জনপ্রিয় হয়েওঠা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের কথাও, যাঁর জন্মও বেড়েওঠা গুপ্তিপাড়ায়। পারিবারিক অনটনের কারণে যৌবনের প্রারম্ভে জামালপুরের লোকমোটিভে কেরানির চাকরি নিয়ে স্থানান্তরিত হন তিনি এবং মুঙ্গের ও পরে বেনারসকে কেন্দ্রকরে 'ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা' নামক হিন্দু মিশনারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন, ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করেন এবং *ধর্ম্মপ্রচারক* নামক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ও অসংখ্য পুস্তিকায় ব্রহ্মচর্যের আদর্শ প্রচার করেন।[১৬] অথবা চন্দননগর নিবাসী এক ক্ষুদ্র অসফল ব্যবসায়ীর সন্তান মতিলাল রায়ের কথা বলা যায় যিনি বিশ শতকের প্রথম দশকে নিজে কিছুদিন এক সওদাগরি অফিসে কেরানির চাকরি করতেন। পরে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেন, 'প্রবর্ত্তক সংঘ'-এরমতো একটি ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন এবং অসংখ্য বই লেখেন যার মধ্যে একটির নাম *ব্রহ্মচর্য্য*।[১৭]

সুমিত সরকার এবং অনিন্দিতা ঘোষ যে বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক পরিচয়ভুক্ত লেখকদের কথা তাঁদের আলোচনায় তুলে ধরেছেন,[১৮] তাঁদের সাথে ব্রহ্মচর্য নিয়ে লেখা উপদেশমূলক পুস্তিকার লেখকদের পরিচয় মিলেযায়। এঁদের ব্যাখ্যা থেকে বোঝাযায় মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সামাজিক প্রেক্ষাপট, বৈচিত্র্যপূর্ণ পেশা এবং এলাকা থেকেএই মানুষরা আসছিলেন। একদিকে যেমন ব্যক্তিগত জীবনে প্রখ্যাত এবং সমকালীন সাহিত্য দুনিয়ার সফল ব্যক্তিরা এই প্রক্রিয়ার অংশ ছিলেন; অন্যদিকে তুলনায় কম পরিচিত, অনেক ক্ষেত্রে পরিচয়হীন অখ্যাত ব্যক্তিরাও আলোচ্য বিষয়ে অসংখ্য লেখালিখি করেছেন। ফলত বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হিসেবে ঐতিহাসিকরা যে বিসমসত্ত্ব গোষ্ঠীকে উনিশ এবং বিশ শতকের বাংলার সামাজিক জীবনে একটি পৃথক সামাজিক শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন, এঁদের মোটের ওপর সেই সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়।

---

[১৫] Sir Gooroo Dass Banerjee, A Few Thought on Education (Calcutta : S. K Lahiri & Co, 1910).

[১৬] কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের জীবন ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্যভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (সম্পাদক), *কুমার পরিব্রাজক*, ১৩৪৬। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের লেখা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, *নীতি রত্নমালা* (কাশী-যোগাশ্রম: ১৩২২), তৃতীয় সংস্করণ; শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, *নীতি রত্নমালা পরিব্রাজকের বক্তৃতা : পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রী কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় প্রদত্ত বক্তৃতাবলী* (কাশী-যোগাশ্রম: ১৮১৬ শঃ); শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, *সাধন-শিক্ষা-সোপান*, ১৩৩০।

[১৭] মতিলাল রায়, *ব্রহ্মচর্য্য*, ১৯৩৪ খ্রি.।

[১৮] Sumit Sarkar, "'Kaliyuga', 'Chakri' and 'Bhakti': Ramakrishna and His Times," *Economic and Political Weekly* 27, no. 29 (1992): 1543–66; Anindita Ghosh, "Revisiting the 'Bengal Renaissance': Literary Bengali and Low-Life Print in Colonial Calcutta," *Economic and Political Weekly* 37, no. 42 (2002): 4329–38.

সুমিত সরকারের মতে ঔপনিবেশিক বাংলায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে পুঁজিবাদী উদ্যোগের সাথে সংযুক্ত করে দেখা যায় না। বরং তাদের দেখাযায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রধানত উঁচু জাতের অন্তর্ভুক্ত এবং জমির সাথে ছোট জমিদারি এবং বেশিকরে মধ্যসত্বভোগী হিসেবে যুক্তগোষ্ঠী হিসেবে।[১৯] বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ সম্পর্কে জন ম্যাকগুয়ারের পরিমাণগত পর্যবেক্ষণ থেকে ভদ্রলোকের একাংশের শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা যায় যেখানে তিনি দেখান ভদ্রলোকের এক বড়অংশ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত ছিল খাজনাভোগী (renter) হিসেবে।[২০] ম্যাকগুয়ার দেখান মধ্যবিত্তের অন্তত তিরিশ শতাংশ পুরুষ ছিল এই জীবিকার অন্তর্ভুক্ত। কোথায় জমিটি অবস্থিত অথবা জমির পরিমাণ কী সেই বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিসদৃশ হলেও অন্তত এটা বলাযায় যে একজন ক্ষুদ্র কেরানিরও গ্রামে জমি থাকতে পারার সম্ভাবনা ছিল।[২১] সুমিত সরকারের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিতে এই যে মধ্যসত্বভোগীদের উত্থান হয়, জমিকে ঘিরে নানা সংকটের ফলে তাঁরা ধীরে ধীরে নিজেদের সচ্ছলতা বজায় রাখতে অপারগ হতে থাকেন। ফলত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে বেশি তৎপর হয়েওঠে। কারণ এই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করলেই ডাক্তারি, ওকালতি, শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, সরকারি চাকুরে এবং কেরানির মতো সামাজিকভাবে সম্মানজনক জীবিকা গ্রহণ সম্ভবপর ছিল।[২২] এর সাথে তুলনায় আর্থিকভাবে অসচ্ছল নিম্ন-মধ্যবিত্ত অংশের কথাও উল্লেখ করতে হয় যাদের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বোঝান, “কলকাতা, মফস্বল শহর বা গ্রামের পড়ন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, যাঁদের হয়তো বলা যায় traditional literati এবং সেইসব ইংরেজি শিক্ষা অল্পস্বল্প পেয়েও যাঁরা বিশেষ লাভ করতে পারেননি, প্রতিষ্ঠিত উকিল-ডাক্তার-অধ্যাপক-সাংবাদিক লেখকদের চাইতে অনেক নীচে পড়ে-থাকা ভদ্রলোক চাকুরিজীবী-স্কুলমাস্টার বা, সর্বোপরি, অফিসের কেরানী” এই অংশকে।[২৩]

এই শ্রেণীকে বুঝতে গিয়ে সুমিত সরকার তিনটি বিষয়ের ভূমিকাকে পৃথকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। পশ্চিমী ধাঁচে স্কুল, কলেজের পত্তনের পর থেকে নতুন ধরনের শিক্ষার গুরুত্ববৃদ্ধি, ছাপাখানার বিস্তার এবং

---

১৯ Sumit Sarkar, *Writing Social History* (Delhi: Oxford University Press, 1997), 169.

২০ John McGuire, *The Making of a Colonial Mind : A Quantitative Study of the Bhadralok in Calcutta, 1857-1885* (Canberra: Australian National University, 1983).

২১ Ibid., 16–47.

২২ Sarkar, *Writing Social History*, 169.

২৩ সুমিত সরকার, “কলিযুগের কল্পনা ও ঔপনিবেশিক সমাজ”,*গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্মাননা গ্রন্থ : ইতিহাস চর্চার ধারা*, সম্পাদক অনিরুদ্ধ রায় (কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫), ২৯৫।

জীবিকা হিসেবে সরকারি এবং সওদাগরি অফিসে কেরানির চাকরিবৃত্তি।[২৪] পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের প্রসঙ্গটি ঐতিহাসিকদের অনেকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে এখানে বিশেষ করে তিথি ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যাটি উত্থাপন করা জরুরি। তিনি বলতে চেয়েছেন, যে শিক্ষা ভদ্রলোকের অন্যতম পরিচয় তৈরি করেছে তা শুধু ইংরেজি শিক্ষার ধারণার থেকেও বৃহত্তর। এটা সাংস্কৃতিক কোডগুলির মধ্যে একটি সংযোগের ভূমিকায় এসে সমাজ, ভাষা ও মূল্যবোধ তৈরি করে। তার সাথে স্কুল, কলেজ, চাকরির সম্ভাবনা, শাসনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার রাস্তা তৈরির মতো আরও অসংখ্য বস্তুগত বিষয়ের সাথে তা সম্পর্কিত হয়েওঠে।[২৫] এর সাথে অবশ্যই ছাপাখানার প্রসার এবং ছাপা বই, পত্র-পত্রিকা-সংবাদপত্রের প্রকাশনা ও তার বাজার তৈরি বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের পরিসর নির্মাণের প্রক্রিয়াকে অনেকটা আকার দিয়েছে। যেমন তিথি ভট্টাচার্যের মতে এটা কাকতালীয় নয় যে উনিশ শতকের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বই হয় ছাপাখানা, না হয় প্রকাশনা অথবা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে এই তিনটি সাধারণ বিষয়েরই সমন্বয় দেখা যায়।[২৬] এমনকী উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত হওয়ার তিনটি নির্ধারক– বিদ্যা, প্রকাশনা এবং চাকরির মাধ্যমেই তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সফল হয়েছিলেন।[২৭] কিন্তু ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে সফল হয়েওঠা এই উচ্চশিক্ষিত অংশের বাইরেও ঐতিহাসিকরা মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের এক বৃহৎ দুনিয়াকে চিহ্নিত করেছেন যাদের ওপরও এই ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত বই ও প্রাথমিক পর্যায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।[২৮] ফলত ছাপা লেখার প্রকাশের মাধ্যমে সর্বোপরি একটি জনপরিসরের[২৯] নির্মাণ প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

---

২৪ Sarkar, *Writing Social History*, 170.

২৫ Tithi Bhattacharya, *The Sentinels of Culture: Class, Education and the Colonial Intellectual in Bengal, 1848-1885* (New Delhi: Oxford University Press, 2005), 4.

২৬ Ibid.,24.

২৭ Sarkar, *Writing Social History*, 232.

২৮ Ghosh, "Revisiting the 'Bengal Renaissance': Literary Bengali and Low-Life Print in Colonial Calcutta."

২৯ হাবারমাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পর্ব থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রে 'বুর্জোয়া জন-পরিসরের' বিকাশ ঘটে যা এক বৌদ্ধিক ক্ষেত্রকে সূচিত করে। এখানে শিক্ষিত ব্যক্তিমানুষরা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যুক্তি তর্ক সমেত নানা বিষয়ে আলোচনা ও মতামত ভাগকরে নেওয়ার অবকাশ পায়। 'সাহিত্যকেন্দ্রিক জনপরিসর' এইক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যার মাধ্যমে রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ে তর্কবিতর্ক আকার নেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। কফিহাউস অথবা সেলনের মতো সামাজিকতা বিকাশের পরিসরগুলি অথবা খবরের কাগজ, ইস্তেহারের মতো ছাপা লেখালেখি এইক্ষেত্রে মতামত বিনিময়ের ক্ষেত্র হয়েওঠে। Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1989).

অবশ্যই এই সামাজিক বর্গ কায়িক পরিশ্রম থেকে বিযুক্ত থেকেছেন এবং মূলত বাংলার তিনটি উচ্চ জাত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থদের প্রাধান্য এর জাত পরিলেখকে(profile) বুঝতে কিছুটা সাহায্য করে।[৩০] যদিও জাতপাতের প্রসঙ্গটি বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের পরিলেখকে ঠিক কোন মাত্রায় নির্ধারণ করে সেই বিষয়টি নিয়ে যে খুব মীমাংসামূলত আলোচনা চোখে পড়ে তা হয়তো নয়। ফলত রিচার্ড ক্রনিন সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে শুধু উঁচু জাত পরিচয় যে সর্বদা ভদ্রলোকের সামাজিক মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করেছে সেটা নয়।[৩১] কিন্তু এটা দেখাগেছে, যে জাত-গোষ্ঠীর মধ্যেথেকে ভদ্রলোকেরা উঠে আসে, তার মধ্যে উক্ত তিনটি জাতের প্রাধান্যই অধিক থেকেছে।[৩২] ফলত এটা অবশ্যই বলাযায় যে মূলত গ্রাম অথবা শহরে কায়িক শ্রমে যুক্ত মানুষ, নীচু জাত এবং মুসলমান জনতার বাইরে এই অংশের অবস্থান।[৩৩] যদিও সম্পূর্ণ উনিশ এবং বিশ শতক জুড়ে এই চরিত্র যে একইভাবে বহাল থেকেছে তাও বলা যায় না। সুমিত সরকার সহ বহু ঐতিহাসিকই দেখিয়েছেন যে ভারতীয় উপমহাদেশে এলাকা এবং সময়ভেদে মধ্যবিত্তের মধ্যেও নানা স্তর বর্তমান থেকেছে।[৩৪] ফলত জন ম্যাকগুয়ারের মতে ভদ্রলোককে কখনোই একটি নিশ্চল সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে দেখা যায় না। বরং এদের দেখাযায় পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের প্রতিরূপ হিসেবে।[৩৫]

---

৩০ Sarkar, *Writing Social History*, 169; Bhattacharya, *The Sentinels of Culture: Class, Education and the Colonial Intellectual in Bengal 1848-1885*, 24–25.

৩১ Richard P. Cronin, “The Government of Eastern Bengal and Assam and ‘Class Rule’ in Eastern Bengal, 1905-1912,” in *Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, ed. John R. McLane and Rachel Van M. Baumer, Occasional Paper No. 25 (East Lansing: Asian Studies Center, Michigan State University, 1975), 99.

৩২ McGuire, *The Making of a Colonial Mind : A Quantitative Study of the Bhadralok in Calcutta, 1857-1885*, 49.

৩৩ Sarkar, *Writing Social History*, 169.

৩৪ Sarkar, “‘Kaliyuga’, ‘Chakri’ and ‘Bhakti’: Ramakrishna and His Times”; Veena Naregal, *Language Politics, Elites, and the Public Sphere* (Delhi: Permanent Black, 2001); Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism* (New Delhi: Parmanent Black, 2001); Bhattacharya, *The Sentinels of Culture: Class, Education and the Colonial Intellectual in Bengal (1848-1885)*; Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947"; Walsh, *Domesticity in Colonial India : What Women Learned When Men Gave Them Advice*; Anindita Ghosh, *Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society, 1778-1905* (New Delhi: Oxford University Press, 2006).

৩৫ McGuire, *The Making of a Colonial Mind : A Quantitative Study of the Bhadralok in Calcutta, 1857-1885*, 2.

ঐতিহাসিকদের পর্যবেক্ষণ থেকে অনুধাবন করা যায় সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যাপক প্রসারের ফলে জনপরিসরের পরিধি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩৬] যদিও ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে জনপরিসরের বাধাহীন বিকাশের সুযোগ যে সীমিত ছিল সেই দিকটি সম্পর্কেও তাঁরা অনেকেই নজর করেছেন।[৩৭] আমরা জানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার শাসনের আদর্শ অনুযায়ী অর্থনৈতিক নীতি অথবা প্রশাসনের মতো সর্বজনীন বিষয়গুলিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখে, যেখানে দেশীয় জনতার 'ঘরোয়া' বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল দেশীয় জনতা জনপরিসরে এই 'ঘরোয়া' বিষয়গুলিকে উত্থাপন করতে থাকেন। বাংলায় ১৮৭০-এর মধ্যে জনপরিসরের নাগাল সমাজের বেশ নীচু স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েযায়,[৩৮] যেখানে গার্হস্থ্যের ঘরোয়া বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার এক বিস্তৃত পরিসর তৈরি হয়। পত্র-পত্রিকাগুলিতে সতীদাহ, কুলিন বিবাহ অথবা বিধবা বিবাহের মতো বিষয়গুলি নিয়ে ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক স্থান পেতে থাকে, যেখানে "বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বটতলার লেখক পাঠকদের মতো সমাজের বিস্তৃত স্তরের মানুষ অংশ নেন।"[৩৯]

উল্লেখ করার মতো বিষয় হল এই জনপরিসরের মধ্যদিয়েই জাতি কল্পনার সুযোগগুলি উন্মুক্ত হয়। বিশেষত 'সাহিত্যকেন্দ্রিক জনপরিসরে' জাতি কল্পনার নিজস্ব নান্দনিক এবং সৃজনশীল পরিভাষা বিকশিত হয়।[৪০] যদিও জনপরিসরে এই জাতি কল্পনার প্রক্রিয়ার মধ্যে জাতপাত, সাম্প্রদায়িক পরিচয় নিয়ে চাপা উত্তেজনা অনবরত বজায় থেকেছে। বিশেষত জাতীয়তাবাদী এলিটদের নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্চ-সাহিত্যকেন্দ্রিক জনপরিসরকে একাধারে গণতান্ত্রিক করেতোলার তাগিদ এবং বর্জনমূলক (exclusionary) করে ফেলার প্রবণতা পাশাপাশি লক্ষ

---

৩৬ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*; Ghosh, *Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society, 1778-1905.*

৩৭ Shukla Sanyal, *Revolutionary Pamphlets, Propaganda and Political Culture in Colonial Bengal* (Delhi: Cambridge University Press, 2014), 5.

৩৮ Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 64–66.

৩৯ Ibid., 25.

৪০ Samarpita Mitra, *Periodicals, Readers and the Making of a Modern Literary Culture: Bengal at the Turn of the Twentieth Century* (Leiden; Boston: Brill, 2020).ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে সাহিত্যকেন্দ্রিক জনপরিসরের নির্মাণ এবং জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য - Francesca Orsini, *The Hindi Public Sphere 1920–1940 : Language and Literature in the Age of Nationalism* (Delhi: Oxford University Press, 2009).Naregal, *Language Politics, Elites, and the Public Sphere*.

করাযায় যখন জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িকতাকে ঘিরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।[৪১] যদিও এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাঠক মহল যে এর মধ্য দিয়ে বিভাজিত হয়েগেছে তা নয়, জনপরিসরে আসা সকল ধরনের লেখালিখি নানাভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠকদের পাঠ্যতালিকায় স্থান পায়।[৪২] অন্যদিকে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই জনপরিসর যে শুধুই জাতি কল্পনার মাধ্যম হয়েছে তাও নয়। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসারেও তা কাজে লেগেছে। সেন্ড্রিয়া ফ্রাইটগ দেখান ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে জনপরিসর তৈরি হতে শুরু করে সেটা একাধারে ধর্মীয় গোষ্ঠীভিত্তিক একাত্মবোধ বা 'কল্পিত গোষ্ঠীর' ধারণা এবং পরবর্তী পর্বে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনাকে সংঘবদ্ধ করতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়।[৪৩] বহুবিধ বিষয়ের মতো এই জনপরিসরেই যৌনাচারের নানান বিধি এবং সেই বিধির মাধ্যমে পৌরুষের আদর্শ রূপ নিয়ে আলোচনার অবকাশ উন্মুক্ত হয়। শুধু উপদেশমূলক সাহিত্য নয়, চিকিৎসামূলক রচনা, স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনার মধ্যদিয়ে তৈরি হওয়া বিস্তৃত পরিসর, সৃজনশীল সাহিত্যের দুনিয়া এবং পত্রপত্রিকায় যৌনাচার নিয়ে তৈরি হওয়া বাদানুবাদ, জীবনী এবং আত্মজীবনীতে প্রকাশিত ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে ব্রহ্মচর্য তথা লিঙ্গ, যৌনাচার নিয়ে আলোচনা এবং সমালোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরি করে সেখানথেকে পৌরুষের নানাবিধি নির্মাণ এবং প্রসার পাওয়ার অবকাশ পায়। ছাত্র-কিশোর-যুবকদের সম্পর্কে বিবিধ নীতিমালা সামনে আসতে থাকে। যেমন *ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও যুবকগণের নৈতিক উন্নতি বিধানার্থ* গ্রন্থের লেখক যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ তার গ্রন্থের শুরুতেই লেখেন,

> হে ভাই সকল, ব্রহ্মচর্য্য হানি আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অপচয় সংঘটিত করিয়াছে। প্রাচীন ভারত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছিল।... বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনে প্রথম পদার্পণ এবং যৌবনের কিয়দংশ পর্যন্ত শ্রীগুরু সমীপে যাপন করিতে হইত। বস্তুতঃ, এই কালই চরিত্র নির্মাণের প্রকৃষ্ট কাল এবং এই বাল্য যৌবনের প্রথমাংশই চরিত্র নির্মাণের প্রকৃষ্ট উপাদন।... এই যে **ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা** ইহাই আর্য্যজাতির মূল ভিত্তিভূমি, ইহাই আর্য্যজাতির জাতীয় গৌরবের মূল মন্ত্র স্বরূপ এবং যদি আমরা আর্য্যজাতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকি, যদি আমাদের ধমনীতে প্রকৃত আর্য্যশোণিত প্রবহমান থাকে, যদি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ প্রকৃত

[৪১] Mitra, *Periodicals, Readers and the Making of a Modern Literary Culture: Bengal at the Turn of the Twentieth Century*, 8–9.

[৪২] Ghosh, *Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society, 1778-1905*, 25.

[৪৩] Sandria B. Freitag, “Contesting in Public: Colonial Legacies and Contemporary Communalism,” in *Making India Hindu : Religion, Community, and the Politics of Democracy in India*, ed. David E Ludden, (Delhi: Oxford University Press, 2005), 211–34.

আর্য্য হইয়া থাকেন, তবে ইহা সুনিশ্চিত, **আমরা আর্য্য-জাতির প্রকৃত ধর্ম্ম, আর্য্য-জাতির প্রকৃত কর্ম্ম এবং তাহার মূল মন্ত্র স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ব্যতীত কিছুতেই উঠিতে সমর্থ হইব না।**[৪৪]

০ পৌরুষের নির্মাণ এবং জাতিসত্তার লিঙ্গায়িত চেহারা

বর্তমান সন্দর্ভটি ঔপনিবেশিক শাসনকালের শেষ অংশে বহু স্তরীকৃত বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সামাজিক জগৎ, চিন্তা-চেতনার পরিসরকে উদ্ঘাটন করার মধ্য দিয়ে পৌরুষের নির্মাণ এবং সেই সম্পর্কিত নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবে। এই প্রক্রিয়ায় আলোচনার মূলত কেন্দ্রে থাকবে ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গটি যে বিষয়টি নিয়ে উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে জনপরিসরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আলোচনা চোখে পড়ে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রহ্মচর্যের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া গেলেও খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম এবং প্রথম শতকের মধ্যে রচিত ধর্মসূত্রে এটির প্রথম স্পষ্ট ধারণা পরিলক্ষিত হয়, যা ক্রমবর্ধমান বর্ণ বিভাজিত বৈদিক সমাজে উচ্চবর্ণের পুরুষের পিতৃগোত্রজ পারিবারিক মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করতে ক্রমশ নিয়মবদ্ধ বর্ণাশ্রম প্রথার প্রথম আশ্রম হিসেবে গণ্য হয়। উল্লেখ্য কুমকুম রায় উক্ত পর্যবেক্ষণটির পাশাপাশি এই বিষয়টিও উল্লেখ করেন যে এই পর্বে গাঙ্গেয় সমভূমিতে রাষ্ট্রগঠন এবং ক্রমশ জটিল হতে থাকা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় উক্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী বিধিটি বিবর্তনরত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে মান্যতাদানের জন্য আবশ্যিক হয়ে ওঠে।[৪৫] কুমকুম রায়ের এই পর্যবেক্ষণ থেকে ফলত এই বিষয়টি অনুধাবন করা সম্ভব যে রাষ্ট্র আবির্ভাবের একটি বিশেষ পর্বে লিঙ্গ এবং বর্ণবিভাজিত সামাজিক সম্পর্কগুলিকে নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা থেকে ব্রহ্মচর্যের ধারণাটির প্রথম বিকাশ হয়েছিল। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে বেশকিছু রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে বোঝার চেষ্টা করব, পবিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করার প্রয়াস চালাব যা উনিশ শতকের শেষপর্ব থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্বের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে পুনর্নির্মাণ করে। প্রাথমিকভাবে বলা যায় এক আদর্শ পুরুষের চরিত্র কী হওয়া উচিত এবং তার যৌনাচারের নীতি ঠিক কী হওয়া বাঞ্ছনীয় সেই দিকটি নির্ধারণের প্রয়াস এই ব্রহ্মচর্য নিয়ে আলোচনার মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে লক্ষ করা যায়। এখানে আলাদাভাবে খেয়াল করার মতো বিষয় হল

---

৪৪ যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, *ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতি বিধানার্থ,* দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা : ১৩১৬), ৪-৫।

৪৫ Kumkum Roy, *The Power of Gender and the Gender of Power : Explorations in Early Indian History* (New Delhi: Oxford University Press, 2010), Chapter - 12 Legitimation and the Brahmanical Tradition: The Upanayana and the Brhmacharya in the Dharma Sutras, 241–50.

ঐতিহাসিকরা এই ১৮৭০ পরবর্তী সময়কালকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের উত্থানের সময়পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন,[৪৬] যে জাতীয়তাবাদের চরিত্র বিশেষভাবে লিঙ্গায়িত।[৪৭]

এই প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী এবং 'লিঙ্গ প্রশ্নটি' সম্পর্কে পার্থ চ্যাটার্জিরবহু চর্চিত বিশ্লেষণটি উপস্থাপন করা আবশ্যক। তিনি দেখান উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সরাসরি রাজনৈতিক বিরোধিতায় যাওয়ার আগেই ঔপনিবেশিক সমাজে একটি সার্বভৌম পরিসরের নির্মাণ করে ফেলেছিল। তাঁর মতে এটা সম্ভব হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারিক জীবনকে দুটি পরিসরে বিভাজনের মধ্য দিয়ে। একটি বস্তুবাদী, অন্যটি আধ্যাত্মিক পরিসর। বস্তুবাদী পরিসর বলতে 'বাহির'-এর পরিসরের কথা তিনি বলতে চেয়েছেন। এটি হল অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্র, যেখানে পশ্চিম নিজেকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণিত করেছে আর প্রকাশ পেয়েছে প্রাচ্যের বিফলতা। অন্যটি আধ্যাত্মিক পরিসরটি। এটি হল 'অন্দর'-এর জগৎ যা সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নক। পার্থ চ্যাটার্জি মনে করেন বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত তার গার্হস্থ্য জীবন ও সংস্কৃতির অন্যান্য অংশে নিজস্ব স্বাধিকার রক্ষার প্রশ্নটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাকে 'আধ্যাত্মিক' প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। আর এর বিপরীত হিসাবে দেখা হয়েছে ঔপনিবেশিক পশ্চিমী 'বস্তুবাদী' দুনিয়াকে।[৪৮] তাঁর এই যুক্তিক্রমকে তিনি লিঙ্গ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদের সিদ্ধান্ত বুঝতে গিয়েও সম্প্রসারিত করেন। বাংলার ইতিহাসের প্রসঙ্গ এনে পার্থ চ্যাটার্জি দেখাতে চান যে উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদীদের উদ্বেগ থেকে সমাজ সংস্কার – বিশেষ করে নারীর প্রশ্নটি - অদৃশ্য হয়ে যায়নি। পরিবর্তে, জাতীয়তাবাদীরা নারীর প্রশ্নে একটি নতুন "মীমাংসার" বা "সমাধান" প্রস্তাব করে। এখানে পার্থ চ্যাটার্জি স্বতন্ত্র দুটি পরিসরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দেখান, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের জগৎকে বাহ্যিক, বস্তুগত, পুরুষালি এবং অভ্যন্তরীণ, আধ্যাত্মিক, মেয়েলি এই পরিসরে বিভক্ত করে

---

৪৬ Sumit Sarkar, *Essays of a Lifetime : Reformers, Nationalists, Subalterns* (Albany, NY: State University of New York Press, 2019), 75; Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 2; Indira Chowdhury-Sengupta. "Colonialism & Cultural Identity: The Making of a Hindu Discourse, Bengal 1867-1905." Unpublished PhD thesis.School of Oriental and African Studies. London University, 1993.

৪৭ লিঙ্গ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচিত ইতিহাসচর্চার ধারাকে বিশ্লেষণ করে জাতীয়তাবাদের লিঙ্গায়িত চরিত্রটি মৃণালিনী সিন্‌হা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। Mrinalini Sinha, "Gendered Nationalism: From Women to Gender and Back Again?," in *Routledge Handbook of Gender in South Asia*, ed. Leela Fernandes (london, NY: Routledge, 2014), 13–27.

৪৮ Partha Chatterjee, *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993), 6.

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দূরে নারীর প্রশ্নকে ‘অভ্যন্তরীণ পরিসরে’ নিয়ে যায়। এই দ্বিতীয় পরিসরটি ছিল জাতীয় স্বাধিকার এবং প্রামাণ্যতাকে দাবি করারক্ষেত্র। এই ‘সমাধনে’-র শর্তাবলী অবশ্য লিঙ্গ সম্পর্ককে ‘পুনঃস্থাপনে’ বাধা দেয়নি। তবে এটি প্রাথমিকভাবে ভারতীয় ‘জাতীয়তার’ ধারণার মাধ্যমে অর্জন করার কথা বলে, যার জন্য লিঙ্গের প্রসঙ্গটিকে নতুন জাতীয়তাবাদী পিতৃতন্ত্রের আওতাভুক্ত করাহয়।[৪৯]

পার্থ চ্যাটার্জির উল্লিখিত এই ব্যাখ্যানটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি বিশেষ চরিত্রকে সামনে আনে। তা হল জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্যের পরিসরটির কীভাবে রাজনীতিকরণ ঘটে এবং তাকে নিয়ে আলোচনা কীভাবে জাতীয়তাবাদী প্রতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে যে গার্হস্থ্যের ধারণাকে আদর্শায়িত করা হয়েছে সেটা কেবল মেয়েদের আভ্যন্তরীণ, আধ্যাত্মিক জগৎ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে তা নয়। ব্রহ্মচর্যের সাথে পৌরুষের সংযোগের প্রসঙ্গ— যেটি আমাদের সন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয়, তাকে আমরা যদি উক্ত আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে দেখব গার্হস্থ্য পরিসর এবং সেখানে লিঙ্গের প্রশ্নটির রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়াটি তুলনায় আরও জটিল যাকে বাহ্যিক/অভ্যন্তরীণ, পুরুষ/নারী অথবা আধ্যাত্মিক/বস্তুবাদী এই দ্বৈতর বিভাজনের মধ্য দিয়ে বোঝার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। এইক্ষেত্রে পার্থ চ্যাটার্জির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যোসেফ অল্টারের একটি সমালোচনা প্রাসঙ্গিক। উত্তর-ঔপনিবেশিক উত্তর ভারতে ব্রহ্মচর্য চর্চা সম্পর্কিত নানা আলোচনা এবং কুস্তিবিদদের জীবনচর্যা সম্পর্কিত নৃতাত্ত্বিক গবেষণার প্রেক্ষিতে তিনি এই প্রশ্নটি তুলেছেন যে পার্থ চ্যাটার্জি হিন্দু আধ্যাত্মিক জীবনকে যেভাবে “অভ্যন্তরীণ” ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হতে দেখেছেন তার যৌক্তিকতা কতটা। কারণ তাঁর মতে হিন্দুদেহটি এবং তাকে ঘিরে তৈরি হওয়া আচার, তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা এবং তাকে কেন্দ্রকরে সামাজিক উচ্চতরক্রমগুলি যেভাবে বিকশিত হয় তা দেহটিকে ‘অভ্যন্তরীণ’ রাখেনা, দেহ এর মধ্য দিয়ে যথেষ্ট প্রকাশ্যে চলে আসে। এইক্ষেত্রে অল্টার যথার্থভাবেই অনুমান করেছেন যে ব্রহ্মচর্য এতটাই শরীরকেন্দ্রিক একটি বিষয় যে এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আলোচনার মধ্যে চলে আসাই স্বাভাবিক, আর দেহকেন্দ্রিক এই প্রকাশ্য বিষয়গুলির ওপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও

[৪৯] Chatterjee, “The Nationalist Resolution of the Women’s Question,”233–52.

তার ক্ষমতাকে নানাভাবে প্রয়োগের সুযোগ পায়। ফলত এইক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের যে দ্বৈতটির ধারণার কথা পার্থ চ্যাটার্জি উপস্থাপনা করেছেন তা অল্টারের মতে ঝাপসা হয়ে যায়।[৫০]

যদিও অল্টার উক্ত সমালোচনাটি উপস্থিত করলেও ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে দেহের ওপরযে শুধু জাতীয়তাবাদী/ঔপনিবেশিক ক্ষমতার অক্ষ ক্রিয়াশীল থাকে না, বরং এইক্ষেত্রে ক্ষমতার যে একাধিক সূত্র ক্রিয়াশীল থাকতে পারে সেই দিকটি উদ্ঘাটন করেননি। ফলত তাঁর ভাষ্যেও ব্রহ্মচর্য, জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ এবং লিঙ্গায়িত দেহের ধারণার আন্তঃসম্পর্ককে বোঝার ক্ষেত্রে একটি একশৈলিক (monolithic) ছক অব্যাহত থেকে গেছে, তাঁর উক্ত সমালোচনাটি সম্প্রসারিত হয়নি। আমরা নিজেদের আলোচনার ক্ষেত্রে উক্ত যুক্তিক্রমকে সম্প্রসারিত করতে আগ্রহী থাকব। এইক্ষেত্রে তাঁর আলোচনায় অল্টার শরীরের যে বস্তুগত প্রতীয়মানতার (palpability) দিকটি উদ্ঘাটন করেছেন যা তাঁর ভাষায় ‘দেহগত জাতীয়তাবাদের’ (somatic nationalism) অংশ, তার নির্মাণের প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে গিয়ে আমরা যদি ব্রহ্মচর্যের ধারণাটি নির্মাণের বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটিকে উদ্ঘাটন করি তাহলে দেখতে পাব দেহের মতো প্রতীয়মান বিষয়টির ওপর যখন ব্রহ্মচর্যের মতো নৈতিক বিধি আরোপিত হয়, তখন বহু ধরনের সামাজিক ক্ষমতা সেই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। কোনো বিশেষ এক ধরনের ক্ষমতা সেখানে ক্রিয়াশীল থাকেনা। প্রেক্ষিত অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতার অক্ষ এবং তার প্রতিচ্ছেদ (intersection) থেকে ব্রহ্মচর্যের নির্মাণ হয়। ফলত ব্রহ্মচর্যের মতো ‘দেহগত’ বিষয়টি ক্ষমতার ভিন্ন ভিন্ন বয়ান তৈরি করে, ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্রহ্মচর্যের অর্থতেও বদল আসে, পৌরুষের ভাষ্যও পরিবর্তিত হয়। পার্থ চ্যাটার্জি গার্হস্থ্যের সাথে উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের যে একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্কের কথা বলেছেন এবং তার কারণ খুঁজেছেন উপনিবেশবাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জের ফলে তৈরি হওয়া দ্বিধার মধ্যে, সেই ব্যাখ্যা থেকে ফলত আমাদের আলোচনা সরে আসবে এবং আলোকপাত করতে চাইবে সেই বিবিধ প্রক্রিয়াগুলির প্রতি যার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্য এবং পৌরুষের একাধিক ভাষ্য তৈরি হয়। তার ফলে কার্যত একাধিক বস্তুমুখী (material) অভিজ্ঞতা কীভাবে জাতীয়তাবাদ এবং লিঙ্গভিত্তিক সত্তা নির্মাণের প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করেথাকতে পারে সেদিকে আমরা আমাদের আলোচনাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস চালাব।

---

[৫০] Joseph S Alter, “Celibacy, Sexuality, and the Transformation of Gender into Nationalism in North India,” *The Journal of Asian Studies* 53, no. 1 (1994): 47.

এই ক্ষেত্রে আমরা মূলত চারটি প্রেক্ষিতকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারি যেখানে ব্রহ্মচর্য, জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ এবং লিঙ্গায়িত দেহের গভীর আন্তঃসম্পর্ক লক্ষ করা যায় এবং তার মধ্য দিয়ে পৌরুষের বিবিধ ভাষ্য তৈরি হয়। যদিও একই সঙ্গে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্রহ্মচর্যের এবং পৌরুষের এই নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে ধারণাগত ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকলেও এরা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বিকশিত হয়নি। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের এই নির্মাণ প্রক্রিয়াটি একে অপরের থেকে জলরোধকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকেনি। এদের মধ্যে ধারণাগত নানা সংযোগ অব্যাহত থেকেছে।

আমরা এই ক্ষেত্রে যে বৃহত্তর চারটি প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে পারি তা হল – ১৮৭০-এর পর থেকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সাথে হিন্দু আত্মপরিচয়ের সংযুক্ত হওয়া এবং সেখানে পৌরুষের প্রসঙ্গ; স্বদেশি পরবর্তী পর্বের, মূলত ১৯০৯-এর পর থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সত্তা নির্মাণের প্রক্রিয়া এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক পৌরুষের অবধারণা; ১৯০৫ পরবর্তী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন তার গণমুখী আবেদন হারানোর পর বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে ঝোঁক বৃদ্ধি এবং এই ধরনের গুপ্ত সমিতিভিত্তিক আন্দোলনে পুরুষ বিপ্লবীদের মধ্যে পৌরুষের অবধারণা; এবং সর্বোপরি ১৮৮০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রজনন এবং পৌরুষের প্রসঙ্গ। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের গবেষণার সময়সীমায় ব্রাহ্মসমাজের কিছু ব্যক্তিত্ব এবং গান্ধিবাদী জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মধ্যেও ব্রহ্মচর্যের ধারণাটির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রগুলির সীমিত উপস্থিতি এবং অন্যান্য ধারাগুলির সাথে তার গভীর সংযোগ ও অধিক্রমণের কারণে আমরা তাদের নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করিনি। কিন্তু আমাদের মূল আলোচনায় এই প্রবণতাগুলির গুরুত্ব নথিভুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গ অনুযায়ী তাদের আমরা আলোচনার মধ্যে নিয়ে এসেছি।

বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে হিন্দু গার্হস্থ্য যেভাবে কেন্দ্রে চলে আসে তার পেছনে কিছু বস্তুগত কারণকে চিহ্নিত করেছেন তনিকা সরকার। পাশাপাশি বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার ইতিহাসচর্চার বিস্তৃত একটি ধারা (historiography) তৈরি হয়েছে। এখানে সেই চর্চিত ইতিহাসটি উত্থাপিত করে সামগ্রিকভাবে আলোচ্য সময় এবং বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদ এবং পৌরুষের নির্মাণের বৃহত্তর চারটি প্রেক্ষিতকে নির্ধারণ করা হবে, যেখানে আমরা ব্রহ্মচর্যের ভাষ্যগুলিকে তৈরি হতে দেখি। বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাবশালী

ধারাটির সাথে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের সংযোগের দিকটি অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন,[৫১] যা একে অপরকে বিভিন্নভাবে পুষ্ট করে। তনিকা সরকার এইক্ষেত্রে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ১৮৭০-এর দশককে একটি পটপরিবর্তনের সময় হিসেবে দেখেছেন যেখানে মূলত সমাজ সংস্কারের উদ্যোগে ভাঁটা পড়তে দেখাযায়।[৫২] তুলনায় হিন্দু প্রথা, বিশ্বাস এবং আস্থার ওপর জোর বৃদ্ধি পায়। জাতিকল্পনার হিন্দু, ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং পিতৃতান্ত্রিক চরিত্রকে এক্ষেত্রে তিনি চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন, যার এক দীর্ঘ প্রেক্ষিত তিনি অনুধাবন করেছেন বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতায়। তিনি দেখান ১৮৪০নাগাদ অর্থনৈতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাঙালি উদ্যোগের অসফলতা, জমিনির্ভর বাঙালি ভদ্রলোকের জমি থেকে আয় সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা, ঘড়ির কাঁটায় সময় বাঁধা কেরানির চাকরিজনিত হতাশাবোধ এবং বর্ণবৈষম্যের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিত মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরুষ তার ‘পুরুষ সত্তাকে’ যেভাবে ঔপনিবেশিক পরিসরে হারাতে বসে, তার প্রভাব তনিকা সরকার সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদীদের গার্হস্থ্য সম্পর্কে মতামতের পরিবর্তনের মধ্যে লক্ষ করেছেন। সরকার দেখান সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী চিন্তায় ঔপনিবেশিক পরিসরকে চিহ্নিত হতে দেখাযায় এমন একটি পরিসর হিসেবে যেখানে ঔপনিবেশিত পুরুষ তার সত্তাকে হারাতে বসেছে। এর বিপরীতে তারা হিন্দু পরিবার এবং গার্হস্থ্য জীবনকে জাতির ‘স্বাধিকার রক্ষার শেষ ক্ষেত্র’ হিসাবে চিহ্নিত করতে থাকে।[৫৩] এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল এই একই সময়ে ঔপনিবেশিক বয়ানে বাঙালি দেহকে দুর্বল প্রতিপন্ন করার প্রবণতা স্পষ্ট হতে থাকে এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত দুর্বলতার এই যুক্তিকে কিছুদূর পর্যন্ত আত্মস্থ করতে থাকে।[৫৪] মৃণালিনী সিনহা এই প্রেক্ষিতে নজরে এনেছেন যে ঔপনিবেশিক বয়ানে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উদীয়মান বাঙালি পুরুষরা মেয়েলি হিসেবে প্রতিপন্ন হতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসন নিজেদের পৌরুষদৃপ্ত জাতি হিসেবে প্রতিপন্ন করার মধ্যদিয়ে ‘মেয়েলি’ দেশীয় তথা বাঙালি প্রজাদের

---

[৫১] Sarkar, *Essays of a Lifetime : Reformers, Nationalists, Subalterns*, 57, 81; Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 140; Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947," 43.

[৫২] Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 24.

[৫৩] Ibid.,198.

[৫৪] John Rosselli, “The Self-Image of Effeteness: Physical Education and Nationalism in Nineteenth-Century Bengal,” *Past and Present* 86, no. 1 (1980): 121–48.

ওপর তাদের শাসনের বৈধতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আর পৌরুষের এই ঔপনিবেশিক নির্মাণ সমকালীন ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশ বিরোধী বিরোধপূর্ণ রাজনীতিকে আকার দেয়।[৫৫]

উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের প্রাধান্য যে পরের শতকের প্রথম কিছু দশকের মধ্যে সংকটে পড়ে, বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের এক বড় অংশ যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঝুঁকতে শুরু করে, সেই সামাজিক প্রক্রিয়াটিকে জয়া চ্যাটার্জি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।[৫৬] ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক অনেক জটিল একটি বিষয়। তবে অন্তত আদর্শগত দিকদিয়ে এদের একটিকে অন্যের 'অপর' হিসেবে দেখা যায় না।[৫৭] কিন্তু বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে সাম্প্রদায়িকতায় এই পটপরিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করা সম্ভব, যা বিগত কিছু দশকে ঐতিহাসিকরা মুনশিয়ানার সাথে সামনে এনেছেন। অবশ্যই এইক্ষেত্রে বাংলার ব্যবসায় ব্রিটিশ পুঁজির প্রাধান্য,[৫৮] জমিনির্ভর বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণীর অলাভজনক জীবিকা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক মন্দার প্রসঙ্গ এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যা বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের মধ্যে হতাশা তৈরি করে, তার গার্হস্থ্যের আদর্শকেও তা প্রভাবিত করে।[৫৯] অপর দিকে বাংলায় নির্বাচনমূলক রাজনীতির ধীর সূচনায় রাজনীতিতে একচ্ছত্রভাবে থাকা বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের আধিপত্যে ছেদ মধ্যবিত্ত হিন্দু নেতৃত্বে সংকট তৈরি করে, কারণ বাংলার বিশ শতকের শুরুতে জনসংখ্যার নিরিখে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুদের থেকে সামান্য অধিক পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি হিন্দু নেতৃত্বের জন্য সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে একই সালে হওয়া পুনা চুক্তির ফলে বাঙালি বর্ণহিন্দু এই প্রদেশে

---

[৫৫] Mrinalini Sinha, *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century* (New Delhi: Kali for Women, 1995), 1–32.

[৫৬] Joya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

[৫৭] Gyanendra Pandey, *The Construction of Communalism in Colonial North India* (Delhi: Oxford University Press, 1990), 2, 241.

[৫৮] Amiya Kumar Bagchi, *Private Investment in India, 1900-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), 165–170; Rajat Kanta Ray, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927* (Delhi: Oxford University Press, 1984), 14–21.

[৫৯] Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947,* 9, 15, 94.এই প্রসঙ্গে সুদেষ্ণা ব্যানার্জির আলোচনা খুব প্রাসঙ্গিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক মন্দা এবং বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের বস্তুগত সংকট কীভাবে তার গার্হস্থ্যের অবধারণায় সংকটকে ডেকে আনে সেই দিকটি তিনি তুলে ধরেছেন। Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta, 1880-1947,"80-121.

সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়, বাঙালি ভদ্রলোক বাংলার রাজনীতিতে তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারাতে থাকে।[৬০] পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ কৃষিসমাজেও হিন্দু জমিদার-মহাজন এবং মুসলমান কৃষকদের মধ্যে দাঙ্গাগুলির ক্রমশ সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটতে থাকে,[৬১] বর্ণহিন্দুরা এই সময় থেকেই হিন্দুপ্রধান পৃথক প্রদেশের দাবিতে সরব হয়।[৬২]

বিশ শতকের সূচনায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থানের এই প্রক্রিয়াটিতে অনেকে বিশ শতকের একের দশককে একটি গুরুত্বপূর্ণ জলবিভাজিকা হিসেবে দেখেছেন যেখানে মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে ভীতির এবং জাতপাত সম্পর্কে বর্ণহিন্দু বাঙালি নেতৃত্বের মানসিকতায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের ঝড় স্তিমিত হওয়ার পরে বাংলায় যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয় সুমিত সরকার সেই প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তনগুলিকে বুঝতে চেয়েছেন।[৬৩] পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের পরিলেখ মূলত তিনটি উঁচুজাত দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এখানে পিছিয়ে থাকা জাতির প্রতি উদাসীনতা এবং উচ্চজাতগত স্বাভিমানকে বাংলার উচ্চবর্ণের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায় (বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনীতিতেও এই উদাসীনতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়)। কিন্তু বিশ শতকের একের দশক থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের পূর্ব অবস্থানে একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সুমিত সরকার যেমন দেখান বাংলায় হিন্দু জনসংখ্যার প্রসঙ্গটিতে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস নাগাদ বাংলায় সেন্সাস কমিশনার গেইট-এর একটি ঘোষণা। তিনি জানান সেই সকল জাতের মানুষকে হিন্দু তালিকা থেকে বাইরে রাখা হবে যাঁদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচারে ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করেননা, যাঁরা মন্দিরে প্রবেশাধিকার পান না, এবং হিন্দুদের কাছথেকে এই ধরনের অন্যান্য বৈষম্যর শিকার হন। সুমিত সরকার দেখান আদমসুমারি কমিশনারের এই

---

[৬০] Chatterji, *Bengal Divided,* 15.

[৬১] বাংলায় বিশ শতকের প্রথম থেকে দাঙ্গার ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক চরিত্রটি সুরঞ্জন দাস বিস্তারিতভাবে উত্থাপন করেছেন, যেখানে সুগত বসু দেখিয়েছেন যে তিনের দশক থেকে এই দাঙ্গাগুলি কীভাবে গ্রামীণ কৃষিসমাজের মধ্যেকার সম্পর্ককে সাম্প্রদায়িক করে তোলে। Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal: 1905-1947* (Delhi: Oxford University Press, 1993);Bose, 181–232.

[৬২] Chatterji, *Bengal Divided : Hindu Communalism and Partition, 1932-1947*, 227–40.

[৬৩] Sumit Sarkar, *Beyond Nationalist Frames : Postmodernism, Hindu Fundamentalism, History* (Delhi.: Permanent Black, 2010), 81.

নীতি সাবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিরোধ তৈরি করে।[৬৪] কারণ এই উদ্যোগগুলিও হিন্দুসংখ্যা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা তৈরি করে। অন্যদিকে প্রদীপ কুমার দত্ত দেখান ১৯০৯ নাগাদ আদমসুমারির ওপর ভিত্তি করে যেভাবে বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান এবং মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান এই ধরনের বয়ান জনপ্রিয় হতে থাকে, তার পর থেকে জনপরিসরে মুসলমান বিরোধী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বিশেষভাবে পালে হাওয়া পায়।[৬৫] সংখ্যার নিরিখে সংখ্যালঘু হিন্দু সাবর্ণ বাঙালির মধ্যে গড়েওঠা এই সাম্প্রদায়িক ভীতি তাদের নীচু জাতিকে দলে টানার জন্য বাধ্য করেতোলে। এই সাম্প্রাদায়িক ভীতিগুলি যে শুধুই মুসলমানের তরফ থেকে আসা হুমকির অবধারণা ছিল তা নয়। বিশেষ করে সুগত বোস যেমন দেখিয়েছেন মুসলমান ক্ষুদ্র কৃষক অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গে কৃষকদের সাথে হিন্দু উচ্চবর্ণ জামিদার এবং মহাজনদের আর্থিক লেনদেনের ভারসাম্যমূলক সম্পর্কটি তিনের দশকের শুরু থেকে বিশ্বজনীন আর্থিক মন্দা ও বাজারের ওঠাপড়ার কারণে ভেঙে পড়ে। ফলত আলোচ্য সময় থেকে হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান কৃষকের মধ্যে যে দাঙ্গাগুলি আত্মপ্রকাশ করে তা তাদের আগের শ্রেণীচরিত্রকে বজায় রাখার পাশাপাশি গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক চেহারা নিতে থাকে।[৬৬] সুরঞ্জন দাসও দাঙ্গা নিয়ে তাঁর বিস্তারিত গবেষণায় দাঙ্গাগুলির সাম্প্রদায়িকীকরণ সম্পর্কে একই প্রবণতা লক্ষ করেছেন।[৬৭] উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা যদি বাংলায় বর্ণহিন্দুর সংখ্যা লঘু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার সাথে ভদ্রলোক পৌরুষের সংকটের সম্পর্কটি উদ্ঘাটন করতে আগ্রহী হই তাহলে বিশ শতকের প্রথম কিছু দশকে বাংলায় হিন্দু সাম্প্রদায়িক পরিসরে পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে অনুধাবন করা যেতে পারে।

বাংলায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের অন্তিমপর্বে যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির উত্থান হয়েছিল তা জনমুখী আন্দোলনের প্রয়াস থেকে সরতে শুরু করে, একটি এলিট আন্দোলনের চেহারা নেয়।[৬৮] এই আন্দোলনের চেহারা সহিংস হতে থাকে, ব্রিটিশ আমলা এবং তার দেশীয় সহযোগীদের প্রতি মূলত এই সন্ত্রাস সংগঠিত হওয়া শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে ইতিপূর্বে ঐতিহাসিকরা

---

৬৪ Ibid., 84–85.

৬৫ Pradip Kumar Datta, "'Dying Hindus': Production of Hindu Communal Common Sense in Early 20th Century Bengal," *Economic and Political Weekly* 28, no. 25 (1993): 1305–19.

৬৬ Bose, *Agrarian Bengal : Economy, Social Structure, and Politics, 1919-1947*, 181–232.

৬৭ Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal: 1905-1947* (Delhi: Oxford University Press, 1993), 2, 132-33.

৬৮ Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908* (New Delhi: People's Publishing House, 1973), 490.

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[৬৯] এমনকী খুব সাম্প্রতি এই বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলগুলির কর্মকাণ্ড, বিশেষত যে পদ্ধতিতে এই দলগুলির কার্যকলাপ পরিচালিত হতো তার ইতিহাসও আলোচিত হতে শুরু হয়েছে।[৭০] বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি নিয়ে যেসব ঐতিহাসিকরা গবেষণা করেছেন তাঁরা এই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন যে বিশ শতকের শুরুর দিকে এই বিপ্লবী চরমপন্থী রাজনীতির ভাবাদর্শগত অনুপ্রেরণা এসেছিল উনিশ শতকের হিন্দু পুনরুত্থানবাদ থেকে। বিশেষ করে ব্রিটিশ উপনিদেশবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদের এই ধারা জাতির যে ভাবমূর্তি কল্পনা করেছিল তা মূলত উনিশ শতকের এই হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের তৈরি করা প্রতীকগুলি গ্রহণ করেছিল।[৭১] এঁরা যে মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনা পোষণ করতেন তা হয়তো নয়। কিন্তু এঁদের সাংস্কৃতিক ঝোঁক এবং বোধের মধ্যে হিন্দুস্বর স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যায়। অমলেশ ত্রিপাঠির মতে এর ফলে একাধারে তাঁরা মুসলমান জনমানস বুঝতে অসমর্থ হন এবং হিন্দুধর্মের এক নিজস্ব ব্যাখ্যায় আবদ্ধ হয়ে পড়েন।[৭২] তিনি মনে করেন পশ্চিমী আধুনিকতাজাত সমস্যাগুলির সাথে না যুঝতে পেরে চরমপন্থীরা প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার 'সুরক্ষিত জঠরে' আশ্রয় নেন। ফলত এই মতাদর্শকে ঐতিহ্যবাদী হিন্দুধর্ম, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের সাথে পশ্চিমী আধুনিকতা আনীত আইন, প্রতিষ্ঠান এবং তার মূল্যবোধের সংঘাত হিসেবে দেখেছেন তিনি।[৭৩] সুমিত সরকার স্বদেশি রাজনীতিতে ধর্মের বিশেষ গুরুত্বের প্রতি নজর দেওয়ার পক্ষপাতী। কারণ তাঁর মতে মানুষের কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃত করার মধ্য দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় জনতার সমর্থন আদায় করে নিতে এই ধর্মীয় চেতনা ব্যাপক প্রভাবশালী ভূমিকার কাজ করেছিল। অমলেশ ত্রিপাঠির বক্তব্যকে প্রতিধ্বনিত করে

---

[৬৯] Peter Heehs, *The Bomb in Bengal : The Rise of Revolutionary Terrorism in India, 1900-1910* (New Delhi: Oxford University Press, 1993); Sanyal, *Revolutionary Pamphlets, Propaganda and Political Culture in Colonial Bengal*.

[৭০] Michael Silvestri, "The Bomb, Bhadralok, Bhagavad Gita, and Dan Breen: Terrorism in Bengal and Its Relation to the European Experience," *Terrorism and Political Violence* 21, no. 1 (2009): 1–27..

[৭১] শুক্লা সান্যাল আলোচ্য সময়ের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ইস্তেহারের চরিত্র উদ্ঘাটন করে এই বিষয়টি বিশেষভাবে দেখিয়েছেন যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়অর্ধের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তাবিদদের রচনা এই পর্বের বিপ্লবীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁরা তাঁদের ইস্তেহারে যে ধরনের ধর্মীয় প্রতীক ও বাগ্‌ধারা ব্যবহার করছিলেন তা এই পুনরুত্থানবাদীদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ছিল। Sanyal, *Revolutionary Pamphlets, Propaganda and Political Culture in Colonial Bengal,* 59-60.

[৭২] Amalesh Tripathi, *The Extrimist Challenge: India Between 1890 and 1910* (New Delhi: Orient Longman, 1967), xiii.

[৭৩] Ibid., 1-2.

তিনিও মনে করেন, স্বদেশি যুগে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী ভাবনা আধুনিকতার থেকে পরম্পরাবাদী মতাদর্শের দিকে যাত্রার দিকটিই চিহ্নিত করে। এখানে যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদ থেকে অচল সামাজিক রীতিনীতি নির্ভর ক্ষুদ্র উপদলবাদী (sectarianism) মতাদর্শের দিকে সরণ লক্ষ করা যায়, যাকে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পূর্বাভাস হিসেবে গণ্য করা যায়। তাঁর মতে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ এই প্রবণতার ঊর্ধ্বে ছিল না। তিনি এই বিপ্লবী যুবকদের আদর্শবাদ এবং নির্ভীক বীরত্বের দিকটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিলেও একই সাথে এঁদের বহু নেতৃত্বের ধর্মীয় উৎসাহের দিকটিও নজরে আনেন। যদিও এই প্রসঙ্গে তিনি দেখান বিপ্লবীগোষ্ঠীর মধ্যে সকলে যে হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক এবং বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন তা নয়। তাঁর মতে এই ধর্মীয় মতাদর্শগত ভিন্নতা বিপ্লবীদের মধ্যে সংঘাতের জন্ম দেয়।[৭৪]

অন্যদিকে শুধু বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণা, সংগঠনের গঠনপ্রণালী বা নিয়মনীতির দিক থেকে যে বাংলার নানা বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল তা নয়, বিপ্লবী কর্মসূচীর পরিকল্পনা এবং তাকে প্রণয়নের ক্ষেত্রেও কলকাতা, ঢাকা, চন্দননগর, মেদিনীপুরের মতো স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলীয় কেন্দ্রগুলি এবং কিছুক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য অংশের বিপ্লবী সংগঠনগুলির সাথেও এরা সহযোগীরূপে কাজ করেছে। বাংলায় বিশ শতকের সূচনার পর্ব থেকে যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি বিকশিত হচ্ছিল তারা আদর্শগত অনুপ্রেরণা পেয়েছিল বহু ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দর্শনের দ্বারা। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিবিধ ধারার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল 'হিন্দুপুনরুত্থানবাদী' দর্শনটি। যদিও এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে "Natural and indigenous to British imperial domination"[৭৫] বলা কতটা সংগত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ এই বিপ্লবী সংগঠনগুলির মতাদর্শগত অবস্থান এবং কার্যকলাপের অনুপ্রেরণার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে শুধুই তার মধ্যে পুনরুত্থানবাদের প্রভাব বা দেশীয় উৎস সন্ধান করলে, তুলনায় কম আলোচিত বিষয়গুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয়। এখানে উল্লেখ্য বাংলার এই পর্বের বিপ্লবীরা নানা সনাতন হিন্দুবিশ্বাস এবং দর্শনের পাশাপাশি ইউরোপীয় নৈরাজ্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক, আইরিশ বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার

---

৭৪ Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, 483–92.

৭৫ Peter Heehs, "Foreign Influences on Bengali Revolutionary Terrorism 1902–1908," *Modern Asian Studies* 28, no. 3 (1994): 533–56.

দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[৭৬] ফলত এই বিবিধ ধারাগুলি যেভাবে বিপ্লবীকর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাকে দেশীয় এবং বিদেশি এই দুটি ধারায় ভাগ করা সংগত নয়। আবার অন্যদিকে প্রথম পর্বের বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দু প্রতীক এবং মতাদর্শ যতটা প্রভাবশালী ছিল, পরবর্তী পর্বে সেই লক্ষণগুলি তেমন প্রকটভাবে নজরে আসে না।[৭৭] বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এই গতিধারাগুলি স্মরণে রেখে যদি আমরা আমাদের আলোচ্য পর্বের দিকে নজর ফেরাই তাহলে যে বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হল এই যে উনিশ শতকের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তাবিদরা এই পর্বের বিপ্লবীদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।[৭৮] একদিকে যেমন তাঁরা জাতি কল্পনার রসদ অনেকটাই আহরণ করেছিলেন উক্ত সময়ে তৈরি হওয়া নানা হিন্দু প্রতীক থেকে, অন্যদিকে বিপ্লবী সংগঠনের গঠনপ্রণালীর প্রাথমিক ছক বা নিয়মনীতি নির্ধারণের ব্যাপারেও আলোচ্য সময়ের চিন্তাভাবনার ছাপ আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ করতে পারি। এই প্রেক্ষিতে আমরা যদি বিপ্লবী সংগঠন এবং তাদের কর্মকাণ্ডের আভ্যন্তরীণ জগতের প্রতি আলোকপাত করি তাহলে দেখতে পাব সেখানে দেশীয় পৌরুষের ভাষ্য তৈরির প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে যা ঔপনিবেশিক বয়ানে প্রতীয়মান দুর্বল বাঙালির ধারণার বিপরীতে একটি বিকল্প পৌরুষের ভাষ্য নির্মাণ করে।

চতুর্থ বিষয়টিতে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে এই বিষয়টির আঁচ পাওয়া যায় যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বিশেষত আটের দশক থেকে ভারতীয় স্বাস্থ্যজ্ঞ এবং বিদ্বৎসমাজের নানাপ্রান্ত থেকে জাতীয় স্বাস্থ্য বিষয়ে নানা উদ্বেগ এবং সচেতন হয়েওঠার উপলব্ধি প্রকট হতে দেখাযায়।[৭৯] কিন্তু এই ধরনের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী বয়ানে দেশীয় জনতার স্বাস্থ্য নিয়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগের যে প্রকাশ চোখে পড়ে তার সঙ্গে দেশীয় জনতার স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থার সম্পর্কটি কোথাও আলোচিত হয়নি। পাশাপাশি যদি আমরা সমকালীন জনস্বাস্থ্য, রোগ, মহামারী এবং মৃত্যুর হার সংক্রান্ত গবেষণার দিকে নজর দিই তাহলে

---

[৭৬] এই বিষয়টি সুমিত সরকারের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, 483–92.

[৭৭] বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের এই বিবর্তন বোঝার জন্য দ্রষ্টব্য, David M Laushey, *Bengal Terrorism & the Marxist Left : Aspects of Regional Nationalism in India, 1905-1942* (Calcutta: Firma KLM Private Limited, 1975).

[৭৮] Sanyal, *Revolutionary Pamphlets, Propaganda and Political Culture in Colonial Bengal*, 65.

[৭৯] Satadru Sen, "Health, Race and Family in Colonial Bengal," in *Children, Childhood and Youth in the British World*, ed. Shirleene Robinson and Simon Sleight (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016), 144–60; Satadru Sen, "The Conservative Animal: Bhudeb Mukhopadhyay and Colonial Bengal," *The Journal of Asian Studies* 76, no. 2 (2017): 363–81.

দেখতে পাব উনিশ শতকের শেষ দশকে এসে ব্রিটিশ ভারতীয় উপনিবেশে মৃত্যুর হার সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়[৮০] এবং তার তিন দশক আগে থেকে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মহামারী বঙ্গদেশ বিশেষত নিম্ন এবং পশ্চিম বঙ্গদেশকে জনশূন্য করে তোলে।[৮১] একাধারে ঔপনিবেশিক বয়ানে বাঙালি দেহের দুর্বলতার গৎবাঁধা ধারণার আধিক্য, দেশীয় জনতার স্বাস্থ্যের প্রকৃত চেহারা এবং এই বিষয়ে জাতীয়তাবাদী স্বাস্থ্যজ্ঞ এবং চিকিৎসক মহলের উদ্বেগ এই তিনটি বিষয়কে যদি আমরা পাশাপাশি রাখি তাহলে আলোচ্য সময়ে বাঙালির স্বাস্থ্য, পৌরুষ এবং প্রজননশীলতার আন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপটকে উন্মুক্ত হতে দেখব।

পৌরুষ : পূর্ববর্তী গবেষণা ও তত্ত্বায়ন

সেই অর্থে ইতিহাসচর্চায় নারীবাদী সমালোচনাধর্মী ধারাটির প্রবেশের পূর্বে এক অর্থে ইতিহাসচর্চা মূলত পুরুষের কার্যকলাপকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। নারীবাদী পণ্ডিতরা এর মধ্যেথেকে মেয়েদের জীবন অভিজ্ঞতাকে উদ্ধার করার প্রয়াস নেন, মানবসমাজে তাদের লিঙ্গায়িত অবস্থানকে বোঝা কতটা জরুরি সেই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। ফলত লিঙ্গের ইতিহাস এবং সেখানে মূলত মেয়েদের অবস্থানকে বোঝা আজ ইতিহাসচর্চার মূল ধারায় কিছুটা গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু সেই মাত্রায় এক লিঙ্গায়িত চরিত্র হিসেবে পুরুষের কার্যকলাপকে বোঝা এবং বিশ্লেষণ করার প্রয়াস খুবই কম। কারণ ঐতিহাসিকভাবে মেয়েদের কেবল তাদের নারীসত্তা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, পুরুষদের সর্বদা সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি।[৮২] অন্যদিকে পুরুষের কার্যকলাপকেই ইতিহাস হিসেবে মূলত গণ্য করা হলেও, পুরুষদের একটি লিঙ্গায়িত সত্তা হিসেবে বোঝার চেষ্টা করা হয়নি। ফলত মাইকেল কিমেলের মতে পুরুষদের ইতিহাস লিখতে হলে পৌরুষের সামাজিক নির্মাণ এবং পুরুষালি অভিজ্ঞতাগুলি কীভাবে পুরুষদের কার্যকলাপকে নির্ধারণ করে তা বিশ্লেষণ করতে হবে। একই সাথে তাঁর মতে আমাদের এটিও অন্বেষণ করতে হবে যে সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর

---

[৮০] Ira Klein, "Population Growth and Mortality Part I: The Climacteric of Death," *Indian Economic and Social History Review* 26, no. 4 (1989): 387–403.

[৮১] Ira Klein, "Imperialism, Ecology and Disease: Cholera in India, 1850-1950," *The Indian Economic and Social History Review* 31, no. 4 (1994): 491–518; Ira Klein, "Population Growth and Mortality in British India Part II: The Demographic Revolution," *Indian Economic and Social History Review* 27, no. 1 (1990): 33–63; Arabinda Samanta, *Malarial Fever in Colonial Bengal, 1820-1939: Social History of an Epidemic* (Kolkata: Farma KLM Private Limited, 2002).

[৮২] John Tosh, "What Should Historians Do with Masculinity? Reflections on Nineteenth-Century Britain," *History Workshop Journal* 38, no. 1 (1994): 180.

নিরিখে পৌরুষের সংজ্ঞা কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং সময়ের সাথে তাও কীভাবে পরিবর্তিত হয়। একই সাথে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে পৌরুষের মতো একটি বিমূর্ত ধারণা কেন পরিচালনা করে সেই বিষয়ে একটি সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। আর তাঁর মতে এই সকল অর্থে পুরুষ এবং পৌরুষের ইতিহাস রচিত হয়নি।[৮৩] তাই শুধু পুরুষের কার্যকলাপের ইতিহাসকে 'পুনরুদ্ধার' করা বর্তমান সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয়, বর্তমান সন্দর্ভ মূলত পৌরুষের সামাজিক ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করতে চায় যার একটি বড় অংশ জুড়ে আছে পুরুষের লিঙ্গায়িত অভিজ্ঞতা। লিঙ্গ এবং বিশেষ করে পৌরুষকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে একটি *ক্যাটেগরি* হিসেবে গণ্য করার এই প্রচেষ্টা খুব সাম্প্রতিক। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় বিগত প্রায় চার দশকে খুব ধীরগতিতে এর গুরুত্বকে ঐতিহাসিকরা উপলব্ধি করেছেন এবং মানববিদ্যাচর্চার অন্যান্য ধারার সাথে একটি কথপোকথনের মধ্য দিয়ে তার যাত্রাপথ নির্ধারণ করছেন।

o উপনিনেশবাদ ও পৌরুষ

বিশেষ করে গবেষকরা ঔপনিবেশিক ভারতীয় উপমহাদেশে 'মেয়েলি' এবং 'পুরুষালি' এই লিঙ্গায়িত *ক্যাটেগরিকে* সমস্যায়িত (problematize) করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন ঔপনিবেশিক ক্ষমতার একটি বিশেষ অভিব্যক্তি থেকে যাকে পৌরুষদৃপ্ত এবং পৌরুষের *কাল্ট* হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিয়ে আগ্রহী ঐতিহাসিকরা ভিক্টোরীয় এবং এডওয়ার্ডীয় ব্রিটেনে 'পৌরুষদৃপ্তির এই কাল্টটির' নির্মাণ এবং বিবর্তনের বিস্তৃত রূপরেখা ইতিপূর্বেই তৈরি করেছেন।[৮৪] ভারতে ব্রিটিশ বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান জনবসতি এবং বিশেষকরে ঔপনিবেশিক ভারতীয় আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর জীবনশৈলীর অধ্যয়নে এক অর্থে এই ভিক্টোরীয় পাবলিক স্কুল, ক্লাব, ভিক্টোরীয় পৌরুষ, ক্রীড়া সংস্কৃতি এবং সামরিকতাবাদের (militarism) মতো পৌরুষকেন্দ্রিক সংস্কৃতির কী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার অন্বেষণের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।[৮৫] একই সাথে

---

৮৩ Michael S. Kimmel, "Invisible Masculinity," *Society* 30 (1993): 28–35.

৮৪ Norman Vance, *The Sinews of the Spirit: The Ideal of Christian Manliness in Victorian Literature and Religious Thought* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); J. A Mangan, *Athleticism in the Victorian and Edwardian Public School : The Emergence and Consolidation of an Educational Ideology* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); H. John Field, *Toward a Programme of Imperial Life : The British Empire at the Turn of the Century* (Oxford: Clio Press, 1982); Graham Dawson, *Soldier Heroes: British Adventure, Empire and Imaging of Masculinities* (London ; New York: Routledge, 1994).

৮৫ Kenneth Ballhatchet, *Race, Sex, and Class Under the Raj: Imperial Attitude and Politics and Their Critics 1793-1905,* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1980); Francis G. Hutchins, *The Illusion of Permanence :*

গবেষকরা এই দিকটিকেও অনেকটা আলোচনায় এনেছেন যে ঔপনিবেশিক শাসন ঔপনিবেশিকরণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় অভিজাত, রাজা-মহারাজা এবং এলিটদের সন্তানদের জন্য যে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে উপযুক্ত 'পুরুষালি' আচরণ শিক্ষার প্রকল্পগুলি কীভাবে কার্যকরী হয়।[৮৬] গবেষকরা আর একটি বিষয়ে বিশেষ করে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে দেশীয় জনগোষ্ঠীকে 'রণনিপুণ' এবং 'অরণনিপুণ' জাতির বৈপরীত্যে বিভাজিত করে সেনাবাহিনীর নিয়োগ নীতি নির্ধারণ করার প্রয়াসগুলির ওপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন ।[৮৭] সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় একটি বৈপরীত্যের মাধ্যমে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের তথাকথিত 'পুরুষালি' জনগণ এবং বাংলা ও ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় 'স্থায়ীবসতিপূর্ণ' অঞ্চলের জনগণকে 'মেয়েলি' হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার প্রয়াস অথবা 'বলশালী' মুসলমান ও 'মেয়েলি' হিন্দু এই গৎবাঁধা ধারণাগুলির নির্মাণের প্রয়াসগুলি ঐতিহাসিকরা বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন।[৮৮] এইক্ষেত্রে তাঁরা দেখিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর পুরুষদের ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের এই বিভাজনমূলক ধারণাগুলি কীভাবে ভারতীয়কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কৌশল হিসেবে কাজে এসেছে। একই সাথে ভারতীয়দের কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষ উক্ত ধারণাগুলিকে কীভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছে। যদিও এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রেম চৌধুরীর প্রবন্ধটি বাদ দিয়ে উল্লিখিত ঐতিহাসিকরা কেউই ঠিক লিঙ্গের নিরিখে আলোচ্য প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করেননি। কিন্তু এই আলোচনাগুলি অবশ্যই উপনিবেশবাদের লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অনুসন্ধানের রাস্তা প্রস্তুত করেছে।

British Imperialism in India (Princeton: Princeton University Press, 1967); Lewis D Wurgaft, *The Imperial Imagination : Magic and Myth in Kipling's India* (Middletown, CT: Wesleyan University Press , 1983).

[৮৬] J. A Mangan, "Eton in India: The Imperial Diffusion of a Victorian Educational Ethic," *History of Education* 7, no. 2 (1978): 105–18; Mady Martyn, *Martyn Sahib: The Story of John Martyn of Doon School* (New Delhi: Dass Media, 1985).

[৮৭] David Omissi, "'Martial Races': Ethnicity and Security in Colonial India 1858–1939," *War & Society* 9, no. 1 (1991): 1–27.

[৮৮] John Rosselli, "The Self-Image of Effeteness: Physical Education and Nationalism in Nineteenth-Century Bengal," *Past and Present* 86, no. 1 (1980): 121–48; David Arnold, "Bureaucratic Recruitment and Subordination in Colonial India: The Madras Constabulary, 1859–1947," in *Subaltern Studies 4: Writing on South Asian History and Society* (New Delhi: Oxford University Press, 1985), 1–53; Philip Constable, "The Marginalization of a Dalit Martial Race in Late Nineteenth and Early Twentieth Century Western India," *The Journal of Asian Studies* 60, no. 2 (2001): 439–78; Prem Chowdhry, "Militarized Masculinities: Shaped and Reshaped in Colonial South-East Punjab," *Modern Asian Studies* 47, no. 3 (2013): 713–50.

প্রাচ্যবাদ নিয়ে এডওয়ার্ড সায়িদের প্রভাবশালী গ্রন্থ *Orientalism* লিঙ্গ, সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আগ্রহী বহু গবেষককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই ধারায় খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ আমরা আশিস নন্দীর রচনায় লক্ষ করতে পারি। ঔপনিবেশিকতার মনোবিজ্ঞান/মনস্তত্ত্বনিয়ে তাঁর অগ্রণী আলোচনায় ভারতে ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদের অতিপুরুষালিপ্রতর্কের প্রভাব সম্পর্কে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি এইক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে যৌন ও রাজনৈতিক— এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক নজরে এনেছেন যা তাঁর ভাষায় ‘language of homology between the sexual and the political’.[৮৯] আশিষ নন্দী মনেকরেন জ্ঞানদীপ্তি-পরবর্তী ইউরোপে পুরুষালি এবং মেয়েলি এই কঠোরদ্বিবিভাজনের যে লিঙ্গ মতাদর্শ প্রকট হয়,তা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অতিপুরুষালি মতাদর্শের মধ্যে প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। তাঁর মতে এর প্রভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যে পালিত তরল এবং অনেকটা ছড়িয়ে থাকা লিঙ্গপরিচয় নতুন আকার নিতেথাকে। ব্রিটিশদের মধ্যে পৌরুষের যে প্রতিযোগী আক্রমণাত্মক-কিন্তু-ভদ্রব্যক্তিসুলভ আদর্শ বর্তমান ছিল সেটি আশিস নন্দীর মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় এলিট পুরুষরা বেশিরভাগ আত্মস্থ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যকে ব্রিটিশপৌরুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এইক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রতি গান্ধির গভীর সমালোচনা এবং প্রতিস্পর্ধাকে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ব্রিটিশ পৌরুষের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা হিসেবে যে পৌরুষ দাঁড়িয়েছিল যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ এবং শারীরিক বলের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর।

উপনিবেশবাদী শাসনকে ভারতীয় সমাজের লিঙ্গ এবং যৌন অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের জলবিভাজিকা হিসেবে দেখার প্রবণতার মধ্যে আমরা প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়কে *রোমান্টিসাইজ* করার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারি।[৯০] এই প্রবণতাটি বিশেষভাবে প্রকট হতে দেখাযায় সমকালের বস্তুবাদী সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাক্-আধুনিক ভারতীয় লিঙ্গপরিচয় এবং যৌনতা সম্পর্কে রঙিন ছবি তুলেধরার প্রবণতারমধ্য দিয়ে, যাতে আবার অনেক সময় প্রাচ্যবাদী অথবা জাতীয়তাবাদী নানা সিদ্ধান্তকেই পুনর্বহাল করার লক্ষণ নজর করা যায়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজের লিঙ্গসত্তা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ যা

---

[৮৯] Ashis Nandy, *Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonialism* (New Delhi: Oxford University Press, 1983), 6.

[৯০] এমন একটি আলোচনা, Ruth Vanita and Saleem Kidwai, *Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History* (Basingstoke: Macmillan, 2000).

আমাদের সেই প্রেক্ষিতে প্রোথিত লিঙ্গ মতাদর্শের তুলনায় অনেক জটিল বিন্যাসকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।[৯১] মুঘল সাম্রাজ্য এবং পৌরুষ নিয়ে রোজালিন্ড ও'হ্যানলনের অধ্যয়নে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এবং পৌরুষের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ভালোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।[৯২] এখানে ও'হ্যানলন উত্তর ভারতে অষ্টাদশ শতকে মুঘলদের পতন এবং অসংখ্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের অস্থির প্রেক্ষাপটে লিঙ্গায়িত সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি এইক্ষেত্রে 'সামরিক সাহসিকতার বিধি এবং সঠিক পৌরুষপূর্ণ আচরণ'-এর[৯৩] ধারণা শাসক এবং অভিজাতদের মধ্যে এবং বেতনভোগী সামরিক নেতা এবং তাদের *ওয়ারব্যান্ডের* মধ্যে জোট বাঁধতে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।ও'হ্যানলন দেখান একসময় মুঘল শাসকদের দ্বারা অভিজাতদের সমর্থকদের নিয়োগের জন্য সামরিক পুরুষত্বের উক্ত বিধি সফলভাবে কার্যকরী হলেও এই মুঘল মডেল অষ্টাদশ শতকের সামরিক পুরুষত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী মডেলগুলি আবির্ভূত হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে *চ্যালেঞ্জের* সম্মুখীন হয়। তিনি এইক্ষেত্রে মনে করেন মুঘল 'সাম্রাজ্যিকপৌরুষ'-এর বিধিটি খুব কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে – যাকে উত্তর ভারতে অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাতরা অনুকরণ এবং অস্বীকার দুটোই করতে থাকে। এইক্ষেত্রে তিনি দেখান একদিকে অনেকগুলি পরস্পর বিপরীতমুখী বিধি যেমন-- একদিকে সরল এবং পৌরুষপূর্ণ সাধারণ সৈনিকের ধারণা অপর দিকে রাজদরবারের বিলাসবৈভব এবং হারেমের নারীপরিবৃত জীবনের মধ্যে নানা ধরনের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে যেমন পৌরুষের মূল্যবোধগুলি বিকশিত হয়, অন্যদিকে রাজদরবারে সৈনিকদের মধ্যে লড়াইয়ের অভ্যাস, আমোদের জন্য শিকার যাত্রা, পশুদের লড়াই এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকৃত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অভিজাত রাজনৈতিক পরিসরে অষ্টাদশ শতকে 'সাম্রাজ্যিক পৌরুষের' ধারণাটি বিকশিত হয়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক 'সাম্রাজ্যবাদী পৌরুষ' নিয়ে তাঁর এই অধ্যয়ন স্পষ্ট করে দেয় যে পৌরুষকে

[৯১] Ruby Lal, *Domesticity and Power in the Early Mughal World: Historicizing the Haram* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); Walter Penrose, "Colliding Cultures: Masculinity and Homoeroticism in Mughal and Early Colonial South Asia," in *Queer Masculinities, 1550–1800 : Siting Same-Sex Desire in the Early Modern World*, ed. Katherine O'Donnell and Michael O'Rourke (New York: Palgrave Macmillan, 2006); Jarrod L. Whitaker, *Strong Arms and Drinking Strength: Masculinity, Violence, and the Body in Ancient India* (New Delhi: Oxford University Press, 2011); Ali Anooshahr, "The King Who Would Be Man: The Gender Roles of the Warrior King in Early Mughal History," *Journal of the Royal Asiatic Society* 18, no. 3 (2008): 327–40.

[৯২] Rosalind O'Hanlon, "Issues of Masculinity in North Indian History: The Bangash Nawabs of Farrukhabad," *Indian Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (1997): 1–19.

[৯৩] Ibid., 5.

ক্ষমতার একটি রূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি প্রথম করেনি। তার আগেও ভিন্ন প্রেক্ষিতে এমন প্রয়াস কার্যকারী থেকেছে।এইক্ষেত্রে তিনি আশিস নন্দীকে সমালোচনা করে দেখিয়েছেন, নন্দীর এই অনুমান সঠিক নয় যে সমরনিপুণ ক্ষত্রিয় ঐতিহ্য ছিল ভারতে প্রাক-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশ, যতক্ষণ না তা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অতিপুরুষালি সংস্কৃতির প্রভাবে চাগাড় দিয়ে ওঠে।[৯৪] সেখান থেকে এই অনুমিত জলবিভাজিকাটি সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে যে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের তরল, নমনীয় লিঙ্গপরিচয় ব্রিটিশ শাসনে অনমনীয় হয়েপড়ে।

মৃণালিনী সিন্‌হা, ভারতে 'মূলধারার' উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে একটি ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন, যেখানে জাতপাত, লিঙ্গ, যৌনতা এবং শ্রেণীর মতোপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় ক্ষমতার অক্ষগুলি একীভূত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলত এক অর্থে তিনি জাতীয়তাবাদ, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদ্‌পটে উক্ত অক্ষগুলির পারস্পরিক ছেদবিন্দু(intersection)-গুলিকে বিস্তারিতভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন, যার কেন্দ্রে করেছে 'ঔপনিবেশিক পৌরুষ' নির্মাণ প্রক্রিয়া। ফলত যে পদ্ধতিতে তিনি 'ঔপনিবেশিক পৌরুষের' নির্মাণ প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা বহু কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত তিনি ঔপনিবেশিক ক্ষমতার গঠনপ্রক্রিয়াকে বুঝতে লিঙ্গ, বিশেষত পৌরুষকে ঘিরে তৈরি হওয়া আলোচনাগুলিকে যেভাবে বুঝেছেন তা অভিনব। ইংরেজ জাতি তার 'পৌরুষদৃপ্ততার' যুক্তিতেই 'মেয়েলি' বাঙালি তথা ভারতীয়দের ওপর শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম – এই উপনিবেশবাদী মতাদর্শটি আমাদের কাছে 'ঔপনিবেশিক পৌরুষের' নির্মাণ ইতিহাসকে বোধগম্য করেতোলে, যেখানে পৌরুষ ক্ষমতার খুব কেন্দ্রীয় চিহ্নক হিসেবে সামনে আসে। এইক্ষেত্রে তিনি পৌরুষ নির্মাণের প্রক্রিয়াকে শুধুই প্রতর্কের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেননি। বরং ১৮৫৭ পরবর্তী বাংলায় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বস্তুমুখী পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বুঝতে চেয়েছেন। এইক্ষেত্রে তিনি উনিশ শতকের শেষ সময়টিকে বেছে নিয়েছেন যখন উপনিবেশবিরোধী বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাথমিক সমালোচক হয়ে ওঠে। ইলবার্ট বিল বিতর্ক, নেটিভ ভলান্টিয়ার মুভমেন্ট, এবং সহবাস সহমতি বিলকে ঘিরে ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশিতের মধ্যে যে আদর্শগত বিরোধ এবং সহমতির স্থানগুলি গড়ে ওঠে সেই বিষয়টির ওপর মৃণালিনী সিন্‌হা বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। এটি করার মধ্য দিয়ে তিনি ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসকে 'সাম্রাজ্যবাদীসমাজ গঠন'

---

[৯৪] Ibid., 17.

বা ‘imperial social formation’-এর বৃহত্তর ছকের মধ্যে নিয়ে আসেন, এবং দেখান কীভাবে উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে থাকা ব্রিটিশ ইতিহাস একে অপরের দ্বারা আকার পায়। পৌরুষের নির্মাণে জাতপাত, শ্রেণী, বর্ণবাদ, যৌনতার প্রসঙ্গকে সংযুক্ত করে তার বৃহত্তর সামাজিক সংযোগগুলির প্রতি তিনি নজরফেলেন। দেখান ঔপনিবেশিক ভারতে ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশিতের নিজেদের মধ্যে বাঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশিতদের মধ্যে একাধিক অক্ষকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা ক্রিয়াশীল হয়। ফলত উপনিবেশ এবং উপনিবেশিতের মধ্যে ক্ষমতার সমীকরণের তুলনায় জটিল যোগাযোগের কাহিনীটি সামনে আনেন।

o দেশীয় পৌরুষ, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও আধিপত্য

মৃণালিনী সিন্‌হা ঔপনিবেশিক মতাদর্শের কেন্দ্রে যেমনভাবে লিঙ্গ-প্রসঙ্গটি নিয়ে এসে অতিপুরুষালি ইংরেজ এবং মেয়েলি বাঙালির নির্মাণের প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরেন, সেই প্রকল্পটি মূলত ভারতীয় এলিট পুরুষের পৌরুষ চেতনাকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা ইন্দিরা চৌধুরী চমৎকারভাবে অধ্যয়ন করেছেন।[৯৫] মূলত ১৮৭০নাগাদ উদীয়মান সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবদ এইক্ষেত্রে তাঁর আলোচনার সূচনাকাল, যেখানে তিনি ঔপনিবেশিক পৌরুষের যুক্তি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভদ্রলোক কীভাবে আত্মীকরণ করে সেই দিকটির ওপর আলোকপাত করেন। এঁদের দু’জনের আলোচনাতেই যে বিষয়টি সাধারণ তা হল, দুর্বল এবং মেয়েলিত্বের অপবাদ যেভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আত্মীকরণ করে নেয়, এবং এর নিরিখে বাঙালির পৌরুষদৃপ্ততার অবধারণাকে পুনর্নির্মাণ করতে চায় তার মধ্য দিয়ে কীভাবে আধিপত্যের ভাষ্য তৈরি হয় সেই প্রসঙ্গটি। এটি করতে গিয়ে ইন্দিরা চৌধুরী ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে অধীনতার যে লিঙ্গভিত্তিক ভাষ্য তৈরি হয় তার প্রতিবাঙালি ভদ্রলোক পুরুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তারবিবিধ রূপকে সামনে আনেন। এইক্ষেত্রে যেমন হিন্দুমেলার প্রচেষ্টা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন যার মধ্য দিয়ে দেশীয় শরীরচর্চার সংস্কৃতিকে জীবন্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয় এবং গুপ্তসমিতির কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তা পুনরায় উত্থাপিত হয়, অন্যদিকে তিনি দেখান প্রতাপাদিত্য এবং শিবাজি উৎসবের মতো ‘উদ্ভাবিত’ আচার-প্রথাগুলি পুরুষালি ইতিহাসের দিকে নজর ফেরানোর কাজ করে। এই ধরনের পুরুষালি হিন্দুধর্মের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তিনি বিবেকানন্দর কর্মকাণ্ডের মধ্যে

---

[৯৫] Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History: Gender and the Politics of Culture in Colonial Bengal*, (Delhi: Oxford University Press, 2001).

চিহ্নিত করেন যেখানে দৃঢ় তপস্বী সন্ন্যাসীর অবয়ব জনপ্রিয় হয়েওঠে যা পরবর্তী স্বদেশি আন্দোলনের ভাবধারাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। আর চমৎকারভাবে তিনি দেখান এই ধরনের পুরুষালি অবয়বের খোঁজ নারীচরিত্রের মধ্যেও কীভাবে প্রবেশ করে, ইতিহাস এবং কিংবদন্তির চরিত্র এবং দৃঢ়চেতা নারী চরিত্রদের ওপর পৌরুষ ও বীরের বিশেষণ কীভাবে আরোপিত হয়। ফলত মৃণালিনী সিনহা এবং ইন্দিরা চৌধুরীর অধ্যয়ন থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে মেয়েলিত্বের ধারণার এই আত্মীকরণনিজেই একটি নতুন আধিপত্যবাদী প্রকল্পের অংশ হয়েওঠেযেখানে 'হৃত' পৌরুষের 'পুনরুদ্ধারের' প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এলিট, উচ্চবর্ণ এবং হিন্দু পৌরুষের সামাজিক কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়। এই আধিপত্যবাদী প্রবণতাটিকে আরও কিছুটা বৃহৎ সামাজিক প্রেক্ষাপট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তনিকা সরকার।[৯৬] এইক্ষেত্রে তিনি বহু স্তরীকৃত বাঙালি মধ্যবিত্তের জগৎকে উন্মোচিত করে সেখানে দেশীয় পৌরুষের সংকটকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন যে বিষয়টি নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

কিন্তু ঔপনিবেশিক পৌরুষকে কেবল 'কর্তৃত্ব এবং প্রতিরোধের' দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর মধ্যেকার জটিলতাগুলিকে কতটা ছুঁতেপারা সম্ভব সেই প্রশ্নটি পল ডিমিও-র আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণভাবে উত্থাপিত হয়েছে।[৯৭] তিনি ভারতীয়দের 'সভ্যকরণের' মিশনে ফুটবলের মতো পুরুষালি হিসেবে চিহ্নিত ব্রিটিশ খেলাকে যেভাবে এই দেশে প্রবর্তন করা হয়েছিল তা পাঞ্জাবি এবং বাঙালিরা কীভাবে গ্রহণ করেন সেই দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখান ঔপনিবেশিক বয়ানে 'সমরপটু' জাতি হিসেবে পাঞ্জাবিদের এবং 'মেয়েলি' হিসেবে বাঙালিদের চিহ্নিত করা হলেও বাঙালিরা যেভাবে একে উপনিবেশ বিরোধী ক্রীড়া সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, পাঞ্জাবের ফুটবলের ইতিহাসে সেই প্রতিরোধ তৈরি হয়না। ফলত বাঙালিরা এই খেলাকে যেভাবে তাদের পৌরুষের ভিন্নতা প্রতিপন্ন করার জন্য চর্চা করতে থাকে তার রাজনীতি পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি যেটা এক একটি অঞ্চলের পৌরুষের কল্পনার ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাকে দর্শায়। তিনি অন্য একটি প্রবন্ধে এই দিকটিও তুলে ধরেছেন যে বাঙালি প্রজাদের অনুশাসন এবং পৌরুষের পাঠ পড়াতে প্রাথমিকভাবে কলকাতায় ফুটবল

---

[৯৬] এই বিষয়টির জন্য বিশেষ করে দ্রষ্টব্য তাঁর বইয়ের সূচনা অংশটি।Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 1-22.

[৯৭] Paul Dimeo, "Colonial Bodies, Colonial Sport: 'Martial' Punjabis, 'Effeminate' Bengalis and the Development of Indian Football," *International Journal of the History of Sport* 19, no. 1 (2002): 73.

ক্লাবগুলি তৈরি হলেও ভিন্ন ভিন্ন সময়পর্বে তা কীভাবে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকে।[৯৮]

আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণাটি নিয়ে তাত্ত্বিকরা বিগত চার দশকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। রেইউইন কনেল-কে এইক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি যদিও পৌরুষের আধিপত্যবাদী রূপকেই শুধু চিহ্নিত করেননি, পৌরুষও যে বহুবিধ সেই বিষয়টির উপরও আলোকপাত করেছেন।[৯৯] কনেল তাঁর এই তত্ত্বায়নের সমালোচনাগুলির প্রেক্ষিতে পরবর্তী দশকে নিজের ধারণার বেশ কিছু পরিমার্জনও করেন। তাঁর মতে আধিপত্যবাদী পৌরুষ অন্যান্য পৌরুষের থেকে, বিশেষত অধীনস্থ পৌরুষগুলির থেকে পৃথক। পরিসংখ্যানগতভাবে এটি বহু সংখ্যক পুরুষের মধ্যে চর্চিত হবে তা মনে করা হয় না, বরং ভাবা হয় এটি ক্ষুদ্র সংখ্যক পুরুষের আয়ত্তাধীন। কিন্তু আবশ্যিকভাবে এটিকেই পৌরুষের প্রামাণ্য বিধি মনে করা হয়। কোনো এক বিশেষ সময়ে একে ধারণ করাকেই পুরুষ হিসেবে সবচাইতে সম্মানজনক মনে করা হয়, যার নিরিখে পুরুষ হিসেবে অন্য সকল ধরনের পুরুষরা নিজেদের অবস্থান চিহ্নিত করেন, এবং পুরুষদের অধীনে নারীর বিশ্বজনীন অধীনতার ধারণা দার্শনিকভাবে এই পৌরুষ দ্বারাই মান্যতা পায়। কড়া রকম পুরুষালি কর্তৃত্ব চর্চা না করেও যে সকল পুরুষ পিতৃতন্ত্রের সকল সুযোগ-সুবিধে ভোগ করেন তাকে এর সহযোগী (compliance) পৌরুষ হিসেবে গণ্য করা যায়। এই সহযোগী গোষ্ঠীর সাথে ভালো সম্পর্ক এবং বিসমকামী নারীদের সম্মতি থাকলে এর আধিপত্য সবচাইতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আধিপত্য বলতে এখানে হিংসাকে বোঝানো হয় না, যদিও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এ উপকৃত হতে পারে। আধিপত্যের অর্থ এখানে সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান এবং সমঝোতার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা অর্জন।[১০০]

পৌরুষের কার্যপ্রণালী বুঝতে কনেল-এর এই তত্ত্বায়নটির গুরুত্ব অস্বীকার না করেও পরবর্তী গবেষকরা এই তত্ত্বায়নের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করে দেখিয়েছেন পৌরুষকে বোঝার এই ছকটি ক্ষমতার অন্যান্য অক্ষগুলি বিবেচনা ব্যতীত ক্রিয়াশীল থাকতে পারেনা। ফলত লিঙ্গ, শ্রেণী, প্রজন্মের মতো অন্যান্য বিষয়গুলির

---

[৯৮] Paul Dimeo, “Football and Politics in Bengal: Colonialism, Nationalism, Communalism,” *Soccer and Society* 2, no. 2 (2001): 57–74.

[৯৯] Raewyn Connell, *Masculinities* (Cambridge: Polity, 1995).

[১০০] R. W Connell and James W Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept,” *Gender & Society* 19, no. 6 (2005): 832.

সাথে পৌরুষের আন্তঃসম্পর্কের নিরিখে পৌরুষের আধিপত্যের চরিত্রকে বোঝা একান্ত প্রয়োজনীয়।[১০১] একই সাথে পৌরুষের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা, জাতপাত ও শ্রেণীতে বিভাজিত ঔপনিবেশিত ভারতীয় সমাজে আধিপত্য কায়েম করতে চাওয়ার প্রক্রিয়া যে ভিন্নতর সেই দিকটি সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। কনেল তাঁর পরবর্তী প্রকাশনায় আধিপত্যবাদী পৌরুষের সংজ্ঞায় পুনরায় কিছু সংযোজন ঘটিয়েছেন এবং এই বিষয়টিও স্বীকার করেছেন যে আধিপত্যবাদী পৌরুষের কোনো বিশ্বজনীন রূপ থাকতে পারে না। উপনিবেশ অথবা দক্ষিণের দেশগুলির পৌরুষের অভিজ্ঞতা ইউরোপ-আমেরিকায় পৌরুষের থেকে আলাদা হতে পারে।[১০২] এক্ষেত্রে পৌরুষের অভিজ্ঞতাকে সেইভাবে নজরে না আনলেও ব্রিটিশ ভারতের মতো ঔপনিবেশিত রাষ্ট্রে আধিপত্যের প্রশ্নটিকে পণ্ডিতরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করেছেন।[১০৩] বলা বাহুল্য কনেল-এর মতো অ্যান্টোনিও গ্রামসির আধিপত্য সম্পর্কিত তত্ত্বায়নটি দক্ষিণ এশিয়ায় ঐতিহাসিকদেরও ক্ষমতা এবং সামাজিক সম্পর্কের সমীকরণকে বোঝার প্রচেষ্টাগুলিকে প্রাথমিকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।[১০৪]

---

[১০১] Ann-Dorte Christensen and Jørgen Elm Larsen, "Gender, Class, and Family: Men and Gender Equality in a Danish Context," *Social Politics* 15, no. 1 (2008): 53–78; Ann-Dorte Christensen and Sune Qvotrup Jensen, "Combining Hegemonic Masculinity and Intersectionality," *Norma : International Journal for Masculinity Studies* 9 (2014): 60–75.

[১০২] Raewyn Connell, "Masculinities in Global Perspective: Hegemony, Contestation, and Changing Structures of Power," *Theory and Society* 45, no. 4 (2016): 303–18.

[১০৩] এইক্ষেত্রে রনজিৎ গুহর একটি আলোচনা উল্লেখ্য। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক এবং প্রাক্-ঔপনিবেষিক রাষ্ট্রের সাথে প্রজার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতার সাধারণ একটি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তা হল দুই ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র সরাসরি সংঘাত (coercion)-এর মধ্য দিয়ে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব (Domination) প্রতিষ্ঠার দর্শনকে সক্রিয় রেখেছে। রণজিৎ গুহর মনে করেন এখানে রাষ্ট্র তার ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রজার সাথে কোনো ধরনের সমঝোতা বা persuasion-এর প্রক্রিয়ায় এগোয়নি যার মধ্য দিয়ে আধিপত্য বা hegemony-র কোনো ভাষ্য তৈরি হয়। তিনি ঔপনিবেশিক ভারতে দেশীয় এলিট গোষ্ঠীর মধ্যেও ক্ষমতার এই একই কর্তৃত্ববাদী ভাষ্যকে অব্যাহত থাকতে দেখেছেন।Ranajit Guha, "Dominance Without Hegemony and Its Historiography," in *Subaltern Studies VI: Writings on South Asian History and Society*, ed. Ranajit Guha (New Delhi: Oxford University Press, 1989), 210–309. উল্লিখিত এই প্রবন্ধটিতে গুহ তাঁর তত্ত্বটিকে উপস্থাপন করেন যা বিস্তৃতভাবে তিনি তাঁর গ্রন্থেও আলোচনা করেছেন। Ranajit Guha, *Dominance Without Hegemony : History and Power in Colonial India* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

[১০৪] আধিপত্য বিষয়ক রণজিৎ গুহর যুক্তিক্রম যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে তা বলা যায় না। প্রথমত আমরা যদি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে আলোকপাত করি তাহলে তার কেন্দ্রে (metropole) শাসনের যে ধরনের দার্শনিক নীতি তৈরি হয়েছে, উপনিবেশগুলিতে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার নানা অন্যথা বা তারতম্য লক্ষ করা যায়, যে বিষয়টি নীলাদ্রি ভট্টাচার্য নজরে এনেছেন। তাঁর মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে শাসনের যে মতাদর্শগুলি বিকশিত হয়েছে, উপনিবেশগুলিতে তা প্রয়োগের সময় অনেকটাই নির্বাচিত থেকেছে। এই প্রয়োগ প্রক্রিয়াগুলি নির্ধারিত হয়েছে উপনিবেশগুলির তৎকালীন প্রয়োজনীয়তার উপর। তাঁর মতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার প্রাত্যহিক কার্যকলাপে বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করত না। রাষ্ট্রীয় নীতি এবং আইনের ক্ষেত্রে বলপূর্বক কিছু আরোপ করার প্রবণতার পরিবর্তে চেষ্টা হতো সম্মতি আদায় এবং বিরোধিতাকে স্বপক্ষে আনার মাধ্যমে প্রশমিত করার। ফলত ঔপনিবেশিক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা ছিল রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য তৈরির জন্য তার সুনামকে সুনিশ্চিত করা, শাসনের বৈধতা তৈরির জন্য কিছু দূর পর্যন্ত তার প্রতি আত্মবিশ্বাস তৈরির চেষ্টা দেখতে পাওয়া যেত।

এইক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি দেশীয় সমাজে মধ্যবিত্তের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বাসনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের কল্পিত জাতিচেতনায় এই আধিপত্যের প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু ভদ্রলোকের কল্পিত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ কীভাবে ঔপনিবেশবিরোধী ভারতীয় জাতিচেতনাকে আকার দিয়েছে সেই দিকটি সবচাইতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তনিকা সরকার দেখিয়েছেন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে মধ্যবিত্ত পুরুষের আধিপত্যের চেতনা আসে তাদের নিজস্ব ক্ষমতাহীনতার কল্পনা থেকে, যেখানে মনেকরা হতে থাকে যে তার অস্তিত্ব সংকটের মুখে। বিশেষ করে তুলনায় আরও বৃহৎ আধিপত্যবাদী ক্ষমতার সামনে নিজের দুর্বলতার উপলব্ধি এই আধিপত্যবাদী প্রবণতাকে প্রকট করে তোলে। এইক্ষেত্রে সরকার বৃহৎ আধিপত্যবাদী ক্ষমতা হিসেবে পশ্চিমী যৌক্তিকতার কথা বলতে চেয়েছেন।[১০৫] এক্ষেত্রেআমরা যদি বাঙালি মেয়েলিত্বের অপবাদ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বিকল্প পৌরুষের কল্পনাগুলির দিকেআলোকপাত করি তাহলেই বাঙালি মধ্যবিত্তের লিঙ্গচেতনা এবং সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আন্তঃসম্পর্কের দিকটি প্রত্যক্ষ করা যায়।

তিনি আরও দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র আইনের ধারণাকে, *benevolence-এর* ধারণাকে সামনে এনে *persuasion*-এর কাজ করেছে এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের যথার্থতা (legitimization) প্রতিপন্ন করেছে। ইংল্যন্ডে কোনো একটি মতাদর্শ (কৃষি অথবা করের ক্ষেত্রে উপযোগবাদ) যেমন ভাবেই জন্ম নিক, উপনিবেশে তার প্রয়োগের সময় সেখানকার বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী তা নানা মোড় নিয়েছে। ফলত নীতিতেও পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনগুলির পিছনে কাজ করেছে স্থানীয় নানা প্রতিরোধ, অসন্তোষ অথবা বিদ্রোহ। ফলত ভট্টাচার্য মনে করেন বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ (কর্তৃত্ব) এবং সম্মতির (আধিপত্য) বিপরীত যুগ্মের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পার্থক্যকে পর্যাপ্তভাবে অনুধারন করা সম্ভব নয়। গ্রামসি স্বৈরতান্ত্রিক পূর্ব ইউরোপ এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্র পরিচালিত পশ্চিম-ইউরোপের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যে দুটি ভিন্ন প্রবণতাকে বুঝতে চেয়েছিলেন, তা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্টিত হলেও তা কেবলমাত্র বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ এবং দমনমূলক নীতির মাধ্যমে টিকে থাকেনি। তারা সম্মতি জোগাড় করেছে নিজের শাসনকে বৈধ প্রমাণ করার মধ্য দিয়ে, কিছু মাত্রায় একটি গণকর্তৃপক্ষ হিসেবে সামাজিক ন্যায় এবং অনুশাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। Niladri Bhattacharya, "The Making of Agrarian Policy in British India," in *Colonial State and Agrarian Society*, ed. Burton Stein (Delhi: Oxford University Press, 1992), 143, 147.

এইক্ষেত্রে উল্লেখ্য পেরি অ্যান্ডারসন দেখিয়েছেন, গ্রামসি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব আর আধিপত্যের স্পষ্ট বিপরীত শক্তির মতো কাজ করে না। বিশেষ করে তাঁর পরের দিকের রচনাতে 'Hegemony' বোঝাতে 'consent'-এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর ধারণা হিসেবে 'coercion'-কে দেখেননি। ফলত সংসদীয় গণতন্ত্রে hegemony বলতে তিনি consent এবং coercion-এর সংযুক্তিকে বোঝাতে চেয়েছেন। Perry Anderson, "Antinomies of Antinio Gramsci," *New Left Review*, no. 100, nov. 1976-Jan. 1977. নীলাদ্রি ভট্টাচার্যের লেখা থেকে উদ্ধৃত। Bhattacharya, 147.ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং দেশীয় জনতার মধ্যে শুধু নয়, আধিপত্য এবং অধীনতার সম্পর্কের এই অবধারণার নিরিখে আমরা যদি সমকালীন বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসকে বোঝবার প্রয়াস নিই তাহলে সম্ভবত এই ক্ষমতার অক্ষে পৌরুষের অবস্থানের বৃহৎ চেহারা অনুধাবন করতে পারি যে দিকটির প্রতি কনেল তাঁর পরবর্তী রচনায় ইঙ্গিত করেছেন। Connell, "Theor Soc."

[১০৫] Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 234.

০ হিন্দু সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ, জাতপাত, হিন্দু পৌরুষ ও আধিপত্য

সম্প্রতি পৌরুষের অধ্যয়নে তুলনায় একটি নতুন ক্ষেত্রগুরুত্ব পেয়েছে। তা হল ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রতিক ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিকাশকে লিঙ্গ রাজনীতির নিরিখে বোঝার প্রচেষ্টা। উত্তর ভারতের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে অধ্যয়ন থেকে এই প্রবণতাটি অনুধাবন করা যায় যে শুদ্ধি এবং সংগঠন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কীভাবে হিন্দু পৌরুষের সংকটের অবধারণা প্রকট হয়, আর মুসলমান পুরুষদেহ 'অপরের' স্থান নিতে থাকে।[১০৬] ১৮৪৭ সালে দেশভাগকে কেন্দ্রকরে হওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অধ্যয়ন থেকে উঠে আসে যেমেয়েদের দেহকীভাবে দুটি সম্প্রদায়ের সীমানা চিহ্নিতকরা বা সীমানা লঙ্ঘন করার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।[107] অপরদিকে এই সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের পুরুষদের ধর্ষক এবং অসহায় মহিলাদের অপহরণকারী হিসাবেদর্শানো হয়।[১০৮]ঔপনিবেশিক ভারতের কট্টরপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলি মূলত শহুরে কিশোর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত দোকানদার এবং কেরানিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে, যে পরিসরটি অতিপুরুষালি *রেটোরিকে* ভরপুর, মেয়েদের স্বাধিকারের প্রসঙ্গটি সেখানে সর্বোত্তমভাবে প্রান্তিক হিসাবে বিবেচিত।[১০৯] এইক্ষেত্রে সিকতা ব্যানার্জি ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া হিন্দু সৈনিক এবং যুদ্ধক্ষম সন্ন্যাসীর মতো পরস্পর পরিপূরক 'হিন্দু পৌরুষের' অবধারণাটি

---

১০৬ Charu Gupta, "Anxious Hindu Masculinities in Colonial North India: Shuddhi and Sangathan Movements," *Cross Currents* 61, no. 4 (2011): 441–54.

107 Papiya Ghosh, "The Virile and the Chaste in Community and Nation Making: Bihar 1920's to 1940's," *Social Scientist* 22, no. 1/2 (1994): 80–94.

১০৮ Ghosh; Pradip Kumar Datta, *Carving Blocs : Communal Ideology in Early Twentieth-Century Bengal* (New Delhi: Oxford University Press, 1999); Charu Gupta, *Sexuality, Obscenity, Community : Women, Muslims, and the Hindu Public in Colonial India* (Delhi: Permanent Black, 2001); Aparna Bandyopadhyay, "Of Sin, Crime and Punishment : Elopement in Bengal, 1929," in *Intimate Others : Marriage and Sexualities in India*, ed. Samita Sen, Ranjita Biswas, and Nandita Dhawan (Kolkata: Stree, 2011), 98–117.

১০৯ Tapan Basu, Pradip Dutta, Sumit Sarkar, Tanika Sarkar and Sambuddha Sen, *Khaki Shorts and Saffron Flags : A Critique of the Hindu Right* (Hyderabad: Orient Longman, 1993), 24.

উত্তর ভারতে হিন্দু জঙ্গিসুলভ সংগঠনের অতিপুরুষালি মতাদর্শ নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য -Gyanendra Pandey, 'Hindus and Others: The Militant Hindu Construction', Economic and Political Weekly, 28 December 1991, 2997–3009.

সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পৌরুষের এই *ট্রোপটির* মাধ্যমে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে পৌরুষের অবধারণা মজবুত হয়েছে এবং হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে তা শক্তিশালী করেছে।[১১০]

চারু গুপ্তার আলোচনা থেকে এইক্ষেত্রে আর একটি দিকও উঠে আসে। তিনি দেখান হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের কাছে শুদ্ধি আন্দোলনে নীচু জাতের প্রসঙ্গটি যেহেতু গুরুত্ব পেতে শুরুকরে,[১১১] এবং সার্বিকভাবে হিন্দু সাবর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তায় জাতপাতের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাই দলিত পুরুষদেহও সেই প্রতর্কে কেন্দ্রে চলে আসে।[১১২] যদিও এই বিষয়টাও গুরুত্বপূর্ণ যে সাবর্ণ বয়ানে দলিত দেহ যেখানে নঞর্থকভাবে দর্শিত হয়, তার বিপরীতে আমরা দলিতদের নিজেদের বয়ানকেও পাই যেখানে তাদের পৌরুষের সাথে আত্মসম্মানের প্রসঙ্গটি সংযুক্ত হতে দেখাযায়।[১১৩] ফলত সাম্প্রতিক এই আলোচনাগুলি থেকেও প্রতীয়মান হয় যে পৌরুষকে কখনোই সামগ্রিক সামাজিক সম্পর্কের থেকে পৃথক করে বোঝা যাবেনা। এর নির্মাণ প্রক্রিয়া অনেকগুলি ক্ষমতার অক্ষ দ্বারা নির্ধারিত যাকে সদা পরিবর্তনশীল ক্ষমতার আঙ্গিকে বুঝতে হবে।পৌরুষের সাথে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষমতার এই সম্বন্ধ সম্পর্কে সাম্প্রতিক এই আলোচনাগুলি আমাদের কাছে আধিপত্যের ভাষ্যগুলি বোঝার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু নতুন উপাদানের জোগান দেয়। বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষিতে উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং জাতনির্ভর রাজনীতির সমান্তরাল অবস্থান পৌরুষের আধিপত্যবাদী ভাষ্যতেও বেশ কিছু স্তর সংযোগ করে, যে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা বিশেষভাবে জরুরি হয়ে পড়ে। আধিপত্যবাদী ক্ষমতা যে কখনোই সর্বগামী এবং সর্বগ্রাসী হতে পারে না, প্রতিরোধের প্রক্রিয়াটি যে পাশাপাশি কার্যকরী থাকে,[১১৪] সেই দিকটি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হওয়া যে জরুরি তা এই আলোচনাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। পাশাপাশি ক্ষমতার ভাষ্যগুলিও যে কখনোই

---

[১১০] Sikata Banerjee, *Make Me a Man! : Masculinity, Hinduism, and Nationalism in India* (Albany, NY: State University of New York Press, 2005).

[১১১] Gupta, “Anxious Hindu Masculinities in Colonial North India: Shuddhi and Sangathan Movements.”

[১১২] Charu Gupta, “Feminine, Criminal or Manly?: Imaging Dalit Masculinities in Colonial North India,” *The Indian Economic and Social History Review* 47, no. 3 (2010): 309–42.

[১১৩] Ibid.

[১১৪] Rosalind O Hanlon, “Recovering the Subject: Subaltern Studies and Histories of Resistance in Colonial South Asia,” *Modern Asian Studies* 22, no. 1 (1988): 191.কনেল এই প্রেক্ষিতে আধিপত্যবাদী পৌরুষকে একটি ঐতিহাসিক সম্ভাবনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যাকে কখনোই হাসিল করা যায় না। Connell, “Theor Soc,” 306.

একশৈলিক(monolythic) হয়না, বরং আমরা যে ক্যাটেগরিগুলিকে চিহ্নিত করারমধ্য দিয়ে ক্ষমতার কর্মপদ্ধতিকে বুঝতে চাইব সেখানেও যে তার সূক্ষ্ম তারতম্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং ক্ষমতার বহুমুখী, বহুস্তরীয় চরিত্রকেও বুঝতে হবে সেই বিষয়ে রোজালিন্ড ও'হ্যানলন আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন।[১১৫] অবশ্যই এইক্ষেত্রে আর একটি মাত্রা যোগ করে পৌরুষের জন্য নির্ধারিত বিধি এবং একটি নির্দিষ্ট পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে পৌরুষের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গটি। স্বপ্না ব্যানার্জির সাম্প্রতিক গবেষণা এইক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি ঔপনিবেশিক বাংলায় পিতাপুত্রের সম্পর্কের অভিজ্ঞতা, অনুভূতির প্রকাশ এবং প্রজন্মের অন্তরে তা যেভাবে বদলেছে সেই অভিজ্ঞতাগুলি বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষের আত্মজীবনীতে যেভাবে উত্থাপিত হয়েছে তার খুবই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন।[১১৬] ফলত পৌরুষের আদর্শগত ভিত্তি এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আন্তঃসম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে এই আলোচনাটি সেতুর কাজ করেছে।

ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এবং বিশেষ করে বাংলায় পৌরুষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি একাধারে আমাদের যেমন একটি চালচিত্র প্রদান করে তেমন পৌরুষের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু শূণ্য স্থানচিহ্নিত করতে এবং অনুত্থাপিত প্রশ্নকেও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তকরতে সাহায্য করে যা ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আওতার বাইরে থেকে গেছে। বিশেষ করে ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়াটি বোঝার ক্ষেত্রে এবং সেখানে কী ধরনের আধিপত্যের বয়ান তৈরি হচ্ছে তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে পৌরুষের সাথে আমরা চারটি প্রসঙ্গকে সংযুক্ত করতে চাইব যা ইতিপূর্বের আলোচনাগুলিতে অনুপস্থিত থেকেছে অথবা আংশিকভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিশেষত এইক্ষেত্রে উপনিবেশিত এবং ঔপনিবেশিক– ক্ষমতা এবং পৌরুষের এই কাঠামো থেকে আলোচনাকে সম্প্রসারিত করা এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিভাজিত উপনিবেশিত সমাজের চরিত্রটিকে উদ্ঘাটন করা বিশেষ জরুরি যা অন্তত বাংলায় পৌরুষের ইতিহাসকে বোঝার ক্ষেত্রে অধরা থেকে গেছে।

একেবারে সম্প্রতি স্বপ্না ব্যানার্জির গবেষণা ব্যতীত অনুভূতি এবং তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাথে পৌরুষের প্রশ্নটিকে সংযুক্ত করার প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিশেষ করে অনুভূতি, অন্তরঙ্গতার অভিজ্ঞতা এবং

---

[১১৫] Hanlon, "Recovering the Subject: Subaltern Studies and Histories of Resistance in Colonial South Asia," 200.

[১১৬] Swapna M. Banerjee, "Everyday Emotional Practices of Fathers and Children in Late Colonial Bengal, India," in *Childhood, Youth and Emotions in Modern History: National, Colonial and Global Perspectives*, ed. Stephanie Olsen (London: Palgrave Macmillan, 2015), 221–41.

পৌরুষের নিয়মবদ্ধ বিধির মধ্য দিয়ে পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়া কীভাবে অনুধাবন করা যেতেপারে সেই বিষয়টি এখনও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বাইরে থেকে গেছে। প্রজনন তথা সন্তান উৎপাদনের সাথে নারীত্বের সম্পর্ক ঔপনিবেশিক কালপর্বে কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা হলেও তার পাশাপাশি পুরুষ এবং প্রজননের সম্পর্ক ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় গুরুত্ব পায়নি। ফলত প্রজননের প্রসঙ্গটি কতটা লৈঙ্গিক সেই প্রশ্নটিও দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে আংশিকভাবে অধরা থেকে গেছে। ফলত প্রজনন এবং পৌরুষের আন্তঃসম্পর্কের দিকটিকে অনুধাবন করা এইক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য, আমাদের প্রশ্নাবলী

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী প্রকল্প, পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি, প্রথম পর্যায়ের উপনিবেশবিরোধী বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি এবং বাংলায় স্বাস্থ্যচেতনার ক্ষেত্রেবাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতাগুলি ইতিপূর্বের ঐতিহাসিকরা উত্থাপন করেছেন এবং পৌরুষের নির্মাণের সাথে তার সংযোগটি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, আমাদের সন্দর্ভটি সেই আলোচনাকেই আংশিকভাবে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করবে। এখানে লিঙ্গের প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্রে রেখে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাঙালি ভদ্রলোকের আধিপত্যবাদী প্রবণতার সঙ্গে পৌরুষ নির্মাণের গতিশীল প্রক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করে বোঝার চেষ্টা করব আমরা। ফলত যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয়ভাবে আলোচিত হবে তা হল কোন প্রেক্ষিতে, কারা ও মূলত কাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সময়ে ব্রহ্মচর্যের ধারণাটির পুনর্নির্মাণ হয়, আর ব্রহ্মচর্যকে আদর্শ করে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষপর্বে বাংলায় কীভাবে আধিপত্যবাদী পৌরুষের একাধিক (multiple) ভাষ্য তৈরি হয় সেই প্রসঙ্গটি। এইক্ষেত্রে যদিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমরা আধিপত্যবাদী পৌরুষ নির্মাণকে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখব, যাকে কখনো হাসিল করা যায় না।[১১৭] বরং তাকে দেখাযায় একটি সমষ্টিগত উদ্যোগ হিসেবে যার মাধ্যমে লিঙ্গগত উচ্চতর ক্রম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করা হয়। পাশাপাশি পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বুঝতে হলে লিঙ্গের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিষয়গুলিকে কীভাবে সংযুক্ত করা প্রয়োজন এখানে তার উত্তর খুঁজব আমরা। বিশেষ করে এইক্ষেত্রে লিঙ্গের সাথে জাতপাত, সাম্প্রদায়িক আত্মপরিচয় নির্মাণ, বর্ণ, প্রজন্ম এবং অনুভূতির প্রশ্নগুলিকে আমরা উত্থাপন করব এবং এর নিরিখে বাঙালি সাবর্ণ হিন্দু মধ্যবিত্তের সামাজিক-রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বৃহৎ প্রবণতার সাথে

[১১৭] Connell, “Theor Soc,” 306.

আধিপত্যবাদী পৌরুষ নির্মাণ প্রকল্পের নির্ধারণমূলক সম্পর্ককে তুলে ধরব। আমরা দেখব, এর মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্যের ধারণার পুনর্নির্মাণকে কেন্দ্রকরে আধিপত্যবাদী পৌরুষের বহুমুখী ভাষ্য কীভাবে তৈরি হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় আদর্শ পৌরুষের ধারণাটিও স্থবির থাকেনি, প্রেক্ষিত এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার ধারণাটিতেও বদল আসে এবং ব্রহ্মচর্যর পরিভাষাও বদলে যায়। এবং সর্বোপরি আমরা যে বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করব তা হল বাঙালি ভদ্রলোকের দেশীয় সমাজে যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায় সেই বৃহৎ প্রক্রিয়ার সাথে পৌরুষের প্রসঙ্গটিকে কীভাবে সংযুক্ত করা যায়, বা অন্যভাবে বলতে গেলে বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক পরিসরে বাঙালি ভদ্রলোকের এই আধিপত্যবাদী প্রবণতায় পৌরুষের প্রসঙ্গে আলোচনা কীভাবে প্রাসঙ্গিক সেই দিকটি। এইক্ষেত্রে প্রাথমিক একটি প্রশ্নকে সামনে রেখে আমরা বর্তমান সন্দর্ভটিকে আকার দিতে চাইব তা হল, ১৮৮০ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলার জাতীয়তাবাদী পরিসরে কেন ব্রহ্মচর্যের ধারণার পুনর্নির্মাণ হয়, কারা এই পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা পৌরুষের যে আধিপত্যবাদী বয়ানকে মূর্ত হতে দেখি তা ঔপনিবেশিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পৌরুষের বিকল্প যে ভাষ্য তৈরি করে তা কী অর্থে বহুমাত্রিক, বহুস্তরীয় চরিত্র নেয়? উক্ত প্রশ্নটিকে কেন্দ্রে রেখে আমরা আর তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত প্রশ্ন সামনে রাখতে রাখতে চাইব—

বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক উনিশ শতকের অন্তিম পর্বথেকে যে ব্রহ্মচর্যচর্চাকে আবর্ত করে পৌরুষের অবধারণাটি নির্মাণ করতে চাইছিলএবং সেখানে তার বৃহত্তর সামাজিক আধিপত্যের প্রসঙ্গটি সংযুক্ত ছিল, সেই প্রক্রিয়াটিকে তাদের জাতপাতের নিরিখে উচ্চ-বর্ণগত অবস্থান কীভাবে নির্ধারণ করে এবং এর মধ্য দিয়ে আধিপত্যবাদী পৌরুষের কী ধরনের ভাষ্য সামনে আসে? এক্ষেত্রে আমরা উপনিবেশিত এবং ঔপনিবেশিক— ক্ষমতা এবং পৌরুষের এই কাঠামো থেকে আলোচনাকে সম্প্রসারিত করে অভ্যন্তরীণভাবে বিভাজিত উপনিবেশিত সমাজের চরিত্রটিকে সামনে এনে প্রশ্ন উত্থাপন করব যে জাতপাতের প্রসঙ্গটি দেশীয় পৌরুষকে নির্মাণ করতে কী ভূমিকা নেয়?

দ্বিতীয়ত, আমরা উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ধারার প্রসঙ্গটিকে উত্থাপন করে প্রশ্ন করতে চাইব বিপ্লবী পরিসরে অনুশাসনমূলক ব্রহ্মচর্যের বিধি, বিপ্লবীদের মধ্যেকার অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতির অভিব্যক্তির মাধ্যমে বিপ্লবীদের মধ্যে পৌরুষের যে অবধারণাটি আবর্তিত হয় তাকে জাতীয়তাবাদের 'অন্দর' ও 'বাহিরের' পরিসরের দ্বৈতে বিভাজিত করা সম্ভব কিনা এবং এইক্ষেত্রে পৌরুষের যে অবধারণাটি

তৈরি হয় তা কি অর্থে আধিপত্যবাদী? ফলত আমরা এইক্ষেত্রে পৌরুষের সামাজিক নির্মাণকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে 'অন্দর' ও 'বাহিরের' বিভাজনের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রশ্ন করব।

তৃতীয়ত, বাঙালি হিন্দু পুরুষের দেহকে প্রজননে সক্ষম রাখার উদ্দেশ্যে যেভাবে তার চিকিৎসাকরণ করা হয়, ব্রহ্মচর্যকে প্রজননের জন্য যথার্থ বিধি হিসেবে উত্থাপন করা হয় তা কীভাবে প্রজননশীল একটি পুরুষদেহের অবধারণাকে সামনে আনে? এখানে ছাত্র-কিশোর-যুবকের মতো প্রজন্মগতভাবে কনিষ্ঠদের অনুশাসিত করার মধ্য দিয়ে আধিপত্যের কী ধরনের বয়ানকে উত্থাপিত হতে দেখা যায়?

আমাদের লেখ্যাগার এবং গবেষণার সাধন

আমাদের গবেষণাটি মূলত লেখ্যাগারনির্ভর। এই গবেষণার জন্য ব্যাপকভাবে আমরা উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা, তালিমি কেতাব, প্রবন্ধমূলক রচনা, ধর্মীয় গ্রন্থ, আত্মজীবনী, ইস্তেহারের ওপর নির্ভর করেছি। পাশাপাশি আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত জীবনী, সাংগঠনিক মুখপত্র এবং ইস্তেহার, পঞ্জিকা ইত্যাদিকে কিছু ক্ষেত্রে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছি। পাশাপাশি সমকালীন কিছু গল্প এবং উপন্যাসের পাঠগত বিশ্লেষণ এই আলোচনার জন্য আবশ্যক হয়েছে। এর সাথে সরকারি মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত নানা সরকারি প্রতিবেদন এবং সরকারি ফাইল আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করেছি।

বর্তমান গবেষণায় আমরা যেহেতু ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রধানত পৌরুষনির্মাণের আদর্শগত ভিত্তিগুলিকে বুঝতে চাইছি এবং পাশাপাশি কিছুদূরপর্যন্ত এই সকল আদর্শগত মানদণ্ড এবং যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা কীভাবে পুরুষদের জীবনকে আকার দিয়েছে সেই দিকটিকেও উদ্ঘাটন করতে চাইছি তাই উপরিউক্ত বিবিধ চরিত্রের নথি এবং প্রকাশনার সম্মিলিত ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়ে। এইক্ষেত্রে উক্ত তথ্যগুলি ব্যবহারের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য কার্যকরী থেকেছে। এর মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মচর্য বিষয়ক অসংখ্য তালিমি কেতাব অথবা উপদেশমূলক বইগুলির কথা উল্লেখ করতে হয় যেগুলি উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে ব্যাপক হারে প্রকাশিত হতে দেখাযায়। বেশ কিছু গ্রন্থের নয়-দশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১১৮] বস্তুত

[১১৮] উদাহরণ হিসেবে – ১৯০৮ খ্রি. থেকে ১৯১৯ খ্রি. মধ্যে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের *ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা* বইটির সাতটি সংস্করণ পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, *ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা,* প্রথম সংস্করণ ১৯০৮ খ্রি., দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯ খ্রি., তৃতীয় সংস্করণ ১৯১১ খ্রি., ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯১৬ খ্রি., সপ্তম সংস্করণ ১৯১৯ খ্রি.; অন্যদিকে রমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর *ব্রহ্মচর্য্য* বইটির নয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০৩ বঃ থেকে ১৩২৬ বঃ-এর মধ্যে। রমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর *ব্রহ্মচর্য্য* প্রথম সংস্করণ, ১৩০৩ বঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০৪ বঃ,

প্রাথমিকভাবে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের পাঠ দেওয়ার জন্য প্রকাশিত এত বহুল সংখ্যক বইয়ের সমাহার আমাদের এই বিষয়টিকে গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক আগ্রহ তৈরি করেছে। আমরা একাধারে এই গ্রন্থগুলি যে ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসছে তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি, অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি এই ধরনের উপদেশমূলক গ্রন্থ অথবা প্রবন্ধ যাঁরা লিখছিলেন তাঁদের সামাজিক পরিচয়কে। পাশাপাশি যাদের উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল সেই সামাজিক বর্গকেও আমরা আংশিকভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি এই রচনাগুলির পাঠগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত লিঙ্গায়িত চরিত্রটিকেও উদ্ঘাটনের প্রয়াস চালিয়েছি। অবশ্য এইক্ষেত্রে শুধু উক্ত বিষয়ক বইগুলি নয়, আলোচ্য সময়ে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির কথা উল্লেখ করতে হয়। এই পত্রিকাগুলি যে শুধু আমাদের ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত জনপরিসরে উঠে আসা আলোচনা বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক থেকেছে তা নয়, পাশাপাশি আমাদের সেই বৃহৎ সামাজিক প্রেক্ষাপটটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছে। বিবিধ বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি একাধারে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের বৃহত্তর সামাজিক চালচিত্রটিকে খাড়া করতে কাজে এসেছে। এখানে উল্লেখ্য ব্রহ্মচর্য বিষয়ক পুস্তকগুলি যে শুধু ছাত্র-কিশোর-যুবক সম্প্রদায়কে উপদেশ দেওয়ার জন্য রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছে তা নয়। চিকিৎসাশিক্ষা, স্বাস্থ্য সচতনতার মতো শিক্ষামূলক প্রকল্পে প্রজনন, পুরুষদের যৌনস্বাস্থ্য, যৌনতা যখন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যজ্ঞ সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচিত হয়েছে সেই প্রেক্ষিতেও এই বিষয়ক বহু গ্রন্থ আমরা প্রকাশিত হতে দেখি। পাশাপাশি অবশ্যই বহু স্বাস্থ্যমূলক পত্রিকার প্রবন্ধগুলিকে উল্লেখ করতে হয় যা যৌনস্বাস্থ্যের বিবিধ দিক নিয়ে আলোচনার এক বিস্তৃত পরিসর তৈরি করে। এই গদ্যমূলক রচনাগুলির পাশাপাশি আমরা সমকালীন লেখকদের রচিত কিছু উপন্যাস, গল্পের পাঠগত বিশ্লেষণ করেছি। উপদেশমূলক রচনার পাশাপাশি এই সৃজনশীল সাহিত্যগুলিও সামাজিক আদর্শ এবং বিধি তৈরিতে ভূমিকা নিয়ে থাকে, বিশেষ করে যে রচনাগুলি সমকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং পাঠকমহলে দীর্ঘসময় পর্যন্ত সমাদৃত হয়ে থেকেছে। ফলত উপদেশমূলক সাহিত্যের পাশাপাশি এই রচনাগুলি সম্মিলিতভাবে কী ধরনের সামাজিক বিধি তৈরি করছে তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় সংস্করণ ১৩০৫ বঃ, চতুর্থ সংস্করণ ১৩১১ বঃ, পঞ্চম সংস্করণ ১৩১৬ বঃ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩১৮ বঃ, সপ্তম সংস্করণ ১৩২২ বঃ, অষ্টম সংস্করণ ১৩২৪ বঃ, নবম সংস্করণ ১৩২৬ বঃ।

আমাদের আলোচনায় আত্মজীবনীমূলক রচনাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকেছে। বাঙালি তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসকে মুদ্রিত করার ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিজীবনের নির্মাণকে বুঝতে আত্মজীবনীমূলক রচনা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেপারে তা সম্প্রতি পণ্ডিতরা গুরুত্বের সাথে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কারণ এটি একাধারে জীবনকে বর্ণন করে চলে, একটি বাস্তবজীবন সম্পর্কে আত্মবাচক (reflexive) ভঙ্গিতে মতামত রাখে।[১১৯] এখানে স্বপ্না ব্যানার্জির পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি দেখিয়েছেন আত্মজীবনীকে আমরা 'প্রামাণ্য' প্রাথমিক উপাদানের মতো করে ব্যবহার না করে বরং তাকে দেখতে পারিসামাজিক জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যম হিসেবে; যাকে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করা যাবে বহুমাত্রায়।[১২০] আমরা নিজেদের গবেষণায় যে সকল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী পুরুষদের আত্মজীবনীগুলি বেছে নিয়েছি সেখানে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ সম্পর্কে তাঁদের অবধারণা, সমলিঙ্গ এবং বিসমলিঙ্গের ব্যক্তিদের সাথে অন্তরঙ্গতাকে কীভাবে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে লিঙ্গবিধিগুলিকে তাঁরা কীভাবে নিজেদের জীবনে মান্যতা দিয়েছেন অথবা উল্লঙ্ঘন করেছেন তা বোঝার চেষ্টা করেছি। ফলত আত্মজীবনীগুলি আমাদের কাছে একাধারে একটি বিশেষ সময়পর্বে পৌরুষ সম্পর্কিত সামাজিক বিধি কীভাবে ব্যক্তিজীবন অনুধাবন করেছে তা বোঝার মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে, পাশাপাশি আত্মবাচক ভঙ্গিতে কীভাবে নিজের অনুভূতি এবং নৈকট্য উপস্থাপিত হয়েছে তাও বোধগম্য হয়েছে। উপরে উল্লিখিত রচনাগুলিকে মহাফেজখানা হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি আমি বহু সরকারি প্রতিবেদন, আদমসুমারি, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নথি এবং বিশেষ করে সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের নথি ব্যবহার করেছি যা প্রধানত আমাদের সমগ্র গবেষণা প্রকল্পটির বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে চিহ্নিত করার ভূমিকায় উপযোগী হয়েছে।বিগত চার দশকে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাদান ব্যবহার করে ইতিহাসনির্ভর গবেষণা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা তৈরি হয়েছে। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এই সামাজিক ইতিহাস রচনার পদ্ধতিটি একাধারে ক্যুয়ার, নারীবাদী, নিম্নবর্গ এবং মার্ক্সীয় সমালোচনাধর্মী গবেষণার অভিমুখ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং সমৃদ্ধ হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনায় উক্ত গবেষণার অভিমুখ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছি এবং উপরে উল্লিখিত মহাফেজখানাকে এই আলোকে পাঠ এবং বিশ্লেষণ করেছি। উল্লেখ্য উপরিউক্ত অভিমুখের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় ক্যুয়ার এবং

---

[১১৯] Sudipta Kaviraj, *The Invention of Private Life: Literature and Ideas* (Ranikhet: Parmanent Black, 2014), 302.

[১২০] Banerjee, "Everyday Emotional Practices of Fathers and Children in Late Colonial Bengal, India," 223.

সমালোচনাধর্মী পৌরুষবিদ্যার অনুপ্রবেশ কিছুটা দেরিতে হলেও গুরুত্বের সাথে জানান দিয়েছে। আমরা আমাদের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই বিদ্যাচর্চা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছি।

অধ্যায় বিভাজন

আমরা আমাদের সম্পূর্ণ আলোচনাটিকে চারটি অধ্যায়ে বিভাজিত করব। চারটি আখ্যানবস্তু অনুযায়ী আমরা আমাদের আধ্যায়গুলিকে পৃথক করেছি। আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম ব্রহ্মচর্যের সাথে পৌরুষের সম্পর্কের চারটি পরস্পর কিছু ক্ষেত্রে সংযুক্ত কিন্তু চরিত্রগতভাবে ভিন্ন প্রবণতাকে চিহ্নিত করা যায়। এই চারটি ভিন্নভাবে সংযুক্ত বিষয়কে আমরা চারটি আখ্যানবস্তু হিসেবে বিবেচনা করে চারটি পৃথক অধ্যায়ে স্থান দিয়েছি। উল্লেখ্য এই অধ্যায় বিভাজনের প্রধান ধরনটি আখ্যানবস্তু অনুযায়ী হলেও আমরা তার মধ্যে ইতিহাসনির্ভর সময় ক্রমকে সচেতনভাবে বজায় রেখেছি। আমরা এইক্ষেত্রে যে বৃহত্তর চারটি প্রবণতাকে চিহ্নিত করেছিলাম তা হল— ১৮৭০-এর পর থেকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সাথে হিন্দু আত্মপরিচয়ের সংযুক্ত হওয়া এবং সেখানে পৌরুষের প্রসঙ্গ, স্বদেশি পরবর্তী পর্বের মূলত ১৯০৯-এর পর থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সত্তা নির্মাণের প্রক্রিয়া এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক পৌরুষের অবধারণা, ১৯০৫ পরবর্তী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন তার গণমুখী আবেদন হারানোর পর বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে ঝোঁক বৃদ্ধি এবং এই ধরনের গুপ্ত সমিতিভিত্তিক আন্দোলনে পুরুষ বিপ্লবীদের মধ্যে পৌরুষের অবধারণা, সর্বোপরি ১৮৮০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রজনন এবং পৌরুষের প্রসঙ্গ।

প্রথম অধ্যায়টি মূলত ১৮৮০ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুসত্তার নির্মাণের প্রেক্ষিতে ব্রহ্মচর্যের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করবে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ গার্হস্থ্যের পরিসরকে যখন বিশেষ একটি নৈতিক বিধির আওতায় আবদ্ধ করতে চেষ্টা করে তখন সেই প্রকল্পের মধ্যে শুধু মেয়েদের জন্য আচরণীয় নীতিমালা তৈরি হয়নি। পাশাপাশি পুরুষদের জন্যও একটি নৈতিক বিধি তৈরির প্রয়াস কার্যকরী হয়। বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা যখন ঔপনিবেশিক অধীনতাবোধকে প্রকট করে তোলে, মেয়েলি হওয়ার অপবাদ তার পৌরুষের স্বাভিমানকে আঘাত করে, সেই হীনম্মন্যতাবোধ কীভাবে তার পৌরুষ চেতনাকে নির্ধারণ করে

সেই দিকটি আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। বিশেষ করে বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ এইসময় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তা থেকে তার আদর্শগত অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে, যেটি আবার একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী বিশ্বদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইক্ষেত্রে আমরা পৌরুষের ঔপনিবেশিক ভাষ্যের প্রতিরোধে বাঙালি মধ্যবিত্ত-সাবর্ণ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যে বিকল্প পৌরুষের বয়ান খাড়া করতে চায় তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করতে চাইব। দেখার চেষ্টা করব ব্রহ্মচর্যের একটি বিকল্প ভাষ্য তৈরির মধ্য দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত পৌরুষের একটি প্রতি-আধিপত্যবাদী বয়ান তৈরি করতে চায় এবং এর মধ্য দিয়ে তারা কীভাবে তাদের সামাজিক নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার প্রয়াস চালায়।

আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায়ের সাথে কিছুটা সম্পর্কিত হলেও আখ্যানবস্তুর দিক থেকে ভিন্ন। এই অধ্যায়টি মুখ্যত স্বদেশি আন্দোলন পরবর্তী বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের সূচনা, হিন্দু সাম্প্রদায়িক সত্তার নির্মাণ এবং হিন্দু পৌরুষের বিষয়টিকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসতে চাইবে। এইক্ষেত্রে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ হল আমাদের আলোচনার সময়কাল যেখানে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সেই অংশকে নিয়ে কথা বলব যারা আলোচ্য সময় থেকে জাতপাত নির্বিশেষে হিন্দু ঐক্যের ধারণা তৈরির তাগিদ অনুভব করছিল এবং বিপরীতে মুসলমান ‘অপরের’ ধারণাকে পোষণ করতে শুরু করে। এই ধরনের হিন্দু সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের মধ্যে পৌরুষের সংকটের প্রসঙ্গটি খুব কেন্দ্রীয়ভাবে উত্থাপিত হয় যখন মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসমান এই সাধারণ জ্ঞানটি জনপ্রিয় হতে থাকে। আমরা দেখব এহেন জনসংখ্যাগত সংকটের কল্পনা হিন্দু সাবর্ণ নেতৃত্বর মধ্যে নিম্নজাতি এবং দলিত সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার প্রয়াসকে প্রকট করে, দলিত শরীর হয়ে ওঠে হিন্দু দুর্বল পৌরুষের ধারণার প্রতীক। দলিত সম্প্রদায়ের ‘উন্নয়নের’ তাগিদ এবং অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক বিধিকে শিথিল করা একদিকে যেমন হিন্দু নেতৃত্বের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, পাশাপাশি হিন্দু সাবর্ণ নেতৃত্বের নৈতিক অধিকারের প্রসঙ্গটিও পাশাপাশি প্রকট হতে থাকে। চিত্তাকর্ষকভাবে এই একই উদ্যোগের অংশ হতে দেখা যায় বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি। হিন্দু বাল্যবিধবার পুনরায় বিবাহ দিয়ে তার প্রজনন ক্ষমতাকে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে লাগানোর প্রয়াস নেয় হিন্দু সাবর্ণ নেতৃত্ব। ফলত এর মধ্য দিয়ে দলিত শরীরের পাশাপাশি হিন্দু মেয়েদের যৌনতাকেও নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালানো হয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতর্কে ব্রহ্মচর্য একাধারে হয়েওঠে সুস্থ হিন্দু পুরুষসন্তান বৃদ্ধির জন্য

প্রয়োজনীয় যৌনবিধি এবং সাবর্ণ পৌরুষের সামাজিক আধিপত্যের আদর্শগত ভিত্তি। আমরা এই অধ্যায়ে আধিপত্যবাদী হিন্দু পৌরুষ এবং তার ব্রাহ্মণ্যবাদী চরিত্রকে উদ্ঘাটন করতে চাইব।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে আমরা বাংলার প্রথম পর্বের বিপ্লবীদের নিয়ে আলোচনা করব। বিপ্লবীদের মধ্যে পৌরুষের অবধারণাটিকে অনুধাবন করা হবে এই অধ্যায়ের প্রাথমিক লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে আমরা বিপ্লবী পরিসরে পৌরুষের পরিভাষা তৈরিতে ব্রহ্মচর্যের ভূমিকাটিকে চিহ্নিত করতে চাইব, একই সাথে এই বিধিগুলির পাশাপাশি বিপ্লবী পরিসরের দৈনন্দিন আবেগ সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী পৌরুষের নির্মাণে কী ভূমিকা নিয়েছিল তা বোঝার চেষ্টা করব। ফলত বাংলায় বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বিকশিত প্রথম পর্বের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী পরিসরে পৌরুষের ধরনটি বুঝতে গিয়ে আমরা বর্তমান অধ্যায়ে তাদের মধ্যে অনুশাসন, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতি— এই তিনটি বিষয়ের উপস্থিতির ওপর মূলত আলোকপাত করব। এইক্ষেত্রে আমরা বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তির দীর্ঘ সূত্রগুলিকে অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ, ব্রহ্মচর্যের সংকল্প নেওয়া বিপ্লবী পৌরুষের আদিকল্পটি বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বিকশিত হয়। কৃচ্ছ্রসাধনা, আত্মসংযম, ত্যাগের অভ্যাসের মতো বিষয়গুলি যার সাথে অনুশাসনমূলক প্রকল্পের সংযোগ রয়েছে সেগুলি অভ্যাসের পাশাপাশি এই পৌরুষের অভিব্যক্তিতে দেশমাতৃকার প্রতি আবেগ, সহ-বিপ্লবীদের সাথে বন্ধুত্ব এবং গভীর ভালোবাসা প্রবলভাবে বর্তমান থেকেছে। ফলত আমরা এই অনুশাসনমূলক প্রকল্প, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতির প্রবল উপস্থিতির সহাবস্থানকে উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম পর্বে বাংলায় পৌরুষ নির্মাণের একটি ধারাকে বোঝার চেষ্টা করব।

উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হবে বিপ্লবীদের ব্রহ্মচর্য এবং নিয়মানুবর্তিতার অন্যান্য পাঠ দেওয়ার মাধ্যমে গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে অনুশাসনের ধারা তৈরির চেষ্টাটি। এই ধারাটি অবশ্যই বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে অনুশাসনের একটি উচ্চতর ক্রমকে দর্শাবে। কিন্তু এর পাশাপাশি বিপ্লবীদের মধ্যে হোমো-সোস্যাল বা সম-সামাজিক পরিসর উন্মুক্ত থাকায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতি ব্যক্ত করার নানা অবকাশ বর্তমান থেকেছে তাও এই আলোচনা চিহ্নিত করবে। এই সম-সামাজিক পরিসরে পৌরুষনির্ভর বন্ধনকে অভিজ্ঞতা লাভ করার ক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। এই অধ্যায়ে এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা হবে যে সেই বন্ধনের চরিত্র কখনো থেকেছে বিপ্লবী নেতৃত্বের সাথে কর্মীদের গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মতো উচ্চতর ক্রমনির্ভর, আবার কখনো তা বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা, আবেগ এবং রোমান্টিকতার

স্তরেও উত্তীর্ণ হয়েছে যেখানে সম্পর্কগুলি পৌরুষকেন্দ্রিক হলেও সমানাধিকার সম্পন্ন থেকেছে। ফলত এখানে পৌরুষের বিবিধ অভিজ্ঞতা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই একই বিপ্লবীদের দাম্পত্য জীবনের ঝাঁকি দর্শনের মাধ্যমে এই বিষয়টিও উত্থাপিত করা হবে যে সেখানেও আবেগ, অনুভূতি ব্যক্ত করার মতো বহু মুহূর্ত তৈরি হলেও তা থেকেছে সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক উচ্চতর ক্রমনির্ভর একটি পরিসর। ফলত বিপ্লবীদের বিবিধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পৌরুষের যে অবধারণাকে এই অধ্যায়ে সামনে আসতে দেখা যাবে তা প্রাথমিকভাবে পৌরুষের আধিপত্যবাদী চরিত্রকের কিছু বৈশিষ্টকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূলত স্বাস্থ্য, পুরুষদেহ এবং তার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই বিষয়টিকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আমরা ১৮৮০ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কে নির্ধারণ করেছি। কারণ উনিশ শতকের আটের দশক থেকে জাতীয়তাবাদী স্বাস্থ্যচেতনার বৃদ্ধি চোখেপড়ে এবং যৌনস্বাস্থ্যকে সুনিশ্চিত করতে ব্রহ্মচর্য পরামর্শ চিকিৎসক মহলে বৃদ্ধি পায়। আর বিশ শতকের তিনের দশক থেকে *বায়ো মেডিসিনের* প্রসার এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রযুক্তির আগমন ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তাকে সীমিত করে দেয়। এইক্ষেত্রে দীর্ঘ ষাট বছরে প্রজননশীল পুরুষ দেহের অবধারণার নিরিখে এই অধ্যায়টিতে আমরা বাংলায় জনস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী প্রতর্কগুলির প্রতি আলোকপাত করব।

এইক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা করা হবে কীভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে বাঙালি পুরুষদেহকে নিয়ে জাতীয়তাবাদী উদ্বেগ তৈরি হয় এবং বিশ শতকে সেই লৈঙ্গিক দেহের সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়। মূলত বাঙালির স্বাস্থ্য নিয়ে জনপরিসরে তৈরি হওয়া দেশীয় স্বাস্থ্যজ্ঞ এবং চিকিৎসকদের বয়ান এবং তার বিবর্তনের চিত্রটিকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে আলোচ্য সময়ে কীভাবে পুরুষদেহের চিকিৎসাকরণ ঘটে এবং পুরুষের প্রজননগত স্বাস্থ্যের সাথে পৌরুষের ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় সেই বিষয়টি আলোচ্য অধ্যায়ে নিরীক্ষণ করা হবে। এক্ষেত্রে দেখা হবে দেশীয় চিকিৎসকরা ‘ধাতুদৌর্বল্য’কে একটি শারীরবৃত্তীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে যেভাবে বাঙালি পুরুষ প্রজননশীলতা এবং পৌরুষ সম্পর্কে উদ্বেগের আবহাওয়া তৈরি হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য হয়ে ওঠে বাঙালি পৌরুষ এবং তার প্রজননশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম একটি উপায়। স্বাস্থ্যজ্ঞদের আলোচনায় বহু আঙ্গিকে ব্রহ্মচর্যের বিষয়ে আলোচনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে ছাত্র-কিশোর-যুবকদের যৌনাচার হয়ে ওঠে এই আলোচনাগুলির কেন্দ্রীয় বিষয়। তাদের জীবনযাপনের প্রতিটি পর্যায়ের ওপর নজরদারি চালিয়ে তাদের যৌনাচারের নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বয়ানে প্রাধান্য পেতে থাকে। এইক্ষেত্রে

ব্রহ্মচর্য হয়ে ওঠে সেই ঈপ্সীত জীবনচর্যার বিধি যাকে চর্চার মাধ্যমে পুরুষ তার প্রজননক্ষমতা তথা পৌরুষকে ধারণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে কৈশোর এবং যৌবনের প্রসঙ্গটিকে উত্থাপন করে দেখানো হবে উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে কনিষ্ঠ প্রজন্মের উপর অবিভাবক প্রজন্মের নিয়ন্ত্রণকামী প্রবণতা প্রকট হয়। ব্রহ্মচর্য হয়ে ওঠে একটি আদর্শ যৌনজীবনের বিধি যা পালন করার মধ্য দিয়ে বিবাহপূর্ব ও বিবাহ-পরবর্তী জীবনে সুস্থ সন্তান এবং কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু সন্তানের প্রজননকে সুনিশ্চিত করার আশা করা হয়। ফলত এই বিষয়টি উত্থাপন করে প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষের ভাষ্যকে অনুধাবন করা হবে যা অবশ্যই আধিপত্যবাদী পৌরুষের একটি ভাষ্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকেছে।

প্রথম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এবং ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ :
যৌনতার নীতিমালা ও হিন্দু পৌরুষ প্রসঙ্গে, ১৮৮০-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ

সূচনা

> সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উদ্দেশ্য - গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এতদাশ্রম ত্রয়ের মূল সুদূর ভিত্তি স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথা যে দিন হইতে আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে পরিহার করিয়াছে, সেই দিন হইতে এই পুণ্যভূমি শারিরীক দুর্বলতা, জরাগ্রস্ত, দুর্ব্যবহার, ভ্রষ্টাচার, ভীরুতা, চপলতা, অব্যবস্থিত চিত্ততা আদি মানসিক মলিনতা ও ক্ষীণতার প্রধান নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে : প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগণের প্রভুত্বকালে বর্ণানুসারে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সামাজিক নীতি ও বিবিধ সাধারণ নীতি শিক্ষা পাইয়া ভারতবাসিগণ, তপোবল, ধর্ম্মবল, বিদ্যাবল, ধনবলাদি গুণে জাতীর প্রকৃতি উপার্জ্জন পূর্ব্বক এই পবিত্র ভূমিকে সভ্য সমাজ চূড়ামণি করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে সুকুমার মতি বালকগণ স্বেচ্ছা ও যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া বহু দুঃখ দুর্গন্ধময় জীবন লাভ করতঃ পুণ্যশীল ভারতীয় সমাজকে কলঙ্কিত ও উপদ্রবগ্রস্থ করিতে প্রবৃত্ত ও স্বয়ং পরিণাম দুঃখাবহ দুর্ব্বহ দুর্দ্দশার ভাব গ্রহণে অন্ধের ন্যায় ধাবমান হইতেছে দেখিয়া (ভারতবর্ষীয়) আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ভবিষ্যৎ ভারতের পরমহিত সাধনার্থ স্নেহভাজন কোমলহৃদয় তরলমতি বালকগণকে কল্যাণ কল্পতরু শীতল ছায়ায় সুখী কারিবার নিমিত্ত সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্বাপনের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বর্গ নিবাসী আর্য্য মহাত্মাগণ নিজ নিজ তৈজস শক্তি সহ ভারতের হৃদয়তন্ত্রী আকর্ষণ করুন।[১]

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা নামক একটি হিন্দু মিশনারি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। এর পাশাপাশি উক্ত সংগঠনের কর্ণধার কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের উদ্যোগে কিশোরদের উদ্দেশে একটি শাখা সংগঠন খোলা হয়। নাম সুনীতি সঞ্চারিণী সভা।[২] প্রথমে মুঙ্গের পরে বেনারসকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁর মিশনারি কার্যকলাপের সূচনা করেন এবং উত্তর ভারত সহ বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ছোট ছোট জনপদগুলিতে এই সংগঠন দুটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সুনীতি সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠার পিছনে যে উদ্দেশ্যগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন তার একাংশ এই অধ্যায়ের সূচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। সুনীতি সঞ্চারিণী সভার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বালকদের মধ্যে যে নীতিগুলি সঞ্চারিত করতে তৎপর হন তা কেবল তাঁর সংগঠনের একার উদ্দেশ্য ছিল না। উনিশ শতকের আটের দশক থেকে শুধু বালকদের মধ্যে নয়, ছাত্র-কিশোর এবং অবিবাহিত ও বিবাহিত যুবকদের মধ্যে এবং সর্বোপরি হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনে ব্রহ্মচর্যকে আদর্শ জীবনচর্চার মডেল হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতাe প্রকট হতে থাকে যা বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক

[১] ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (সম্পাদক), *কুমার পরিব্রাজক*, ১৩৪৬, ১৪৪-৪৫।

[২] Amiya P. Sen, *Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905 : Some Essays in Interpretation* (New Delhi: Oxford University Press, 1993), 221.

[৩] কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং তাঁর মিশনারি কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য-- ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সম্পাদিত তাঁর জীবনী *কুমার পরিব্রাজক*, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (সম্পাদক), *কুমার পরিব্রাজক*, ১৩৪৬। এছাড়া অমিয় প্রসাদ সেন তাঁর গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, Amiya P. Sen, *Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905,* 218-30.

জাতীয়তাবাদী চিন্তায় আদর্শ গার্হস্থ্য কল্পনার অঙ্গ রূপে গণ্য হয়। ফলত আমরা এই অধ্যায়ে ১৮৮০-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ সময়পর্বে বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী ভাষ্যে ব্রহ্মচর্যের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করব, যা হয়ে ওঠে একাধারে আদর্শ বাঙালি পুরুষ চরিত্রের মানদণ্ড এবং যৌনচর্যার সংহিতাস্বরূপ। ব্রহ্মচর্যচর্চার নিয়মাবলী বাতলে দিতে প্রকাশ হওয়া শুরু হয় অনেক তালিমি কেতাব। যদিও শুধু তালিমি কেতাবের মধ্যেই এই বিষয়ে আলোচনা সীমিত থাকে না। আলোচ্য সময়ের বিদ্বজ্জনদের রচিত গ্রন্থ, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, ধর্মমূলক প্রকাশনা, ডাক্তার-কবিরাজদের রচিত চিকিৎসামূলক রচনা, আত্মজীবনী এবং গল্প-উপন্যাসেও এই ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে আদর্শায়িত করা হয়। বহু ব্যক্তিত্ব তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনেও ব্রহ্মচর্যকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই ধরনের নীতিমূলক রচনার ব্যাপক প্রকাশের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন যা গার্হস্থ্যে মেয়েদের জীবনকে পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনের পাঠ দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকে প্রকাশিত হয়। যেমন জুডিথ ওয়ালস ১৮৬০ এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ধরনের বইয়ের সবচেয়ে বেশি প্রকাশনা লক্ষ করেছেন।[৪] অন্যদিকে তনিকা সরকার এবং সুদেষ্ণা ব্যানার্জী এই ধরনের কিন্তু কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের বইয়ের ব্যাপক প্রকাশনা লক্ষ করেছেন যা তাঁদের মতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের রক্ষণশীল ধারার চিন্তাবিদদের ভাবনার প্রতিফলন।[৫] যদিও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই ধরনের তালিমি কেতাবগুলি ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে বোঝার জন্য একমাত্র মাধ্যম নয়। তার পাশাপাশি আরও যে বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনাগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি মিলিতভাবে সমকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে আদর্শায়িত করে তোলে। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মতো আরও বেশ কিছু ব্রহ্মচারী চরিত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্যচর্চার পাঠ দেওয়ার জন্য সুনীতি সঞ্চারিনী সভার মতো বেশ কিছু সংগঠন তৈরি হয়।

আমরা এই প্রথম অধ্যায়ে মূলত ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিসরে কোন প্রেক্ষিতে ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় এবং ব্রহ্মচর্য শিক্ষা বলবৎ করতে চাওয়ার ইচ্ছা

---

৪ যুডিথ ওয়ালস এই ক্ষেত্রে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯00 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তালিমি কেতাবের প্রকাশনা লক্ষ করেছেন। Judith E Walsh, *Domesticity in Colonial India: What Women Learned When Men Gave Them Advice* (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004), 38.

৫ Tanika Sarkar, "Hindu Conjugality and Nationalism in Late Nineteenth Century Bengal," in *Indian Women: Myth and Reality,* ed. Jasodhara Bagchi (Hyderabad: Sangam Books, 1995), 99; Sudeshna Banerjee, *The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947, PhD Dissertation* (London: SOAS, 1997), 60.

বাস্তবায়িত করার উদ্যোগগুলি নেওয়া হয় তা বোঝার চেষ্টা করব। এইক্ষেত্রে আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী পরিকল্পে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সাবর্ণ ভদ্রলোক গোষ্ঠী ব্রহ্মচর্যকে ঘিরে কীভাবে পৌরুষ এবং পুরুষ যৌনতার নীতিমালার (moral code) নির্মাণ করে সেই প্রক্রিয়াটির অনুধাবন করা। ফলত এখানে দেখার চেষ্টা করা হবে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিসরে ব্রহ্মচর্য কীভাবে পৌরুষের প্রতীকী ভাষ্য হয়ে ওঠে এবং একাধারে এর মধ্য দিয়ে কেমন করে যৌনতার একটি বিধিবদ্ধ নীতিমালা তৈরি হয় যা বাধ্যতামূলকভাবে বিসমনিয়মাত্মক (heteronormative) এবং পিতৃতান্ত্রিক।[৬] আর এই ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বোঝার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের পরিসরে পৌরুষ সম্পর্কে তৈরি হতে থাকা আদর্শের চরিত্রটি অনুধাবন করার চেষ্টা করব। এইক্ষেত্রে আমরা মূলত আলোচ্য সময়ে হিন্দু মধ্যবিত্তের উপনিবেশবিরোধী সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী কল্পনায় অন্তর্নিহিত আধিপত্যবাদী প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব এবং প্রশ্ন করার চেষ্টা করব কীভাবে এই বিকল্প পৌরুষের ভাষ্যনির্মাণের প্রক্রিয়াটি ক্রিয়াশীল হয়? পাশাপাশি উত্থাপিত হবে আরও দুটি প্রশ্ন, প্রথমত আধিপত্যের এই বিকল্প বয়ানটির নির্মাণে ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শন কী ভূমিকায় উপস্থিত থাকে? দ্বিতীয়ত সার্বিকভাবে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে ব্রহ্মচর্য বাঙালি ভদ্রলোকের পৌরুষের অবধারণার নির্মাণে কী ভূমিকা নেয়?

এইক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আমরা আলোচনাটিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করব। প্রথম অংশ আমরা মূলত ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের জাতপাতগত দর্শনের পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় ব্রহ্মচর্যের আদর্শের উত্থানকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করব। দেখার চেষ্টা করব একদিকে পৌরুষ এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ কীভাবে এর আদর্শগত ভিত্তি তৈরি করছে। দ্বিতীয় অংশে আমরা ব্রহ্মচর্যের মতো দর্শনের মধ্যে অন্তর্নিহিত আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-অনুশাসনের ধারণাটি যে সমকালীন চিন্তাবিদদের রচনার মধ্য দিয়ে নির্মিত হচ্ছিল সেই বিষয়টি উত্থাপন করব। এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়টি লিঙ্গায়িত হয় কীভাবে সেই দিকটি হবে আলোচনার অন্যতম বিষয়। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা জাতীয়তাবাদী কল্পনায় গার্হস্থ্য যেভাবে কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র হিসেবে উত্থাপিত হয় সেই বিষয়টি উত্থাপন করে দেখার চেষ্টা করব ব্রহ্মচর্য কীভাবে

---

[৬] বিসমনিয়মাত্মক পিতৃতন্ত্র বলতে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে বিসমকামিতা এবং পিতৃতন্ত্রকে স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক হিসেবে গণ্য করা হয়, আর অন্যান্য অবস্থানকে অস্বাভাবিক, নীতিভ্রষ্ট এবং ধৃণ্য মনেকরা হয়। Maile Arvin, Eve Tuck, and Angie Morrill, "Decolonizing Feminism: Challenging Connections between Settler Colonialism and Heteropatriarchy," *Feminist Formations* 25, no. 1 (2013): 13.

একটি পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণমূলক প্রকল্প হিসেবে উঠে আসে। শেষ অংশে আমরা যৌনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দেখতে চাইব, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাষ্যে যৌনতার বিশেষ অর্থটি এবং তা যৌনাচারকে কীভাবে একমাত্র সন্তান উৎপাদনমূলক প্রকল্প হিসেবে মান্যতা দেয়।

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, ব্রহ্মচর্য এবং সাবর্ণ হিন্দু পৌরুষ

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব উপনিবেশিত ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও মতাদর্শের বিকাশের জন্য যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, তা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।[৭] বিশেষ করে এই অধ্যায়ে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের একাংশ নিজেদের রাজনৈতিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ থেকে যেভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন তার কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায় এক জাতিসত্তার ধারণা। অবশ্যই এই জাতিসত্তার ধারাণা পশ্চিমী অভিজ্ঞতারই ফসল। ভারতীয়দের মধ্যে আনুগত্য প্রোথিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন করা হলেও,[৮] এটা ভারতীয়দের মধ্যে পশ্চিমী যুক্তিবাদী এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার চর্চার পথকে উন্মুক্ত করে।[৯] নাগরিকতা, রাষ্ট্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নাগরিক সমাজ, জনপরিসর, আইনের সমতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়, বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতার মতো অনেক ধারণা ভারতীয়দের মধ্যে "রাজনৈতিক আধুনিকতার" দ্যোতক হয়ে আসে।[১০] আর পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রাই উক্ত ধাঁচে জাতিকে কল্পনার তাগিদটি অনুভব করে। কিন্তু একই সাথে এটাও লক্ষ করা যায় যে জাতিকে কল্পনা করার উপাদানগুলি তাঁরা দেশীয় সমাজ থেকেই নানা পদ্ধতিতে সংগ্রহ করেছিলেন, ঝাড়াই বাছাই করেছিলেন এবং নানা সৃজনশীল উপায়ে ব্যবহার করেছিলেন। ফলত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখ করে বলা যায় ভারতীয় জাতিচেতনার মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতা থেকে ভিন্ন একটি 'আধুনিক' জাতীয় সংস্কৃতিকে কল্পনা করার প্রবণতা

---

৭ Sumit Sarkar, *Essays of a Lifetime : Reformers, Nationalists, Subalterns* (Albany, NY: State University of New York Press, 2019), Chapter 3 - The Pattern and Structure of Early Nationalist Activity in Bengal, 53-85.

৮ এই দিকটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন গৌরী বিশ্বনাথন। Gauri Viswanathan, *Masks of Conquest : Literary Study and British Rule in India* (Delhi: Oxford University Press, 1989).

৯ Akshayakumar Ramanlal Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, 3rd ed (Bombay: Popular Prakashan, 1959), 144.

১০ Dipesh Chakrabarty, *Provincializing Europe : Postcolonial Thought and Historical Difference* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000), 4.

প্রকট হয়ে ওঠে যা আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠিতে পশ্চিম থেকে উন্নততর সংস্কৃতির দাবি রাখে।[১১] ১৮৭০-এর দশক এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়, যাকে এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের উত্থানের সময় হিসাবে দেখা হয়।[১২] কিন্তু আরও নির্দিষ্ট করে বলতে হলে ঐতিহাসিকরা আলোচ্য শতকের সাত এবং আটের দশকে এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রধান ধারার মধ্যে হিন্দুধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী প্রবণতা লক্ষ করেছেন,[১৩] যার কেন্দ্রে ছিল নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবাদর্শ।[১৪]

ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন ১৮৭০-এর দশক থেকে বাংলায় সমাজ সংস্কারের ঢেউ অনেকটাই স্তিমিত হতে থাকে। ব্রাহ্মদের অন্তর্কলহ আর জনপ্রিয়তা কমতে থাকা এই প্রবণতাটিকে অরও স্পষ্ট করে তোলে।[১৫] তুলনায় হিন্দু মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশের মধ্যে সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি ঝোঁক বাড়তে দেখা যায়। যেমন সুমিত সরকার দেখান আলোচ্য সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মীয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। পশ্চিমী যৌক্তিকতানির্ভর শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বাইরে থাকা রামকৃষ্ণের হিন্দু ধর্মের এক সহজ-সরল ব্যাখ্যা অসংখ্য ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তকে আকৃষ্ট করে। যে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বিদেশি সওদাগরি অথবা সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি করতে করতে পিষ্ট, ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা কাজের সময় অথবা অপরিচিত কাজের নিয়মের আবদ্ধতায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ, তারা রামকৃষ্ণের ভক্তির আবেদনে পলায়নের পথ খুঁজে পায়।[১৬] রামকৃষ্ণকে সেই অর্থে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী বলা যায় না। কারণ তিনি সমন্বয়বাদী ধর্মীয় দর্শনের কথা না বললেও অন্যান্য ধর্মীয় দর্শনের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তিনি মনে করতেন পৃথিবীতে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়ার বহু পথ আছে, কিন্তু সকলকে নিজের পথে অটল থাকতে হবে। রামকৃষ্ণের এই উদার মনোভাব খুব দ্রুতই হিন্দুধর্মের মূল নির্যাস হিসেবে প্রতিপন্ন হতে থাকে। ফলত তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের কাছে এটি একটি ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় যার উপর

---

[১১] Partha Chatterjee, *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993), 6.

[১২] Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism* (Bloomington: Indiana University Press, 2001), 2.

[১৩] Tanika Sarkar, Ibid., 8; Sarkar, *Essays of a Lifetime : Reformers, Nationalists, Subalterns*,72, 76.

[১৪] Banerjee, *The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947, PhD Dissertation, 41-59*.

[১৫] Sen, *Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905 : Some Essays in Interpretation*; Sarkar, *Essays of a Lifetime : Reformers, Nationalists, Subalterns*, 76.

[১৬] Sumit Sarkar, "'Kaliyuga', 'Chakri' and 'Bhakti': Ramakrishna and His Times," *Economic and Political Weekly* 27, no. 29 (1992): 1543–66.

ভর করে তিনি সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে সক্ষম হন।[১৭] হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বের এই ধারণাটি এই সময়ের সবচেয়ে কট্টর হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের মূল ভাষ্য। বিবেকানন্দকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মতাদর্শের বাহক হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে,[১৮] অথবা সাধারণভাবে 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদ' এই পরিভাষাটির ব্যাবহার করার ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিকের অনিচ্ছা থাকলেও,[১৯] বিবেকানন্দের বৈদান্তিক ধারা থেকে অনুপ্রেরণা,

---

[১৭] Ibid., 1553, 1559.

[১৮] Tapan Raychaudhuri, *Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal* (Delhi: Oxford University Press, 1988), 9-10.

[১৯] 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদ' এই পরিভাষাটির যথার্থতা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্য আছে। তপন রায়চৌধুরী মনে করেন, পুনরুত্থান শব্দটি সমস্যাজনক কারণ আলোচ্য সময়ে প্রাচীন ঐতিহ্যকে সাধারণ মানুষ থেকে পণ্ডিত-শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা থেকে চর্চা করার কথা বলছিলেন। ফলত অতীতকে অবিমিশ্রভাবে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব এই সময়ে উঠে আসেনি। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেন ঐতিহ্যগত যা কিছুকে সমকালীন ব্যক্তিরা চর্চা করার কথা বলছিলেন তা কোনো না কোনো ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জীবনচর্চায় অব্যাহত ছিল, তা লুপ্ত হয়ে যায়নি। কিছুটা কাছাকাছি সমালোচনা সম্প্রতি বসুধা ডালমিয়ার আলোচনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ পরিভাষাটি এক ধরনের ভ্রান্তি তৈরি করে যে, এই গোষ্ঠীর সমর্থকরা কোনো ধরনের পরিবর্তনেরই পরিপন্থী। তাঁর মতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ যেন এক সেকেলে ধর্মীয় আচার যা সেই সময়ের তুলনায় জড় বা মন্থর স্বভাবের – এমন একটি নিন্দাসূচক বিষয় হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়। তপন রায়চৌধুরীর মতো তিনিও মনে করেন, হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে অপ্রচলিত সেইসব অতীতের আচার, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান থেকে উদ্ধার করে আনা কিছু ধারণার সমষ্টি যখন মনে করা হয় তখন এই সত্যটি অস্বীকার করা হয় যে প্রচলিত নানা ধর্মীয় চর্যা থেকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ আধুনিকতার ধাঁচে অনেক কিছুকেই বেছে নিয়েছিল। অন্যদিকে এই প্রবণতার প্রতি তিনি অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন যে জ্ঞানদীপ্ত গোষ্ঠী থেকে তুলনায় কম উদার বা পুরোপুরি গোঁড়া – এই সকল আধুনিক হিন্দুধর্মের সমর্থকরাই একাধিক ধর্মীয় চর্যাকে কাছে এনে এক বিশেষ ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দুধর্মের ধারণা তৈরি করতে চাইলেন।

বসুধা ডালমিয়া অপেক্ষাকৃত গোঁড়া অংশকে *traditionalist* এবং তুলনায় র‍্যাডিকালদের *reformist* বলার পক্ষপাতী। কিন্তু এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৮৭০ নাগাদ অন্তত বাংলায় হিন্দু সনাতন ধর্মের পক্ষ থেকে শুরু করে সংস্কারপন্থী সকল ঘরানার ব্যক্তিত্বরাই সাংস্কৃতির রেটরিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কল্পনা করতে গিয়ে সর্বদাই ভারতীয় ঐতিহ্যর দিকে পিছন ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়েছেন, যে রসদ তাঁদের দিয়েছিলেন প্রাচ্যবাদীরা। আর বলা বাহুল্য, সংস্কারবাদী হিসাবে যাঁদের চিহ্নিত করা হয় তাঁরা তো বটেই, নব্য-হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যেও এই ঝোঁক কম বেশি সবার ক্ষেত্রেই বর্তমান ছিল। কারণ এই সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই কোনো না কোনো ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পল হ্যাকার দেখেছেন নব্য-হিন্দুত্ববাদ বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা থেকে এলেও এই সারস্বত সমাজের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার থেকেই প্রাথমিকভাবে তাঁদের বৌদ্ধিক ঝোঁক তৈরি হয়েছিল। Paul Hacker, "Aspects of Neo-Hinduism as Contrasted with Surviving Traditional Hinduism," in *Kleine Schriften*, ed. L. Schmidthausen (Wiesbaden: Franz Steiner, 1978), 580–608.ফলত পরিবর্তনের প্রতি বিমুখ থাকার প্রবণতা নব্য-হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে ছিল তা মনে করা সঠিক হবে না। একই সাথে এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়াও অসংগত যে তাঁরা শুধুই চর্চার স্তরে থাকা হিন্দু আচার প্রথাকেই বহণ করছিলেন। একই সাথে তাঁরা অনেক বিষয় সংযোজন করছিলেন যা একাধারে প্রাচ্যাবাদ থেকে গৃহীত। আর পাশ্চাত্য অধুনিকতার সাথে কোনো না কোনো রকম সংযোগ তৈরি হওয়ার ফলেই তাঁদের মধ্যে এই প্রবণতার উপস্থিতি প্রকট হয়। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষা সঞ্জাত আধুনিকতাকে তাঁরা যে গ্রহণ করছেন তা জনপরিসরের আলোচনায় স্বীকার করা যাবে কিনা, এই প্রশ্নটিতে আলোচ্য পর্বে বাংলায় সংস্কারবাদীদের তুলনায় হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের চিন্তায় স্পষ্ট তারতম্য লক্ষ করা যায়। এই প্রশ্নটিতেই পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ আসে যে ধারা পাশ্চাত্য বাহিত চিন্তা-চেতনাকে কম বেশি গ্রহণ করলেও তাকে স্বীকার করতে গররাজি ছিল। এই প্রসঙ্গেই তাঁদের একটা বিশ্বাসের কথা বলা দরকার যে এঁরা নিজেরাই অনেকে বিশ্বাস করছিলেন, তাঁরা হিন্দুধর্মকে তার 'পুরাতন মহিমায়' ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, যেটা সংস্কারপন্থীদের প্রকল্পে ছিল না। এই প্রবণতাকে *traditionalist* হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এই যুক্তিতেই সমগ্র ঔপনিবেশিক কালপর্ব ধরে পরম্পরাবাদী ও সংস্কারবাদী- এই ধাঁচে বিভাজনরেখা যে একইভাবে অব্যাহত থাকবে তা নির্ণয় করা ইতিহাস অনপেক্ষ হয়ে যায়। ফলত মূল বিষয়ে ফিরে এসে বলা যায় অমিয় প্রসাদ সেনের যে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন

হিন্দুধর্মের আগ্রাসী ব্যাখ্যা, বেশ কিছু গোঁড়া হিন্দু আচারে বিশ্বাস, গৌরবময় হিন্দুসভ্যতার প্রতি পরম আস্থা এবং সম্প্রতি সেই ধর্ম অবক্ষয়ের পথে[২০] এই ধারণাগুলি নানাভাবে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী চেতনাকে রসদ যোগায়। আর সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের এই প্রবণতার প্রতিই আমরা পুনরায় আলোকপাত করতে চাই, যাকে সুমিত সরকার চিহ্নিত করতে চাইছেন সমাজ সম্পর্কে উদারনৈতিক আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বল হতে থাকা এবং সেই স্থানে তুলনায় সমালোচনা বিমুখ, সমাজসংস্কার বিমুখ মতাদর্শ স্থান করে নেওয়ার প্রবণতা দিয়ে।[২১] ফলে আলোচ্য সময়ে ভারতীয়দের একাংশের কাছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-সমর্থিত সংস্কারগুলি হয়ে দাঁড়ায় বাইরে থেকে ধার করে আনা যুক্তিবাদী চিন্তা আর ভারতীয় সমাজের প্রতি তৈরি হওয়া পশ্চিমী সমালোচনার কাছে অপ্রয়োজনীয়ভাবে মাথা নত করার সমান। যদিও এই অংশ সংস্কারের ধারণাকে হয়তো সম্পূর্ণ ত্যাগ করেনি। কিন্তু নির্বাচিতভাবে কিছু 'ঘরোয়া' বিষয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের চরমভাবে বিরোধিতা করে। এর সম্ভবত সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৮৯১ সালের সহবাস সম্মতি আইনটিকে ঘিরে কলকাতা তথা বাংলার হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশের বিরোধিতা, যাকে তনিকা সরকার সেই অর্থে আধুনিক ভারতে উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী জনআন্দোলনের প্রথম প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন।[২২] এটি সম্ভবত সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত যেখানে 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদী' আবেগগুলিকে মূর্ত হতে দেখা যায়,[২৩] যেখানে

যে 'পুনরুত্থান' শব্দটি সমকালীন আলোচনাতেই উঠে এসেছে, তাকে গুরুত্ব দেওয়াই যথার্থ। অর্থাৎ সমকালীন ব্যক্তিরা যেহেতু পুনরুত্থানবাদ শব্দটির মধ্য দিয়েই সমকালীন প্রবণতাটিকে বুঝেছেন, তাই তাকে গ্রহণ করে নিয়ে তার পরেই বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করা যুক্তিসঙ্গত। দ্বিতীয়ত সেন দেখিয়েছেন অতীত ঐতিহ্য থেকে বহু কিছু গ্রহণ করলেও সকলেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাকে ব্যবহার করার সময় বিষয়টির অর্থ বদলে গিয়েছে।[19] ফলত পুনরুত্থানবাদ এই পরিভাষাটির সীমাবদ্ধতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করা গেলেও, এটিই সম্ভবত এখনও পর্যন্ত বৌদ্ধিক জগতে ব্যবহৃত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শব্দ যা দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে বাংলায় ক্রিয়াশীল একটি বৌদ্ধিক ধারাকে চিহ্নিত করা সম্ভব। Raychaudhuri, *Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*, 9-10; Vasudha Dalmia, *The Nationalisation of Hindu Traditions : Bharatendu Harischandra and Nineteenth-Century Banaras* (New Delhi: Oxford University Press, 1997), 6; Sen, *Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905 : Some Essays in Interpretation*, 10-11

২০ Sen, *Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905 : Some Essays in Interpretation*, 328-46.

২১ সুমিত সরকার এই পরিবর্তনের সময় হিসেবে মূলত উনিশ শতকের আটের দশককে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। Sarkar, *Essays of a Lifetime : Reformers, Nationalists, Subalterns*, 74-77.

২২ Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*. 195, 229-30.

২৩ সুমিত সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন যে সাধারণ সময় সংস্কারপন্থী এবং পুনরুত্থানবাদীদের মতামতে অনেক অধিক্রমণ লক্ষ করা গেলেও এই চরম মুহূর্তগুলিতে মেরুকরণগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। Sarkar, *Essays of a Lifetime : Reformers, Nationalists, Subalterns*, 76.

মেয়েদের যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণকে ঘিরে বাঙালি পুরুষ এবং ভিক্টোরীয় ব্রিটেনের পিতৃতান্ত্রিক দর্শনের মধ্যে বিবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে বৈপ্লবিক করে তোলে।[২৪]

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতেই একটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় যে কেন দেশীয় গোঁড়া পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শকে মাধ্যম করে উনিশ শতকের অন্তিমপর্বে উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এই প্রশ্নটির সবচেয়ে সরাসরি উত্তর দিয়েছেন তনিকা সরকার, যা আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এখানে উনিশ শতকের আটের দশক পর্যন্ত এসে ঔপনিবেশিক শাসন এবং তার রাজনৈতিক অর্থনীতি বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের মধ্যে যে হতাশা তৈরি করে তার দীর্ঘ খতিয়ান দেন। যেমন বাঙালির নিজস্ব অর্থনৈতিক বিনিয়োগের বিফলতা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে পরজীবী (parasitic) জমিদারশ্রেণী তৈরি হয়, খাজনাসংক্রান্ত আইন*গুলি* প্রবর্তিত হওয়ায় তাদেরও যথেচ্ছ কর আদায়ের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়। অন্যদিকে যথেষ্ট শোষণমূলক এবং প্রান্তিক করে দেওয়া কেরানির চাকরিতে দিন চালালোর গ্লানি, পশ্চিমী শিক্ষা যে জাদুকাঠির মতো ভারতীয়দের ভবিষ্যৎকে বদলে দেবে মনে করা হয়েছিল– তার প্রতি আশাভঙ্গ মধ্যবিত্ত বাঙালিকে আরও হতাশ করে তোলে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের এই যে ক্রমবর্ধমান মোহভঙ্গ, সহবাস সম্মতির বয়স সংক্রান্ত বিতর্কটি সেই প্রক্রিয়াটিকেই ত্বরান্বিত করে। জাতীয়তাবাদীদের জন্য 'জনপরিসর পুরুষত্ব পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে *ওঠে*' যেখানে তারা অনবরত বিফল হয়ে চলেছিল। ফলত সহবাস সম্মতির বয়স সংক্রান্ত বিতর্ক ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী বিরোধের মধ্য দিয়ে 'হিন্দু' দাম্পত্য এবং গার্হস্থ্যের সামাজিক বন্দোবস্তের ব্যাপক রাজনীতিকরণ ঘটে।[২৫] অন্য সকল ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ এবং বিফলতার গ্লানির পর এই গার্হস্থ্যই একমাত্র পরিসর হিসেবে পড়ে থাকে যেখানে বাঙালি পুরুষরা নিজের স্বায়ত্তশাসনকে সংরক্ষিত রাখার মধ্য দিয়ে জনপরিসরে নিজেদের পুরুষত্বের প্রমাণ দিতে সক্ষম থাকে।[২৬] তনিকা সরকারের এই যুক্তিক্রমকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মৃণালিনী সিন্‌হা দেখান একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শাসনই দেশীয় গার্হস্থ্যের পরিসরকে 'দেশীয় পৌরুষের' সার্বভৌম ক্ষেত্র হিসেবে সংরক্ষিত করে, অন্যদিকে গার্হস্থ্য পরিসরের এই নির্মাণটির ফলে সমাজসংস্কার সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের সংশয় বৃদ্ধি

---

২৪ Dagmar Engels, "The Age of Consent Act of 1891: Colonial Ideology in Bengal," *South Asia Research* 3, no. 2 (1983): 107–31.

২৫ Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation: Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 196-97.

২৬ Ibid., 197.

পায় কারণ তারা মনে করতে থাকে এই পরিসরের সংস্কার হলে ভারতীয়রা সকল সার্বভৌমত্ব হারাবে।[২৭] আমরা এই যুক্তিক্রমটিকে ভিন্ন দিকে আরও কিছুটা সম্প্রসারিত করে দেখতে পারি গার্হস্থ্যের পরিসরে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসার এই সঙ্কট থেকে বাঙালি পুরুষত্ব শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েদের সহবাস সম্মতির বয়স নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিতে নিজের সার্বভৌমত্ব দাবি করে না। 'দেশীয় পৌরুষ' এই সর্বভৌম নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিকে গার্হস্থ্যের অন্য সদস্যদের ওপরও প্রতিষ্ঠা করতে স্বচেষ্ট হয়। যেখানে এসে যায় ছাত্র-কিশোর-যুবকদের মতো পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যদের প্রসঙ্গ। ফলত হিন্দু পিতৃতন্ত্র এখানে লিঙ্গের পাশাপাশি প্রজন্মগত উচ্চতর ক্রমকেও নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করে। ব্রহ্মচর্যের মতো একটি সাবর্ণ অনুশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে পুনর্নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে ওঠে যা 'দেশীয় পৌরুষের' একটি বিকল্প সার্বভৌম ক্ষেত্রের কল্পনা থেকে জাত।

হিন্দু পিতৃতন্ত্র এবং পুরুষত্বের সঙ্কট সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মতামতের মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হয়, তাকে আর একটি গতে বাঁধা ঔপনিবেশিক নির্মাণ বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তা হল পৌরুষদৃপ্ত ইংরেজ এবং মেয়েলি বাঙালি পুরুষের ধারণা। মৃণালিনী সিন্‌হা দেখিয়েছেন উনিশ শতকের বিভিন্ন পর্যায়ে ঔপনিবেশিক প্রতর্কে বাঙালি এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অনেক গোষ্ঠীর পুরুষদের মেয়েলি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হলেও, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব বিশেষত আটের দশকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জোরালো সমালোচক হয়ে ওঠা পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় এবং বিশেষ করে বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষদেরই নির্দিষ্টভাবে মেয়েলি প্রতিপন্ন করা শুরু হয়।[২৮] এই আলোচনাটিতে আশীষ নন্দী দ্বিতীয় মাত্রা যোগ করেন। তিনি দেখান ঔপনিবেশিক বয়ানে ঔপনিবেশিত প্রজার চরিত্র চিত্রায়ণ করা হয় মেয়েলি এবং শিশু সুলভ হিসাবেও, আর বিজেতা হিসাবে ঔপনিবেশিক শক্তি নিজের চরিত্রের সাথে জুড়ে দেয় পৌরুষদৃপ্ত এবং পরিণতবয়স্ক হওয়ার স্বাভিমান।[২৯] এক্ষেত্রে মৃণালিনী সিন্‌হা তাঁর সন্দর্ভে 'ঔপনিবেশিক পৌরুষের' যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছবি তুলে ধরেছেন সেখানে উনিশ শতকে পৌরুষদৃপ্ত ইংরেজ এবং মেয়েলি বাঙালির নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে খুব সূক্ষ্মভাবে উত্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পৌরুষকে ঘিরে ক্ষমতার উক্ত সমীকরণটি

---

[২৭] Mrinalini Sinha, *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century* (New Delhi: Kali for Women, 1995), 140.

[২৮] Ibid., 16-18.

[২৯] Ashis Nandy, *Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self Under Colonialism* (New Delhi: Oxford University Press, 1983). 7-8, 11-16, 52-53.

কখনোই স্থায়ী থাকেনি এবং একতরফা উপনিবেশকারীদের তরফ থেকে তৈরি হয়নি। বরং তুলনায় তা অনেক গতিময়, এবং সমকালীন বস্তুগত প্রেক্ষিতে নির্মিত এবং পরিবর্তিত হয়েছে। ফলত তাঁর মতে বাঙালি মেয়েলিত্বের ধারণাটি উপনিবেশকারীদের সাথে দেশীয় মধ্যবিত্তের বিরোধ এবং সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। আর অপরদিকে ঔপনিবেশিক পৌরুষ এবং মেয়েলিত্বের রাজনীতিটি থেকে একাধারে এই লক্ষণটিও বোঝা যায় যে পৌরুষের ধারণাকে আবর্তন করে দেশীয় মধ্যবিত্তও ঔপনিবেশিক সমাজে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিল।[৩০] এই প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রেক্ষিতে ইন্দিরা চৌধুরী বিস্তারিতভাবে উত্থাপন করেছেন কীভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পৌরুষের বিকল্প ভাষ্য নির্মাণ করে।[৩১] ফলত ঔপনিবেশিক জনপরিসরে বাঙালি মধ্যবিত্তের পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠায় বিফলতাবোধ এবং মেয়েলিত্বের 'অপবাদ', সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিকল্প আধিপত্যবাদী পৌরুষ নির্মাণের তাগিদগুলিকে প্রকট করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়াটিকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করব। দেখার চেষ্টা করব এই যে প্রক্রিয়াটিও একই সাথে কীভাবে পৌরুষের আধিপত্যকামী ভাষ্য তৈরি করে।

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী প্রতর্কে নির্দিষ্টভাবে আমরা দুটি প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে পারি যা ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একটি নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী বিশ্বদর্শনের নির্মাণ, অপরটি পৌরুষ সম্পর্কে তৈরি হতে থাকা বাঙালির নিজস্ব ভাবমূর্তি যাকে জন রোসালিন 'self-image of effeteness' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।[৩২] ব্রহ্মচর্য নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা এই দুটি প্রবণতার মধ্যে গভীর যোগাযোগ লক্ষ করব। উনিশ শতকের অন্তিমপর্বে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাবশালী ধারাটি যে আধ্যাত্মিকতাবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে গার্হস্থ্যকে জাতির অবধারণার কেন্দ্রে আনতে চেয়েছে তাকে সুদেষ্ণা ব্যানার্জি নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩৩] হিন্দু পুনরুত্থানবাদের বৃহৎ দর্শনগত ভিত্তি হিসেবে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী

---

৩০ Sinha, *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century*. 22

৩১ Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History : Gender and the Politics of Culture in Colonial Bengal*, SOAS Studies on South Asia (Delhi: Oxford University Press, 2001).

৩২ John Rosselli, "The Self-Image of Effeteness: Physical Education and Nationalism in Nineteenth-Century Bengal," *Past and Present* 86, no. 1 (1980): 121–48.

৩৩ Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947," Unpublished PhD Dissertation, 41.

জ্ঞানতত্ত্বকে বিবেচনা করা যায়। সুদেষ্ণা ব্যানার্জি দেখিয়েছেন নিকট অতীতে ব্রাহ্মণ্যবাদ বলতে যদি মূলত বোঝায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, তাহলে এই নতুন সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ উদ্দীপিত হয় নিজেকে যুক্তি দ্বারা গ্রহণযোগ্য করে তোলার কাজে। উপনিবেশবাদ যখন সভ্যতার মানদণ্ড হিসেবে 'যুক্তিবাদ', জ্ঞানতাত্ত্বিক সার্বিকতা, অথবা 'নৈতিক সততা'র মতো বিষয়গুলিকে আবশ্যিক মনে করতে থাকে, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী অধিবিদ্যাও উৎসুক হয় এর নিরিখে একটি আদর্শ হিন্দু জীবনের ছবি তৈরি করতে। যেহেতু ঔপনবেশিক যুক্তিগুলিকে মোকাবিলা করার প্রয়োজন থেকেই এই মতবাদের উত্থান তাই অনেকক্ষেত্রেই আলোচ্য সময় সচেতনভাবে 'যুক্তির আলোকে' শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা বেগ পায় ।[৩৪]

উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখান জেমস মিল তার গ্রন্থ History of British India হিন্দুদের আদিম, অনিয়মানুবর্তী, কুসংস্কারগ্রস্ত, অত্যন্ত কামুক এবং নৈতিকতার ধার ধারে না– এমন একটি সম্প্রদায় হিসাবে চিত্রিত করেন।[৩৫] মনিয়াস উইলিয়াম মনে করতেন ভারতীয় ইস্কুলের ছাত্রদের পরিণত হয়ে ওঠার একান্ত উপায় স্বেচ্ছায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। সমকালীন ভিক্টোরীয় মতামতের ধাঁচে অনেক ইংরেজ ব্যক্তিত্ব ভারতীয় বাল্যবিবাহ এবং মহিলাদের 'পদদলিত' অবস্থাকে সমালোচনা করেন। বিপরীতে দু-পক্ষের সহমতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সাহচর্যপূর্ণ বিবাহকে (companionate marriage) তাঁরা উপযোগী মনে করেছেন যা খ্রিস্টীয় রীতিনীতিকেই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে। আরেকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হেনরি মেইনের প্রবণতা ছিল রোমান বিধিবদ্ধ আইনকে পৃথিবীর অন্যান্য আদিম সমাজের আইন থেকে অগ্রসর প্রমাণ করা, যেখানে বিধিবদ্ধতা হয়ে ওঠে উন্নতির চিহ্নক। আর যে সমাজগুলির আইন বিধিবদ্ধতার বাইরে তারা সভ্যতা হিসাবে পিছিয়ে পড়া। তাঁর মতে সভ্যসমাজের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, এবং এ-ধরনের অধিকার সমকালীন ইংরেজ আইনব্যবস্থাই যেন সুনিশ্চিত করেছে যেখানে ভারতীয় পারিবারিক আইন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মানমর্যাদা এবং পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ফলত তা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং ইংরেজ আইন-কানুনের নিরিখে আদিম।[৩৬] ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে মিলের অশ্রদ্ধা, উইলিয়ামের মতো মানুষদের ভারতীয়দের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার বাসনা, প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তনের আশঙ্কা অথবা ভাতরীয় আইন-বিধিগুলি সম্পর্কে ঔপনিবেশিক আমলা-বুদ্ধিজীবীদের অবজ্ঞাগুলি হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যে

---

৩৪ Ibid., 44.

৩৫ Ibid., 44-45.

৩৬ Ibid., 45.

প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। উক্ত সমালোচনাগুলির সম্মুখীন হতে গিয়ে বাঙালি আত্মাভিমান এমন নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনকে তুলে ধরতে চায় যার ভিত্তি— লিপিবদ্ধ 'মান্যতাপ্রপ্ত' শাস্ত্র, যৌক্তিকতা, 'সভ্য' ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস, 'আর্য' ব্যুৎপত্তি, পরিপূর্ণ সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বিস্তৃত জ্ঞানতত্ত্ব।[৩৭]

আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঔপনিবেশিক প্রশাসন বিশেষ করে তার শাসনের প্রয়োজনে যেভাবে দেশীয় সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান তৈরি করতে শুরু করে তাও একভাবে ভারতীয় সমাজের জাতপাতকে ঘিরে তৈরি হওয়া আত্মপরিচয়গুলিকে আরও স্থায়ী এবং পোক্ত রূপ দেয়। বার্নার্ড কোন এই প্রবণতাটির প্রতি প্রাথমিকভাবে নজর টানেন[৩৮] এবং নিকোলাস ডার্ক এই বিষয়ে আলোচনার বিস্তার করে দেখান ঔপনিবেশিক প্রশাসন যে নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষাগুলি শুরু করে অথবা আদমসুমারির মতো পরিসংখ্যানগত তথ্যগুলি দেশীয় সমাজ থেকে আহরণ করতে থাকে তার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতীয়দের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক পরিচয়গুলি সংকুচিত হয়ে জাতপাতনির্ভর স্পষ্ট গণ্ডিবদ্ধ পরিচয়গুলি তৈরি হয়।[৩৯] যদিও জাত-পাত সংক্রান্ত এই গণ্ডিবদ্ধ আত্মপরিচয় নির্মাণটি ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-জ্ঞানের উপজ হিসেবে গণ্য করলে ভারতীয় প্রাক্-আধুনিক জাতিব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে অস্বীকার করা হয় এবং ঔপনিবেশিক আমলে জাতপাতনির্ভর সামাজিক সম্পর্কের নির্মাণে ভারতীয়দের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়। সুজান বেইলির আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় জাতপাতনির্ভর গণ্ডিবদ্ধ আত্মপবিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়াটি ইংরেজ শাসনের পূর্বেই দৃশ্যমান ছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয়দের সক্রিয় ভূমিকাও কিছু কম ছিল না।[৪০] আর প্রাচ্যবাদী, মিশনারি,

---

৩৭ Ibid., 45.

৩৮ Bernard S. Cohn, *An Anthropologist Among the Historians and Other Essays* (Delhi ; New York: Oxford University Press, 1987), Chapter - "The Census, Social Structure and Objectification in South Asia", 224-54.

৩৯ Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind : Colonialism and the Making of Modern India* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), 5.

৪০ সুজান বেইলি দেখিয়েছেন 'caste' এই শব্দটি ইউরোপীয় বাণিজ্যিক অভিযান এবং পরবর্তী রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সময় থেকেই ভারতীয় সমাজের বিশেষ সামাজিক বিন্যাস বোঝাতেই প্রথম ব্যবহার হতে দেখা যায়। 'caste' বলতে প্রথম দিকের ইউরোপীয় বনিক বা ভ্রমণকারীরা যে ঢিলেঢালা বিবিধ সামাজিক পরিচিতিকে চিহ্নিত করেতেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠীত হওয়ার পর তার অর্থ আর ততটা ঢিলেঢালা থাকে না। বিশেষত অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে এটি তুলনায় অনেক স্পষ্ট একটি সামাজিকভাবে ক্রমোচ্চ বিন্যস্ত ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের বহু সমাজিক প্রতিষ্ঠানের কথা নজরে এনেছেন যা কাস্ট বা কাস্টের মতো বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। সুসান বেইলি দেখিয়েছেন অষ্টাদশ শতকে ভারতে মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা সঙ্কটের মুখে পড়ার পর থেকে যে আঞ্চলিক স্তরে রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয় সেখানেও জাতি এবং বর্ণভিত্তিক সামাজিক বিন্যাসগুলি বিশেষভাবে প্রকট থাকতে দেখা যায় এবং সেই রাষ্ট্রগুলির নির্মাণে জাতপাত বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। আর ঔপনিবেশিক কালপর্বেও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি দেশীয় জনতাও এই জাতপাতের নির্মাণ

ঔপনিবেশিক প্রশাসক, পর্যবেক্ষক, নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষকরা ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-জ্ঞানের এই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জাতিব্যবস্থাকে ভারতীয় সমাজের 'অনগ্রসরতার' চিহ্নক হিসেবে সমালোচনা করলেও,[৪১] এই সমালোচনাগুলি ভারতীয় সমাজের সকল অংশ যে সরাসরি আত্মস্থ করেছে তাও হয়তো বলা যায় না। আমরা উনিশ শতক জুড়ে বাংলায় জাতপাত সম্পর্কে সাবর্ণ শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের ধারণায় কিন্তু তুলনায় আরও জটিল প্রক্রিয়া কার্যকরী থাকতে দেখি। যেমন উনিশ শতকের প্রথম দফায় শিক্ষিত বাঙালির একাংশের মধ্যে জাতিভেদ ব্যবস্থাকে সামাজিক পশ্চাদপদতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা বেশ প্রকট ছিল এবং বিশেষ করে ব্রাহ্ম আন্দোলনে জাতিব্যবস্থাকে অস্বীকার করার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।[৪২] যদিও এই প্রয়াসগুলি কতটা আন্তরিক ছিল সেই বিষয়ে সুমিত সরকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৪৩] কিন্তু এই শতকের সাত এবং আটের দশকের মধ্যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী বয়ানে জাতিভেদ ব্যবস্থার সপক্ষে বক্তব্য মজবুত হতে থাকে। সম্প্রতি দ্বৈপায়ন সেন ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে উপনিবেশবাদ এবং জাতিব্যবস্থার বৃহত্তর প্রশ্নটি উচ্চবর্ণ কীভাবে নির্ণয় করে সেই বিষয়ে কৌতূহলবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিনিক্ষেপ জরুরি মনে করেছেন।[৪৪] এই আলোচনার প্রেক্ষিতে সমকালীন সাহিত্য-দুনিয়ার পরিচিত নাম চন্দ্রনাথ বসুর কথা উল্লেখ করা যায়।[৪৫] তিনি জাতিভেদের গুরুত্বকে নতুন যুক্তিতে উত্থাপন করেন। জাতিভেদ ব্যবস্থাকে

প্রক্রিয়াটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। Susan Bayly, *Caste, Society and Politics in India: From the Eighteenth Century to the Modern Age* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

৪১ Dirks, *Castes of Mind : Colonialism and the Making of Modern India*, 27, 33, 40-41, 232.

৪২ উনিশ শতকের আটের দশক পর্যন্ত ব্রাহ্ম আন্দোলনে জাতপাতের প্রশ্নটি ব্যাপকভাবে সামনে এসেছে এবং অসবর্ণ বিবাহ, পৈতে ত্যাগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতিভেদকে বৈপ্লবিকভাবে অস্বীকার করেছে ব্রাহ্ম আন্দোলনের কিছু ধারা। Pradip Sinha, *Nineteenth Century Bengal: Aspects of Social History* (Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1965), 121; David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind* (Princeton, New Jersey, 1979), 132-33, 148, 224; Kenneth W Jones, *Socio-Religious Reform Movements in British India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 34-36. বাংলার বাইরে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে জাতিভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Christine E. Dobbin, *Urban Leadership in Western India: Politics and Communities in Bombay City, 1840-1885* (Oxford University Press: London, 1972), 240-50; Richard Tucker, "Hindu Traditionalism and Nationalist Ideologies in Nineteenth-Century Maharashtra," *Modern Asian Studies* 10, no. 3 (1976): 321–48.

৪৩ Sumit Sarkar, *Writing Social History* (Delhi: Oxford University Press, 1997), 365.

৪৪ Dwaipayan Sen, "Caste in British India: Between Continuity and Colonial Construction, and Beyond," in *The Routledge Handbook of the History of Colonialism in South Asia*, ed. Harald and Maria Framke Fischer-Tiné (New York: Routledge, 2022), 19.

৪৫ চন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনা থেকে জানা যায় তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। হুগলির কৈকালা গ্রামের বসু পরিবার ওই অঞ্চলে "ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান হিন্দু" হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এঁরা শাক্ত উপাসনা করতেন, এবং তান্ত্রিক

টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাঁর যেন আপাতভাবে কোনো তাগিদ নেই। কিন্তু তাঁর মতে এই প্রথা যতদিন টিকে আছে ততদিন তার 'গুণ'গুলি গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তিনি মনে করেন পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায়নি এবং সেই তুলনায় ভারতীয় সমাজ অগ্রবর্তী। এই আধ্যাত্মিক অগ্রগতির কারণ জাতিব্যবস্থা, কারণ ভারতীয় সমাজের সকল স্তরে আধ্যাত্মিকতা চুঁইয়ে প্রবেশ করেছে জাতিভেদ ব্যবস্থার সৌজন্যেই। তিনি "বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র" নামক প্রবন্ধে লিখছেন-

> ...বর্ণভেদ প্রথার আর কতগুলি গুণ বা লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা ধর্ম্মভাবের প্রাধান্য বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ধর্ম্মচর্য্যা সমস্ত হিন্দু সমাজে বড়ই সম্প্রসারিত হইয়াছে। বর্ণভেদ প্রথায় মানুষ শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ইহার একটি ফল হয় এই যে, নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠকে মান্য করিতে শিখে এবং শ্রেষ্ঠকে মান্য করিতে শিখিলে শ্রেষ্ঠের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হয়। সেইজন্য হিন্দুর মধ্যে নিকৃষ্ট বর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণের আচার ব্যবহার অনুকরণ করে। ইহার আর একটি ফল হয় এই যে, যে শ্রেষ্ঠ সে নিকৃষ্ট হইতে এককালে বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ যে শ্রেষ্ঠ সে তাহার নিকৃষ্টের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ এবং যে নিকৃষ্ট সে তাহার শ্রেষ্ঠের সম্বন্ধে নিকৃষ্ট। অতএব একটা সূত্রে শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ- বিশিষ্ট। শ্রেষ্ঠ বর্ণ নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একটা না একটা সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া বর্ণে যে নিকৃষ্ট, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বর্ণ লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয় এবং সেইজন্য শ্রেষ্ঠবর্ণ যাহা উত্তম জীবন-প্রণালী বলিয়া অনুসরণ করে, নিকৃষ্ট বর্ণও সেই জীবন-প্রণালী অনুকরণ করে।[৪৬]

চন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিকে পিতৃতান্ত্রিক জাতিভেদভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের সঙ্কটের একটি উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তনিকা সরকার মনে করেন উনিশ শতকের সাতের দশককে এসে জমিনির্ভর বাঙালি মধ্যবিত্ত 'জেন্ট্রী' শ্রেণী তার শ্রেণীগত সামাজিক বিশেষাধিকারগুলি খুইয়ে বসে, যা এতদিন তারা উপভোগ করে আসছিল। এই বিশেষাধিকার যে শুধুই জমিদারির আর্থিক মুনাফা বা জমিভিত্তিক শ্রেণীসম্পর্ক তা নয়। এটা

সাধনায় বিশ্বাস রাখতেন। বাবার তত্ত্বাবধানে তিনি কলকাতায় পড়াশুনা করতে আসেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করার সময় ধর্মস্পৃহা মেটানোর জন্য কেশব সেনের সভায় যাতায়াত শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে একেবারেই সন্তুষ্টি মেলেনি। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে যাতায়াতের সূত্রে চন্দ্রনাথ শশধর তর্কচুড়ামণির সংস্পর্শে আসেন এবং ধর্মের প্রকৃত খোঁজ পান। তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায় প্রতি রবিবার বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে শশধর তর্কচুড়ামণির মতো অনেকেরেই সমাবেশ হতো। তাঁরা ধর্ম-সমাজ বিষয়ে আলোচনা করতেন। কিছুদিন আইন পেশায় যুক্ত থাকার পর তিনি সরকারের শিক্ষাবিভাগে অনুবাদকের পদে চাকরি করেন। বহু পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হয়, আর প্রকাশিত হয় বহু গ্রন্থ। বাল্যবিবাহ এবং সতীত্বের ধারণায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী চন্দ্রনাথ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সহবাস সম্মতি আইনের বিরোধিতা করেন। চন্দ্রনাথ বসু, পৃথিবীর সুখ দুঃখ, (কলকাতা, ১৩১৫); ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*-৮৩, চন্দ্রনাথ বসু, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎ, ১৩৫৮), ৮-৩১; করুণাময় মজুমদার, চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য (কলকাতা, ১৯৬০ খ্রি.)।

[৪৬] "বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র" নামক প্রবন্ধটি প্রথমে *নবজীবন* পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তা লেখকের *ত্রিধারা* নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। বর্তমান আংশটি *ত্রিধারা* নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। চন্দ্রনাথ বসু, 'বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র', ত্রিধারা, তৃতীয় সংস্করণ (কলকাতা : ১৩১৪), ৮৯-৯০।

একটা এমন *মরাল ইকনমি* যেখানে সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রক্রিয়াকে মুখোশের আড়ালে লঘু করে রাখা হতো শ্রম, সেবা এবং ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে যা দাঁড়িয়েছিল ব্যক্তিগত আনুগত্য ও জাতনির্ভর প্রথাগত মূল্যবোধগুলির উপর।[৪৭] একাধারে ঔপনিবেশিক এবং পাশ্চাত্যবাদী আধিপত্যর শিকার বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতনির্ভর এবং লিঙ্গভিত্তিক বিশেষাধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত হতে পারে এই আশঙ্কাবোধ তার সাবর্ণ চেতনাকে নানাভাবে উদ্বেলিত করে। আর এই প্রেক্ষিতেই উল্লেখ করা সঙ্গত যে সাবর্ণ বাঙালি মধ্যবিত্তের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার বাসনাটি চন্দ্রনাথের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে বহুভাবে। তাঁর এই প্রবন্ধটির পরের অংশে আরও স্পষ্ট করে চন্দ্রনাথ লিখছেন,

> ...শুধু উপদেশবাক্য বা উচ্চভাবের জোরে সমাজকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। উপদেশবাক্য উচ্চ প্রকৃতির লোকের জন্য– উচ্চভাব উচ্চদরের লোকের জন্য। কিন্তু সমাজ শুধু উচ্চদরের লোক লইয়া নয়, প্রধানতঃ সামান্য লোক লইয়াই সমাজ। কিন্তু সামান্য লোক শুধু উপদেশে আবদ্ধ হয় না...সমাজকে বাঁধিতে ও সদাচার সম্পন্ন করিতে হইলে, মুখের উপদেশও চাই, উচ্চভাবও চাই, আবার বর্ণভেদ, পারিবারিক শাসন প্রভৃতি ঠেকাঠোকাও চাই"। 'ঠেকাঠোকা'র মানে তিনি পরের লাইনে বিস্তারিত করে বলছেন, "মানুষকে যেমন উপদেশ দিয়া এবং উচ্চভাবের তরঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ভাল করিবার চেষ্টা করা চাই, আচার ব্যবহার সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঠেকাঠোকা দিয়াও তেমনি ভাল করিবার চেষ্টা করা চাই।[৪৮]

এই প্রেক্ষিতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ আবশ্যিক হয়ে পড়ে যিনি জাতিকে কল্পনার সৃজনশীল প্রক্রিয়ার অংশ হওয়ার পাশাপাশি হিন্দুধর্ম, ভারতীয় সমাজ, জাতপাত নিয়ে আলোচ্য সময়ে বিস্তৃতভাবে লেখালিখি করেছেন।[৪৯] এইক্ষেত্রে যে বিষয়টি ভূদেবের রচনার কেন্দ্রীয় স্থানে দেখতে পাওয়া যায় তা হল পরিবর্তিত

---

[৪৭] Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 11.

[৪৮] চন্দ্রনাথ বসু, "বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র", ৯২-৯৩।

[৪৯] সমকালীন লেখক চিন্তাবিদদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি সমকালীন ভারতীয় সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি সম্পর্কে ব্যাপক হারে নিজের বক্তব্য মুদ্রিত করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও সাহায্যে তাঁর ছাত্র টীকা সহ মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মচর্চা সম্পর্কে অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ ভূদেবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ পরিবারে ভূদেবের জন্ম। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ছিলেন নিজের সময়ের খুব সম্মানীয় পণ্ডিত। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও কাব্য ছাড়াও তন্ত্র, পুরাণ এবং দর্শনের অন্যান্য শাখায় তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন অনেকটাই জীবিকার তাগিদে। শিক্ষকতাকে প্রথমে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে তিনি সরকারি শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন এবং স্কুল পরিদর্শকের চাকরিও করেন। এই কাজে পাঁচ, ছয় এবং সাতের দশকে বাংলার বহু প্রান্ত ও বিহারে তিনি ব্যাপক পরিমাণে ঘুরে বেড়ান। তিনি বাংলার বহু প্রান্ত ও বিহারে তিন দশক স্কুল পরিদর্শকের কাজ করেছেন। এডুকেশন গেজেটের রিপোর্ট তৈরি করা এবং সম্পাদনা করার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নিজের কর্মজীবনে তিনি যথেষ্ট সক্রিয়তার সাথে নিজের চিন্তাভাবনাকে প্রায়োগিক রূপ দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিষয়ে একটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করতেন। ভূদেবের নিজের সম্পাদিত পত্রিকাটি ছিল *শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার* যা পরবর্তীতে *শিক্ষা দর্পণ ও মাসিক পত্রিকা* নামে প্রকাশিত হতো। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "ভূদেব মুখোপাধ্যায়," *সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৪৩* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎ, ১৩৫২) ৫, ১৪, ১৬, ২১।

ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক কাঠামোকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায় সেই প্রশ্নটি। সন্তান উৎপাদন, সন্তানের বাল্যজীবন, শিক্ষাজীবন (পুরুষ সন্তানের ক্ষেত্রে), জীবিকাগ্রহণ, বিবাহ, গার্হস্থ্যজীবন, বার্ধক্য— হিন্দুজীবনের সকল মুহূর্তে পালনীয় ধর্মীয় আচার এবং বর্ণভেদে তার পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ভূদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন; যেখান থেকে তাঁর সামাজিক রক্ষণশীলতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।[৫০] আর এই হিন্দু গার্হস্থ্য পরিসর সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি থেকেই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত ব্রাহ্মণ্যবাদী আপাত উদারনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর *সামাজিক প্রবন্ধ*-এ মূলত চারটি মৌলিক সাদৃশ্যের কথা বলছেন যা মানুষের মধ্যে সমভাবাপন্নতার অনুভুতি সঞ্চার করে। আর এই সমভাবাপন্নতার চেতনাই তাঁর কাছে 'জাতীয়ভাব' নির্মাণের মূল শর্ত। যে চারটি বিষয়কে তিনি এক্ষেত্রে চিহ্নিত করছেন তা হল— 'আকার এবং রূপ-সাদৃশ্য', 'ধর্ম্ম এবং আচার-সাদৃশ্য', 'ভাষা এবং উচ্চারণ-সাদৃশ্য' আর 'রাজ্যশাসন এবং সামাজিক প্রণালীর সাদৃশ্য'।[৫১] অন্যদিকে আপাত অমিলের ক্ষেত্রেও তিনি সাদৃশ্যের সূত্র দেখছেন। ভূদেবের মতে ভারতীয় উপমহাদেশে একজাতি তৈরির চেতনার ক্ষেত্রে প্রথম বাধা তার নানাবিধ বৈচিত্র্য। কিন্তু ভূদেব এখানেই এক উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ তুলে আনছেন যা পরবর্তী বহু জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলছেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেই মৌলিক চরিত্রটা হল, ভারতভূমিতে বহিরাগতকে দ্রুত আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা। তাঁর ভাষায়,

> এইটিই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এইজন্যই এতদ্দেশবাসীদিগের হৃদয়ে একটী বিশেষ ভাবের অধিষ্ঠান হইয়া আছে।...ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকল ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটি চমৎকার উপাদান আছে। ইহারা পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে।[৫২]

এই উদারনৈতিক সহাবস্থান বোধ কল্পনার মধ্যেই ভূদেবের জাতিকল্পনার মৌলিক সুরের ছকটি আন্দাজ করা সম্ভব। কিন্তু একই সাথে এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের সুরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি 'ধর্ম্ম এবং আচার-সাদৃশ্য' অংশে ভারতীয়দের ধর্মীয় সহনশীলতার প্রসঙ্গে লিখছেন, "ভারতবর্ষীয়দিগের এই মৌলিক বিশিষ্টতার

---

[৫০] সার্বিকভাবে ভূদের মুখোপাধ্যায়ের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে আকর্ষণীয় আলোচনা করেছেন শতদ্রু সেন। Satadru Sen, "The Conservative Animal: Bhudeb Mukhopadhyay and Colonial Bengal," *The Journal of Asian Studies* 76, no. 2 (2017): 363–81.

[৫১] ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "সামাজিক প্রবন্ধ", *ভূদেব-রচনাসম্ভার*, সম্পাদনা – প্রমথনাথ বিশী (কলকাতা : মিত্র ঘোষ, ১৩৬৪), ৬।

[৫২] ঐ, ৭।

বিকাশ, তাহাদিগের অত্যুদার ধর্ম্মপ্রণালীতে অতি সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের শাস্ত্রে পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে, এবং অধিকারীভেদের ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার গোলযোগের মূল্য পর্য্যন্ত একবারে নিরাকৃত হইয়া আছে। অপর কোন দেশের ধর্ম্মপ্রণালীতে অধিকারীভেদের উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশিষ্টতার এই চরম দৃষ্টান্ত"।[৫৩] সুমিত সরকার দেখিয়েছেন বাংলায় সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকে অধিকারীভেদের ধারণাটি ধর্মীয় সহনশীলতার বার্তা বহন করলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে হিন্দু সাবর্ণ বয়ানে অধিকারীভেদের ধারণাটিতে পরিবর্তন আসে এবং তা জাতিভিত্তিক সামাজিক বিভাজনকে মান্যতা দেওয়া এবং জাতপাতনির্ভর সামাজিক ক্ষমতার উচ্চতম ক্রমকে বজায় রাখার চেষ্টায় ব্যবহৃত হয়। তিনি দেখান সমকালীন হিন্দু পুনরুত্থানবাদী লেখকদের রচনায় অধিকারীভেদের ধারণাটি ব্যাপকভাবে উঠে আসে।[৫৪] ভূদেবের রচনাতেও জাতপাতভিত্তিক সামাজিক উচ্চতর ক্রম নির্ধারণের এই প্রবণতাটি লক্ষ করেন।[৫৫] ফলত আপাতভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের এক বহুত্ববাদী অভিজ্ঞতা ভূদেব ভারতীয় সমাজে অনুভব করেছেন। কিন্তু এই বহুত্ববাদকে মেনে নিলেও তাঁর রচনার সর্বত্র ভারতীয় সমাজের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি যে দার্শনিক অভিজ্ঞতাকে স্থান দিচ্ছেন তা অবশ্যই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজনীতি। তাই তিনি তাঁর লেখনীতে ভারতীয় সমাজকে সংঘবদ্ধ করার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন করতে চেয়েছেন তা ব্রাহ্মণ্যবাদ।

আলোচ্য সময়ে সাবর্ণ আধিপত্যের এই প্রয়াস বিভিন্ন ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করে। যার মধ্যে অন্যতম বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে যুক্তিযুক্ত করে তোলার প্রচেষ্টা। ১২৯৩ বঙ্গাব্দ থেকে প্রকাশ পেতে থাকা *বেদব্যাস* পত্রিকা ঘোষিতভাবে 'হিন্দু ধর্মের পুনস্থাপনের' উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেতে থাকে।[৫৬] ১২৯৯ বঙ্গাব্দ থেকে এই পত্রিকা হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মতবাদের অন্যতম সংরক্ষক সংস্থা ধর্মমণ্ডলীর মুখপাত্র হিসেবেও কিছু বছর প্রকাশ পায়।[৫৭] এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক ভূধর চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। *বেদব্যাস* সম্পাদনা ছাড়াও তিনি বহু স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ, সম্পাদনা এবং রচনা করেন। ভূধর *বেদব্যাসের* দ্বিতীয় বর্ষে "জাতিভেদ" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন যেখানে এই বর্ণাশ্রমব্যবস্থাকে নিয়ে

---

[৫৩] ঐ, ৭।

[৫৪] Sarkar, *Writing Social History*, 368-69.

[৫৫] Ibid., 372.

[৫৬] ১২৯৬ বঙ্গাব্দের প্রথম খণ্ডে *বেদব্যাস*-এর উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পাদকীয়, বৈশাখ, *বেদব্যাস*, ১২৯৬, ১।

[৫৭] সম্পাদকের নিবেদন, *বেদব্যাস*, বৈশাখ, ১২৯৯, ১৬।

বিস্তারে আলোচনা করেন।[৫৮] ভূধরের মতে আধুনিক পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান জাতিভেদব্যবস্থাকে একটি কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করছেন মূলত শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞানতাজনিত 'সামাজিক অধঃপতনের' ফলে। ভূধর তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান উন্মোচিত করে দেখানোর চেষ্টা করেন প্রতিটি জাতির পৃথক কিছু গুণের অধিকারী হওয়ার কারণেই জাতিভেদব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা জরুরি। আর এই গুণগুলি নির্ধারিত হয় সত্যঃ, রজঃ এবং তমঃ এই তিন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। একমাত্র আর্য ঋষিগণ এই গুণের বিচার করতে পারতেন এবং এই গুণের উপস্থিতি অনুযায়ী চারটি বর্ণ তাঁরা নির্ধারিত করে গেছেন। কিন্তু বুদ্ধি নামক মানবীয় সম্পদের কুব্যবহারের ফলে বর্তমানে মানুষ এই গুণগুলির অপপ্রয়োগ করেছে। তাই ব্রাহ্মণ হারিয়েছে তার 'তপস্তেজ', দ্বিজত্ব। কিন্তু জাতিভেদ প্রকৃত ভাবে কার্যকারী করলে এই গুণগুলি পুনরুদ্ধার সম্ভব। বেদব্যাসের চতুর্থ বর্ষে বিশিষ্ট চিকিৎসক কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন "বর্ণ বিচার" নামে।[৫৯] এই প্রবন্ধমালাটি ভূধরের থেকে একটি বিষয়ে স্পষ্টভাবে ভিন্ন। ভূধরের লেখায় জাতিভেদ যে কোনো সামাজিক বৈষম্য থেকে তৈরি হয়নি এটা প্রমাণ করার তাগিদ লক্ষ করা গেছিল, কিন্তু এমন অপরাধবোধজনিত পীড়া কামাখ্যাচরণের লেখায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কামাখ্যাচরণ কোনো কৈফিয়তের ধার না ধেরে তাঁর সমগ্র প্রবন্ধমালা জুড়ে এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চান যে পৃথিবীতে সকল মানুষের বুদ্ধি, মেধা, কর্মক্ষমতা এক নয়। তাই ঈশ্বরই সামাজিক গোষ্ঠীগুলির গুণগত তারতম্যতার ভিত্তিতে সমাজে বর্ণ বিভাজনের রচনা করেছেন। ব্রাহ্মণ সমাজে সর্বোচ্চ স্থানে কারণ সে জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সামাজিক মর্যাদা শূদ্রের প্রাপ্য নয় কারণ শূদ্র পাপ কাজের দ্বারা পতিত হয়েছে। শূদ্র সৎ জীবনযাপন করলেও সেই জন্মেই ব্রাহ্মণ হতে পারবেন না। ইহজন্মে পাপমোচন ও পুণ্য অর্জন করলে সে পরজন্মে ব্রাহ্মণ হিসেবে জন্মানোর অধিকার পেতে পারে। কামাখ্যাচরণের কাছে জাতিভেদ একমাত্র ভারতেই প্রচলিত নয়। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে অন্য রূপে এই সামাজিক বৈষম্যগুলি ক্রিয়াশীল। যেমন ইউরোপে অর্থের নিরিখে শ্রেণী বিভাজন বা গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে বর্ণবিদ্বেষও এই জাতিভেদেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র। শুধু তাই নয়, উনি নানা নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ, আয়ুর্বেদিক পর্যবেক্ষণ এমনকী শবব্যবচ্ছেদ থেকে পাওয়া তথ্য থেকেও নাকি ব্রাহ্মণের উচ্চমেধার প্রমাণ পেয়েছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি বলছেন,

---

[৫৮] ভূধর মুখোপাধ্যায়, "জাতিভেদ", *বেদব্যাস,* মাঘ ও ফাল্গুন, ১২৯৪, ২৬০-৬৪, ২৯০-৯২।

[৫৯] কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত চিকিৎসক হিসেবেই পরিচিত যিনি চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বহু বইও রচনা করেন। এর মধ্যে অন্যতম *আর্য্য চিকিৎসক, মাতার প্রতি উপদেশ, প্রসূতির কর্তব্য, সুসন্তান লাভের উপায়, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা* ইত্যাদি। সৌরিন্দ্রকুমার ঘোষ, *সাহিত্যসাধক মঞ্জুষা* (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৩ খ্রি.), ১০৬।

> এ পর্য্যন্ত ৭ জন ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ্ করিয়া দেখা গিয়াছে। ইহারা সকলেই এক প্রকার অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান। ইহাদের মস্তিষ্কের গুরুত্ব লওয়া হইয়াছিল। উক্ত ৭ জনের মস্তিষ্কের গুরুত্ব গড়ে ৫০ আউন্স ৩ ড্রাম হইয়াছে। ঐ সকল মস্তিষ্কের উপরের বিশেষত ললাটের অংশের কনভানিউশন অর্থৎ উচ্চতা ও নিম্নতাগুলি অধিক স্পষ্ট, উচ্চ ও সংখ্যায় অধিক দেখা যায়। ব্রাহ্মণগণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে অধিক চিন্তা করিতে সক্ষম, এ ভিন্ন তাঁহাদের দয়া, নিঃস্বার্থ পরোপকারের ইচ্ছা ইত্যাদি সাধু প্রবৃত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়। এই সকল কারণেই সম্ভবত ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কের পূর্ণতা অধিক হইয়াছে।[৬০]

বিপরীত দিকে শূদ্র সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা,

> এ পর্যন্ত ২৩টী শূদ্রের মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে। উহাদের মস্তিষ্কের গুরুত্ব ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা ন্যুন। ঐ ২৩টীর মধ্যে ১২টীর মস্তকের গুরুত্ব লওয়া হইয়াছিল। ইহাদের মস্তিষ্কের কনভনিউশন অর্থাৎ উচ্চতা ও নিম্নতাগুলি ব্রাহ্মণের মস্তষ্ক হইতে ইতরবিশেষ দেখা যায়। আমাদের দেশে বিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই দুই জাতির মস্তষ্কের বিভিন্নতার কারণগুলি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদির দ্বারা এবং বিশেষ গবেষণা পূর্ব্বক নির্ণয় করিতে পারিলে আর্য্য ঋষিদের জাতিভেদ প্রথার প্রকৃত উদ্দেশ্য অতি সহজেই সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পরিবে।[৬১]

কামাখ্যাচরণের মতো চিকিৎসক যেভাবে পশ্চিমী আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কল্পিত সাধারণকে ব্যবহার করে তার ব্যাখ্যাকে মান্যতা দিতে চান তা কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ-ধরনের ছদ্মবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আলোচ্য আমলে এক শ্রেণীর হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের রচনায় অহোরহ আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। *বেদব্যাস* পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা এবং সেই সময়ের হিন্দু রক্ষণশীল গোষ্ঠীর অন্যতম মুখপাত্র শশধর তর্কচূড়ামণির ব্যাপক জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণই ছিল তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞানের সাথে নানা চটকদার যুক্তি জুড়ে দিয়ে প্রমাণ করে চলেছিলেন হিন্দু বিশ্বাস এবং আচার-প্রথার যৌক্তিকতা ও মাহাত্ম্য।[৬২] *বেদব্যাস* প্রকাশিত এমন অসংখ্য প্রবন্ধ বর্ণাশ্রম সঠিকভাবে পালন করার নানা পরামর্শে মুখরিত থেকেছে।[৬৩] এই প্রবন্ধগুলি জাতিভেদপ্রথার বর্তমান শিথিল রূপকে সামাজিক অবক্ষয়ের সূচক হিসেবে দেখেছেন। বার বার উদ্ধৃত করেছেন মনুসংহিতার বহুল পরিচিত বয়ানগুলিকে যেখানে বলা হয়েছিল কলি যুগে শূদ্র এবং মহিলারাই সমাজ শাসন করবেন, ব্রাহ্মণের মর্যাদা গিয়ে ঠেকবে তলানিতে। এই লেখাগুলি বর্ণব্যবস্থার পুরাতন রূপকে

---

[৬০] কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বর্ণ বিচার," *বেদব্যাস*, ফাল্গুন, ১২৯৬, ২৩৭।

[৬১] ঐ, ২৩৯-৪০।

[৬২] Raychaudhuri, *Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*, 9-10.

[৬৩] এমন অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ– "নববর্ষারম্ভে দুই একটী কথা," *বেদব্যাস*, বৈশাখ, ১২৯৭, ২-৬; হৃষিকেশ শাস্ত্রী, "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম," *বেদব্যাস*, মাঘ, ১২৯৪, ৩০৭-১০।

ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে এক কঠোর ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুশাসনের মধ্য দিয়ে কারণ শাস্ত্রমতে ব্রহ্মার মুখ থেকে তৈরি হয়েছেন ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য আর পা থেকে শূদ্র।

উপরিউক্ত সাধারণ বয়ানগুলির পাশাপাশি আলোচ্য পত্রিকাগুলিতে আর একটা বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। তা হল বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা দুশ্চিন্তা, তাদের বর্ণগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা অথবা জ্ঞানগত উচ্চমান বজায় রাখার তাগিদ। জন্মভূলি সমকালীন আর একটি পত্রিকা যা *বঙ্গবাসী* নামজ জনপ্রিয় প্রকাশনা গোষ্ঠী থেকে প্রকাশিত হতো। এঁদেরও ঘোষিত নীতি ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের সম্মান উদ্ধার।[৬৪] সস্তা কাগজে ছাপা, সস্তা *বঙ্গবাসী* দৈনিক পত্রিকার বিক্রি তো সমকালে সবচেয়ে বেশি ছিলই, *জন্মভূমি* পত্রিকার জনপ্রিয়তাও কম।[৬৫] ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *"ব্রাহ্মণের আত্মপরিচয়"* শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাভারতী মূলত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, বংশ তালিকা, গোত্র, পদবি, ঋষিদের বিস্তারিত তালিকা দিয়ে বাংলায় ব্রাহ্মণদের বর্ণগত বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বিস্তারিত তালিকা খাড়া করছেন।[৬৬] এই প্রবন্ধটিতে লক্ষ করার মতো বিষয় হল লেখক নানান শাস্ত্রর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাচ্ছেন নানা আচার-অনুষ্ঠান ও বৈবাহিক নিয়ম-নীতি গুলি মেনে চলার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বর্ণগত বিশুদ্ধতাকে কীভাবে বজার রাখা সম্ভব ও বাংলা য় ব্রাহ্মণের অস্তিত্বর জন্য তা কতটা জরুরী।

ব্রাহ্মণের বর্ণগত স্বাভিমানকে উসকে দেওয়ার পাশাপাশি ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্কটকে কল্পনা করার প্রবণতাও একইভাবে সমাজে তাদের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অন্য এক পদ্ধতি। এই ধাঁচেও অনেককে কলম ধরতে দেখা যায় এই সময়। বেদব্যাস ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা পঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের[৬৭] *"ব্রাহ্মণের দুর্গতি"* নামক প্রবন্ধ দুটি এই ঢঙেই লেখা।[৬৮] ব্রাহ্মণ সমাজের ওপর আক্রমণ নেমে আসার ইতিহাসকে পাঁচকড়ি বৌদ্ধ, মুসলমান থেকে শুরু করে ইংরেজ 'আমল' পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত ক্ষোভ ইংরেজি

---

[৬৪] *জন্মভূমি* পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, সম্পাদকদের পরিচিতি ও প্রকাশনার বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য, স্বপন বসু, *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র* (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০১৮), ৬২৭-২৯।

[৬৫] দ্রষ্টব্য,স্বপন বসু, *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র*, ৬২৮।

[৬৬] শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাভারতী, "ব্রাহ্মণের আত্মপরিচয়," *জন্মভূমি*, বৈশাখ, ১৩১৪ , ৩৯১-৯৯।

[৬৭] বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যাতা এবং সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস ছিল হালিশহর। তিনি বেনারসে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সরকারি প্রচার বিভাগে কিছুকাল তিনি বঙ্গানুবাদকের কাজও করেন। *বঙ্গবাসী* পত্রিকা সহ উনিশ শতকের শেষ পর্ব এবং বিশ শতকের প্রথম দু'ই দশকে প্রকাশিত বেশকিছু পত্রিকার সম্পাদনার ভূমিকায় ছিলেন তিনি। সৌরিন্দ্রকুমার ঘোষ, *সাহিত্যসাধক মঞ্জুষা*,, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৩), ৩০৬।

[৬৮] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, "ব্রাহ্মণের দুর্গতি," *বেদব্যাস*, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ১২৯৬, ১৩৭-৪০, ১৮১-৮৫।

শিক্ষিত হিন্দুদের ওপর বেশি। কারণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে সম্মানের সাথে সুরক্ষা দেওয়ার দায় হিন্দু সমাজেরই। তাই তিনি সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা রামমোহন রায়কে দুষেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা কীভাবে হিন্দু যুবকদের পথভ্রষ্ট করেছে, আর ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা কীভাবে ব্রাহ্মণদের অবহেলা করে চলেছে সেই অভিযোগ তিনি বারে বারে করলেও এটা তাঁর রচনা থেকে স্পষ্ট যে লেখক সমগ্র জাতিভেদ প্রথার অবক্ষয়ের বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করছেন। ব্রাহ্মণের দুরবস্থার ছবি এঁকে তিনি সমগ্র জাতিভেদব্যবস্থার অবক্ষয়ের *রেটরিককেই* তুলে ধরছেন, যে সমাজের 'ব্রাহ্মণরা সমাজপতি'। তাঁর লেখায় ব্রাহ্মণের জীবিকায় টান, দারিদ্র্য তাই সমগ্র সাবর্ণ গোষ্ঠীর দারিদ্র্য ও কর্মহীনতারই প্রতিফলন। তাই এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণের, হিন্দু সমাজের গৌরবে, ব্রাহ্মণের গৌরব। হিন্দু সমাজের আধিপত্যে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বিস্তার হইবে। কাযেই সমাজের কল্যাণ কামনায় ব্রাহ্মণকে যতখানি কোমর বাঁধা উচিত এত কাহারও নহে। লোভ, মোহ, বিলাস, ছাড়িয়া কাঙ্গাল ব্রাহ্মণ আরও কাঙ্গালী সাজিয়া যদি হিন্দুর মনে হিন্দুর ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিতে পারে, তবে সব বজায় থাকিবে"।[৬৯] ব্রাহ্মণের দুরবস্থার কাহিনী এবং তার প্রতিকারের পথ একভাবে সমগ্র সাবর্ণ সমাজের জাত-পাতগত আধিপত্য পুনরুদ্ধারেরই দ্যোতক, যে জাতব্যবস্থার শীর্ষে আছেন ব্রাহ্মণরা। কালীঘাটে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ সভা-র অধিবেশনের বক্তৃতায় আরও বিস্তারিতভাবে ব্রাহ্মণদের সামাজিক সম্মান ফিরে পাওয়ার উপায় বাতলে পরামর্শ দিতে দেখা যায় তৎকালীন দ্বারভাঙ্গার জমিদারকে। তাঁর মতে, "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন যে সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারেনা" তা তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন। কারণ "সনাতনধর্ম্মের আচার ব্যবহাররূপ একটি কলেবর, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণের আচরণই মস্তকস্বরূপ হইয়া সর্ব্বোপরি বর্তমান"। এহেন মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সদাচারের উন্নতির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ সমাজের সার্বিক উন্নতির প্রত্যাশী তিনি। তাই তিনি কয়েকটি উপায়ের কথা বলছেন নিজের বক্তৃতায়। সেগুলি হল ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে তপস্যা, অধ্যয়ন, সদাচার, সদ্‌বিচার শিক্ষা এবং গর্ভাধানের মতো আচারগুলির অবশ্য পালন।[৭০] এখানেই আমরা নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শকে মূর্ত হতে দেখি।

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই চতুরাশ্রম প্রথার অংশ হিসেবে পরিচিত ব্রহ্মচর্যকে প্রচলিত করতে চাওয়ার দাবি একমাত্র দ্বারভাঙ্গার জমিদারের একার পরামর্শ নয়। *জন্মভূমি, বেদব্যাস, হিন্দু* পত্রিকায় প্রকাশিত

---

[৬৯] ঐ, ১৮৪।

[৭০] "সদনুষ্ঠানে দারবঙ্গাধিপতির বক্তৃতা," *জন্মভূমি*, আগ্রহায়ণ, ১৩১৩, ২২০-২১।

প্রবন্ধের প্রায় সকল লেখকই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে উপরের তিনটি বর্ণের জন্য নির্ধারিত ব্রহ্মচর্য নামক বৈদিক সমাজের অন্যতম পালনীয় আশ্রমধর্মকে পুনঃপ্রচলিত করার সপক্ষে সওয়াল করতে দেখা যায়। সকলেই মনে করেছেন ব্রহ্মচর্যের প্রচলন না থাকার কারণেই ভারতে বর্ণভেদ প্রথা অবলুপ্তির দোরগোড়ায় এসে ঠেকেছে। আলোচ্য লেখকদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক কাঠামোকে বজায় রাখার তাগিদের সাথে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অব্যর্থতাকে জুড়ে নেওয়ার এই প্রবণতা দু-ধরনের তাগিদ থেকে আত্মপ্রকাশ হতে পারে। ব্রহ্মচর্য আশ্রম বলতে প্রায় সকল লেখকই ঠিক চতুরাশ্রমের ধাঁচে জীবনের এক বড় সময় যে আশ্রমে অতিবাহিত করতে হবে এমন আশা কিন্তু করেননি। বরং এটা অনেকের কাছেই এক প্রতীকী গুরুত্ব রেখেছে। ফলত সেই অর্থে ব্রহ্মচর্য এখানে হয়ে দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণব্যবস্থায় অনুপ্রবেশের একটা চিহ্নকের মতন। অন্যদিকে ব্রহ্মচর্য আশ্রমই যেহেতু জ্ঞানচর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাই পরিবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাচর্চার পরিমণ্ডলের মধ্যেও জ্ঞানের আহরণের ব্রাহ্মণ্যবাদী এই সামাজিক উচ্চতর ক্রমকে বজার রাখার প্রতীকী বাসনা এখানে আত্মপ্রকাশ করে।

গুরু এবং শিষ্যের কথোপকথনের ঢঙে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের[৭১] লেখা *ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা* গ্রন্থে শিষ্য গুরুকে যখন প্রশ্ন করছেন যে শাস্ত্র অনুযায়ী কেন শূদ্রের ব্রহ্মচর্য শিক্ষায় অধিকার নেই তখন গুরু তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝান শূদ্রের ব্রহ্মচর্য শিক্ষার আলাদাভাবে প্রয়োজন নেই। কারণ "শূদ্রাদি তমোমলিন – যাহারা তমোলিপ্ত, তাহারা কেবল ব্রাহ্মণাদির সত্ত্বগুণের সাহায্যে উৎকর্ষতা লাভ করিবে, আর যাহারা উন্নত গুণাশ্রিত, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্ম আচরণে নিযুক্ত হইবে।" গুরুর ব্যাখ্যায় যেহেতু "সঙ্গগুণে একে অপরের ধর্ম্ম ও স্বভাব অনুক্রামিত হয়" তাই সাবর্ণ জাতির সাহচর্যেই শূদ্রের শিক্ষালাভ হবে। "শূদ্রের পক্ষে যে স্থলবিশেষে ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেবল অত্যন্ত অজ্ঞানীর জন্য।...খুব নিম্নশ্রেণীর শূদ্র বা শূদ্রজাত জাতি, - যাহাদের কোনরূপ আত্মজ্ঞান বা দায়িত্ব বোধ নাই,- সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা-দীক্ষা-শূন্য-তাহারাই উচ্চশ্রেণীর জাতির সেবাদিরূপে সঙ্গ করিয়া জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিবে; আর সকলেই – ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনের উন্নতি করিবে।"[৭২] যোগেন্দ্রমোহন

[৭১] নদীয়া জেলার অনন্তপুর গ্রামের এক পণ্ডিত পরিবারের সন্তান সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। তিনি উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে ব্রহ্মচর্য শিক্ষার মতো যোগ ও ধর্ম বিষয়ক অসংখ্য বই রচনা করেন। তাছাড়া তিনি বহু জনপ্রিয় উপন্যাস এবং গল্প লিখেও পরিচিতি পান। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *বঙ্গসাহিত্যাভিধান*, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০), ৩৫৫।

[৭২] সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা, প্রথম সংস্করণ - ১৩১৫ (কলকাতা : ১৩১৬), ৫০।

ঘোষ তাঁর *ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও যুবকগণের নৈতিক বিধানার্থ*[৭৩] গ্রন্থের সূচনাতেই লিখছেন, "ভাইরে, ছিল যা তা কই! আর্য্যজাতির বলিতে যাহা ছিল, তাহা এক্ষণে কোথায়! আমরা খোয়াইতে খোয়াইতে সবই খোয়াইয়া বসিয়াছি। ... আমরা খাইতে খাইতে আপন আপন প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ধর্ম্ম সবই খাইয়াছি। অবশিষ্ট্য এই দেহটা, এই দেহটারও অস্থি মজ্জাদি সমুদয় দুরন্ত উদারাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। ... কিরূপে এই জাতি উঠিবে, কিরূপে ইহার দুর্দ্দশার অপনয়ন হইবে, কিরূপে ইহার সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি উন্নতি সংসাধিত হইবে, তত্তৎ সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের দুর্ব্বল বুদ্ধি বিশেষ কিছু বিচার করিতে উন্মুখ নয়। ... আমার যৎকিঞ্চিৎ যাহা বক্তব্য তাহা হচ্চে এই, যে একটি কারণে আর্য্যজাতির অধঃপতন হয় নাই। বহু কারণ সম্পাতে আমাদের বর্তমান দুর্দশা। আর যতগুলি কারণে ভারতের এই দশা **ব্রহ্মচর্য্যহানি** তাহার মধ্যে এক প্রধানতম কারণ।"[৭৪]

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কিছু মাস পরেই তাঁর *আচার প্রবন্ধ* বইটি প্রকাশ পায়। পৃথক পৃথক বর্ণের জন্য শাস্ত্র নির্ধারিত পালনীয় ধর্মাচার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার তাগিদ থেকে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। বইটির শুরু থেকেই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে 'সদাচার' প্রচার করাই এই গ্রন্থের মুল উদ্দেশ্য। গ্রন্থের অভ্যন্তরে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি বর্ণের জন্য নির্ধারিত 'জাতকর্ম' কীভাবে পালন করতে হবে, এর মধ্য দিয়ে যাতে 'সদাচার' আয়ত্ত করা যায়, এ-সমস্ত তিনি বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিপূর্বের শাস্ত্রকারদের থেকে যদিও তিনি কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতার দাবি রাখেন। কারণ তাঁর মতে পুরাণ এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলি যেসকল আচারের উল্লেখ করেছিল এবং সমাজে যেসকল আচার প্রচলিত তার মধ্যে বিবিধ প্রভেদ লক্ষ করেছন তিনি। এক্ষেত্রে তিনি শাস্ত্রনির্দেশিত এবং প্রচলিত 'জাতকর্মে'র মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের কাজ করছেন। বিশেষত ঔপনিবেশিক সময়ের পরিবর্তিত বাস্তব পরিস্থিতিকে স্মরণে রেখে তিনি ব্যাখ্যা করতে চান কোন কোন শাস্ত্রীয় নিয়মকানুনে পরিবর্তন এসেছে এবং এই পরিবর্তনগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক নিয়মকানুনগুলিকে বলবৎ রাখা যায়, যাতে দেশীয় জনগণের মধ্যে সদাচার ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এবং এই নিয়মকানুন বা আচারগুলি মেনে চলা হিন্দু সামাজিক কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কতটা জরুরি। তাঁর মতে যে যে আচার পালনের ক্ষেত্রে 'স্খলন' ঘটেছে তা মেরামতের জন্য তিনি গ্রন্থে আদর্শ

---

[৭৩] যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, *ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও যুবকগণের নৈতিক বিধানার্থ*, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা: ১৩১৬)।

[৭৪] ঐ, ৩-৪।

পালনীয় আচারের একটি সংহিতা উপস্থাপন করেছেন যার নিরিখে সহজেই বুঝে নেওয়া সম্ভবপর হবে অপরাপর 'জাতকর্ম'গুলি কতটা গুরুত্ব সহকারে প্রচলন করা আবশ্যক।

ভূদের এই সদাচারের পাঠ কেন দিতে চাইছেন সেই বিষয়টি নির্ধারণ করাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ভূদেব ঔপনিবেশিক সমাজে দেশীয় হিন্দু জনতার মধ্যে এক ধরনের সঙ্কটকে চিহ্নিত করছেন। সেই সঙ্কটটি হল ইংরেজি শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে দেশীয় জনতার মানসিক ও দৈহিক সবলতা এবং সুস্থতার ক্ষেত্রে তাঁর মতে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং তার প্রভাবে ভারতীয়রা বর্তমানে দুর্বল— এই অবধারণাটি। সম্প্রতি শতদ্রু সেন দেখিয়েছেন একটি রক্ষণশীল অবস্থান থেকে ভূদের বাঙালির রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যগত এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক দুর্বলতার কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তিনি উনিশ শতকের অন্তিম দশকগুলিতে যে প্রবন্ধগুলি লেখেন সেখানে বাঙালির দুর্বল স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ দুশ্চিন্তার সাথে উত্থাপিত হয়।[৭৫] এই বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ভূদেব এবং সমকালীন অনেক লেখকের রচনায় বাঙালির স্বাস্থ্যের এই যে সঙ্কটের ধারণাটি উপস্থাপিত হয়েছে জন রোসালিন তাকেই 'self-image of effeteness' বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। আমরা ভূদেব এবং সমকালীন অনেক লেখকের রচনাতে দেখতে পাব, বাঙালির নিজের সম্পর্কে এই যে দুর্বলতার ধারণা তৈরি হয় তা কীভাবে একটি প্রতি-আধিপত্যবাদী (counter-hegemonic) বয়ান তৈরি করেছে। ভূদেব "আচার" প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় লিখছেন, "যে ইংরেজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাবল্যের প্রকৃত হেতু ... অনাচার বা অত্যাচার নহে, উহার হেতু তাঁহাদের স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা এবং পরস্পর ঐকান্তিক সহানুভূতি। আমাদেরও শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সম্বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরেজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন।"[৭৬]

তিনি দেখাচ্ছেন 'পুরুষ পরম্পরায়' পিতা-মাতা যেমনভাবে তাঁর সন্তানদের বড় করবেন, যেভাবে আহার, বস্ত্র, বাসস্থান দেবেন, এবং দেশের অবস্থা যেরকম 'পবিত্র' অথবা 'দূষিত' থাকবে সেইমতো সন্তান দুর্ব্বল অথবা

---

[৭৫] Satadru Sen, "Health, Race and Family in Colonial Bengal," in *Children, Childhood and Youth in the British World,* ed. Robinson and Simon Sleight Shirleene (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016), 144–60.

[৭৬] ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *আচার প্রবন্ধ* (হুগলী, ১৩০১), ৩।

সবল হয়ে বেড়ে উঠবে। এমনকী যদি ‘পুরুষানুক্রমে’ মানুষ সদাচারী জীবনযাপন করে তাহলে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানোর সম্ভাবনাও থাকে না। এখানে যে বিষয়টা লক্ষ করার মতো যে আচারের কথা তিনি বার বার বলছেন সেটি জাতনির্ভর আচার, যার উপর সন্তানের সুস্থতা এবং বলশালিতা নির্ভর করবে।[৭৭] এইক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আচার পদ্ধতিকে তিনি আদর্শায়িত করে লিখছেন, “ভারতবাসী অপরাপর ধর্মের লোকেরাও, যাঁহারা যতদূর পারিয়াছেন, এই আচার পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইয়া এবং তাহার যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া কষ্ট সহ, ধৈর্য্যশীল এবং ধর্মভীরু হইয়াছেন। কারণ ব্রাহ্মণাচারই সকল ভারতবাসীর পক্ষে সদাচারের আদর্শ স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট্য”।[৭৮] ভূদেবের এইধরনের সিদ্ধান্তের মধ্যেই আমরা বাঙালি হিন্দুর স্বাস্থ্য ও পৌরুষ সম্পর্কে তৈরি হওয়া ‘দুর্বলতার ধারণার’ সঙ্গে নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের সংযোগকে অনুধাবন করতে পারি।

কিছুটা অন্যভাবে চন্দ্রনাথ বসুর বয়ানেও আমরা এই প্রবণতা প্রকট হতে দেখি। যেমন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য শিক্ষাবিভাগের অনুমোদনপ্রাপ্ত পাঠ্য *সংযম শিক্ষা* গ্রন্থটির শুরুতেই খুব স্পষ্ট করে বলছেন পারিবারিক এবং বংশগতভাবেই মূলত মানুষ শিষ্টাচারগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে এবং তাকে চর্চার মধ্য দিয়েই কোনো ব্যক্তি সেই গুণগুলিকে পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তর করে। তাই সমাজ সংস্কারমূলক উদ্যোগগুলি গ্রহণ আদতে কোনো দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক মঙ্গল করতে পারে না। তাঁর ভাষায়, “আমরা মনে করি, ইংরাজ রাজার নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার বাহির করিয়া লইতে পারিলেই আমরা প্রকৃত মানুষ হইব, অথবা জনকয়েক বিধবার বিবাহ দিলেই আমাদের সমাজ সুসংস্কৃত ও সমুন্নত হইবে, অথবা জাতিভেদ উঠাইয়া দিলেই আমরা অতুলনীয় উন্নতির পথে দৌড়াইতে পারিব ইত্যাদি। কিন্তু এ প্রকার চেষ্টা অনেক হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কিছুই ত হয় নাই এবং কখনো ও যে কিছু হইবে, তাহারও ত কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।”[৭৯] বরং তিনি মনেকরেন ব্যক্তি মানুষকে শিষ্টাচার শেখানেই সামাজিক উন্নতি করা সম্ভব। তাই তাঁর মতে “(সংস্কারের) চেষ্টায় যে কিছুই হইবার নয়, এমন কথা বলি না। কিন্তু প্রকৃত মানুষে এরূপ চেষ্টা না করিলে যে ইহাতে কিছু হয় না, বরং অনিষ্টই ঘটে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ অস্বীকার করা, প্রায় সমান কথা।” ফলত তাঁর মতে “আমাদিগকে মন বলিষ্ঠ এবং অন্তরের মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিতে হইবে। সংযমশিক্ষা তাহার প্রথম ও প্রধান উপায়। কিন্তু সংযম-শিক্ষা সহজেও হয় না, শীঘ্রও হয় না।

---

[৭৭] ঐ, ৮।

[৭৮] ঐ, ১০৮।

[৭৯] চন্দ্রনাথ বসু, *সংযম শিক্ষা বা নিম্নতর সোপান* (প্রথম প্রকাশ ১৩০৯) (কলকাতা : ১৩১১), ৮-৯।

উহা বড় কঠিন সাধনা। উহার জন্য স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, একাগ্রতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় একান্ত আবশ্যক।”[80] এখানেই চন্দ্রনাথ পারিবারিক এবং বংশগত শিক্ষার কথা উত্থাপন করে লেখেন, “কিন্তু জন্মের পূর্ব্ব হইতে উহাতে দীক্ষিত হয়, তাহার পক্ষে উহা তত কঠিন হয় না, অনেক স্থলে সহজ ও সুখকর হয়। আপনারা সংযম-শিক্ষা করিয়া সন্তান-সন্ততি বা ভবিষ্যবংশীয়দিগকে সংযমে দীক্ষিত না করিলে আমাদের আর এক মুহূর্ত্তও চলিতেছে না।”[81] এখানে চন্দ্রনাথ খুব স্পষ্টভাবেই উচ্চজাতির গার্হস্থ্য জীবনকে আদর্শায়িত করছেন, যে নীতিমালাগুলি পালনের মধ্য দিয়েই ঔপনিবেশিক শাসনে ‘অধঃপতিত’ বাঙালি তার শারিরীক বল ও পৌরুষ পুনরুদ্ধার করতে পারবে।[৮২] ভূদেব, চন্দ্রনাথ এবং সমকালীন অপরাপর লেখকদের রচনার এই স্তরে আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং উচ্চবর্ণের পৌরুষের স্বাভিমানের নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে লক্ষ করতে পারি যেখানে সংযম বা ব্রহ্মচর্যের ধারণা আদর্শ সাবর্ণ পৌরুষের ভাষ্যটি নির্মাণ করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সাবর্ণ পৌরুষের এই ভাষ্য তৈরির প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংজ্ঞা সামনে আসে। ফলত নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতর্কে ব্রহ্মচর্য বলতে শুধুই যৌনজীবনে সংযমের বিধান গুরুত্ব পায় তা নয়। একই সাথে ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রতিরোধের উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রনাথ বসু তাঁর *সংযম শিক্ষা* গ্রন্থে খুব ছোটবেলা থেকে বাঙালি শিশুদের পালন করার ক্ষেত্রে বিস্তৃত নিয়মাবলী উপস্থাপন করেছেন যেখানে আধুনিক ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকে বাঙালির শারীরিক দুর্বলতা এবং মেয়েলিত্বের কারণ হিসেবে দর্শানো হয়েছে। তিনি লিখছেন-

> শিশুর শরীর যাহাতে শক্ত হয়, হিমতাপাদিতে ক্লিষ্ট না হয় এবং ক্রমে ক্রমে বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং শ্রমক্ষম হইয়া ওঠে, পূর্বে এইরূপ শিশুর পরিচর্য্যা করা হইত। এখন জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে শিশুকে পশম ফ্ল্যানেল জামা মোজা টুপি প্রভৃতিতে মুড়িয়া রাখা হয়।...এইরূপ পরিচর্য্যার ফলে এখনকার শিশুর শরীর বড় বেশি মাত্রায় কোমল, সুকুমার বা রোগপ্রবণ হইয়া পড়িতেছে এবং বড়ো হইয়া পুরুষোচিত কঠিনতা লাভ করিতে না পারিয়া দুর্ব্বল, রুগ্ন অথবা নিস্তেজ হইতেছে। যাহাদের দেহ এইরূপ, তাহাদের মনও এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা সংযম করিতে পারে না।...আমাদের শরীর এবং মন দুইই effeminate বা মেয়েলি রকমের হইতেছে। ইহাতে সংযম সাধন আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িতেছে। তাই জন্মের পূর্ব্ব হইতে এবং জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে সংযমী হইবার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। তাহারা

---

[৮০] ঐ, ৯-১০।

[৮১] ঐ, ১০।

[৮২] চন্দ্রনাথ বসু তাঁর *হিন্দুত্ব* নামক গ্রন্থে বাঙালি হিন্দুর শারীরিক দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর মতামত বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করেছেন। চন্দ্রনাথ বসু, *হিন্দুত্ব : হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস* (কলকাতা: মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৮৯২), ১৭৮-৮৩।

> একটু বড় হইলে...পশম ফ্ল্যানেলের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অতিশয় মিহি জামা প্রভৃতি পরাই। তাহাতে তাহাদের শরীর আরও কোমল হইয়া পড়ে এবং পুরুষোচিত কাঠিন্যলাভের আরও অনুপযুক্ত হয়। তাহারা যেন ননীর পুতুল হইতে থাকে। ও দিকে তাহাদিগকে আমরা নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছি। আমরা অন্নকষ্ট স্বীকার করিয়া, এমন কি ঋণ করিয়াও পূর্ব্বের সেই আটপৌরে মোটা কাপড় এবং পূজা পার্ব্বণের সেই একটু ঢাকাই কাপড় আর চাদরের পরিবর্ত্তে, তাহাদের ভালো জামা, জুতা, ভালো ভালো মোজা, সাটিন, মক্‌মল, জরির জামা পরাইয়া, এবং পূর্ব্বের সেই নির্দ্দোষ পুষ্টিকর মুড়ি, ঝুনা নারিকেল, শশা, কলার পরিবর্ত্তে বিষবৎ মিঠাই খাওয়াইয়া তাহাদের এমনই লুব্ধ মুগ্ধ অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি যে, বড় হইয়া তাহারা এই সকলের মোহ কাটাইতে পারে না।[৮৩]

চন্দ্রনাথের বয়ান থেকে বোঝা যায় সংযমের ধারণা এখানে কৃচ্ছ্রসাধনার পর্যায়ে উপনীত হয় যেখানে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, বিনোদন, দৈনিক জীবনযাপনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভোগের মাত্রাকে সীমিত করার প্রতি জোর দেওয়া হয়। এমনকী তিনি খাদ্যর পরিমাণের ক্ষেত্রেও "ধনী হইতে নির্ধন পর্য্যন্ত যিনি যে প্রকার আহার্য্য ব্যবহার করিতে ক্ষমবান, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আহার্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইবে"[৮৪] এই পরামর্শ দেন।

এক্ষেত্রে দারিদ্র্যকে নিয়ে আলোচ্য সময়ে নয়া-ব্রাহ্মণ্যবাদী বয়ানে একটি বৈশিষ্ট্য সুদেষ্ণা ব্যানার্জি লক্ষ করেছেন তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উল্লিখিত বয়ানগুলিতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত *রিফর্মড* বাঙালিকে সমালোচনা করা হয়েছে এই মর্মে যে ভোগবাদী সংস্কৃতির বশবর্তী হওয়ার ফলে তাঁরা নৈতিক ভাবে দরিদ্র হয়ে পড়েছেন। আর এর ঠিক বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ চরিত্রকে যারা দৈনন্দিন জীবনে দরিদ্র হলেও নৈতিক জীবনে ধনী।[৮৫] এইক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য বা সংযমের ধারণাকে একটি বিকল্প দর্শনের পরিপূর্ণ প্যাকেজ হিসেবে সামনে আসতে দেখা যায়, যা চর্চার মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করা যায় এবং তার মধ্য দিয়ে নৈতিক জীবনে উন্নতি আনা সম্ভব। বিশেষ করে দারিদ্র্যের ধারণাটি যেহেতু দেহে প্রোথিত তাই সেই দেহের চাহিদাগুলি দমন করার বিধান দিয়ে দৈনন্দিন দারিদ্র্যজনিত যন্ত্রণা থেকে ঊর্ধ্বে ওঠার পরামর্শ সামনে আসে। তাই খুব আকর্ষণীয়ভাবে ব্রহ্মচর্য সংক্রান্ত অধিকাংশ রচনাগুলিতে দৈনন্দিন জীবনপ্রণালীকে নিয়মবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ছাত্র-

---

[৮৩] চন্দ্রনাথ বসু, *সংযম শিক্ষা বা নিম্নতর সোপান*, ২১-২৩।

[৮৪] ঐ, ৪৯।

[৮৫] Sudeshna Banerjee, "Valorizing Poverty: Nationalist Discourse on Genteel Poverty in Colonial Bengal," *Journal of History* 20 (2002-2003): 64–72.

কিশোর-যুবকদের জন্য একটি রুটিন তৈরি করে দেওয়া হয়।[৮৬] এই রুটিনগুলিতে মুদ্রিত আছে ভোরে ঘুমভাঙা থেকে ঘুমোতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত দিনের প্রতিটি কাজের একটি অনুশাসনমূলক নির্দেশিকা ও কৃচ্ছ্রসাধনার নিয়মাবলী যা কার্যত শুরু হয় ভোরবেলা নিদ্রাভঙ্গ থেকে পর্যায়ক্রমে সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। আর এক্ষেত্রে যৌন বাসনাকে শরীরের সবচেয়ে বিপজ্জনক বাসনা হিসেবে দেখা হয়, যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে শরীর ও মনের অন্যান্য কামনাকেও পর্যায়ক্রমে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। এখানে একটি বিষয় পৃথকভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রহ্মচর্য যখন দারিদ্র্যকে সহ্য করার নৈতিক অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে তখন সেই ত্যাগসাধনের মধ্যে পৌরুষের অনুষঙ্গও জুড়তে দেখা যায়। ছাত্র-কিশোর-যুবকদের জন্য লেখা তালিমি কেতাবগুলিতে বারে বারে ফিরে আসে আর্য ঋষিদের জীবনের উদাহরণ। দেখানো হয়, ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েই তাঁরা কীভাবে পৌরুষের গরিমায় উন্নীত হতে পেরেছিলেন।

বাঙালি পৌরুষ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক বয়ানগুলি যেভাবে সংশয় প্রকাশ করেছিল, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী কল্পনায় কীভাবে তার প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় সেই দিকটি ইন্দিরা চৌধুরী খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক প্রভুরা যে পৌরুষ নিয়ে 'শ্রেষ্ঠত্বের ভান' করে তার প্রতিক্রিয়া বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী চরিত্রের নির্মাণে তিনি অনুধাবন করেছেন। ঔপনিবেশিক মূল্যায়নে বাঙালি যখন 'মেয়েলি' প্রতিপন্ন হয়েছে তার প্রতি-বয়ান তিনি এই 'নতুন' পৌরুষের নির্মাণের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন যেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি পুরুষ সন্ন্যাসী বীরসুলভ ভঙ্গিতে দৈহিক কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম, তপস্যায় রপ্ত এবং আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত।[৮৭] এই যে বিকল্প 'আধ্যাত্মিক পৌরুষের' নির্মাণের প্রক্রিয়াটি ইন্দিরা চৌধুরী তুলে ধরছেন যা আধ্যাত্মিক হওয়ার সুবাদে ইংরেজ পৌরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর, তা শুধু বিবেকানন্দের মধ্যে নয়, উনিশ শতকের আটের দশক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে সামনে আসছে। পৌরুষকে এই আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাথে সংযুক্ত করে ত্যাগ এবং কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম হিন্দুদেহের কল্পনা। ফলত দৈনন্দিন দারিদ্র্য সহ্য করেও নৈতিক-আধ্যাত্মিকভাবে ধনী পৌরুষের

---

[৮৬] যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, *ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও যুবকগণের নৈতিক বিধানার্থ*, ১২-২২; আদীশ্বর ভট্টাচার্য, *ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার*, ২৬-৪৬; চন্দ্রনাথ বসু, *হিন্দুত্ব*, ১৭২-৭৫।

[৮৭] Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History: Gender and the Politics of Culture in Colonial Bengal*, 130-31.

অবধারণাটি আমরা ব্রহ্মচারীর চরিত্রে জুড়ে যেতে দেখি।এখানে দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য ও পৌরুষের একটি বিকল্প জগৎ নির্মিত হয় যা আধ্যাত্মিক হওয়ার সুবাদে নৈতিকভাবে ধনী ও উন্নততর। এবং অবশ্যই সেখানে গঠন হওয়া শুরু হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষের আধিপত্যকামী ভাষ্যটি যা হিন্দুদেহকে এক বিকল্প অনুশাসনের গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে চায়। তার জন্য তৈরি হয় অনুশাসনের আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক বিশ্বদর্শন।

আত্মসংযম, নিষ্কাম কর্ম ও অনুশীলন : অনুশাসনের সংহিতা প্রণয়ন

আধ্যাত্মিকতাকে পৌরুষের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি হিসেবে নির্ধারণ করার এই আধিপত্যবাদী প্রক্রিয়াটি অনুশাসনের বেশ কিছু প্রকল্প নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এগুলি হল আত্মসংযম, নিষ্কাম কর্ম ও অনুশীলন ধর্মের ধারণা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই স্কুলপাঠ্য হিসেবে নীতিমূলক বইয়ের প্রকাশনার যে নজির আছে,[৮৮] তার থেকে এই বিষয়টি চরিত্র এবং বিষয়গত দিক দিয়ে আনেকটাই আলাদা। উনিশ শতকের আলোচ্য পর্বে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে হিন্দু আত্মপরিচয়কে সংঘবদ্ধ করার যে উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়, সেই প্রক্রিয়ার সাথে উক্ত নীতিমালা নির্মাণের গভীর যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। এখানেই আমরা জীবনের প্রতিটি ক্রিয়াকে আধ্যাত্মিকরণের প্রবণতা লক্ষ করব, যা আলোচ্য সময়ে জাতীয়তাবাদী প্রতর্কের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী তৎকালীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে রক্ষণশীল মহলে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি।[৮৯] *বেদব্যাস* পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে তিনি "ইন্দ্রিয়-সংযম" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর মতে, "বিষয় সন্নিহিত থাকিবে, আমার লাভ করারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিবে, অথচ ইন্দ্রিয়গণ সেই সেই বিষয়কে চাহিবে না, তাহা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সংযতভাবে থাকিবে, ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম বলিয়া আমার ধারণা"।[৯০] আর্থাৎ ইন্দ্রিয় উদ্রেককারী বস্তুকে দূরে না রেখে, তার সাথে সহবাস করেও যদি কেউ সেই বিষয়ে আসক্ত না হন তাকেই তিনি ইন্দ্রিয়সংযম বলার পক্ষপাতী। কিন্তু গীতা-র শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি এটাও দেখাচ্ছেন যে

[৮৮] আশিষ খাস্তগীর, *বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা,* ১৮০২-১৮৫৬ (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০০৪)।

[৮৯] প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী *হরিভক্তি তরঙ্গিণী* এবং *পল্লিবাসী* নামক দু'টি পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং *আর্যজীবন, শ্রীশ্রী চণ্ডীরহস্য, কান্তরতি, সাধনপ্রদীপ, শাক্তনন্দনতরঙ্গিণী, বৃহৎতন্ত্রসার*-এর মতো বহু ধার্মিক পুস্তকের রচনাকার ছিলেন। সৌরিন্দ্রকুমার ঘোষ, *সাহিত্যসাধক মঞ্জুষা* প্রথম খণ্ড, ১৯৮৩ খ্রি., ৩৩৬।

[৯০] প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী, "ইন্দ্রিয়-সংযম," *বেদব্যাস,* পৌষ-মাঘ, ১২৯৯, ১৩২।

বিষয়ের নৈকট্য আছে, তার প্রতি আসক্তিকেও অবহেলা করা হচ্ছে না, শুধু তাকে আহরণ করা হচ্ছে — একেও প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম বলা যায় না। গীতা উদ্ধৃত করে তিনি লিখছেন, "হে অর্জুন! যিনি মনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়র দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত সংযমী, তিনিই সমস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"।[৯১] এখানে আপাতভাবে একটি স্ববিরোধের কথা লেখক উল্লেখ করছেন যা বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি *মনুসংহিতা* উদ্ধৃত করে বলছেন বিষয়ের সাথে সহবাস করলে কখনোই বিষয়বিমুখ থাকা যায় না। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়াসক্তি তৈরি হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনুর উল্লেখ করে তিনি লিখছেন, "জ্ঞান বিরহিত হইয়া বিষয়ের উপভোগ করিলে সেই উপভোগ ইন্দ্রিয় নিগ্রহের কারণ হইতে পারে না, বরং তদ্দ্বারা ক্রমে বিষয় পিপাসা প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে, আবার জ্ঞানপূর্ব্বক বিষয়ের সেবা সেই বিষয় সেবাই ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রসারের সহায়তা না করিয়া প্রত্যুত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাকৃষ্ট করে। অতএব মনুবচনে বিষয়ভোগের যে দোষ কীর্ত্তন আছে, তাহা অজ্ঞানীর পক্ষে, আর বিষয় সেবা করিয়া বিষয় হইতে যে ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিবৃত্তির উপদেশ, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে, সুতরাং মনুবাক্যে কোনই বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই"।[৯২] এই অংশ থেকে খুব স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় লেখক জ্ঞানের প্রসঙ্গ এনে এই আপাত স্ববিরোধের মীমাংসা করছেন। সমাজের যে অংশ জ্ঞানচর্চার বাইরে তাদের কাছে সংযমের যে অর্থ, যারা জ্ঞানচর্চায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তাদের কাছে সংযম সেই একই অর্থ বহন করছে না। এই প্রেক্ষিতে "ইন্দ্রিয়-সংযম" প্রবন্ধটির একটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে।

> ...অতএব বিষয় ভোগ না করিয়া উহা হইতে ইন্দ্রীয়গণকে সংযত করাই কর্ত্তব্য" এইরূপ ধারণাকেই মনু বচনে "জ্ঞান" বলিতে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার জ্ঞান পূর্ব্বক বিষয়রাশি ভোগ করিতে করিতে তাহার দোষানুভব করিয়া ইন্দ্রিয়গণের যে তাহা হইতে প্রত্যাহরণ করা, তাহার নাম প্রকৃত সংযম এবং পূর্বোক্ত বিষয়ের দোষ পর্য্যালোচনাই ইন্দ্রিয় সংযমের প্রধান উপায়। ইন্দ্রীয়গণ বিষয়সমূহ গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু মনে সর্বদাই তাহার দোষের পর্যালোচনা করিবে, এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে বীততৃষ্ণ হইবে।[৯৩]

প্রসন্নকুমার এখানে স্পষ্ট করে ইন্দ্রিয় সংযমের জ্ঞানে সাবর্ণ অধিকারের কথা উল্লেখ না করলেও এক্ষেত্রে যে তাদের আগ্রাধিকার প্রাপ্য মনে করেছেন তা অনুমেয়। একই সাথে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় যে লেখক স্পষ্টভাবে বলছেন "সংসারে রমণী আর রত্নই লোকের বিশেষ আদরের বস্তু, ইন্দ্রিয়গণও ইহার সংগ্রহের

---

[৯১] ঐ, ১৩২।

[৯২] ঐ, ১৩৩।

[৯৩] ঐ, ১৩৪।

নিমিত্ত সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত"। তিনি এই 'সুখ' থেকে বিরত থাকার পদ্ধতি হিসেবে অনুতাপবোধকে জাগরূক করাকেই প্রকৃত পদ্ধতি মনে করছেন। ফলত এই জ্ঞান আভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়াকে বলবৎ করার মধ্য দিয়ে পাওয়া সম্ভব বলে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই বিষয়টি চন্দ্রনাথ বসু এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরও বিস্তারিতভাবে তাঁদের রচনায় আলোচনা করেছেন।

চন্দ্রনাথ বসু তাঁর *হিন্দুত্ব* গ্রন্থে হিন্দুধর্মের যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলছেন তার মধ্যে একটি হল নিষ্কাম ধর্ম বা নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কামের অর্থ এখানে কামনারহিত। আর এই অর্থে যে কাজের পিছনে আত্মস্বার্থ যুক্ত কোনো কামনা থাকে না তাকে তিনি নিষ্কাম কর্ম বলে চিহ্নিত করছেন।[৯৪] চন্দ্রনাথের মতে কর্ম দু-প্রকার হতে পারে — কাম এবং নিষ্কাম। প্রাথমিকভাবে তিনি কামযুক্ত কর্মের সমালোচনা করলেও এর অনিবার্যতাকে অস্বীকার করেননি। যেমন ব্রত হিন্দু ধর্মীয় চর্চার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং এর প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে তর্কাতীত। কিন্তু এই সকল কর্মগুলিকে তিনি নিকৃষ্ট কিন্তু 'আবশ্যকীয়' বলেই মনে করেছেন। বিপরীতে ঈশ্বর বা স্ত্রীয়ের প্রতি প্রেমকে তিনি নিষ্কাম ধর্ম বলে উল্লেখ করছেন। কারণ এক্ষেত্রে এই প্রেমগুলি আবেগতাড়িত। নিজের জন্য সুখ আশা করা এই কর্মের উদ্দেশ্য নয়, তা নিঃস্বার্থভাবে অপরের প্রতি। তাই এই কর্মকে তিনি উচ্চমানের মনে করছেন। এইভাবে চন্দ্রনাথ দু-ধরনের কর্মকেই স্বীকার করলেও তাদের মধ্যে তারতম্য করছেন।

চন্দ্রনাথ শেষ বয়সে নিজের আত্মজীবনীতে বয়ঃসন্ধির অনুভূতির স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে কিছু কথা বলছেন যা এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখছেন,

> বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, যে যাহাকে Puberty বা যৌবনোদ্ভেদ বলে, তাহা ঘটিলে বুঝিতে পারা যায় মন মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শৈশবের সে রৌদ্রের সেই রং, উদ্ভিজ্জের সেই রং, বাতাসের সেই সুন্দর শান্তিময় নিশ্বাস আর নাই – অন্তর্জগৎ বহির্জগৎ সবই যেন মলিন বা আবিল হইয়া উঠিয়াছে। ... তখন শৈশবের সেই আনন্দে আমার আর কুলাইল না। অন্য আনন্দে স্পৃহা হইল। বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল। বিবাহ হইল। বিবাহ করিয়া যত সুখ যত আনন্দ পাইব মনে করিয়াছিলাম – বিবাহ করিবার পর তাহার অপেক্ষা অনেক সুখ ও আনন্দ পাইলাম। যাঁহার সাথে বিবাহ হইল তিনি আমাতে এত মিশিলেন যে, তাকে একদিন না দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়িতাম। ... তাঁহাতে এত মিশিবার কারণ এই যে, তাঁহার গুণে তিনি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সচরাচর যাহাকে রূপসী বা রূপবতী বলে

---

[৯৪] চন্দ্রনাথ বসু, *হিন্দুত্ব : হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস*, ৫৯-৭০।

> তিনি তাহা নহেন। কিন্তু তাঁহার মতন মিষ্টি মুখশ্রী আর কোন স্ত্রীলোকের দেখি নাই। সে কেবল তাঁহার গুণের বাহ্য অভিব্যক্তি বলিয়া। তাঁহার কোন পার্থিব কামনাই দেখি নাই। কখনো আমার কাছে একখানি অলঙ্কার কি ভাল কাপড় কি নিজ প্রয়োজনে একটি টাকা চান নাই। ... এইরূপ পত্নী পাইয়া আমি চিরজীবন সেই বাল্যকালের নির্ম্মল আনন্দের ন্যায় ভরপুর হইয়া আছি।[৯৫]

এখানেই শেষ নয়। চন্দ্রনাথ দীর্ঘ বয়ানে বলে চলেছেন, এরূপ স্ত্রীর জন্যই তিনি আদর্শ পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী পেয়েছেন যারাও জীবনে পার্থিব কিছুই কখনো চায়নি। "ইহারা সকলেই দরিদ্রের মহামনা সন্তানের ন্যায় দরিদ্রতা শ্লাঘার বস্তু মনে করে, এবং দরিদ্রের ন্যায় মোটা চাল চলনে জীবন যাপন করিতে ভালোবাসে"।[৯৬] চন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর এই অংশে তাঁর নিষ্কাম কর্মের আদর্শকেই আমরা যেন প্রতিফলিত হতে দেখি। একই সাথে কামনার আত্মসুখজনিত গ্লানিবোধও যেন চন্দ্রনাথের স্মৃতিরোমন্থনের মধ্যে প্রতিফলিত। বয়ঃসন্ধিক্ষণের তৈরি হওয়া দৈহিক কামনা যে সাময়িকভাবে তার মনে পদস্খলনের বোধ তৈরি করে, তাকে যেন ঢাকতে সাহায্য করে ইহলৌকিক কামনা-বাসনারহিত তাঁর স্ত্রীর চরিত্রগুণ। ব্রহ্মচারী জীবন আর গৃহী জীবনের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম এক সেতু রচনা করে। তার নীচে যেন বিলীন হয় নিকৃষ্ট কিন্তু 'আবশ্যকীয়, অনিন্দনীয়' কাম।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ভাবাদর্শের সাথে একজন সৃজনশীল ব্যক্তি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে নির্ধারণ করা কঠিন। তাঁর রচনা এতটাই বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে পণ্ডিতরা বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে তার রচনাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন।[৯৭] তপন রায়চৌধুরী যেমন মনে করেন একজন লেখক হিসেবে বঙ্কিমকে পাঠ করা মুশকিল, কারণ জীবনের বিভিন্ন সময় বিবিধ বিষয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন।[৯৮] আবার নিজের মতামতকেই অনেক সময় তিনি নিজেই বিদ্রূপ করেছেন।[৯৯] ফলত হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ধারার মধ্যেও তাঁর

---

[৯৫] চন্দ্রনাথ বসু, *পৃথিবীর সুখ দুঃখ* (কলকাতা, ১৩১৫), ৩৪-৩৬।

[৯৬] ঐ, ৩৮।

[৯৭] যেমন সুদীপ্ত কবিরাজ ঐতিহাসিক পর্বে বঙ্কিমের রচনাকে বিভাজিত না করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনাকে পৃথক পৃথকভাবে নিখুঁত পাঠ করেছেন এবং তার মধ্য থেকে বঙ্কিমের রচনায় উত্তর ঔপনিবেশিক চেতনার সন্ধান করেছেন। Sudipta Kaviraj, *The Unhappy Consciousness : Bankimchandra Chattopadhyay and the Formation of Nationalist Discourse in India* (Delhi: Oxford University Press, 1995).

[৯৮] Raychaudhuri, *Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*, 103- 218.

[৯৯] Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism,* Chapter 4, Bankimchandra and the Impossibility of a Political Agenda, 135-62.

অবস্থানে স্বতন্ত্রতা লক্ষ করেছেন অনেকে।[১০০] তবে আটের দশক থেকে তাঁর লেখার চরিত্রে এক ধরনের স্পষ্ট সরণ নজর করেছেন তনিকা সরকার। তিনি দেখান এই সময় তাঁর লেখা তুলনায় অনেক গোঁড়া এবং পুনরুত্থানবাদী চিন্তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।[১০১] আলোচ্য সময়ে উদীয়মান সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী দর্শন এবং তার হিন্দু বিশ্বাস, প্রতীকের প্রতি ঝোঁকের চরিত্র বুঝতে গিয়ে ফলত তনিকা সরকার বঙ্কিমের জীবনের শেষপর্বে রচিত তিনটি উপন্যাস *আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম* এবং দুটি প্রবন্ধ "কৃষ্ণচরিত্র" ও "ধর্মতত্ত্ব"-র প্রতি আলোচনা নিষিদ্ধ করেছেন। আমরাও যেহেতু হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তায় বঙ্কিমের বিশিষ্ট অবস্থানটি বোঝার চেষ্টা করব, এবং তাঁর রচনায় আদর্শ পৌরুষ এবং যৌনতার কী ধরনের বিধিবদ্ধতা জন্ম নিচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করব, তাই বঙ্কিমের রচনাকে তনিকা সরকার যেভাবে পর্বে বিভাজন করেছেন সেই ছক অনুসরণ করব। এইক্ষেত্রে আমরা মূলত আলোচনা করব তাঁর শেষ জীবনের পাঁচটি রচনায় অভিষ্ট আদর্শ হিন্দু পুরুষের জীবনদর্শন কী হওয়া উচিত বলে মনে করেছেন সেই দিকটি নিয়ে।

বঙ্কিম উনিশ শতকের আটের দশকের প্রথম পর্বতেই কিছু পত্রিকায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু ছোট বড় প্রবন্ধ লিখছিলেন যা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিবর্ধমান অন্তর্মুখিতার ইঙ্গিত দেয়। যদিও এটাও বলে রাখা প্রয়োজন যে তিনি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর এই অন্তর্মুখিতার পর্বেও পশ্চিমী জ্ঞানতত্ত্বের গুরুত্বকে অস্বীকার একেবারেই করেননি। উক্ত সময়ের প্রবন্ধগুলিতে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। তিনি এই পর্বে *প্রচার* ও *নবজীবন* পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তিনটি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তাঁর ভাষায়, "উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্ম্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ক; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র"।[১০২] এই রচনাগুলিরই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপ *ধর্ম্মতত্ত্ব* এবং *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থ দুটি।[১০৩] এই দুটি গ্রন্থ বঙ্কিম একই সাথে রচনা শুরু করেছিলেন এবং তিনি নিজেও মনে করতেন *ধর্ম্মতত্ত্ব* এবং *কৃষ্ণচরিত্র* এই দুটি রচনার মধ্যে ধারাবাহিকতা

---

[১০০] অমিয়প্রসাদ সেন হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মধ্যে চিন্তাগত ভিন্নতা এবং ভাবনার মাত্রাগত তারতম্য লক্ষ করেছেন। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তায় অনেক বেশি সৃজনশীলতা তিনি নজরে এনেছেন। Sen, *Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905 : Some Essays in Interpretation,* 83-202.

[১০১] Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation*, 165.

[১০২] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্র, সম্পাদক – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৪), প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

[১০৩] বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর বাকি রচনাগুলি এবং কিছু পাণ্ডুলিপি থেকে *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা* এবং *দেবতত্ত্ব এবং হিন্দু ধর্ম্ম* গ্রন্থ দুটি প্রকাশ পায়। শেষ দুটি রচনা যেহেতু বঙ্কিমের নিজের সম্পাদিত ও সংশোধিত নয় তাই আমরা সেই রচনাগুলিকে আলোচনার বাইরেই রাখব।

আছে।[১০৪] আমরা পর্যায়ক্রমে উনিশ শতকের আটের দশকের *গোরা* থেকে বঙ্কিমের রচনাগুলিকে যদি সাজাই তাহলে দেখতে পাব ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে *আনন্দমঠ*, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে *দেবী চৌধুরাণী*, আর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি *কৃষ্ণচরিত্র* আর *ধর্ম্মতত্ত্ব* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা শুরু করেন,[১০৫] আর এই একই বছর *সীতারাম*-এর প্রকাশ শুরু হয় ধারাবাহিকভাবে। পরবর্তীকালে এই রচনাগুলির অনেকটাই তাঁকে সংশোধন করতে দেখা গেলেও হিন্দুধর্ম, এবং তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন অনুশীলন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর যে মতামত তৈরি হয়, প্রথম রচনা থেকে শেষ রচনাটির মধ্যে তার একটি ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। *কৃষ্ণচরিত্র* ও *ধর্ম্মতত্ত্ব* -র ক্ষেত্রে আখ্যানিক কাল্পনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার পরিসর থেকে বেরিয়ে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতরে অনুপ্রবেশ করে।

বলা বাহুল্য বঙ্কিম তাঁর জীবনের এই পর্বে যে বিষয়গুলিকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল ঔপনিবেশিক পৌরুষের বিপরীতে এক আদর্শ হিন্দু চরিত্রের খোঁজ। অবশ্যই তাঁর প্রবন্ধগুলির রচনাশৈলিতে তাঁর বক্তব্য অনেক বেশি ধারালো ও স্পষ্ট। কারণ সেগুলি রচনার উদ্দেশ্যই হল হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নিরুপণ এবং তার দার্শনিক ভিত্তিকে উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য পাঠকসংখ্যাও যে সীমিত, সে সম্পর্কেও তিনি নিজেই অবগত ছিলেন।[১০৬] তুলনায় স্বভাবতই তাঁর উপন্যাসগুলির রচনাশৈলীর ধরন ভিন্ন। তা যেহেতু আখ্যানধর্মী, তাই সেখানে তাঁর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি সরাসরি উপস্থাপিত করা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু এই পর্বে হিন্দুধর্ম নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন খুব স্পষ্টভাবেই এই উপন্যাসগুলিতে পড়েছে। বরং বলা

---

[১০৪] বঙ্কিম তাঁর *কৃষ্ণচরিত্র*-র প্রথম বিজ্ঞাপনে লেখেন যে তিনি চেয়েছিলেন প্রথম *ধর্মতত্ত্ব* পুস্তকাকারে প্রকাশ কাম্য ছিল, কারণ সেটা ধর্ম সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দেয়। আর তার প্রায়োগিক দিকটির কথা *কৃষ্ণচরিত্র* -এ আলোচিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *কৃষ্ণচরিত্র*, প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

[১০৫] ১২৯১ আশ্বিন সংখ্যা (১৮৮৪ খ্রি.) থেকে *প্রচার* পত্রিকায় *কৃষ্ণচরিত্র* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে শুরু করে। এর দুবছর পরে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে এটি গ্রন্থিত হয় *কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম ভাগ* নামে। এরপর এই গ্রন্থের অনেকটা অংশ সংযোজন ও বিয়োজনের পর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে *কৃষ্ণচরিত্র* নামে পুনরায় প্রকাশ পায়। আর প্রথম *নবজীবন* পত্রিকার ১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থটির আদি অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। ১২৮১ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৯২ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত উক্ত পত্রিকাতেই "বিবিধ প্রবন্ধ"-এ ধারাবাহিকভাবে তিনি তাঁর 'অনুশীলন ধর্ম্ম'র তত্ত্বটিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে) তিনি *ধর্মতত্ত্ব* পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন যেখানে তিনি ১২৯১ থেকে ১২৯২ পর্যন্ত রচিত উক্ত রচনাগুলিকেই সম্পাদনা করে স্থান দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী : দ্বিতীয়-খণ্ড*, "ভূমিকা" যোগেশচন্দ্র বাগল (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬১, চতুর্থ মুদ্রণ- ১৩৭৬), সাহিত্য-প্রসঙ্গ – তেইশ।

[১০৬] বঙ্কিমচন্দ্র *ধর্মতত্ত্ব*-র ভূমিকাতেই লিখেছেন, "প্রধানতঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সে জন্য সকল কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়া বুঝান যায় নাই"। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ধর্মতত্ত্ব*, সম্পাদক - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎ, ১৩৪৮), ২।

যেতে পারে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তাগুলিকে পারিবারিক, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রয়োগ করে দেখার ও দেখানোর ক্ষেত্রে এই উপন্যাসগুলি অনেক সময়ই উপযোগী প্লট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সর্বোপরি বঙ্কিম এই পর্বে দু-ধরনের রচনাতেই যে একটি পৌরুষদৃপ্ত হিন্দু চরিত্রের নির্মাণ করতে চাইছিলেন তা খুব স্পষ্ট। এইক্ষেত্রে পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে উত্থাপন করেন যে পৌরুষকে দেহে ধারণ করা একটি অভ্যাসলব্ধ বিষয় এবং এর জন্য চোখের সামনে একজন আদর্শ পুরুষের চেহারা উপস্থিত থাকা প্রয়োজন যাতে করে সেই পুরুষ চরিত্রকে অনুকরণ করা যায়, তার থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।[১০৭] এখানেই আমরা তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র"-এ নির্মিত কৃষ্ণের চরিত্রটির কথা উত্থাপন করতে পারি। এখানে কৃষ্ণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের মানবীয় রূপ। তিনি এখানে কৃষ্ণের চরিত্রটিকে যেভাবে নির্মাণ করতে চান তা ছিল আত্মবিমুখ কর্মযোগীর এক মূর্ত প্রতীক।[১০৮] সুদীপ্ত কবিরাজ দেখান এক্ষেত্রে বাংলার প্রচলিত মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণের যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, আমোদপ্রবণ চরিত্র চিত্রিত ছিল সেখান থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ চরিত্রে পরিবর্তন ঘটান। বঙ্কিমের কৃষ্ণ তাঁর মতে এক পরাধীন জাতির ঈশ্বর যিনি অতীতের পরাধীনতাজনিত অসম্মানকে প্রত্যাখ্যান করে জাতিকে উত্তরণে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।[১০৯] বঙ্কিম কৃষ্ণের চরিত্রে এই যে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন তার পিছনে কাজ করেছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের সমালোচনা। কারণ তাঁরা হিন্দুদের লম্পট, কামুক প্রতিপন্ন করতে গিয়ে কৃষ্ণ চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনা টানেন।[১১০] কৃষ্ণের চরিত্রের এই যে নবনির্মাণ তা ফলত তাঁকে শুধু জাতীর উওরণের দিশারী পৌরুষদৃপ্ত চরিত্র হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করে তা নয়, সেই ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর মধ্যে কিছু ক্রিয়া আশা করে। এই ক্রিয়াগুলি হল যথাক্রমে ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য এবং অনুশীলন ধর্মের চর্চা।

---

১০৭ Chandrima Chakraborty, *Masculinity, Asceticism, Hinduism : Past and Present Imagining of India* (Ranikhet: Permanent Black, 2011), 50.

১০৮ সুদীপ্ত কবিরাজ এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় দুজনেই *কৃষ্ণচরিত্র*-এ কৃষ্ণের এই পুনর্নির্মাণটি লক্ষ করেছেন। Kaviraj, *The Unhappy Consciousness : Bankimchandra Chattopadhyay and the Formation of Nationalist Discourse in India*, 72-106; Partha Chatterjee, *Nationalist Thought and the Colonial World : A Derivative Discourse* (London: Zed Books, 1986), 58-59, 70.

১০৯ Kaviraj, *The Unhappy Consciousness: Bankimchandra Chattopadhyay and the Formation of Nationalist Discourse in India*, 91.

১১০ Chakraborty, *Masculinity, Asceticism, Hinduism : Past and Present Imagining of India*, 50-51.

ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য এবং অনুশীলন ধর্ম এই তিনটি বিষয় বঙ্কিমের রচনার এই পর্বে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেয়। অনুশীলন ধর্মের ধারণাটি তাঁর নিজস্ব চয়ন, যে তত্ত্বের উপস্থাপন আর সম্ভাব্য প্রায়োগিক দিকগুলির উল্লেখ তাঁর শেষদিকের রচনায় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আর সেই অর্থে অনুশীলন ধর্ম তাঁর এই পর্বের সবকটি রচনার অন্যতম সাধারণ বিষয় এবং সবকটি রচনার মধ্যেকার সংযোগও বটে। আগেই বলেছি একজন আদর্শ হিন্দু হয়ে ওঠার পন্থা হিসেবে বঙ্কিম অনুশীলন ধর্মকে বিবেচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন উক্ত উপন্যাসগুলিতে পুরুষ চরিত্রগুলির পাশাপাশি কিছু নারী চরিত্রকেও আদর্শ হিন্দু ধাঁচে গড়ে তোলার প্রয়াস রয়েছে। বিশেষ করে আপদকালীন অবস্থায় বেশ কিছু নারীচরিত্রকে দেখা যায় যারা প্রথাগত গৃহকর্মের বাইরে এসে আদর্শ হিন্দুধর্মের চর্চার দিকে ঝুঁকেছেন। কিন্তু সাথে এই বিষয়টাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সেই চরিত্রগুলি অনেকটাই ব্যতিক্রমী। অন্যদিকে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে তিনি অনুশীলন ধর্ম পালন করার জন্য যাকে আদর্শ হিসাবে দেখছেন এবং যাদের তা চর্চার জন্য আহ্বান করছেন তারা স্পষ্টভাবে পুরুষ। এক্ষেত্রে তাঁর লেখা প্রবন্ধ “ধর্মতত্ত্ব”-কে তিনি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক রচনা হিসাবে বিবেচনা করেছেন, আর “কৃষ্ণচরিত্র”-কে সেই তত্ত্বের উদাহরণ সহ প্রয়োগের প্রয়াস হিসাবে দেখেছেন।[১১১]

বঙ্কিমের মতে *ধর্ম্মতত্ত্ব* -এ ধর্ম বিষয়ে তাঁর মৌলিক অবদান হল ধর্মার্জনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উনিশ শতকের নতুন পরিস্থিতিতে পুনঃব্যাখ্যা।[১১২] গুরু শিষ্যের কথোপকথনের ধাঁচে লিখিত এই গ্রন্থটি এক অর্থে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই কথোপকথন থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে ধর্ম এবং শিক্ষার সংযোগটির উপর তাঁর গুরুত্ব আরোপ করার হেতু কিছুটা স্পষ্ট হবে।

> গুরু। ... শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দুধর্ম্মে আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষাবিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন; গার্হস্থ্যে কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই আর্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ব্বক,

---

[১১১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *কৃষ্ণচরিত্র,* প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

[১১২] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ধর্ম্মতত্ত্ব,* ২১।

তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিন ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, “না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত মর্ম্মের বিপরীতাচরণ হইবে।” হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর ; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিত সাধন করিবে; কেন না, মানবপ্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দুধর্ম্মের নব সংস্কারের এই স্থুল কথা।

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা কোম্‌তের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশের সঙ্গে কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরিতে হর্বর্ট স্পেন্সর কোম্‌ত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মতঃ বেদান্তে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। বেদান্তের সাথে হর্বর্ট স্পেনসারের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তটা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা স্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না – বরং স্পিনোজা বা স্পেনসরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দুমধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্ম্মের যাহা স্থুল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুঁইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে।

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি হিন্দুধর্ম্মের শাসনাধীন হইল, ধর্ম্ম ছাড়া কি?

গুরু। কিছুই ধর্ম্ম ছাড়া নহে। ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ ; কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর মনুষ্য, সমস্ত জীব সমস্ত জগৎ- সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?[১১৩]

উপরের দীর্ঘ কথোপকথন থেকে দুটি বিষয়কে আমরা আলাদাভাবে উল্লেখ করব। একটি হল বর্ণাশ্রমনির্ভর শিক্ষাদর্শনের প্রতি বঙ্কিমের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং একই সাথে সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষাপদ্ধতির সাথে এক ধরনের সময়োপযোগী সমঝোতার দিকে হাঁটার প্রস্তাবনা। ফলত তিনি যে হিন্দু শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলছেন তা আবশ্যিকভাবেই পুরাতন, সংস্কারবিমুখ ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থা নয়। বরং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ

---

১১৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ, ২১-২২।

জাতি নির্মাণে আগ্রহী একটি সংস্কারপ্রাপ্ত হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা যা হিন্দুধর্মের মধ্যে 'নব সংস্কার' আনতে সক্ষম হবে। হিন্দুধর্মের এই আধুনিক সংস্কারের পরেও তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার যে অস্মিতা জাগরূক রাখা সম্ভব বলে তিনি মনে করছেন তার কারণ অনুশীলনের মতো ধর্মচর্চার সূত্র যা একান্তভাবে দেশীয় এবং অনন্য। "ধর্মতত্ত্ব"-এর বিবিধ অংশে বঙ্কিম অনুশীলন ধর্মের অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে নীচে উদ্ধৃত কথোপকথনটি সম্ভবত সবচেয়ে সহজবোধ্য।

> গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, দুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। কেন সুখী হও, তাহা বুঝিতে পার?
>
> শিষ্য। আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়।
>
> গুরু। এক মুঠা শুকনা চাউল খাইলে তাহা হয় – মিঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে কি তুমি তুল্য শুখী হও?
>
> শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই।
>
> গুরু। তাহার কারণ কি?
>
> শিষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্য-রসানার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, সেই সম্বন্ধ জন্যই মিষ্ট লাগে।
>
> গুরু। মিষ্ট লাগে সে জন্য বটে, কিন্তু তাহাত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ায় তোমার শুখ কি জন্য? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি একজন আসল বিলাতি সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকরো রোষ্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবেনা। ... এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধবশতঃ নহে। তবে কি?
>
> শিষ্য। অভ্যাস।
>
> গুরু। তাহা না বলিয়া অনুশীলন বল।
>
> শিষ্য। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক?
>
> গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়া অনুশীলনই বল।
>
> শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি?
>
> গুরু। ...যে প্রত্যহ কুইনাইন খায় তাহার কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখনো সুখদ হয় কি?
>
> শিষ্য। বোধকরি কখনো সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়।
>
> গুরু। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল ; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম

সহিষ্ণুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসাস্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এজন্য তোমার যে শক্তি অনুশীলিত হইয়াছে – মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। ঐরূপ অনুশীলনবলে তুমি রোষ্ট বীফ খাইয়াও সুখী হইতে পার। ...

এ গেল একটা ইন্দ্রিয় সুখের কথা। আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখোৎপত্তি।...

তা ছাড়া, আমাদের কতগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে ফল, তাহাও সুখ । ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোনো সুখ নাই। ইহার অভাব দুঃখ।[১১৪]

এখানে অনুশীলন আর অভ্যাসের মধ্যে বঙ্কিম যে পার্থক্য করছেন সেখানেই তিনি স্থাপন করছেন হিন্দু আধ্যাত্মিকতা এবং তার মৌলিকত্বকে, যা তাঁর মতামত অনুযায়ী পশ্চিম থেকে স্বতন্ত্র। আর এই মৌলিক পদ্ধতিতে মানব শরীরের ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রণমূলক চর্চাই তাঁর কাছে অনুশীলন ধর্ম। এখানে উল্লেখ্য অনুশীলন ধর্ম হল বঙ্কিমের কাছে মূলত পুরুষের জীবনযাপনের জন্য পালনীয় একটি কড়া অনুশাসনের চর্চা। তনিকা সরকার এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করেছেন। তা হল বঙ্কিমের এই প্রবন্ধে নারীরা কোথাও বর্তমান নেই। এমনকী *আনন্দমঠ*-এ যে মাতৃভূমিরূপী নারীচরিত্রকে তিনি নির্মাণ করেছিলেন, সেও এখানে অনুপস্থিত। এখানে তিনি 'নব্য হিন্দু' হিসেবে যাকে কল্পনা করছেন তিনি একজন পুরুষ। এবং তাঁর উপর অনুশাসন বলবৎ করার জন্য বাইবের ধর্মীয় ও নৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থার প্রয়োজন নেই। অনুশীলনের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটি হল অন্তর্নিহিত একটি প্রক্রিয়া। তাই এই অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়ার দ্বারাই একমাত্র তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হতে পারে। আর এই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াই তাঁর মতে অনুশীলন ধর্ম। আর এই সত্তা তৈরির বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু ধর্মীয় জ্ঞানের বিশেষ কিছু পুনর্ব্যাখ্যার উপর।[১১৫] আর এখানেই আত্মপ্রকাশ করছে বঙ্কিমের ব্রহ্মচর্যের ধারণা। এটা অভ্যাস করলে তা বাইরের বস্তু হয়ে থাকে। কিন্তু অনুশীলন করলে অন্তরের চেতনার অংশ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর *কৃষ্ণচরিত্রে* আমরা এমন এক আত্মনিয়ন্ত্রিত আদর্শ হিন্দু পুরুষ চরিত্রের খোঁজ পাই। অন্যদিকে তাঁর উপন্যাস *আনন্দমঠ* এবং *দেবী চৌধুরাণী*-তে ব্রহ্মচারী ব্রতধারী চরিত্রগুলিতে আমরা অনুশীলন ধর্মের নানা বাস্তব প্রয়োগের প্রচেষ্টাগুলিকে মূর্ত হতে দেখি।

আমাদের ধারণা আত্মনিয়ন্ত্রণ বা নিজের প্রতি নজরদারির একটি স্বনির্ভর পদ্ধতির বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ব্রহ্মচর্যের ধারণার দিকে ঝুঁকেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ ও

---

[১১৪] ঐ, ৮-৯।

[১১৫] Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 175.

উপন্যাসে ব্রহ্মচর্যকে সবসময় সংসারধর্মের অন্তর্গত করেই দেখেছেন। কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে তিনি সংসার অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনের বাইরেও ব্রহ্মচর্যের চর্চার কিছু আবশ্যিকতার কথা বলেন। আপাতকালীন সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে সাংসারিক জীবন থেকে নিজেকে নির্বাসন দিয়ে ব্রহ্মচর্যের চর্চায় ব্রতী হওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা উপলব্ধি করেছেন তার পেছনে কাজ করেছে কিছু অনুশাসনমূলক আচরণকে চর্চা করার তাগিদ যা সংসারের মধ্যে থেকে করা সম্ভব নয়। যেমন *আনন্দমঠ*-এ ব্রহ্মচর্য ততদিন পালন করা কর্তব্য যতদিন না দেশকে যবনমুক্ত করা যায়। *দেবী চৌধুরাণী*-তে অরাজকতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনসেবার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রের জন্য ব্রহ্মচর্যপালন জরুরি হয়েছে। তাই দু-ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির অনুকূল হলে পুনরায় ব্রহ্মচর্যের নিয়মাবলী তাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই ব্রহ্মচর্যকে কখনোই তিনি সামাজিক দৈনন্দিন জীবনের বাইরের কোনো অভ্যাস বলে দেখেননি। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তাঁর উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা জরুরি।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১২৮৭ চৈত্র থেকে ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে *আনন্দমঠ* প্রকাশিত হয়। শেষ বছরই অর্থাৎ ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২ খ্রি.) উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। *আনন্দমঠ* এমন একটি উপন্যাস যার বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বঙ্কিমচন্দ্র একাধিকবার সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন। তাঁর জীবনকালে এর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠ*-এর কাহিনীকে স্থাপন করেছেন। যদিও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উল্লেখ তাঁর উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে পাওয়া যায় না। এটি তার পরবর্তী সংযোজন। আর *আনন্দমঠ* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্লটে যে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীদের আমরা পাই তাঁরা ঠিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়কার সন্ন্যাসী চরিত্রও নন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তাঁর উপন্যাসের পট হিসেবে পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত হলেও, এটা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, এর নায়ক-নায়িকাদের ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমের ছিল না। এমনকী এই উপন্যাসটি আদতেও যে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় তা তিনি উল্লেখও করেছিলেন।[১১৬] মূল আখ্যানটি যে চারজন হিন্দু ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ও একজন সন্ন্যাসিনীর চরিত্রগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে তাঁরা তাই প্রথাগত সন্ন্যাসী একেবারেই নন। সন্তানদল নামক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এই সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসীদের

---

[১১৬] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ: উপন্যাস-খণ্ড*, সম্পাদক গোপাল হালদার (কলকাতা: সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৩৮০), পরিশিষ্ট –ঙ।

‘রাজনৈতিক সন্ন্যাসী’ বলা যেতে পারে। কারণ *আনন্দমঠ*-এর সন্ন্যাসীদের কর্মকাণ্ডে এমন অনেক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা কাহিনীর স্তরে বাস্তবায়িত করতে দেখা গেছে। মুখ্যত ‘মুসলমান শাসক’ হিন্দু ভারতীয় সমাজের অবনতি ঘটিয়েছে, এমন একটি ধারণা এই সন্তানদলের সদস্যদের চেতনার অনেকটা স্থান জুড়ে বর্তমান থাকতে দেখা যায়। আর ক্ষণস্থায়ী হলেও ইংরেজদের কাছ থেকে বস্তুগত জীবনের বিষয়ে পাঠগ্রহণের মধ্য দিয়েই এই হিন্দু ভারতীয় সমাজকে জাগরূক করা সম্ভব, এই বিশ্বাসও গৌণভাবে উপন্যাসটিতে বর্তমান। যদিও ইংরেজদের সম্পর্কে কিছু অসন্তোষও উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে প্রকট। যার ধার পরবর্তী সংস্করণে কমতে দেখা যায়।[১১৭] কিন্তু এই সন্ন্যাসীদের প্রাথমিক অসন্তোষ যে ‘মুসলমান শাসন’ নিয়ে, তাদের বঙ্গদেশ থেকে উৎখাত করার তাগিদটি *আনন্দমঠ*-এর প্রতিটি সংস্করণেই প্রায় একই রকম প্রকট থেকে যায়।[১১৮]

বঙ্কিমের এই উপন্যাসে অনুশীলন ধর্মের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু চারিত্রিক শুচিতা, নৈতিক বিশুদ্ধতা এবং সর্বোপরি ব্রহ্মচর্যচর্চার যে ধারণা তিনি উপন্যাস জুড়ে দিয়েছেন, তা রপ্ত করার পদ্ধতির সন্ধানের মধ্যেই অনুশীলনের প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে সন্তানদলের নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট বিভাজন দেখতে পাওয়া যায়। শুধু যুদ্ধের সময়ই প্রচুর সংখ্যক সন্তান সদস্যদের দেখা মেলে। এই সদস্যদের অদীক্ষিত দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে অর্থে এঁরা হলেন জনতা, যাদের শুধু বিপদের সময়ই প্রয়োজন হয়। আর অন্য সদস্যরা হলেন দীক্ষিত। এঁরাই হলেন দলের মূল নীতিনির্ধারক। উপন্যাসে সন্তানদলের গুরুত্ব শুধু

---

[১১৭] এখানে বলা প্রয়োজন *আনন্দমঠ*-এর বহু অংশ সংশোধন হলেও তাতে *আনন্দমঠ* উপন্যাসটির বক্তব্যে খুব মৌলিক বদল আসেনি। এটা অবশ্যই সঠিক যে রাজরোষে পড়ার আশঙ্কায় বঙ্কিম প্রতিটি সংস্করণেই উপন্যাসটিতে কিছু কিছু সংযোজন-বিয়োজন এনেছেন। তাতে হয়তো ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে সন্ন্যাসীদের বিষোদ্গারের মাত্রাটিও কিছুটা আড়ালে নিয়ে যাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে উপন্যাসটির মৌলিক বক্তব্যে কোনো বদল আসে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা সমস্যা থাকলেও সন্ন্যাসীরা ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার যে উপায় নেই, বরং ইংরেজদের সবচেয়ে বড় গুণের বিষয় দেহবল ও ইহলৌকিক বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞানকে আয়ত্তের মধ্য দিয়েই হিন্দুজাতির উত্থান সম্ভব, তা সন্তানদল বহুবারই উপলব্ধি করে। পুরো উপন্যাস জুড়েই দেখা যায় শাসনব্যবস্থায় মুসলমানদের বহাল থাকার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বহু নৈতিক সওয়াল উঠতে।

[১১৮] ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ভবানন্দর একটি প্রশ্নের উত্থাপনে সন্ন্যাসীদের রাজনৈতিক সমস্যাটি সামনে আসে। ভবানন্দ মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন “হিন্দু রাজ্যে আবার মুসলমান রাজা কি?” বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ*, প্রথম সংস্করণ, সম্পাদক - চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিকেশন, ১৯৮৩), ৩০। যদিও দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য বঙ্কিম এই প্রশ্নটাকে সংশোধন করেন। সেখানে ভবানন্দ প্রশ্ন করে, “যে রাজা রাজ্য পালন করেনা, সে আবার রাজা কি?” বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ*,, *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ: উপন্যাস-খণ্ড*, ৭২৬। যদিও অন্যত্র সত্যানন্দ ঠাকুরের একটি বয়ান বঙ্কিম প্রতিটি সংস্করণেই অপরিবর্তত রাখেন। পূর্ব উদ্ধৃত বয়ানটির থেকেও স্পষ্টভাবে এখানে সন্ন্যাসীদলের মুসলমান বিদ্বেষকে ব্যক্ত করা হয়, যখন সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেন, “আমরা রাজ্য চাইনা – কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই”। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ*, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ৭৫০।

এটাতে সীমাবদ্ধ নয় যে তাঁরা সমাজের স্বল্প সংখ্যক অংশ থেকে এসেছেন। তাঁদের গুরুত্ব আরও বেশি এই কারণে যে এই স্বল্পসংখ্যক সদস্যরা সমগ্র সন্তানদলকে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাখেন। নেতৃত্ব দেবার ব্যাপারে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে এই বিশেষ অধিকারের একটি প্রতীকী গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্বটিকে উদ্ঘাটন করতে হলে প্রথম প্রশ্ন করতে হবে দীক্ষিত সদস্য বা সন্ন্যাসীরা এই অগ্রাধিকার কোথা থেকে পাচ্ছেন? শুধু *আনন্দমঠ*-ই নয়, আমরা বঙ্কিমের এই পর্বের সবকটি রচনাতেই দেখতে পাব এই ধরনের অগ্রাধিকার অর্জনের একটি কারণ শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা প্রয়োজন যে বঙ্কিম এই স্বল্পসংখ্যক সদস্যদের যেভাবে বেছে নিচ্ছেন তার নির্ণায়ক কী? বঙ্কিম এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসেবে রেখেছেন সাময়িকভাবে যেকোনো ধরনের সাংসারিক ও গার্হস্থ্য সংযোগ থেকে দীক্ষিত সদস্যদের বিরত থাকার অঙ্গীকারকে। অর্থাৎ সাময়িক ব্রহ্মচর্যের ব্রতগ্রহণ। ব্রহ্মচর্যের সাথে নেতৃত্বর উপযোগিতার এই সংযোগটি বঙ্কিমের পরের উপন্যাস *দেবী চৌধুরাণী*-তেও আমরা লক্ষ করব। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ দিকটি হল– নেতৃত্বর সাথে শাস্ত্রজ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্যের আন্তঃসম্পর্কটি, যা এই স্বল্পসংখ্যক সদস্যদের প্রতীকী গুরুত্বটিকে চিহ্নিত করে। আমরা বঙ্কিমের শেষ তিনটি উপন্যাসেই দেখতে পাব সফল নেতৃত্বর প্রসঙ্গটি কীভাবে এই দুটি বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সম্প্রতি নিখিল গোভিন্দ ঔপনিবেশিক কালপর্বে বিপ্লবী বিষয়ক উপন্যাসগুলিতে প্রেম এবং মৃত্যুর মধ্যে মুক্তির সম্বন্ধটিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। গোভিন্দের মতে সমগ্র *আনন্দমঠ* উপন্যাসটিকে তাড়া করে বেড়িয়েছে মানুষের জীবনে আত্মবলিদানের মুল্য কী—এই প্রশ্নটি। *আনন্দমঠ*-এ দেখা যায় দুর্ভিক্ষের কারণে জীবনের মূল্য ক্রমশ হ্রাসমান। গোভিন্দের মতে এই পরিস্থিতিতে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে নিজের ও অন্যের জীবনের গুরুত্বকে ফেরানো সম্ভব– এই ধারণাটি জীবনের মূল্যকে উপন্যাসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।[১১৯] *আনন্দমঠ* সম্পর্কে গোভিন্দের এই ব্যাখ্যাটিকে আরও কিছু দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যায়। *আনন্দমঠ*-এ জীবন দিয়ে জীবনকে অর্থবহ করে তোলার এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রে দেখতে পাওয়া যায় দুটি বিষয়। এক, নারী এবং দুই, একটি নৈতিকতাবোধ। মঠে হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবমূর্তিকে উপাসনা করা হলেও মূল আরাধ্য হলেন দেশমাতৃকা। সত্যানন্দের কাছে দেশমাতৃকার দুঃখ নিবারণই সন্তানদলের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই জন্যই *আনন্দমঠ* এবং সন্তানদলের জন্ম। কিন্তু দেশ, যাকে কল্পনা করা হচ্ছে একজন নারীমূর্তি হিসাবে,

---

[১১৯] Nikhil Govind, *Between Love and Freedom: Revolutionary in the Hindi Novel* (New Delhi: Routledge, 2014), 29-43.

তার দুঃখ মোচনের জন্য নারীসঙ্গত্যাগই দীক্ষিত সন্তানদের প্রধান অঙ্গীকার। আর এখানেই সমগ্র উপন্যাস জুড়ে সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক *নৈতিক দোলাচল* ক্রিয়াশীল থাকতে দেখ যায়। যার পরিণতিতে আসে প্রাণত্যাগের পালা। এই প্রাণত্যাগের মধ্য দিয়েই শুধু জীবনের মূল্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় না, জীবনের মূল্যকে এক উচ্চস্থানে উন্নীত করা হয়। উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখি দুর্ভিক্ষপীড়িত আমজনতা বেঁচে থাকার তাগিদে স্ত্রী, কন্যাকে বিক্রি করার মতো *নৈতিক* অধঃপতনে পৌঁছেছে। সেখান থেকে আমরা দেখি জীবনের গুরুত্বকে এক উচ্চ শিখরে নিয়ে যায় *আনন্দমঠ*-এর সন্ন্যাসীরা। দেশমাতার জন্য গ্রহণ করা ব্রত থেকে পদস্খলন হয় জীবানন্দ ও ভবানন্দের। এই স্খলনজনিত আত্মদংশন থেকে যুদ্ধে আত্মত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করছেন দুজনে। নৈতিক অধঃপতন থেকে নৈতিকতার পথে উত্তরণের এই যাত্রাটি *আনন্দমঠ*-এর শুরু থেকে শেষ অধ্যায়ে ঘটতে দেখি আমরা। আখ্যানে মঠের প্রধান সত্যানন্দের তিন শিষ্য ভবানন্দ, মহেন্দ্র ও জীবানন্দকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে আমরা পাই। এর মধ্যে ভবানন্দ ও জীবানন্দকে আমরা দেখি নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে প্রাণের আহুতি দিতে। আর মহেন্দ্র ব্রত চলাকালীন নারীর প্রতি অনাসক্ত থাকেন। সম্ভবত এই সুবাদেই ব্রত শেষে তাঁকে দেখা যায় হিন্দুরাজ্যের রাজা হতে।

এখানে সন্তানদলের গ্রহণ করা ব্রহ্মচর্য ব্রত সম্পর্কে কিছু পৃথক আলোচনা করা প্রয়োজন যা সামগ্রিকভাবে এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনাচিন্তাকেও স্পষ্ট করবে এবং বঙ্কিমের পরবর্তী রচনাগুলিতে কীভাবে এই বিষয়টির গুরুত্ব অব্যাহত রয়েছিল সেই অলোচনার অবকাশকেও উন্মুক্ত রাখবে। বঙ্কিমের উপন্যাস এবং প্রবন্ধ দুটি পড়লেই দেখা যায় তাঁর চিন্তায় মানুষের জীবৎকালে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল গার্হস্থ্য জীবন। তিনি গার্হস্থ্যকালকে সবচেয়ে উৎপাদনশীল এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী সময় হিসাবে দেখেছেন।[১২০] কিন্তু তাহলে একটা প্রশ্নের উদয় হয় যে *আনন্দমঠ*-এর বা *দেবী চৌধুরাণী*-তেও ব্রহ্মচারীরা কেন এত গুরুত্বের সাথে দৃশ্যমান? আসলে বঙ্কিমের ব্রহ্মচর্যের ধারণাটা মূলত সাময়িক, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য গৃহীত যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রহ্মচর্য ব্রতের সমাপ্তি হয়। *আনন্দমঠে* এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি ছিল মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের বিতারিত করা ও দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা। এমন অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা। *আনন্দমঠে* বঙ্কিম দীক্ষিত সন্তানদের অবশ্য পালনীয় ব্রত হিসাবে ব্রহ্মচর্যকে প্রধান স্থান দেওয়ার কারণ মূলত সাংসারিক জীবনের আসক্তি থেকে

---

[১২০] পরে *ধর্ম্মতত্ত্ব*-তে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ধর্ম্মতত্ত্ব*, ২৩।

সন্তানদের মুক্ত করা। লোভনীয় আহার, আরামদায়ক শয্যা থেকে আত্মীয় সকলের সাথে সংযোগ ছিন্ন করা তাই ব্রহ্মচর্য ব্রতের পালনীয় আংশ। কিন্তু এই সবের মধ্যে সবচেয়ে কাঠিন্যের সাথে পালনীয় নিয়ম দেখা যায় মহিলাসঙ্গ বাধ্যতামূলকভাবে ত্যাগ করার বিধান।[১২১] বঙ্কিমের পরবর্তী রচনাগুলিতে ব্রহ্মচর্যের অর্থ বৌদ্ধিকভাবে আরও শাণিত হতে দেখা যায়। সংযোজিত হয় নতুন বিষয়। কিন্তু *আনন্দমঠ* ও *দেবী চৌধুরাণী*-তে একটা বিষয় সাধারণ, তা হল দুটোতেই ব্রহ্মচর্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা এসেছে একটি আপদকালীন পরিস্থিতিতে। তাই ব্রহ্মচর্যপালনের পরিস্থিতি কখনোই স্থায়ী হয়নি। *আনন্দমঠে* দেশমাতৃকার জন্য নরীসঙ্গ প্রত্যাহারের ব্রত গ্রহণ এবং নৈতিকতার পাঠের মধ্যে দিয়ে অন্তর থেকে নিজেকে গড়ে নেওয়ার এই প্রক্রিয়া তাঁর পরের রচনাগুলিতে আরও পরিণত হতে দেখা যায়, তা ধর্ম সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক জিজ্ঞাসার সাথে জুড়ে যায়। যাকে আমরা পরে অনুশীলন ধর্ম বলে উল্লিখিত হতে দেখি। তাই কি এখানে প্রফুল্ল মহিলা না পুরুষ তা গুরুত্ব রাখেনা? কিন্তু অন্তত *আনন্দমঠে* দেখি এই ব্রতের সাথে স্বল্পসংখ্যক মানুষদেরই যুক্ত হতে। তারাই প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবনরক্ষা ও জীবনের মূল্য ও মানবৃদ্ধির নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাই দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের মত লৈঙ্গিক জাতীয়তাবাদী প্রকল্প, প্রচলিত লিঙ্গগত সামাজিক ভূমিকার বাইরে এসে শান্তির সন্তানদলে যোগ ও পৌরুষ প্রদর্শন অথবা অদীক্ষিত সাধারণ জনতাকে (যারা এমনিতে অনৈতিক, দাঙ্গার পর লুঠপাটে মন দেয়) মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় খেপিয়ে তোলা মিশন হয়ে দাঁড়ায়।[১২২] তাই ভবানন্দ এবং জীবানন্দের মতো সন্তান সেনাপতিরা ব্রহ্মচর্যচ্যুত হলেও বীর সন্ন্যাসী হিসাবে বেঁচে থাকে সাধারণ অদীক্ষিত সৈন্যদের মনে। কিন্তু নারীসঙ্গলিপ্সার পাপে মৃত্যু হয় ভবানন্দের কারণ সে অন্যের স্ত্রীকে কামনা করেছিল। কিন্তু একই পাপে জীবানন্দের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়, কারণ তার কামনা ছিল নিজ স্ত্রী শান্তির প্রতি। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবেই এটি পাঠকের সামনে আসে। অদীক্ষিত সন্তানরা তা অবগত থাকেন না। আর অন্য দিকে এই সাধারণ অদীক্ষিত জনতা মুসলমানদের গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ লুঠ করতে থাকে। দাঙ্গা লাগে, আগুন জ্বলতে দেখা যায় শুধু। ফলে *আনন্দমঠ* উপন্যাসে জ্ঞানকে হয়ে উঠতে দেখি ব্রহ্মচর্যপালনের প্রাথমিক শর্ত যা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলিটদের একাংশের মধ্যে এমন এক নৈতিক পাঠ দিতে

---

[১২১] *ধর্মতত্ত্ব*-এ এই বিষয়টি উত্থাপিত হলেও *আনন্দমঠ* উপন্যাসে সন্তানদলের নিয়মাবলী আলোচনা করতে গিয়ে এই বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

[১২২] এক্ষেত্রে বঙ্কিমের শেষপর্বের উপন্যাসে মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িক হিংসার যে বর্ণনা দৃশ্যমান হয় তা থেকে তনিকা সরকার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে উনিশ শতকের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মতাদর্শ এবং পরের দশকগুলিতে মুসলমান বিরোধী যে হিংসাত্মক রাজনীতি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে বঙ্কিম সেতুবন্ধনের কাজ করেন। Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism,* 185.

পারে যে জীবন দিয়ে জীবনের মূল্য ফেরানোর উপলব্ধি জন্মায়। যে উপলব্ধিকেই আমরা পরে দেখি অনুশীলন ধর্মের মধ্যে।

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসটি *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৯০ বঙ্গাব্দের মধ্যে কিছুটা প্রকাশ পায়। এরপর সম্পূর্ণ উপন্যাসটি ১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪ খ্রি.) বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক পরিবর্তন করা হয়। বঙ্কিমের জীবনকালে এই গ্রন্থটির ছটি সংস্করণ প্রকাশ পায়। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর পিতাকে। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন, "যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন, যিনি এখন পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়, তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে এই গ্রন্থ ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম"।[১২৩] গ্রন্থটির ভাবাদর্শস্বরূপ প্রথম পাতায় উদ্ধৃত হয় কিছু উক্তি। যেমন– "The Substance of Religion is Culture"; "The Fruit of it the Higher life"; "The General Law of Man's Progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man become more and more Religious".[১২৪] ফলে উপন্যাস শুরু হওয়ার আগেই কিছুটা আভাস পাওয়া যায় যে আখ্যানটি ধর্ম বিষয়ে বঙ্কিমের চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন।

বাঙলায় নবাবী শাসনের অবসান হয়েছে কিন্তু কোম্পানীর শাসন তখনও জাঁকিয়ে বসতে পারেনি, এমন এক সন্ধিক্ষণের অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতি *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসের মূল প্লট। বোঝা যায় *আনন্দমঠ* আর *দেবী চৌধুরাণী*-র আখ্যান প্রায় একই সময়কালের কথা। যদিও এই উপন্যাস তিনটির কোনোটিই সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, তা বঙ্কিম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন।[১২৫] হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত হলেও ভবানী পাঠক বেশি পরিচিত ডাকাত দলের সর্দার হিসাবে। ডাকাতি করে তিনি তাঁর প্রায় আলাদা একটি রাজত্বই তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁর ডাকাতির উদ্দেশ্য মহৎ। দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের অন্নসংস্থান করা। তার এই ডাকাতের রাজত্বে একজন রাজা দরকার যিনি অনুশীলন ধর্মের সঠিক অধ্যয়ন করবেন। যদিও বহিরঙ্গে তাঁর ভাবমূর্তিতে এক রাজসিক ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশও জরুরি। ঘটনাচক্রে পাঠক মহাশয় প্রফুল্লের সাক্ষাৎ পান। এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম অপূর্ব সুন্দরী যুবতী হল প্রফুল্ল যে ভাগ্যদোষে স্বামীর ঘরে ঠাঁই পায়নি। অনাথা প্রফুল্লর দারিদ্র্য তাকে জঙ্গলে এনে হাজির করেছে। সেখানেই ভবানী পাঠকের পরিচয় প্রফুল্লের সাথে। তৎক্ষণাৎ দলের রানি

---

[১২৩] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ: উপন্যাস-খণ্ড*, পরিশিষ্ট ছ।

[১২৪] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ, "ভূমিকা", আঠাশ।

[১২৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পরিশিষ্ট ঙ।

হিসেবে প্রফুল্লকে শনাক্ত করে ফেলেন তিনি। পুরুষের বদলে এক মহিলাকে পেয়ে তাকেই গড়েপিটে নেওয়ার সংকল্প নেন তিনি। কিন্তু ভবানী পাঠকের এই নির্ণয়ে যে ভুল ছিল তা বঙ্কিম উপন্যাসের শুরুতেই পাঠকদের অবগত করিয়ে দিয়েছিলেন। উল্লেখিত অংশে বঙ্কিম লিখছেন, "ভবানী ঠাকুরের অভিসন্ধি যাহাই হৌক, তাঁহার একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রফুল্লকে পাঁচ বছর ধরিয়া শাণ দিয়া, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রফুল্লের মত নানাগুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই...তবে ভাবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল– প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত"।[১২৬] *দেবী চৌধুরাণী*-র মূল আখ্যানটি মূলত অনুশীলন ধর্ম শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রফুল্লর ডাকাত দলের নেত্রী হয়ে ওঠার, এবং শেষপর্বে বহু কষ্টার্জিত 'পুরুষসুলভ' বৈশিষ্ট্য, বাহির জগতে বিচরণের অভ্যাস ও অধিকারগুলিকে ত্যাগ করে পুনরায় স্বামীর সংসারে ফিরে গিয়ে গৃহকর্মে আপনাকে সঁপে দেওয়ার গল্প। প্রফুল্লের জীবনের শেষপর্বে পরে আসছি। প্রথমে তার শিক্ষাপর্ব নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ভবানী পাঠকের তৈরি করা রাজত্বে প্রফুল্লকে রানি হিসাবে অভিষিক্ত করতে গেলে তাকে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরুর দিকের কাজ। তাই প্রফুল্ল যখন ডাকাত দলে যোগ দেওয়ার কথা মনস্থির করল, পাঠক মহাশয় তাকে পাঁচ বছরের শিক্ষানবিশীর বিধান দেন। মূল ধারার জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাঁচ বছরে যে শিক্ষাগুলি প্রফুল্লকে নিতে দেখা গেল তার ধাঁচটা একেবারেই ব্রহ্মচর্য শিক্ষার সমতুল্য। পার্থক্য একটাই, ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা এখানে দেওয়া হচ্ছে বিবাহিত এক ব্রাহ্মণ মহিলাকে। পুঁথিগত শিক্ষার সাথে আহার, নিদ্রা, পোশাক, কেশবিন্যাস, পুরুষসঙ্গ সকল বিষয়ে আত্মসংযম তৈরির জন্য নানান কৌশল প্রফুল্লর উপর প্রযোগ হতে দেখা যায়। এমনকী মল্লযুদ্ধও এই শিক্ষাক্রমের অংশ হয়ে ওঠে। শিক্ষা শেষে প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের কাছে কাজে (যাকে তিনি কর্ম্ম বলছেন) নামবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু প্রথমেই ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে জানিয়ে দেন, যে কাজই প্রফুল্ল করতে চায় তার কিছুতেই যেন আসক্তি না থাকে। এখানে ভবানী পাঠকের কিছু নিদান উল্লেখ করা যায়। পাঠক প্রফুল্লকে প্রশ্ন করেন, "এখন অনাসক্তি কি? তাহা জান। ইহার প্রথম লক্ষণ, ইন্দ্রিয়-সংযম। ... দ্বিতীয় লক্ষণ, নিরহঙ্কার। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। ... ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত, তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখনও তাহা মনে করিবে না। করিলে পুণ্য কর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর তৃতীয় লক্ষণ এই যে, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল

[১২৬] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ: উপন্যাস-খণ্ড*, ৭৬৭-৬৮।

শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে।"[১২৭] উদ্ধৃত অংশ থেকেই স্পষ্ট যে প্রফুল্লকে 'কর্ম্মে' নিয়োজিত করতে যেভাবে ভবানী পাঠক ব্রহ্মচর্যের[১২৮] অনুশাসনে আনতে চেয়েছিলেন তার কেন্দ্রে আছে বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মের নীতিগুলি।

নিঃসন্দেহে জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রার মধ্য দিয়ে প্রফুল্লর ব্যক্তিগত জীবনে একধরনের স্বশক্তিকরণ হতে দেখি আমরা। কিন্তু এতে সংসার ও সংসারের বাইরের দুনিয়ার সীমারেখাটি কোনোভাবেই শিথিল হয় না। আর ভবানী পাঠকের আশাও পূর্ণ হয় না। তিনি প্রফুল্লকে অনুশীলন ধর্মের শিক্ষা দিয়ে যুক্তিবাদী করে তুলেছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি নৈতিকতার পাঠ পান। কিন্তু বঙ্কিম শুরুতেই একজন মহিলাকে রাজার পাঠ দেওয়ার সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। পাঁচ বছর ধরে ব্রহ্মচর্যের মতো কঠিন ব্রত পালন করে ধর্মশিক্ষা করে এবং পরের পাঁচ বছর 'কর্ম্ম' শিক্ষা করলেও পাঠক মহাশয় বোঝেননি প্রফুল্লর একাদশীতে মাছ খাওয়ার তাৎপর্য কী। তাৎপর্যটি বোঝা যায় উপন্যাসের শেষপর্বে যখন প্রফুল্ল নাটকীয়ভাবে ফিরে যায় তার স্বামীর গৃহে, শুরু করে প্রথাগত সংসারজীবন। ভার নেয় বৃহৎ জমিদার পরিবারের হেঁসেলের। কাছারির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও তার মতামত নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদিও উল্লেখ্য, এই সবকিছুই সে করে অন্দরমহল থেকে। শুরুতেই বলেছি এতে প্রফুল্লর বিচরণ অনেকটাই সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু মেয়ে হিসাবে সংসারধর্মকেই কাম্য ধর্ম হিসাবে বুঝতে শেখে সে। এমনকী যে অনুশীলন ধর্মের শিক্ষা সে পেয়েছিল ভবানী পাঠকের কাছ থেকে তাকে পালন করার জন্য সন্ন্যাস নয়, সংসারই হয়ে ওঠে আদর্শ পরিসর। তার প্রিয় সতীন কৌতূহলের সাথে তাকে প্রশ্ন করে,

> এখন গৃহস্থালিতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হরির মা, পারির মার হুকুম-বর্‌দারি কি তার ভাল লাগিবে?[১২৯]

এই প্রশ্নের উত্তরেই বাড়ির বাইরে প্রফুল্লর করা অনেক সংগ্রামই অর্থহীন হয়ে যাওয়ার কথা বঙ্কিমের পাঠককুলের কাছে। প্রফুল্ল বলে, "ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না

---

[১২৭] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ: উপন্যাস-খণ্ড*, ৭৬৬।

[১২৮] এখানে উল্লেখ্য যে প্রফুল্ল ব্রহ্মচর্য চর্চা করলেও শিক্ষানবিশির পাঁচ বছর প্রতি একাদশীতে খুঁজে পেতে মাছ খেয়েছে, যাতে তা বৈধব্যকে চিহ্নিত না করে। এটাই সাংসারিক জীবনে প্রফুল্লের পথকে উন্মুক্ত রাখে কারণ সে বিবাহিতা।

[১২৯] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ: উপন্যাস-খণ্ড*, ৮১৮।

হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস ঠিক? এর চেয়ে কোন পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব"।[১৩০] সংসারের ফেরার প্রফুল্লর সিদ্ধান্তকে প্রফুল্লর মুখ দিয়ে নয়, বঙ্কিম নিজে আর একবার পাঠকের কাছে বুঝিয়ে বলেন।

> এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেননা প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না – কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা – কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ ধর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।[১৩১]

এর থেকে বোঝা যায় বঙ্কিম নিষ্কাম কর্মের প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে স্পষ্ট দুটি বিভাজন করছেন, যেখানে নারী নিষ্কাম কর্মের পাঠ নিলেও সংসারই তার কাছে জীবনচর্যার একমাত্র ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়। এমনকী সে অনুশীলন ধর্মের দীক্ষা নিলেও সেই ধর্মজাত জ্ঞান, পাণ্ডিত্য সমাজের কাছে অজানা থাকাই কাম্য। বঙ্কিম তাই উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের শেষ অংশে বলেন,

> প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র – সংসার-গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শানিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা – নিজে পরম পণ্ডিত – সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর পরিচয়ও আছে। গৃহধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। ... (সেখানে) যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।[১৩২]

কিন্তু সংসার বিদ্যা প্রকাশের স্থান না হলেও অনুশীলিত জ্ঞান যে সংসারকে আদর্শ করে তোলে এই আপ্তবাক্যটি দেবী চৌধুরাণী শিখিয়ে যেতে চায় পাঠকদের।

সীতারাম উপন্যাসটিতে এক হিন্দু রাজা সীতারামের গল্প বলা হয়েছে যে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর। হিন্দু সেনাদের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করে তৈরি হয় তার হিন্দু রাজ্যটি, যার রাজধানী মহম্মদপুর। ধীরে ধীরে সীতারামের রাজ্যে বহু প্রান্ত থেকে হিন্দু প্রজারা এসে বসতি গাড়েন। ধীরে ধীরে মহম্মদপুর হয়ে ওঠে সমকালীন বাংলায় হিন্দুদের শেষ আশ্রয়স্থল। এইভাবে একটি ন্যায়বিচারসম্পন্ন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে জন্ম নেয়। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে সীতারামকে দেখা যায় তার গুরু চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের

---

[১৩০] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ঐ*, ৮১৮।

[১৩১] *ঐ*, ৮১৯।

[১৩২] *ঐ*, ৮১৯।

পরামর্শ অনুযায়ী সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে। সীতারামের পরামর্শদাতা ও সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিই হলেন তিনি। এই চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার হলেন এক ব্রাহ্মণ ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু তাঁর শুধু পাণ্ডিত্যই নেই, বঙ্কিমের ভাষায় "...(চন্দ্রচূড়) অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমন মজবুত"।[১৩৩] ধর্মজ্ঞান আর কূটনৈতিক বিদ্যাকে প্রয়োগে করতে পারার ক্ষমতা, এই দুইয়ের সঠিক মিশ্রণ চন্দ্রচূড়ের চরিত্রে পাওয়া যায়। এই গুরুর সঠিক পরামর্শে সীতারাম নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে তাঁর ধর্মরাজ্য তৈরি করেন। কিন্তু রাজ্য তৈরির পর সীতারামের চরিত্রে পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম নির্ধারিত অনুশীলন ধর্ম চর্চার কোনো প্রয়াস সীতারামের চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যের যে ধারণা বঙ্কিম পোষণ করতেন তার লক্ষণও সীতারামের জীবনচর্যায় অনুপস্থিত। বরং ধীরে ধীরে তাঁর চরিত্রে স্খলন পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে তাঁর প্রথম স্ত্রী শ্রী-র প্রতি সে মোহগ্রস্ত হয়ে রাজ্যপাট ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসে দীক্ষিত শ্রী সীতারামকে ত্যাগ করলে তিনি আরও বিপথগামী হন। দেশের বহু প্রান্ত থেকে মহিলাদের হরণ করে এনে নিজের শয্যাকক্ষ পূর্ণ করেন। দেশ পুনরায় মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। শ্রী আর তার সহচরী জয়ন্তীর অনুগ্রহে সীতারাম এবং তাঁর পরিবার প্রাণে বাঁচেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য ধূলিস্যাৎ হয়। অনুশীলন ধর্মের নিরিখে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনটি উপন্যাসকে যদি নিরীক্ষণ করা হয় তাহলে কয়েকটি বিষয় নজরে পড়বে। তিনটি উপন্যাসরের প্রেক্ষাপট নবাবী আমলের বাংলা। বাংলায় নবাবদের অত্যাচার এবং এই কু-শাসনের বিকল্প সন্ধানই প্রতিটি উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রদের উদ্দেশ্য। এমন পরস্থিতিতে এক আদর্শ হিন্দু চরিত্র তৈরির প্রয়াস থেকেই অনুশীলন ধর্মের উত্থাপন। এক্ষেত্রে *আনন্দমঠ* আর *দেবী চৌধুরাণী-তে* যদি অনুশীলন ধর্মচর্চা নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে দেখা যায়, তাহলে *সীতারাম* হল তেমন দৃষ্টান্ত যেখানে অনুশীলনের অভাব হিন্দু পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কী মাত্রায় অবনতি ডেকে আনতে পারে তার আখ্যান।

কৃষ্ণচরিত্রে যে নৈতিক পুরুষের ছবি মূর্ত হয়, অথবা বঙ্কিমের আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে যে হিন্দু সাবর্ণ পুরুষ চরিত্রদের আদর্শায়িত করা হয় তাও একভাবে পৌরুষ এবং যৌনতার সম্পর্কে একটি নিয়মাত্মক (normative) বয়ান তৈরি করে। এখানে যে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, জাতিনির্মাতা পুরুষ চরিত্রদের কথা বলা হয়েছে তারা পুরাতন, সংস্কার না হওয়া হিন্দু পুরুষ নন। তাঁরা প্রথাগতভাবে সামাজিক বিশেষাধিকারগুলি জন্মগতভাবে তাঁদের সাবর্ণ পরিচয় থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাননি। বরং এই বিশেষাধিকারগুলি তাঁরা

[১৩৩] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *সীতারাম*, ৮২৮।

আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের নেতৃত্বের স্থানে বসাতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রবণতার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ক্ষমতার সংশোধিত রূপ লক্ষ করেছেন তনিকা সরকার, যা গভীরভাবে একটি আধিপত্যবাদী আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে বলে তাঁর মত।[১৩৪] চন্দ্রিমা চক্রবর্তীও বঙ্কিম যেভাবে কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ হিসেবে নির্মাণ করেছেন, অথবা সেই আদর্শ পুরুষ হয়ে ওঠার জন্য অনুশীলন ধর্মের চর্চাকে আবশ্যক করে তোলার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে আধিপত্যবাদী পৌরুষের আত্মপ্রকাশ লক্ষ করেছেন। একই সাথে বঙ্কিমের রচনায় আধিপত্যবাদী পৌরুষের এই যে চরিত্রটি উত্থাপিত হয় তা চন্দ্রিমা চক্রবর্তী সঠিকভাবেই 'অর্জন অযোগ্য আদর্শ' বলে মনে করছেন।[135] কারণ আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণাটি আদর্শায়িত, বাস্তবজীবনে চর্চিত নয়। একই সাথে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পৌরুষের এই নিয়মাত্মক মডেলটি কখনোই বাস্তবে প্রযুক্ত না হলেও এটাই পৌরুষের একটি আদিকল্প রচনা করে যার মতো হয়ে ওঠার অভিলাষই আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণাটিকে কার্যকারিতা দান করে। পৌরুষের এই নিয়মাত্মক বয়ান তৈরির প্রচেষ্টাই বঙ্কিমের রচনাগুলিকে হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে, যার গুরুত্ব নিয়ে আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পৃথক পৃথক প্রেক্ষিতে আলোচনা করব।

ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যের নীতিমালা

ভারতীয় মধ্যবিত্তের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা, পশ্চিমী আধুনিকতার সাথে তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক এবং জাতির সাংস্কৃতিক কল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকার ফলে আলোচ্য সময়পর্বে তাদের গার্হস্থ্যের অবধারণায় যে বদল আসতে থাকে সেই বিষয়গুলি বিগত দশকগুলিতে ঐতিহাসিকরা বিস্তারিতভাবে উদ্ঘাটন করেছেন।[১৩৬]

---

[১৩৪] Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 176.

[১৩৫] আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণাটি যে "অর্জন অযোগ্য দর্শন" বা "unattainable ideal" তা চন্দ্রিমা চক্রবর্তী কনেলের তত্ত্বায়ন থেকে গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। Chakraborty, *Masculinity, Asceticism, Hinduism : Past and Present Imagining of India,* 51-52.

[১৩৬] Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984); Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*; Walsh, *Domesticity in Colonial India : What Women Learned When Men Gave Them Advice*; Swapna M Banerjee, *Men, Women, and Domestics : Articulating Middle-Class Identity in Colonial Bengal* (New Delhi ; Oxford: Oxford University Press, 2004).

বিশেষত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ যেভাবে গার্হস্থ্যকে জাতিচেতনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে সেই বিষয়টি নারীবাদী ঐতিহাসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন এই প্রসঙ্গে তনিকা সরকারের পর্যবেক্ষণ ইতিপূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে যে ঔপনিবেশিক পরিসরে যেহেতু ঔপনিবেশিত পুরুষরা তাদের স্বাধিকার হারাতে বসেছিল, তাই তারা গার্হস্থ্য সম্পর্কে একটি নৈতিক অবস্থান নিতে শুরু করে যেখানে গার্হস্থ্য এবং পরিবার কল্পিত হয় তাদের একান্ত 'সর্বভৌম পরিসর' হিসেবে।[১৩৭] এই ব্যাখ্যাটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সুদেষ্ণা ব্যানার্জি বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কীভাবে নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতর্কে গৃহস্থালি ও পরিবারের স্তরে জাতিকে কল্পনা করতে গিয়ে সচেতনভাবে গার্হস্থ্যের আদর্শকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়।[১৩৮] এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে গার্হস্থ্যকে কল্পনা করা হয় জাতির *ইনার ডোমেনের* সবচাইতে সুরক্ষিত এবং পবিত্র ক্ষেত্র হিসাবে যেখানে ঔপনিবেশিক পশ্চিমী আধুনিকতা কোনোভাবেই প্রবেশ করতে পারেনি। ফলত নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শ এই পরিসরেই জাতির শুদ্ধতম আধ্যাত্মিক চরিত্রকে সংরক্ষণ এবং প্রতিপালন করা সম্ভব বলে মনে করত। এই গার্হস্থ্য চেতনার মধ্যেই আমরা হিন্দু পিতৃতান্ত্রিক পৌরুষের নিয়ন্ত্রণকামী চরিত্রটিকে মূর্ত হতে দেখতে পাব।

পরিশীলিত এবং তুলনায় লঘু মেজাজে লেখা বটতলার রচনাগুলির মধ্যে সুদেষ্ণা ব্যানার্জি এইক্ষেত্রে সাধারণ মিলের যে স্থানটি লক্ষ করেছেন তা হল গার্হস্থ্য জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনচর্চার একেবারে কেন্দ্রে দেখার প্রবণতা।[১৩৯] এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণাশ্রম প্রথার *রেটরিককে* অনবরত উঁচু জাতির গার্হস্থ্য জীবনচর্যায় প্রত্যক্ষ করতে চাওয়া হয়েছে।[১৪০] বর্ণাশ্রম প্রথার অর্থ এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চার বর্ণের সামাজিক বিভাজনকে অক্ষত রাখা এবং জীবনচক্রের নিয়ম অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস যা উচ্চবর্ণের জন্যই প্রয়োজ্য, তাকে বজায় রাখার তাগিদ। ফলত এই রচনাগুলিতে বহুভাবে উঠে এসেছে গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে একটি সাধারণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করার প্রবণতা। তাই 'নিত্যকর্ম' এবং 'দশকর্ম' পালনের মতো উচ্চবর্ণের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য গার্হস্থ্যের স্থানকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা

---

১৩৭ Sarkar, "Hindu Conjugality and Nationalism in Late Nineteenth Century Bengal," 98.

১৩৮ Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947," PhD Dis*sertation,* 41.

১৩৯ Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology," 52.

১৪০ Ibid., 52.

হয়েছে।[১৪১] গার্হস্থ্যের এই যাথার্থতা এখানে ইহজীবনের সুখ এবং আনন্দের আকাঙ্ক্ষা থেকে একেবারেই দেওয়া হয়নি। বরং একে দেখা হয়েছে পুরুষ বংশানুক্রমিক ধারায় পাপমোচনের পদ্ধতি হিসেবে। গৃহকর্তার এর জন্য প্রয়োজন এক পুরুষ সন্তানের যে নিত্যকর্ম ও দশকর্মের মতো জীবনচক্রের সাথে যুক্ত ধর্মীয় আচারগুলি পালনের মধ্য দিয়ে এই পরিত্রাণের পথকে প্রশস্ত করবে। এই ধরনের নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী রচনাগুলিতে গৃহকর্মকে মনে করা হয়েছে এক অবশ্যপালনীয় কর্তব্য যার মাধ্যমে গৃহকর্তা থেকে জ্ঞাতি, জাত, প্রতিবেশির মধ্যে বিনা বাধায় ছড়িয়ে পড়বে।[১৪২] ফলত এখানে দাম্পত্যকে দেখা হয়েছে মূলত সন্তান উৎপাদন এবং পাপক্ষালনের উপায় হিসাবে। বিবাহ এখানে বিচ্ছেদহীন, পারস্পরিক সম্মতিরহিত এবং প্রাক্-রজস্বলা নারীর সাথেই একমাত্র করা যায়। বিবাহিত নারীর কাছে সেই আধ্যাত্মিক কর্তব্য আশা করা হয় যা পরিবার এবং তার সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে সনাতন সামাজিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করতে পারে। ফলত 'পতিব্রতা'র মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শকে শুধু একজন বিবাহিত নারীর নৈতিক কর্তব্য শিক্ষার জন্য পুনরায় উদ্ভাবন করা হয় না, পরিবারের সকল মেয়েদের আচারগত মর্যাদা এর দ্বারা নির্ধারিত হয়।[১৪৩] ইহলৌকিক আকাঙ্ক্ষার বাইরে গার্হস্থ্য জীবনকে স্থাপন করতে চাওয়ার এই তাড়না থেকেই ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে আমরা নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতর্কে বিকশিত হতে দেখি। ফলত এখানে গার্হস্থ্য জীবনেই 'নিষ্কাম কর্ম' চর্চা করার আশা করা হয়। তাই দাম্পত্য জীবন শুরু হওয়ার পূর্বে সকল প্রকার যৌনাচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয় আর দাম্পত্য যৌনাচারে প্রাথমিক হয়ে ওঠে সন্তান উৎপাদনের প্রসঙ্গটি।

বাঙালির আদর্শ গার্হস্থ্যের কল্পনা করতে গিয়ে তার মধ্যে সমকালীন লেখকরা ব্রহ্মচর্যকে ঠিক কী কী ভাবে নির্মাণ করছিলেন সেই দিকটি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন। যদিও প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে লেখকদের মধ্যে কিছু ধারণাগত তারতম্যও নজরে আসবে। কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তার মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধানের সন্ধান পাওয়াও মুশকিল। চন্দ্রনাথ বসু *হিন্দুত্ব* নামক বইটির ব্রহ্মচর্য পর্বের শুরুতে লিখছেন, "জন্ম হইতে শৈশবের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য বা সংস্কার –

---

[১৪১] Ibid., 52.

[১৪২] মাধবচন্দ্র সান্যাল, "বিবাহ", *গার্হস্থ্য,* চৈত্র, ১৩২২, ৫৪৮-৫৪। বঙ্গদেশে জাতিব্যবস্থার বিন্যাস এবং বৈবাহিক সম্পর্কের বুনিয়াদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য, Ronald B Inden, *Marriage and Rank in Bengali Culture : A History of Caste and Clan in Middle Period Bengal* (Berkeley ; London: University of California Press, 1976).

[১৪৩] Aishika Chakraborty, "'Constant as the Pole Star'? Debates about Marriage in Nineteenth-Century Bengal," *Proceedings of the Indian History Congress* 62 (2001), 169.

জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ প্রভৃতি-দেবোদ্দেশে সম্পন্ন করা হয়, আর শৈশবের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ও অবিচ্ছিন্ন ব্রক্ষ্মচর্য্যের বিধান করা হইয়াছে। ব্রক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে বলিয়া, ব্রক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হওয়া জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া ব্রক্ষ্মচর্য্য আবশ্যক।... তাই জীবনের প্রারম্ভ হইতেই ব্রক্ষ্মচর্য্যের ব্যবস্থা, জীবনের প্রারম্ভ হইতে ব্রক্ষ্মচর্য্য এত আবশ্যক যে শাস্ত্রে পঠদ্দশাই ব্রক্ষ্মচর্য্যাশ্রম বলিয়া অভিহিত।"[১৪৪] আমরা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যাতেও এই ধারণাটিই কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে দেখি। তিনিও গৃহী জীবনকে দেখেছেন ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী হিন্দুচেতনার কেন্দ্রে। নানান নৈতিক সদাচার এবং আচার পালনের মধ্যে দিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার উপরই তিনি জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর বিশ্বাস ছিল গার্হস্থ্য জীবনে নানান নীতিমালার বাহুবেষ্টনীতে আদর্শ ভারতীয় চরিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব যা ইউরোপীয় জীবনশৈলীর চর্চায় নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই নীতিবাক্যগুলি রপ্ত করার মধ্য দিয়ে সংসারবিমুখ হয়েই কেবল এক আদর্শ পুরুষ হয়ে ওঠা সম্ভব বা তা সকলের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক এর কোনোটাই তিনি মনে করতেন না। তাঁর মতে যা 'চির-কৌমার্য্য' সেটি এমন মহৎ এক আদর্শ যা রপ্ত করা সকলের সাধ্যাতীত। বরং তাঁর মনে হয়েছে ইউরোপের বহু মানুষ নাকি সংসারের দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চিরকৌমার্য ব্রত ধারণ করেন যা অভিপ্রেত নয়। বিপরীতে তাঁর মত অনুযায়ী সমাজে কিছু মানুষ আছেন যাঁদের "কামবৃত্তি সহজেই দুর্ব্বলা এবং পরার্থ প্রবণতা বলবতী"[১৪৫] তারাই কৌমার্যব্রত গ্রহণের অধিকারী হন। যদিও এই শ্রেণীর মানুষদের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে তাঁর লেখায় কোনো তৎপরতা দেখা যায় না।

যহিও চিরকৌমার্য নিয়ে ভূদেবের কোনো উৎসাহ না থাকলেও যৌনাচারকে তিনি কখনোই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্য থেকে দেখেননি। বরং গার্হস্থ্য জীবনে সন্তান উৎপাদনই যে যৌন সম্ভোগের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তা ভূদেবের রচনায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি *পারিবারিক প্রবন্ধ*-এ এই মর্মেই কথা বলেছেন যে ঘন ঘন সন্তান উৎপাদনে প্রসূতির শরীর সবল সন্তান উৎপাদনের যোগ্যতা হারায়। তাই এক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ স্বামী ও স্ত্রী যেন তাদের যৌনমিলনকে নিয়ন্ত্রিত রাখেন, যাতে অন্তত তিন/চার বছর পর পর সন্তানের জন্ম হয়। তাহলেই সন্তান সবল শরীরে বৃদ্ধি পেতে পারে।[১৪৬] খুব চমকপ্রদভাবে এই প্রসঙ্গে তিনি অবলীলায় বিস্তারিতভাবে দাম্পত্য প্রণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। *পারিবারিক প্রবন্ধ*-এ ভূদেব বারে বারে সাহচর্যপূর্ণ

---

[১৪৪] চন্দ্রনাথ বসু, *হিন্দুত্ব*, ১৭১।

[১৪৫] ভূদেব মুখপাধ্যায়, *পারিবারিক প্রবন্ধ*, ১৪৭।

[১৪৬] ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঐ, ১১৫-১৮।

বিবাহের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন যা তাঁর ভাষায় পশ্চিমী ধাঁচের জীবনচর্চার প্রতিনিধিত্ব করে। এর বিপরীতে তিনি জোরালোভাবে বাল্যবিবাহের ওকালতি করেন। বাল্যবিবাহকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম যুক্তি বাল্যবধূ অল্প বয়স থেকেই শ্বশুরবাড়িতে থাকতে পারার দৌলতে কম বয়স থেকেই স্বামীর সাথে সখ্যতা তৈরি করার অবকাশ পাবে। গড়ে উঠবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এক দাম্পত্য প্রণয়। এই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা প্রণয় শুধু গৃহের সুখশান্তিই স্থাপন করবে না। এই গভীর প্রণয় হেতু যে যৌনসম্ভোগ সম্ভব তার থেকেই একমাত্র সুস্থ সন্তানের জন্ম সম্ভব। ভূদেবের এই ব্যাখ্যাগুলি যৌনতা সম্পর্কে নব্য-ব্রহ্মণ্যবাদীদের স্বতন্ত্র বয়ানগুলিকেই তুলে ধরে, যে বিষয়ে আমরা পরের অংশে বিস্তারিত আলোচনা করব।

গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম নামক প্রবন্ধের জনৈক লেখক বিধুভূষণ গুহরায় তাই লেখেন,

> ...সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া উদাসীন হইতে হইবে, গার্হস্থ্যধর্ম্মতত্ত্বের সেরূপ তাৎপর্য বুঝিতে হইবে না। সংসারে বাস করিয়া তাহাতে একান্ত আসক্ত হইতে হইবে না; কেবল মাত্র দেহকে সংসার পাশে আবদ্ধ রাখিয়া মনকে সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপাশে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই পরমপিতা পরমেশ্বরের নির্দেশানুসারে কাজ করা হইল এবং তাহাই ধর্ম্মাচারণের প্রকৃত উপায়। ... দেহ যদিও বিনশ্বর, তথাপি মনের বাসভবন, অতএব সাধ্যমত দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া যত দিন তাহাকে সুস্থভাবে রাখা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ ভাবে সংসারক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, দেহান্তে অবিনশ্বর আত্মাও উন্নতিলাভ করিবে।[১৪৭]

ডাক্তারি পেশায় যুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী আদর্শ হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনের আবশ্যিকতাকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তার মধ্যেই ধর্মরক্ষার জন্য কামের অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন করার তাগিদ বিস্তারিতভাবে প্রকট হয়। *অনুশীলন এবং গার্হস্থ্য আশ্রম* শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "হিন্দু সমাজের পরিণীতা স্ত্রীকে 'গৃহ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; কেননা, সংসারাশ্রমের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে গেলে বিবাহসংস্কার দ্বারা প্রথম দীক্ষিত হইতে হয়। এক্ষণে বিচার্য্য যে, সংসার বা গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম্মসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম (কামনা), মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থসিদ্ধির সাধনাই মানবের প্রধান ব্রত স্থির করিয়া আর্য্য ঋষিগণ বহুকাল হইতে জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন যে, গার্হস্থ্যাশ্রম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমে থাকা মনুষ্য এই চারি প্রকার পুরুষার্থের সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না এবং অন্য কোন আশ্রমের কর্ম্মক্ষেত্রে মনোবৃত্তি সকলের সাম্যভাবে অনুশীলন করিতে কেহ কখনোও সমর্থ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, গার্হস্থ্য আশ্রমের কার্য্য, সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই মানবের

---

[১৪৭] বিধুভূষণ গুহরায়, "গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম," *জন্মভূমি*, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮, ২৭৪-৭৫।

মুখ্য সাধন"।[১৪৮] কিন্তু গৃহীজীবনে পরলোকের উদ্দেশে স্ত্রী-পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক 'কর্তব্য'গুলি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে গেলে যে বাধাটি সামনে আসে তাকে লেখক ষড়রিপু বলে চিহ্নিত করছেন যার অন্যতম কামবৃত্তি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে যে অর্থে পাশববৃত্তির উল্লেখ করেছিলেন তিনিও সেই একইভাবে একে পাশববৃত্তি পদবাচ্য মনে করছেন। আর দয়া, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কর্তব্যজ্ঞানকে তিনি উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি বা ধর্ম বলছেন। ঠিক বঙ্কিমের মতোই তিনিও পাশবিক প্রবৃত্তি এবং উচ্চশ্রেণীর বৃত্তির মধ্যে 'সামঞ্জস্য' তৈরির কথা বলছেন যাতে ধর্ম রক্ষিত হয়। তাঁর ভাষায়,

> আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, আদি যে সমস্ত বৃত্তিকে পণ্ডিতেরা পশুবৃত্তি বলিয়া নিন্দা করিয়া অধর্ম্মের বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা সংসারাশ্রমী বা গৃহী সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিলে তিনি গৃহাশ্রমের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম (Duty) কখনো প্রতিপালন করিতে সক্ষম হন না, অথবা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না...সংসার ক্ষেত্রে মনোবৃত্তিগুলির অনুশীলন না করিলে অর্থাৎ প্রবৃত্তিধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে কখনো নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া যোগাদি নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা হইতে পারে না। অতএব সংসার আশ্রমে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন করিতে হইবেই হইবে।[১৪৯]

অর্থাৎ এখানে প্রিয়নাথ ধর্মকে কর্তব্য বলে বোঝাতে চাইছেন, যে গার্হস্থ্য কর্তব্য আদতে এক পারলৌকিক আধ্যাত্মিক কর্তব্য যাকে ইহজীবনের সুখের জন্য চর্চা করা উচিত নয়। এখানেই চলে আসে নিষ্কাম ধর্মের উল্লেখ। যে নিষ্কাম যৌনাচারের উদ্দেশ্যই হল সন্তান উৎপাদন, যে সন্তান নিত্যকর্ম এবং দশকর্ম আচারগুলি পালনের মধ্য দিয়ে পিতা, এবং বংশের পারলৌকিক জীবনকে সুনিশ্চিত করবে।

এই আলোচনাগুলি থেকে বোঝা যায় সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যাতীত যৌনসম্ভোগে বিরত থাকার বিধিকেই দাম্পত্য জীবনের ব্রহ্মচর্য বলে বেশিরভাগ লেখক চিহ্নিত করতে চেয়েছেন যার কথা ভূদেবও একভাবে বলতে চেয়েছেন তাঁর পারিবারিক প্রবন্ধে। বিশেষত নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তার চৌহদ্দির মধ্যে থাকা বেশিরভাগ লেখকই আমজনতাকে চিরকালীন ব্রহ্মচর্যের পরামর্শ দেননি। এর ব্যতিক্রম খুবই কম ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যেমন ব্রহ্মচর্য বা চিরকৌমার্যকে কঠিন কিন্তু অভিষ্ট ব্রত হিসেবে দেখেছেন কিছু লেখক।[১৫০] কিন্তু এর সংখ্যা খুবই কম। এমনকী অনেক লেখক পাঠকদের এই বিষয়েও সচেতন করতে চেয়েছেন যে বালকদের ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা

---

[১৪৮] প্রিয়নাথ নন্দী, "অনুশীলন এবং গার্হস্থ্য আশ্রম," *জন্মভূমি*, আশ্বিন, ১৩১৩, ১০১।

[১৪৯] প্রিয়নাথ নন্দী, ঐ, ১০৩।

[১৫০] এমন একটি উদাহরণ *হিন্দু* পত্রিকার একটি প্রবন্ধ, "উপায় কি নাই? ব্রহ্মচারী আশ্রম"। এই প্রবন্ধের জনৈক লেখক জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে কিছু মানুষের বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য পালন জরুরি মনে করছেন। "উপায় কি নাই? ব্রহ্মচারী আশ্রম," *হিন্দু পত্রিকা*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩, ৪০-৪৪।

দেওয়া মানেই সে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করবে না। বরং এই ধারণাটি ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে তৈরি হয়।[১৫১] ফলত সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রে পাঠরত ছাত্র-কিশোর-যুবকদের সার্বিক ব্রহ্মচর্য আর বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে আংশিক ব্রহ্মচর্যের নিদান দিতেই দেখা গেছে এঁদের।

আলোচ্য প্রেক্ষিতে পরিবারে অবিবাহিত পুরুষ সন্তানদের যৌনজীবন এবং পৌরুষের প্রসঙ্গে তৈরি হওয়া উদ্বেগের প্রশ্নটিকে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিষয়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। দাম্পত্য জীবনকে আদর্শায়িত করার পাশাপাশি পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যদের নিষ্কাম কর্মের আদর্শে শিক্ষিত করে তোলার তাগিদ আলোচ্য প্রতর্কের সর্বত্র বর্তমান। ইতিপূর্বেই আমরা চন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি যেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন ছাত্রজীবনকে শাস্ত্রকাররা ব্রহ্মচর্য আশ্রম হিসেবে নির্বাচন করেছেন যাতে ব্রহ্মচর্যের পাঠ সে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে আমৃত্যু সে অভ্যাস বহন করতে সক্ষম হন। মূলত পরিবারে ছাত্র-কিশোর-যুব সদস্যদের শরীর গঠন এবং পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি যাতে সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু দুজনেই বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন।[১৫২] ফলত গার্হস্থ্যের যে নীতিমালাগুলি এঁরা তৈরি করে দিতে চেয়েছিলেন তা পরিবারের অবিবাহিত ছাত্র-কিশোর-যুব এবং সদ্য বিবাহিত দম্পতির উপর বিশেষ করে কেন্দ্রিভূত হতে দেখা যায়। বহু গ্রন্থে পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যের অভিভাবকদের পাঠ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে তাঁরা সন্তানদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সফল হতে পারেন। যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ পুত্রের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে লিখছেন,

> যদি পুত্র চাহিতে হয় তবে একটী সুপুত্র কামনা করিয়া সংযম কর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। পুত্র প্রকৃত পুত্র হউক, এবং তোমাদের বংশ ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল করুক। অথবা তোমাদের যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে যাহাদের মঙ্গল তোমাদের করে বিধাতা কর্তৃক ন্যস্ত তোমাদের সেই সমুদয় বালক বালিকাগণের প্রকৃত মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও। যদি তোমরা বংশের কল্যাণ চাও ত এই কর। যদি তোমাদের দেশের কল্যাণ চাও ত এই কর। যদি তোমাদের জাতির কল্যাণ চাও ত তোমাদের সন্তানণকে ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ কর। নতুবা তোমরা তোমাদের বংশ, জাতি, সমাজ ও দেশের নিকট দুরপনেয় অপরাধে অপরাধী হইবে।[১৫৩]

আদিশ্বর ভট্টাচার্যও সন্তানদের অবিভাবকদের উদ্দেশে লিখছেন,

---

[১৫১] আদীশ্বর ভট্টাচার্য, *ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তার প্রতিকার*, ৫।

[১৫২] চন্দ্রনাথ বসু, *হিন্দুত্ব*, ১৭৮-৮১; ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *আচার প্রবন্ধ*, ১-৯।

[১৫৩] যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, *ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও যুবকগণের নৈতিক বিধানার্থ*, ১০-১১।

> একটু বয়স হলেই অর্থাৎ ১৪ বৎসরের কাছাকাছি হলেই ছেলেকে ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে শিক্ষা দাও। লজ্জা কর না। অনেকে মনে করেন – তারা ছেলেমানুষ, ব্রহ্মচর্যের কথা স্পষ্ট করে বললে তারা যাহা জানিতনা তাহাও জানিবে। এটা ভ্রান্ত ধারণা।[১৫৪]

আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের কল্পনার কেন্দ্রে ব্রহ্মচর্যকে এইভাবে স্থান দেওয়ার প্রবণতার মধ্যে আমরা এইক্ষেত্রে হিন্দু ব্রহ্মণ্যবাদী পিতৃতান্ত্রিকতাকে যেভাবে ক্রিয়া করতে দেখি সেখানে লিঙ্গের পাশাপাশি প্রজন্মের প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব এইক্ষেত্রে লিঙ্গ এবং প্রজন্মগত ভিন্নতার নিরিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবারে মেয়েদের পাশাপাশি কনিষ্ঠ বালক-কিশোর-যুবকদের প্রতিও পিতৃতান্ত্রিক বিসমনিয়মাত্মক (heteronormative) বিধি আরোপিত হয় ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়ে। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণকে আমরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক সহবাস সম্মতির আইন তৈরির প্রতিরোধে তৈরি হওয়া হিন্দু পুরুষালি নিয়ন্ত্রণের ধাঁচ হিসেবে দেখতে পারি। যেটা একাধারে আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক, ফলত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় আইনি প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক বিকল্প 'দেশীয় পৌরুষের' দর্শন এই প্রকল্পকে প্রাসঙ্গিকতা প্রদান করে। এটি ব্রাহ্মণ্যবাদী, পিতৃতান্ত্রিক এবং আধিপত্যবাদী একটি বিকল্প পৌরুষের দর্শন যা বিবাহিত দম্পতি এবং ছাত্র-কিশোর-যুবকদের নিয়মবদ্ধ করে একটি বিকল্প পৌরুষের ভাষ্য তৈরি করতে চায়। যৌনাচার এই পৌরুষের কাছে মূলত সুস্থ সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। ফলত যৌনাচারেরও আমরা একটি স্বতন্ত্র ভাষ্য এখানে খুঁজে পেতে পারি যে বিষয়ে আমরা পরের অংশে আলোচনা করব।

নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্দর্ভে যৌনতা এবং অনুশাসন

যৌনতা নিয়ে ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ বাঙালি জনপরিসরের আলোচনাকে একভাবে প্রভাবিত করেছিল এই বিষয়ে ঐতিহাসিকরা প্রায় একমত।[১৫৫] শুধু প্রতর্কের স্তরে নয়, তা শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তর জীবনচর্চাতেও যে বিশেষ দাগ কাটে তা সমকালীন বাঙালি বিদ্বৎসমাজের অনেকের রচনাতেই ধরা পড়ে।[১৫৬] বিশেষত ব্রাহ্ম এবং সংস্কারবাদী হিন্দু পরিসরে এই অতিশালীন চিন্তাধারার প্রতি ঝোঁক সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। যদিও এর

---

[১৫৪] আদীশ্বর ভট্টাচার্য, *ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তার প্রতিকার*, কলকাতা, ১৩২২, ১৫।

[১৫৫] এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Sumanta Banerjee, "Bogey of the Bawdy: Changing Concept of 'Obscenity' in 19th Century Bengali Culture," *Economic and Political Weekly* 22, no. 29 (1987): 1197–1206.

[১৫৬] এক্ষেত্রে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে রচিত দুজন গুরুত্বপূর্ন বাঙালি ব্যক্তিত্ব শিবনাথ শাস্ত্রী এবং নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে তাঁরা এই অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত* (দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, ২০১৫ খ্রি.); Nirad C. Chaudhuri, *The Autobiography of an Unknown Indian* (Berkeley: University of California Press, 1968).

মানে এমন নয় যে ব্যক্তিবিশেষে এর তারতম্য ছিল না। চিন্তার বহু ক্ষেত্রেই অধিক্রমণও লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে রক্ষণশীল এবং সংস্কারবাদী বহু ব্যক্তিত্বের চিন্তার ক্ষেত্রে এমন নানান লক্ষণ লক্ষ করা যায় যা থেকে বোঝা যায় দুটি গোষ্ঠীকে এমন দুটি পৃথক বন্ধনীতে ভাগ করা খুবই যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়। ফলত এই বিষয়টিকে স্মরণে রেখে যদি আমরা ভিক্টোরীয় অতিশালীনতাসম্পন্ন মূল্যবোধের পরিগ্রহণের (reception) দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী পরিসরে তার কিছু বিশেষ চরিত্র নজরে আসবে। বিশেষত সন্তান প্রজনন এবং তার উদ্দেশ্যে আলোচিত যৌনাচারের বিধি, মেয়েদের যৌনবাসনা এবং তা নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী, গর্ভাধানের মতো সমকালে বহুল আলোচিত বিষয়টি অথবা পুরুষ ও নারীর নানান যৌনব্যাধি ও ব্রহ্মচর্যচর্চার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠায় তৎপর আলোচনাগুলির দিকে যদি নজর ফেরানো যায় তাহলে এটা বোঝা সম্ভব যে নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী বয়ানে যৌনতার নিয়ন্ত্রণের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি বিকশিত হয় যেখানে ভিক্টোরীয় নৈতিক মাপদণ্ডগুলি নির্বাচিতভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মেয়েদের সহবাস সম্মতির বয়স নির্ধারণের জন্য আইনি বিধি প্রবর্তনকে ঘিরে যখন বিতর্ক শুরু হয় তখন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ এই বিলটির বিরোধিতা করে অসংখ্য লেখালিখি করে। এক্ষেত্রে রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলি সামনে আনে শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিতে নির্ধারিত গর্ভাধান সংক্রান্ত যুক্তিটি। আলোচ্য সময়পর্বে এই গর্ভাধানকে ঘিরে শুধু *বেদব্যাস, জন্মভূমি*-র মতো পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির দিকে যদি আমরা নজর ফেরাই তাহলে মেয়েদের যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই গোষ্ঠীর লেখকদের মনোভাব বুঝতে পারার পাশাপাশি আমরা জনপরিসরে যৌনতা নিয়ে আলোচনার এক পৃথক ধারাকে লক্ষ করতে পারব। প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন এর মধ্যে কোনোভাবেই মেয়েদের যৌনতার *এজেন্সি* তৈরির সম্ভাবনা চোখে পড়ে না। বরং এই আলোচনার সার্বিক উদ্দেশ্য নারী এবং ছাত্র-কিশোর-যুবকদের যৌনাচারের উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির প্রয়াস থেকে জাত। কিন্তু এই আলোচনাগুলিতে জনপরিসরে অবলীলায় যৌনাচার, যৌন অভ্যাস ও যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা হতে দেখি যা ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের ধারণা থেকে কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের।

জন্মভূমি পত্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে "হিন্দুর গর্ভাধান" নামক প্রবন্ধ লেখেন গোপালচন্দ্র স্মৃতিভূষণ। গর্ভাধানকে এখানে জাতনির্ভর আচার হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে হিন্দু পুরুষের সাবর্ণ অস্তিত্বটিকে জীবিত রাখা সম্ভব বলে তাঁর মত। এই আলোচনাটি তিনি যেভাবে উত্থাপন করেন তার ধরন বুঝে নিতে তাঁর প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক। গোপালচন্দ্র লিখছেন,

...শুক্রশোণিত সম্ভব সন্তানের গর্ভবাস অবস্থায় দেহ, মন ও আত্মা অবিশুদ্ধ থাকে, দশবিধ সংস্কার দ্বারা সেই সকল দোষ সংস্কৃত হয় বলিয়া, উহার নাম সংস্কার। ... গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা সন্তানের দেহ, মন ও আত্মা, এমনকী অভ্যন্তরীণ বৃত্তিগুলিও বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন – "এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভ সমুদ্ভবং"। ... দশবিধ সংস্কারের মধ্যে আদিম সংস্কার গর্ভাধান। ইহা পিতৃ কর্তব্য হইলেও ইহাদ্বারা পুত্রের দেহাদি বিশুদ্ধ হয়, এজন্য ইহা পুত্রের সংস্কার বলিয়াই গণ্য। ... পিতামাতার বীজ দোষ, জীবের অদৃষ্ট দোষ, কাল দোষ ও মাতার আহার বিহার দোষ, এই সমুদয় কারণে প্রাণিগণের অবয়ব বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি জন্মে।...এরূপ অবস্থায় বীজের অর্থৎ শুক্রশোণিতের পরিশুদ্ধি সর্ব্বতভাবে আবশ্যক। স্ত্রীপুরুষের শরীর যেরূপ ভাবাপন্ন থাকে, শুক্রশোণিতেরও সেইরূপ ভাব অবশ্যম্ভাবী।[১৫৭]

পুত্রসন্তান লাভের জন্য লেখক যৌনমিলনের সময় তিনটি আবশ্যিক আচারের পরামর্শ দেন-- উপবাস, দেবপূজা, যোনিস্পর্শ। 'যোনিস্পর্শ' অংশে লেখক বলছেন,

রজস্বলা, রুগ্না, বিশেষতঃ যোনিরোগাক্রান্তা, বয়োজ্যেষ্ঠা, কামোদ্রেক বিহীনা, মলিনদেহ বিশিষ্টা, এবং গর্ভবতী স্ত্রীরমণে নানাবিধ গর্ভদোষ হইয়া থাকে। ... যদি পিতামাতা মন্দবীজ, বা অল্পবীজ বিশিষ্ট, দুর্ব্বল, বা অহর্ষ, মৈথুনে যাহাদের হর্ষ নাই হয়, তবে তাহাদের পুত্র নরষন্ড ও কন্যা নারীষন্ড হয়। মাতার মৈথুনে অনিচ্ছায় অথবা পিতার বীর্য্যের দৌর্ব্বল্য বশতঃ বক্রীসন্তান জন্মিয়া থাকে। ... মৈথুনে উভয়ের সমভাবে স্পৃহা না হইলে, যখন সন্তান বিকলাঙ্গ হয়, ইহা প্রমাণিত হইল, তখন যেরূপ হয় উহা সাধন করা আবশ্যক এই বিবেচনায় এই বিষম লজ্জাকর যোনিস্পর্শ বিধি, গর্ভাধান সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখন পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পুরুষ কর্ত্তৃক যেমন স্ত্রীযোনি স্পর্শ শাস্ত্রবিহিত, সেইরূপ স্ত্রী কর্ত্তৃক পুংদেহ স্পর্শ শাস্ত্রসম্মত হইল না কেন? ইহার উত্তর এই যে, একের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে উভয়ের পক্ষে বিধানের আবশ্যকতা নাই। তবে এরূপ জিজ্ঞাসা অসংগত নহে যে, যদি দুজনের মধ্যে একজনের দ্বারাই স্পর্শে কার্য্য সমাধা হয়, তাহা হইলে পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীযোনিস্পর্শ বিধি প্রচলিত না হইয়া স্ত্রী কর্তৃক পুংদেহ স্পর্শ বিধি প্রচলনে কি আপত্তি ছিল? ইহার কারণ বোধ হয় স্ত্রীগণ সমধিক লজ্জাবতী বলিয়া, আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাদিগকে এই লজ্জাকর কার্য্য হইতে অবসর দিয়াছেন।[১৫৮]

গোপালচন্দ্রের প্রবন্ধ গর্ভাধানের আবশ্যকতা চিহ্নিত করে লেখা অসংখ্য রচনাগুলির প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে রজস্বলা হওয়ার পূর্বেই মেয়েদের বিয়ে দাওয়ার রীতির সপক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল। এই লেখাগুলি পড়লেই বোঝা যায় মেয়েদের যৌন শুচিতাকে সুনিশ্চিত করা এবং এক পুরুষ সন্তানের অভীপ্সাই লেখকদের মূল চিন্তার বিষয়। কিন্তু একই সাথে যেভাবে যৌনসম্ভোগ এবং প্রবৃত্তিগুলি সম্পর্কে লেখকরা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আলোচনার পরিসর তৈরি করছিলেন তার উদাহরণ সমকালীন অন্য কোনো ধরনের রচনায় লক্ষ করা যায় না।

---

[১৫৭] গোপালচন্দ্র স্মৃতিভূষণ, "হিন্দুর গর্ভাধান," *জন্মভূমি,* কার্তিক, ১৩০৮, ৯৭-১০০।

[১৫৮] গোপালচন্দ্র স্মৃতিভূষণ, ঐ, ১০৩-১০৪।

এই রচনাগুলির ধরনে সেক্ষেত্রে তাই কিছু অনন্যতাকেও চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, এই রচনাগুলিতে নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী জাত এবং লিঙ্গগত সিদ্ধান্তগুলিকে মান্যতা দিতে একটি নৈতিক মানদণ্ড অবশ্যই বর্তমান থাকতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, যৌনতা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে লেখকরা বিষয়টি শালীন না অশালীন এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে না গেলেও, একই সাথে শালীনতার গণ্ডিকে এঁরা নিজেদের আলোচনার মধ্য দিয়েই সম্প্রসারিত করেছেন। বিশেষত জনস্বাস্থ্যের, যৌনস্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে তাঁরা যৌনাচারের প্রশ্নগুলিকে জনপরিসরে আনতে থাকেন। যদিও বিধবা, অবিবাহিতা কিশোরী এবং অবিবাহিত ছাত্র-কিশোর-যুবকদের যৌনজীবনকে অনুশাসনে রক্ষার ক্ষেত্রে এখানে কোনো সমঝোতার প্রশ্নকেই প্রশ্রয় দেননি তাঁরা। আর চিত্তাকর্ষকভাবে বিধবার যৌনবাসনার বিষয়টিকে এখানে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে শুধু সাত্ত্বিক আহার এবং জীবনযাপনের নানা শৃঙ্খলার নিদান দিয়ে। কিন্তু অবিবাহিত কিশোর, যুবকদের যৌনাচার অনুচিত মনে করলেও পাতার পর পাতা তাদের সেই যৌন অভ্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাকে নিয়মবদ্ধ করার চেষ্টা চলেছে এবং সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিবাহিত জীবনে সুস্থ পুত্রসন্তান লাভের জন্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে রতিক্রীড়ার নানা পদ্ধতি।

আদীশ্বর ভট্টাচার্যের *ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও প্রতিকার* শিরোনামে বইটির কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। বইটির ভূমিকার একেবারে প্রথম পংক্তিতে আদীশ্বর পাঠকদের কাছে নিজের বই সম্পর্কে গৌরচন্দ্রিকা করতে গিয়ে লেখেন,

> দেশের ছাত্রগণের হিতকামনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিয়াছি। তাহাদিগকে ও তাহাদের অবিভাবকদিগকে উদ্দেশ্যকরিয়া যদি কোনো অপ্রিয় সত্যর অবতারণা করিয়া থাকি, তবে তাঁহারা আমার প্রতি বিরূপ হইবার পূর্ব্বে যেন আমার সদভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ করেন।[১৫৯]

ফলত আদীশ্বরের এই বইটি একেবারেই ছাত্র-কিশোর-যুব সম্প্রদায়ের যৌন অভ্যাসগুলি থেকে তাদের বিরত করার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। ছাত্রদের নৈতিক অবস্থার হাল হকিকত দিতে গিয়ে আদীশ্বর যে বিশদ বর্ণনা দিচ্ছেন তার কিছুটা নমুনা হাজির করলে এই ধরনের বই সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব।

> অনেক বাড়ীতে আবার দম্পতিযুগলের চালচলন ও কথাবার্ত্তাই কুরুচিপূর্ণ। উপন্যাস ছাড়া এঁদের পড়বার বই আর কিছু নাই – প্রেম-সঙ্গীত এঁদের বড় প্রীয়, বাড়িতে ছবি টাঙ্গান – তাও অর্ধ উলঙ্গ বিলাতী রমণীর...অনেক অবিভাবক আবার পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি করেন।

---

[১৫৯] আদীশ্বর ভট্টাচার্য, *ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তার প্রতিকার*, কলকাতা, ১৩২২, ভূমিকা।

তারপর বাপমা বা অবিভাবক ভালই হউন বা মন্দই হউন, ছেলেদের চরিত্রগঠনের দিকে তাঁদের মোটেই লক্ষ নেই। তারা বাড়ির চাকরের সঙ্গে থাকে, পাড়ার বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে মিশে, গৃহশিক্ষক বা স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গগুণে হস্তমৈথুন শিক্ষা করে। বর্তমান স্কুল গুলিতে ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়না...তার পর আছে কুৎসিত উপন্যাস। তাতে স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা, স্ত্রীপুরুষের অনুরাগ, চুম্বন, প্রেম, বিবাহ, আরও কতকি।[১৬০]

স্কুলে ছোট ছোট ছেলেরা বার বৎসর বয়স থেকেই বীর্যনষ্ট করিতে আরম্ভ করেছে। পাঁচটা ছেলে একত্র হলেই সচরাচর অশালীন বিষয়েই আলোচনা হয়ে থাকে। অনেক বালক হস্তমৈথুন দ্বারা প্রত্যহ আত্মহত্যা করিয়া থাকে। অনেকে পুংমৈথুনে অভ্যস্ত। যে সব ছেলে দেখতে একটু সুশ্রী তাদের সর্ব্বনাশ। কামান্ধ বয়স্ক ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে – সুবিধা পেলেই তাদের মাথা খাবে। ... পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ স্কুলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়মিত দল আছে – যেগুলি Friendship Club বা বন্ধুত্বের দল নামে পরিচিত। ... তাদের বন্ধুত্ব অর্থে আর কিছু না – পরস্পরের দ্বারা স্ত্রীলোকের অভাবটা পূরণ করা। ... এতদ্ব্যতীত আরও বহু শিক্ষক নামের অযোগ্য শিক্ষক আছে – তারা যদিও বিবাহিত, তবু পশু প্রবৃত্তি এত বেশি যে ছোট ছোট সুন্দর ছাত্র দেখলেই তাদের সর্ব্বনাশ করেন। ছেলেরা এই মাস্টারদের নাম রেখেছে Boy-hunter বা ছেলে শিকারী।[১৬১]

অবশেষে লেখক এহেন 'বিপথগামী' বালক যুবকদের জন্য ব্রহ্মচর্য বিষয়ক বই পড়ানোর পরামর্শ দেন তাদের অবিভাবকদের। আর অন্তিমে জুড়ে দেন নানা মুনি ঋষিদের বাতলে দেওয়া 'বীর্যধারণের' পন্থা, ব্যায়াম, জিমনাস্টিক, যোগাসনাদির তালিকা এবং আমেরিকা ইউরোপের ডাক্তারদের এই বিষয়ে নানান টিকা টিপ্পনি। এখানে লক্ষ করার মতো বিষয় হল হস্তমৈথুন, পায়ুকাম ইত্যাদি সম্পর্কে এই লেখকরা একটি স্পষ্ট অতিশালীন অবস্থান অবশ্যই নিচ্ছেন। কিন্তু একই সাথে বিবাহিত জীবনে যৌনসম্ভোগ, ছাত্রজীবনের নানা যৌন অভিজ্ঞতা এমনকী সমকামী অভ্যাসগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনাকেও স্থান দিচ্ছেন এক নৈতিক উত্তরণের অভিপ্রায় থেকে। এমন এক লেখক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। কালীপ্রসন্ন মূলত আদর্শ হিন্দু জীবনের দৈনন্দিন নীতিমালা বাতলে দিতে বহু সস্তাদামের বই রচনা করেছিলেন আলোচ্য সময়ে।[162] একাধারে তিনি লিখে গেছেন বেশ কিছু গুপ্তকথার সিরিজ। তার এহেন অজস্র রচনার মধ্যে একটি হল *সংসার তরু বা শান্তি-কুঞ্জ* । সাংসারিক প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর এই বইটিতে স্থান পেয়েছে। পারিবারিক বিধি,

---

[১৬০] আদীশ্বর ভট্টাচার্য, ঐ, ১২-১৩।

[১৬১] ঐ, ৭-৮।

[১৬২] কালিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সমাজ, গার্হস্থ্য জীবন এবং ধর্মমূলক অসংখ্য বই রচনা করেন তার মধ্যে কয়েকটি হল, *কাণাকড়ি*, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ; *ধর্ম্ম প্রচার*, ১২৯৩; *ভবানী-ঠাকুর*, ১২৯৭; *সর্ব্বাণী*, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, *সংসার কোষ*, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ ; *সুখের সংসার*, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ ইত্যাদি।

নানাবিধ রোগ, তার চিকিৎসা, সন্তান পালন থেকে স্ত্রী-পুরুষের পালনীয় ব্রত ও তার নিয়মাবলী, জ্যোতিষ বিদ্যা থেকে প্রেততত্ত্ব, ধর্মের ব্যাখ্যা থেকে তীর্থযাত্রার নিয়মাবলী সবকিছুকেই তিনি একটি বইতে স্থান দিতে চেয়েছেন। এমনই একটি বিষয় "ইন্দ্রিয় পরিচালন" নামক অংশে তিনি গার্হস্থ্য দম্পতির যৌনসম্ভোগের নিয়মাবলীর তালিকা দিয়েছেন। অবশ্যই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য সুস্থ সন্তান উৎপাদনের প্রয়াস। তিনি সন্তান উৎপাদনের জন্য পাঠককে যে পরামর্শ দিচ্ছেন তা এইরূপ,

> রমণী প্রশান্ত মনে স্বামীসম্ভাষণ এবং কামভাবে নিরীক্ষণ করিবেন। হাব ভাবাদি যাহাতে কামঋপু সমুত্তেজিত হয়, সেই সকল কার্য্য পরস্পরেই অনুসরণ করিবেন। রমণী সরল শরীরে সমান থাকিবেন। এইরূপ নিয়মের অনুসরণ করিলে বন্ধ্যা অবশ্যই পুত্রবতী হইবেন, ইহাতে কোন ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা থাকিবে না।[১৬৩]

সপ্তাহে কতদিন অন্তর দম্পতি সম্ভোগে লিপ্ত হতে পারেন, কতটা বীর্য স্খলনেও শরীর সুস্থ থাকে, কোন জাতীয় মানুষের ক্ষেত্রে কতবার সম্ভোগ বাঞ্ছনীয় এসব বিষয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন খোলামেলাভাবে। কিন্তু এই বিষয়গুলি উত্থাপন করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতার কথাও লিখছেন তিনি। যেমন,

> এই সমস্ত কার্য্য ঘৃণিত হইলেও সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য ইহাতে নির্ভর করিতেছে, এই জন্য ইহাতে সকলের সবিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পুত্রলাভার্থ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান অপেক্ষা এ সকলের সাম্যক জ্ঞানে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা। প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ নিতান্তই অসম্ভব এবং সেই বিষয়ক চেষ্টাও নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। পূর্ব্বে এই বিষয়ে গুরু স্বয়ং শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, বেদ, বেদান্তাদি পাঠ শেষ হইলে ছাত্র পরিশেষে "রতি শাস্ত্র" অধ্যয়ন করিয়া সংসারী হইতেন, কিন্তু এখন সে দিনকাল গিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বে সে সকল শাস্ত্র লুপ্ত প্রায়। ইংরাজীতে এ সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ আছে, অনেক কেলেঙ্কারী হইতেছে, কিন্তু ইংরাজলীলাক্ষেত্র ভারতে সে সকল কথা মুখ ফুটিয়া বলে কে?[১৬৪]

এখানে এসেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ভিক্টোরীয় অতীশালীনতাকে সকলেই একভাবে পরিগ্রহণ করেননি। এমনকী সমাজের একাংশের বিবর্ধমান অতিশালীনতা বোধ কিন্তু জনপরিসরে যৌনতা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে এই বোধটি অনেকেই উপলব্ধি করছিলেন। আর এর পাশাপাশি অন্তত একটা অংশে এই শালীনতাবোধের সীমাটিকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াসও অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য নিয়ে ভাবিত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যজ্ঞ, ডাক্তার, আয়ুর্বেদ বিশারদ পণ্ডিতরা এই উপযোগিতাগুলি বারে বারে অনুভব করেছেন।

---

[১৬৩] কালিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, *সংসার তরু বা শান্তি-কুঞ্জ*, ১৯০০, ৫৯।

[১৬৪] কালিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়,ঐ, ৫৩।

তারা যৌনস্বাস্থ্য নিয়ে জনপরিসরে ব্যাপকভাবে আলোচনা এবং লেখালেখিও করেছেন যে বিষয়টি আমাদের সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

বর্তমান রচনাগুলির নিরিখে এটি অনুধাবন করা সম্ভব যে পশ্চিমী মূল্যবোধসঞ্জাত নীতিবোধগুলি দেশীয় সমাজকে আহরণ করতে দেখা গেলেও সেখানে ধারণার আমদানি সর্বত্র একই মাত্রায় ঘটেনি। গ্রহণ বর্জনের প্রক্রিয়াটি সেখানে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অব্যাহত থেকেছে। বিশেষ করে নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলির সাথে সমঝোতা এবং গ্রহণ বর্জনের প্রক্রিয়া অনেক সময়ই ভিন্ন চেতনার জন্ম দিয়েছে। যৌনতা নিয়ে উপরিউক্ত বয়ানগুলি তারই লক্ষণ বহন করে। ফলত এখানে যৌনতার সন্দর্ভের মধ্যে এক ধরনের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়, যা সুস্থ হিন্দু পুরুষ সন্তানের প্রজননকেই যৌনাচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত করে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য থেকেই এই লেখকরা যৌনতা নিয়ে জনপরিসরে আলোচনার পরিসরকে সম্প্রসারিত করার পক্ষপাতী। যৌনাচারের উপর নিয়ন্ত্রণ এখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর সেই উদ্দেশ্যেই যৌনক্রিয়া নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব পেতে থাকে।

উপসংহার

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বলশালী হওয়া সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের যে ধারাটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম, তা জনপরিসরে পৌরুষ এবং পুরুষের যৌন নৈতিকতা সম্পর্কে তৈরি হতে থাকা সন্দর্ভকে অনুধাবন করার ব্যাপারে আমাদের কাছে কিছু সূত্র হাজির করে। এই পৌরুষের ভাবমূর্তি এমন একটি বিশ্বদর্শনের উপর ভর করে বিকশিত হয়, যেখানে আমরা জাতিচেতনার কেন্দ্র হয়ে উঠতে দেখি এক আদর্শ গার্হস্থ্যের কল্পনাকে। আমরা এই বিষয়টিও লক্ষ করেছি যে এক নির্দিষ্ট ধাঁচের আধ্যাত্মিকতা বোধ, যা হিন্দু পুনরুত্থানবাদ থেকে তার আদর্শগত অনুপ্রেরণা পেয়েছিল, তা এই গার্হস্থ্যের কল্পনাকে আকার দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এহেন বিশ্বচেতনা পারিবারিক-সামাজিক-জাতীয় জীবনের মধ্যে এমন এক সূত্রধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যেখানে জীবনকে এক বিশেষ ধরনের নৈতিকতা বোধের আওতায় দেখার প্রবণতা আমরা প্রত্যক্ষ করি। ফলত আমরা এই ধরনের সন্দর্ভে সেইসব নীতিমালার অনুপ্রবেশ হতে দেখি যা একাধারে যৌনসম্ভোগকে কেবল সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস নেয়, এবং এর পাশাপাশি ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করে যা সন্তান উৎপাদন ব্যতীত আর অন্য কোন ধরনের

উদ্দেশ্য থেকে তাড়িত যৌনাচারকে নিয়ন্ত্রণের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সামনে আসে আদর্শ বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক কল্পিত আদর্শ পৌরুষের ভাষ্য।

এক্ষেত্রে যদিও পাশাপাশি অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে এই যৌন নীতিবোধের ধারণা অথবা অতিশালীনতাবোধ এবং পৌরুষের ভাষ্যটি একমাত্রিক চরিত্রের ছিল না। এমনকী হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তার মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নানা মতামতভিত্তিক ভিন্নতার আভাস পাওয়া যায়। যেমন নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে চন্দ্রনাথ বসু এবং তুলনায় আরও কট্টর হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা যেভাবে ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, বঙ্কিম এবং সমকালীন জনৈক কিছু লেখকের ব্রহ্মচর্যের ধারণা সেই আঙ্গিক থেকে কিছুটা পৃথক ছিল। এই দ্বিতীয় অংশের ভাবনায় ব্রহ্মচর্য প্রধানত আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণার প্রতিফলন হিসেবে সামনে এসেছে। কিন্তু সাথে এটাও উল্লেখ করতে হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বিশেষ করে আটের দশক থেকে বিকশিত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী বয়ানের প্রাধান্যবাদী ধারায় আদর্শে পৌরুষের যে মানদণ্ডটি তৈরি হচ্ছিল তার কেন্দ্রে আবশ্যিকভাবে চলে আসে ব্রহ্মচর্যের ধারণাটি।

উনিশ শতকের অন্তিমপর্বে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী পরিসরে বাঙালি হিন্দু পৌরুষের বয়ানে স্বাভিমানে আঘাত পাওয়ার যে অবধারণা প্রত্যক্ষ করা যায় তার আত্মপ্রকাশ আমরা ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অনুধাবন করতে পারি। এখানে যে বিষয়টি আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে লক্ষ করতে পারি তা হল এক ধরনের বিকল্প পৌরুষের অবধারণার উত্থান, বিকল্প হওয়ার পাশাপাশি যা প্রতি-আধিপত্যবাদী। ব্রহ্মচর্যের এই ভাষ্য যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের আধিপত্যবাদী চেতনাকে সামনে আনে এবং এই আধিপত্যবাদী পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বাভিমান যে ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে তা আমাদের সামনে পিতৃতন্ত্রের একটি বিশেষ ধরনকে প্রকট করে। ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে আদর্শায়িত করার এই প্রবণতা লিঙ্গ, প্রজন্ম এবং জাত-পাতগত ভিন্নতার নিরিখে কার্যকরী হয় যা আকর্ষণীয়ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ, পিতৃতন্ত্র এবং পৌরুষের পারস্পারিক সম্পর্ককে বোঝার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা এই অধ্যায়ে পৌরুষের সেই উক্ত নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়কে চিহ্নিত করলাম। অন্তিমপর্বে এই প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে কীভাবে কল্পনা করা হয় তা উল্লেখ করা জরুরি। এই ভাষ্যে ব্রহ্মচর্য মূলত প্রতিভাত হয় এক আত্ম-নিয়ন্ত্রণমূলক আধিপত্যবাদী পৌরুষের ভাষ্যরূপে, যা হিন্দু গার্হস্থ্যে পুরুষের অবস্থানকে চিহ্নিত করার বিধি হিসেবে তার মান্যতা দাবি করে। বাঙালি পৌরুষের সাথে ব্রহ্মচর্যের এই যে বিধিবদ্ধ নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়াকে আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ করলাম তার সাথে অবশ্যই

অন্যান্য সময়পর্বে এবং অন্যান্য প্রেক্ষিতে ব্রহ্মচর্যের তৈরি হওয়া ভাষ্যগুলির নানা সংযোগ এবং মিলের স্থানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন পরের অধ্যায়ে বাঙালি সাম্প্রদায়িক পৌরুষের নির্মাণের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্যের এই ভাষ্যের সাথে বেশ কিছু সংযোগ লক্ষ করব। কিন্তু পাশাপাশি ব্রহ্মচর্যের সেই ভাষ্যে আধিপত্যের বয়ানটির চরিত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বদলও লক্ষ করা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দুর ('ক্ষয়িষ্ণু') দেহ ও সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ :
পৌরুষ, জাতপাত এবং প্রজনন প্রসঙ্গে, ১৯১০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

সূচনা

অসমে অবস্থিত স্বারস্বত মঠ *আর্য্য-দর্পণ* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি স্বারস্বত গ্রন্থাবলীও প্রকাশ করত। এই গ্রন্থাবলীর প্রথম বইটির নাম *ব্রহ্মচর্য্য-সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়মাবলী,* [১] যার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২১ বঙ্গাব্দে (আনু. ১৯১৪ খ্রি.) প্রকাশ পায়। এই বইটির ভূমিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করা হয় যা প্রকাশকের মতে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক *আর্য্য-দর্পণ* পত্রিকার সম্পাদককে লেখেন। সেই চিঠির নির্বাচিত অংশ এবং তার উত্তর হিসাবে প্রকাশকের মন্তব্যের একাংশ উদ্ধৃত করে অধ্যায়টি শুরু করছি।

> মান্যবর, শ্রীযুক্ত কুমার চিদানন্দ, কার্যাধ্যক্ষ আর্য্যদর্পণ" সমীপেষু।
>
> আপনি পত্রিকায় 'ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে অত্যন্ত খুশী হইলাম। ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে কতকটী কথা আপনার নিকট জানিবার জন্য এই পত্র লিখিলাম, আশাকরি সদুপদেশ দিয়া সুখী করিবেন।
>
> ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ আছে বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সময় মত আমি এ বিষয়ে জানিতে পারি নাই, ... এতদিনে সব বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? যে সর্ব্বনাশ হইবার কথা তাহা হইয়াছে। ... এখন উপায় কি? কি করি? সম্প্রতি একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছি। কয়েক বৎসর হইল বিবাহও করিয়াছি। এ অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় কি প্রকারে, সেই উপদেশের জন্য আপনার চরণ প্রান্তে উপনীত হইলাম। আশাকরি আমার আশা পূর্ণ করিবেন।[২]

এই পত্রের উত্তরে প্রকাশকের বক্তব্য নিম্নরূপ—

> ...পত্রপত্রিকায় "ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পর হইতে এই রূপ কত পত্র আমাদের নিকট আসিতেছে। ... অধিকাংশ পত্রলেখক স্কুল কলেজের ছাত্র এবং বয়স ১৬ হইতে ২৩/২৪ এর মধ্যে। দেশের উন্নতিকারী মহামান্য নেতাগণ, সমাজ সংস্কারকগণ! এখন একবার সমাহিত চিত্তে চিন্তা করুন দেশের কি শোচনীয় অবস্থা - কি বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। এখনও সকলে সাবধান হউন; নতুবা রক্ষা নাই। 'বিধবা-বিবাহ-অভাবে দিন দিন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে' বলিয়া যাহারা অভিমত প্রকাশ করেন আমরা তাঁহাদিগের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিনা। কেন না, সমাজে দেখিতে পাই এক একটী রমণী ১৭/১৮টি সন্তান-সন্ততি প্রসব করিয়া থাকেন; কিন্তু কোথাও ২/১ টি অবশিষ্ট থাকে। এই গুলি যথাসম্ভব জীবিত থাকিলে (বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত সত্ত্বেও) হিন্দুর সংখ্যা অশাতীত বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাই বলি, প্রকৃত পথ ছাড়িয়া বিপথে দাঁড়াইয়া

---

[১] *ব্রহ্মচর্য্য-সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়মাবলী,* স্বারস্বত গ্রন্থাবলী, সংখ্যা-১, ১৩২১, ভূমিকা।

[২] ঐ, ভূমিকা।

> চিৎকার করিলে লাভ নাই। বীর্য্যহীন পিতার পুত্র শৌর্য্য বীর্য্য হারাইয়া রোগগ্রস্থ এবং অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছে। ... ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইয়া যুবকগণকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা সাধারণকে বুঝাইয়া দিউন। যে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে তাহার প্রচার লজ্জাজনক বা কুরুচিকর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর হিন্দুদিগের রক্ষা নাই।[৩]

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী বয়ান প্রত্যক্ষ করা যায় সেখানে আমরা ব্রহ্মচর্য নিয়ে আলোচনা বিস্তৃতভাবে উত্থাপিত হতে দেখি। বিশেষ করে আলোচ্য সময়পর্বে বাঙালি সাবর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী পরিসরে পৌরুষের যে ভাষ্য নির্মাণ হতে থাকে সেখানে ব্রহ্মচর্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আর বিশ শতকের একের দশক থেকে তিনের দশকের মধ্যে বাংলায় হিন্দু সাম্প্রদায়িক আত্মপরিচয়ের নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় হিন্দু পুরুষের সংখ্যাবৃদ্ধির তাগিদগুলি খুব কেন্দ্রীয়ভাবে উপস্থিত থাকে যাকে আমরা লিঙ্গায়িত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের অন্যতম কেন্দ্রীয় উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই ক্ষেত্রে উপরে মুদ্রিত চিঠি আর তার উত্তরের মধ্যে থেকে আমরা তিনটি বিষয়কে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার কেন্দ্রে আনতে চাইব, যা বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে একটি নতুন প্রবণতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এক, হিন্দুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে এমন একটি সাম্প্রদায়িক দুশ্চিন্তার জনপ্রিয়তা এবং এই দুশ্চিন্তা নিরসনের জন্য সবলকায় হিন্দু পুরুষ সন্তানের প্রজনন বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করার তাগিদ। দুই, উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত যে তালিমি কেতাবগুলি প্রকাশ পাচ্ছিল, সেখানে আলোচ্য সময় থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্রমহ্রাসমানতা জনিত দুশ্চিন্তার প্রভাব প্রবলভাবে নজরে আসে। হিন্দু পুরুষ তার বীর্য সন্তান উৎপাদন ব্যতীত যেন 'অপচয়' না করে, তাকে সুনিশ্চিত করতে ব্রহ্মচর্য নিয়ে লেখা পুস্তকগুলিতে বারে বারে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়। সেখানে ব্রহ্মচর্য অভ্যাসের বিষয়ে গুরুত্ব বাড়তে থাকে এই যুক্তিতে যে তাতে নাকি সুস্থ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী হিন্দু সন্তানের জন্ম সম্ভব। পাশাপাশি ব্রহ্মচর্যমুখী জীবনচর্চাকে আমরা সাবর্ণ হিন্দু জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিকল্পের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হতে দেখি, যা বাঙালি ভদ্রলোকের সামাজিক নেতৃত্বর ক্ষেত্রে প্রতীকী গুরুত্বকে চিহ্নিত করে। তিন, হিন্দু বিধবার অব্যবহৃত প্রজনন ক্ষমতাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার মধ্য দিয়ে হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির পরিকল্পনা। আর তার জন্য বিধবা বিবাহকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা।

---

[৩] ঐ, ভূমিকা।

উক্ত প্রেক্ষিতে আমরা মূলত যে বিষয়টি এখানে বোঝার চেষ্টা করব তা হল হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির এই প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে বিশ শতকের সূচনাতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক পৌরুষের যে অবধারণাটি নির্মাণ হয় তার বৃহৎ চালচিত্রটি কী এবং তার নির্মাণে ব্রহ্মচর্যের ধারণা কী ভূমিকা নিয়েছে। এটা বুঝতে গিয়ে এখানে আমরা যে বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করব তা হল হিন্দু সাম্প্রদায়িক পরিসরে আধিপত্যকামী পৌরুষের যে অবধারণাটির নির্মাণ হতে শুরু করে তার সাথে জাতপাতের প্রসঙ্গটি কীভাবে সংযুক্ত হয়। হিন্দুর প্রজনন বৃদ্ধির প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্নিহিত ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষের উপস্থিতি চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করব এই জাতীয় পৌরুষ এবং ব্রহ্মচর্য কীভাবে একে অপরের নির্মাণে ভূমিকা নেয়।

বিশ শতকের একের দশক থেকে তিনের দশক— যে সময়টিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, সেই সময়পর্বে ব্রহ্মচর্যের ধারণাটি কীভাবে সাম্প্রদায়িক প্রতর্কের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তার বৃহৎ লৈঙ্গিক ক্ষেত্রভূমিটি কী ছিল তা বুঝতে গিয়ে আমরা বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম পর্যায়ে আমরা মূলত আলোচনা করেছি কীভাবে বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের হ্রাসমানতার মিথটির উত্থানের সাথে সাথে বাঙালি পুরুষের দুর্বলতার তত্ত্বটিতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী সাবর্ণ নেতৃত্বর বয়ানে নিম্নবর্ণ এবং দলিত দেহ হয়ে ওঠে বাঙালির দুর্বলতার চিহ্নক। দ্বিতীয় অংশে আমরা মূলত উত্থাপন করেছি একদিকে দুর্বল হিন্দু পুরুষের অবধারণা এবং তার বিপরীতে মুসলমান অপর পৌরুষের নির্মাণ হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানকে আকার দেয় এবং এর মধ্য দিয়ে পৌরুষকে কেন্দ্র করে এক সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ সামনে আসে। তৃতীয় অংশে আমরা মূলত নিম্নবর্ণ এবং দলিত সম্প্রদায়ের সাথে বাঙালি সাবর্ণ নেতৃত্বের সম্পর্কের দিকটি উত্থাপন করে দেখেছি কীভাবে বাঙালি সাবর্ণ নেতৃত্ব একাধারে নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি একটি পিতৃসুলভ সম্পর্ক তৈরি করতে চায়, যেখানে ব্রহ্মচর্য থাকে এই সামাজিক প্রাধান্যের নৈতিক ভিত্তি। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা ব্রহ্মচর্যচর্চার সাথে সুস্থ সবল পুত্রসন্তান প্রজননের সম্পর্কটিকে যেভাবে সংযুক্ত করে দেখা হয়েছিল সেই বিষয়টি উত্থাপন করে আলোচনা করেছি কীভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানে প্রজননশীল পৌরুষের চরিত্রকে আদর্শায়িত করা হয়। শেষ অংশে আমরা বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছি যা দুয়ের দশক থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতিতে জনপ্রিয়তা পায়। এখানে আমরা এই বিষয়টি উত্থাপন করেছি এইটি দেখানোর জন্য যে বাল্য বিধবাকে পুনরায় বিয়ে দিয়ে তার প্রজনন

ক্ষমতাকে হিন্দু সন্তানের উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একাধারে হিন্দু মেয়েদের দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং হিন্দু পুরুষালি উদ্বেগকে প্রশমিত করার প্রচেষ্টা কার্যকরী থাকে।

'ক্ষয়িষ্ণু' হিন্দুদেহ – হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং হিন্দু দুর্বলতার কিছু চিহ্নক

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বের মধ্যেই দেশীয় জনতার স্বাস্থ্য নিয়ে ভারতীয়রা আলোচনার পরিসরকে অনেকটা বিস্তৃত করেন এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার অঙ্গ রূপে জনস্বাস্থ্য তথা প্রজননগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে দেশীয় স্বাস্থ্যবিদরা জনমত তৈরি করতে শুরু করেন যে বিষয়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই চেতনাগুলি উপনিবেশবাদ বিরোধী রাজনীতির প্রেক্ষিতে বেশ সম্ভাবনাপূর্ণ ও সৃজনশীল হলেও, এক বিশেষ ধরনের লৈঙ্গিক, পৌরুষনির্ভর এবং সর্বোপরি বংশবৃদ্ধিকেন্দ্রিক (Progenital) ভাবনা এই স্বাস্থ্যচেতনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই ভাবনার কেন্দ্রে ছিল ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী নানা বয়ানের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া ভারতীয় তথা বাঙালির ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে নানা দুশ্চিন্তা, এবং এই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয়তাবাদী ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক তথা লেখক মহলে সমাধানসূত্র খোঁজার তাগিদ, যে বিষয়েও আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান অংশে আমরা বোঝার চেষ্টা করব হিন্দুর ক্ষয়িষ্ণুতার তত্ত্বটি কীভাবে হিন্দুর দুর্বলতার অবধারণার নির্মাণ করেছে।

গত কয়েক দশকে বাংলায় আলোচ্য সময়সীমায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এ-বিষয়ে আমাদের একটি চালচিত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসর থেকে নানান সামাজিক স্তরে সাম্প্রদায়িক চেতনার আঁতুড়ঘরগুলি সন্ধান করার এই প্রয়াসগুলি বর্তমান আলোচনাটির ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য রাখে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন এবং তার উত্তর সময়, যাকে সম্প্রতি আন্দ্রে সারতরি 'culturalism'-এর মোড় হিসেবে দেখেছেন,[4] তা বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ পালাবদলের ইঙ্গিত করে। যেমন জন ব্রুমফিল্ড, লিওনার্দ গর্ডন দুজনেই তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর ১৯২৩-এর বেঙ্গল প্যাক্ট বাংলায় নাকচ হয়ে যেতে দেখা যায়, যা বাংলায় সাম্প্রদায়িক টেনশনগুলি আরও

---

[8] Andrew Sartori, *Bengal in Global Concept History : Culturalism in the Age of Capital* (Chicago, 2008).

বাড়িয়ে তোলে।[৫] অন্যদিকে জয়া চ্যাটার্জি দেখতে চেয়েছেন মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশ - বাংলায় নির্বাচনমূলক রাজনীতি লাগু হওয়ার সময় থেকে হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্তর সংখ্যায় কম হওয়ার উদ্বেগ ও নানা কারণে অর্থনৈতিক দুরবস্থা কীভাবে সাম্প্রদায়িক উদ্বেগগুলিকে আকার দিচ্ছিল।[৬] এ-বিষয়ে প্রদীপকুমার দত্তের সূক্ষ্ম গবেষণা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হিন্দু-মুসলমানের এই সংখ্যাতত্ত্বের রাজনীতি ও তার থেকে তৈরি হওয়া উদ্বেগ, এ-বিষয়ে জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির সংযোগ থেকে শুরু করে হিন্দু মহিলা অপহরণের ঘটনাগুলির সাম্প্রদায়িকীকরণের মতো বিষয়গুলি উত্থাপন করে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উত্থানকে সামাজিক স্তর থেকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন।[৭] অন্যদিকে অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে হিন্দু মেয়েদের অপহরণের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে এই সাম্প্রদায়িক বয়ানগুলির লৈঙ্গিক চরিত্রটি উত্থাপন করেছেন।[৮] ফলত এই আলোচনাগুলি লিঙ্গ রাজনীতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার সংযোগ উদ্ঘাটন করার ব্যাপারে বেশ কিছু সূত্রের উন্মোচন করে যা বর্তমান আলোচনার মূল আগ্রহের বিষয়।

হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষের সঙ্গে স্বাস্থ্য চেতনার যে সংযোগের কথা উল্লেখ করা হল তা নতুন মোড় নেয় ১৯০৯ সালে। এই বছর জুন মাস জুড়ে পর্যায়ক্রমে *The Bengalee* পত্রিকায় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "A Dying Race"[৯] শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রদীপকুমার দত্ত দেখিয়েছেন আদমসুমারিকে ব্যাখ্যা করে

---

৫ J. H Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth-Century Bengal* (Berkeley: University of California Press, 1968); Leonard A Gordon, *Bengal: The Nationalist Movement, 1876-1940* (New York; London: Columbia University Press, 1974).

৬ Joya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

৭ Pradip Kumar Datta, *Carving Block: Communal Identity in Early Twentieth-Century Bengal* (New Delhi: Oxford University Press, 1999).

৮ Aparna Bandyopadhyay, "Of Sin, Crime and Punishment: Elopement in Bengal, 1929," in *Intimate Others: Marriage and Sexualities in India*, ed. Samita Sen, Ranjita Biswas, and Nandita Dhawan (Kolkata: Stree, 2011), 98–117.

৯ ১৯০৯ সালের জুন মাসে *The Bengali* পত্রিকায় ক্রমানুসারে 'A Dying Race' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯১০ সালে এই রচনাটি বই আকারে প্রকাশিত হয় এবং এর দুটি সংস্করণ পাওয়া যায়। সম্ভবত ১৯০৯ সালেই এই বইটির একটি বঙ্গানুবাদ 'ধ্বংসোন্মুখ জাতি' নামে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত বলার কারণ আমি এই বইটির প্রকাশ সাল বইটি থেকে পাইনি কিন্তু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগার) এই বইটি ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে entry করা আছে। আমি বর্তমান আলোচনায় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ধ্বংসোন্মুখ জাতি' ও A Dying Race বই দুটির যে সংস্করণ তথ্য হিসাবে ব্যবহার করছি তা হল : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ধ্বংসোন্মুখ জাতি', ১৯০৯ খ্রি. (আনুমানিক); U. N. Mukerji, *A Dying Race*, 2nd edition, Calcutta, M. Banerjee, 1910.

উপেন্দ্রনাথ বাঙালি হিন্দুর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান এবং মুসলমান জনসংখ্যা বিবর্ধমান এমন একটি তত্ত্ব খাড়া করতে চান।[১০] একই সঙ্গে তিনি জনসংখ্যার এই পরিবর্তনের কারণও চিহ্নিত করেন। উপেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি বই আকারে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই এই বিষটির সমর্থন অথবা সমালোচনা করে বহু প্রতিষ্ঠিত এবং অখ্যাত লেখকদের বই এবং প্রবন্ধ প্রকাশ পেতে শুরু করে।[১১] এই বিষয়টির উপর প্রদীপকুমার দত্তের গবেষণা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি দেখিয়েছেন *A Dying Race* এবং তার অনুবর্তী রচনাগুলি কীভাবে অধিক প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন মুসলমান ও ক্রমহ্রাসমান হিন্দু— এই 'সাম্প্রদায়িক সাধারণজ্ঞান'-র জন্ম দেয়।[১২] পরের দশকের আদমসুমারি প্রকাশ হওয়ার পরও এই একই সাধারণজ্ঞান প্রতিফলিত হয়।[১৩] গুরুত্বপূর্ণভাবে বাংলায় হিন্দু জনসংখ্যার প্রসঙ্গটিতে দ্বিতীয় মাত্রা যোগ করে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস নাগাদ বাংলায় সেন্সাস কমিশনার গেইট-এর একটি ঘোষণা। তিনি জানান সেই সকল জাতের মানুষকে হিন্দু তালিকা থেকে বাইরে রাখা হবে যাঁদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচারে ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করেন না, যাঁরা মন্দিরে প্রবেশাধিকার পান না, এবং হিন্দুদের কাছ থেকে এই ধরনের অন্যান্য বৈষম্যর স্বীকার হন। সুমিত সরকার দেখান আদমসুমারি কমিশনারের এই নীতি সাবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিরোধ তৈরি করে।[১৪] কারণ এই প্রচেষ্টাগুলিও হিন্দু সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিকুলতা তৈরি করে।

বিশ শতকে তৈরি হতে থাকা এই হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রেক্ষাপটে যদি আমরা উক্ত রচনাগুলি পাঠ করি তাহলে এই বংশবৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং তার জন্য হিন্দুর দেহকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলার চেষ্টাগুলির

---

[১০] এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন প্রদীপকুমার দত্ত। Datta, *Carving Block: Communal Identity in Early Twentieth-Century Bengal*. এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য— Chapter 1, Hindu Unity and The Communal Common Sense of the 'Dying Hindu', 21-63.

[১১] সেই একই বছরে বেশ কিছু লেখা প্রকাশ পায়। যেমন— রাধারমণ মুখোপাধ্যায়, "বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ ও তাহার প্রতিকার", *বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ, ১৩১৭; সখারাম গণেশ দেউস্কর, *বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?* আশ্বিন, ১৩১৭; Kishori Lal Sarkar, *A Dying Race, How Dying?* (Calcutta: 1911).

[১২] Datta, *Carving Block: Communal Identity in Early Twentieth-Century Bengal*. Chapter 1, Hindu Unity and The Communal Common Sense of the 'Dying Hindu', 21-63.

[১৩] প্রভাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, "বাঙ্গালার লোকসংখ্যা", *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩২৯, ১০৮; রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু জেলা," *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩৩০, ৮৪৩-৫০; শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম, "ধ্বংসের পথে হিন্দু," *প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩৩৩, ৫০-৫৩; হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, "বাঙ্গালায় লোকক্ষয়," *প্রবাসী* অগ্রহায়ণ, ১৩২৯, ২০৯-১২; *বাঙ্গালায় হিন্দু জাতির ক্ষয় এবং তাহার প্রতিকার*, টাঙ্গাইল হিন্দু জাতি সংরক্ষিণী সমিতি, টাঙ্গাইল, ময়মনসিং, ১৩৩১।

[১৪] Sumit Sarkar, *Beyond Nationalist Frames : Postmodernism, Hindu Fundamentalism, History* (Delhi: Permanent Black, 2010), 84–85.

সাম্প্রদায়িকীকরণ সম্পর্কে কিছু সূত্র পেতে পারি। ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর সংখ্যা কমতে থাকার যে কারণগুলিকে চিহ্নিত করছেন তার কেন্দ্রে আছে হিন্দু বর্ণব্যবস্থা। এ-প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, উপেন্দ্রনাথের মতো যাঁরা হিন্দুর সংখ্যা কমে যাওয়া অথবা সার্বিকভাবে হিন্দু সমাজের দুর্দশা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁদের একটা বড় অংশই মনে করছিলেন যে এর জন্য জাতিভেদপ্রথা বিশেষভাবে দায়ী। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল এই যে উপেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগীরা জাতিব্যবস্থাকে কী চোখে দেখেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁর *A Dying Race* গ্রন্থে যেভাবে হিন্দুর হ্রাসমানতার তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন সেখানে আমরা মূলত দুটি সমাজকে সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করি, হিন্দু ও মুসলমান। কখনো কখনো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গ সেখানে এসেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ইসলামের সমতুল্য বলে মনে করা হয়েছে। মুসলমানের বিপরীতে হিন্দুসত্তাকে উপেন্দ্রনাথ যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং দৈহিক সকল দিক থেকেই মুসলমান সমাজের থেকে দুর্বল। মুসলমান সমাজের চেয়ে হিন্দুদের এই পশ্চাদপদতার যে কেন্দ্রীয় কারণটিকে তিনি এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপ্রথা। কারণ উপেন্দ্রনাথের মতে মুসলমান সমাজে সামাজিক ভেদাভেদ না থাকায় উপরোক্ত সব ক-টি ক্ষেত্রেই অনগ্রসর মুসলমানদের অগ্রসর মুসলমানরা উপরের দিকে টেনে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। তাই মুসলমান সম্প্রদায়ের অগ্রগতি হয়েছে। বিপরীতে হিন্দু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাজনিত কারণে এগিয়ে থাকা সাবর্ণ মধ্যবিত্ত হিন্দু আর পিছিয়ে পড়া নিম্ন জাতের হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বেড়ে উঠেছে। সাবর্ণ হিন্দুসমাজ তাই নিম্ন জাতের হিন্দু সম্পর্কে উদাসীন। মূলত এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে উপেন্দ্রনাথ হিন্দুর হ্রাসমানতার কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে উপেন্দ্রনাথের রচনা একাধারে মুসলমান এবং নিম্ন বর্ণ – দুই গোষ্ঠীকেই এক অর্থে 'অপর' হিসেবে দেখেছে। উল্লেখযোগ্য হল এই অপরেরা এখানে মূলত লিঙ্গায়িত পুরুষালি অপর, যে বিষয়টির প্রতি গবেষকরা ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছেন।[১৫] মুসলমান পুরুষদের ক্ষেত্রে এই অপরের ধারণাটি যেমন

[১৫] সম্প্রতি বেশ কিছু গবেষক দেখিয়েছেন হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানে কীভাবে মুসলমান পুরুষদের অপর হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। Paola Bacchetta, "When the (Hindu) Nation Exiles Its Queers," *Social Text*, no. 61 (1999): 141–66; Charu Gupta, *Sexuality, Obscenity, Community : Women, Muslims, and the Hindu Public in Colonial India* (Delhi: Parmanent Black, 2001), 222–307; Sikata Banerjee, *Make Me a Man! : Masculinity, Hinduism, and Nationalism in India* (Albany, NY: State University of New York Press, 2005).

হিন্দু সাম্প্রদায়িক পরিচয় তৈরির ক্ষেত্রে একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কার মতো কাজ করেছে, তেমনি বিপরীতে অপর হিসেবে দরিদ্র নিম্ন জাতের পুরুষ এখানে সংরক্ষণের বিষয় হিসেবে সামনে এসেছে। এই দুই ধরনের পুরুষালি অপর উপেন্দ্রনাথের মূল্যায়নে কীভাবে ভিন্ন তা প্রত্যক্ষ করা যাবে মুসলমান এবং নিম্ন জাতির হিন্দু পুরুষদের দেহকে তিনি কীভাবে চিত্রিত করেছেন তার মধ্যে দিয়েও। তিনি লিখছেন -

> Any one travelling from Calcutta along the E. B. S. Railway will not fail to notice the superior physique of the Mahomedans as compared with that of the Hindus. The Railway porters are either Bengali Mahomedans or up-country Hindus. Very few Bengali Hindu work as porters. Their poor physique stands in the way. One can get a fire idea of the physique of the two communities by looking at the Mahomedan porter and the Hindu sweet-meat-seller on the Railway platform. There are two clases of Hindus who still posses a fairly good physique. They are the Goalas and the Jaleas. The Gor-Goalas of Nadia used to be noted for their strength but they have practically disappeared. The secret of the superior strength of the Goalas and the Jaleas is not far to seek, - they live on more nutritious food than the generality of Hindus. The 'Sirdar' class used to be recruited from the Namasudras and the Bagdis. Every well-to-do man's house in a village had its Sirdar. I do not think a dozen of them can be found in the two Bengals. In our malaria-stricken districts the underfed weakly Hindus have been simply weeded out.[১৬]

এখানে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বয়ানে বাঙালি নিম্নবর্ণ-শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের পৌরুষের যে নির্মাণটি চোখে পড়ে তার প্রতি আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক। এখানে নিম্নবর্ণের দেহকে যেভাবে দুর্বল হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং তার একটি শ্রমশীল, বলশালী, সাহসী অতীতের কথা ভেবে বিলাপ করা হয়েছে তা সংস্কারপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। চারু গুপ্তাও উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে হিন্দু সাবর্ণ সংস্কারপন্থীদের দলিত পুরুষদেহ সম্পর্কিত বয়ানে এমন পিতৃসুলভ প্রবণতা লক্ষ করেছেন।[১৭] কিন্তু বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে এই ধরনের আলোচনার সূত্রপাতের ক্ষেত্রে যে সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করতে হয় তা হল বাঙালি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং মুসলমান পৌরুষ সম্পর্কে তৈরি হতে থাকা ভীতি। মূলত মুসলমানদের অধিক প্রজননক্ষমতা সম্পর্কিত মিথ, সম্প্রতিক অতীতের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার

---

[১৬] U. N. Mujherji, The Dying Race, 8-9.

[১৭] Charu Gupta, "Feminine, Criminal or Manly?: Imaging Dalit Masculinities in Colonial North India," *The Indian Economic and Social History Review* 47, no. 3 (2010): 309–42.

ক্ষেত্রে যেভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তায় একটি কল্পিত সঙ্কটের আকারে দানা বাঁধে তার ফলস্বরূপই হিন্দু সংস্কারপন্থী উচ্চবর্ণের মধ্যে নিম্নবর্ণের প্রতি দৃষ্টি ফেরানোর প্রবণতা তৈরি হয়। সাবর্ণ বয়ানে নিম্নবর্ণের পুরুষদেহ হতে থাকে হিন্দু 'হ্রাসমানতার' চিহ্নক।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যেভাবে মুসলমান অপরের বিপরীতে হিন্দুসত্তার সঙ্কটকে সামনে আনছেন তা সমকালীন বহু চিন্তাশীল হিন্দু বাঙালিকে তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নের প্রতি যে আকর্ষণ করেছিল তার সাক্ষ্য বহন করে এই বিষয়ে তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত বহু রচনা। এর মধ্যে কিছু রচনার ঝোঁক ছিল হিন্দুর বংশবৃদ্ধিকেন্দ্রিক চেতনা ও স্বাস্থ্যজনিত উদ্বেগগুলির প্রতি। উদাহরণস্বরূপ যেমন ১৯১০ সালে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় রাধারমণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ ও তাহার প্রতিকার'[১৮] শীর্ষক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বলছেন "হিন্দু জাতির ক্ষয়ের মূল কারণ পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গ"।[১৯] ডারউইনের যোগ্যতম-র উদ্বর্তন-এর তত্ত্বকে ব্যবহার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসছেন যে এগিয়ে থাকা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে পিছিয়ে পড়া হিন্দুসমাজ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। এর প্রভাবেই তার প্রজননক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। উপেন্দ্রনাথের কড়া সমালোচনা করে সখারাম গণেশ দেউস্কর *বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?* [২০] এই ইস্তেহারটি প্রকাশ করেন। সখারাম গণেশ দেউস্কর রাধারমণের যুক্তিকেই আর একটু সম্প্রসারিত করছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, তিনি আংশিকভাবে উপেন্দ্রনাথের বক্তব্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বরং উপেন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর আপত্তির কারণ এই যে একজন চিকিৎসক হয়েও কেন তিনি স্বাস্থ্যের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। সখারাম এক্ষেত্রে তিনটি সমস্যার উত্থাপন করছেন। এক, বাল্যবিবাহ প্রজননগত স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। দুই, বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও তার প্রতিকারে সরকারি অনীহা। তিন, রাধারমণ মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে হিন্দুর প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রসঙ্গটি।

সখারামের যুক্তিতে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ছোঁয়ায় হিন্দুস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু "মুসলমান-সমাজে সাহেবিয়ানা তেমন প্রবেশ লাভ করে নাই; সেইজন্য মুসলমান সমাজে এমন বিপ্লবও ঘটে নাই। তদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য

---

[১৮] রাধারমণ মুখোপাধ্যায়, "বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ ও তাহার প্রতিকার," *বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ, ১৩১৭।

[১৯] ঐ, ১৮৮।

[২০] সখারাম গণেশ দেউস্কর, *বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?* আশ্বিন, ১৩১৭।

সভ্যতার সহিত মুসলমান সভ্যতার বিরোধ হিন্দু সভ্যতার অপেক্ষা অল্প। এজন্যও মুসলমানের সমাজে হিন্দুর ন্যায় বিপর্য্যয় ঘটে নাই"।[২১] সখারাম মুসলমান সমাজকে এখানে যে পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনে মুসলমান সম্প্রদায়কে বুঝতে চাওয়ার একাধিক প্রচেষ্টার সংমিশ্রণ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন হান্টারের ব্যাখ্যায় ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের একটি সমসত্ত্ব (homoginious) সমাজ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, সমস্ত মুসলমান সমাজকে যেভাবে পশ্চাদপদ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, তাদের পশ্চিমী শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহকে পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে দর্শানো হয়েছে তার প্রভাব সখারামের ধারণায় প্রকটভাবে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য মুসলমান সমাজ সম্পর্কে এই গৎবাঁধা ধারণাগুলো সর্বক্ষণ স্থায়ী থেকেছে তা নয়। অনবরত এর মধ্যে সংযোজন বিয়োজন হতে থেকেছে। অন্যদিকে ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মধ্যে একধরনের সাংস্কৃতিক সমরূপতার অবধারণাও সখারামের ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। ফলত এখানে হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের এক জটিল অঙ্ক কষার চেষ্টা করেছেন তিনি, যার মধ্য দিয়ে এঁদের মধ্যেকার পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি নির্ধারণ করেছেন। সেই কারণেই একই প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে বাস করা সত্ত্বেও দুটি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের গঠন তাঁর কাছে ভিন্ন ঠেকেছে। এইভাবেই সখারাম দুটি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে তাদের দৈহিক, চারিত্রিক ভিন্নতার সাথে সংযুক্ত করেছেন। এই যুক্তিতেই পাশ্চাত্য ও কিছু অর্থে ইসলামিক সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে সেই অপর, যার সংস্পর্শে হিন্দু সংস্কৃতির মূল ভিত্তি অবক্ষয়ের পথে বলে তাঁর ধারণা হয়েছে। এখানে হিন্দু এবং মুসলমান পুরুষের মধ্যে সখারাম যে মূলগত ভিন্নতাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন সেটি হল এক বিশেষ ধরনের নৈতিকতার তফাৎ। সমকালীন অসংখ্য রচনায় আদর্শ হিন্দু পুরুষের নৈতিক চরিত্রকে যেভাবে ব্রহ্মচর্যের সাথে সমার্থক করে দেখা হয়েছে তার সাথে সখারামের চিহ্নিত নৈতিকতার প্রভূত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আর এখানে সখারামের মতে সংস্কৃতির চালিকাশক্তি সেই বিশেষ ধরনের নৈতিকতার অবক্ষয়ের ফলেই অধঃপতিত হিন্দুদের শরীর তার প্রজননক্ষমতা হারাচ্ছে। যে সমস্যাটি মুসলমান পুরুষদের ক্ষেত্রে তৈরি হয়নি। বরং তাঁরা ইসলামের পথে

[২১] ঐ, ১২২।

থাকার ফলে উচ্চ প্রজননশীল। শুধু সখারমই নয় জনৈক প্রফুল্লকুমার সরকারও এই সভ্যতার *রেটোরিককে* হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসকে বুঝেছেন। তাঁর ভাষায়—

> নতুন সভ্যতা ও প্রবলতর জাতির সংস্পর্শে অনেক নতুন ও সাংঘাতিক ব্যাধি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে ও জাতির জাতীয় স্বাস্থ্য শোচনীয় হইয়া উঠে। অন্যদিকে প্রবল ও দুর্ব্বল দুই জাতির সংমিশ্রণে সংকর বর্ণ সৃষ্টি হইতে থাকে। এই সংকর বা মিশ্র জাতি প্রায়ই দুর্ব্বল, জীবনীশক্তিহীন ও রুগ্ন হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে স্ত্রীলোকেদের উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস হইয়া যায় ও শিশু মৃত্যু বাড়িতে থাকে। ... এইরূপে শারীরিক, মানসিক – সকল-প্রকার বিকাশের পথেই তাহারা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে তাদের মনুষ্যচিত শক্তি ও বৃত্তি সমূহ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং যতই পরাধীনতার কাল দীর্ঘতর হইতে থাকে, ততই তাহারা অধিকতর অকর্মণ্য, অপটু, পরিশ্রমকাতর, উৎসাহহীন ও সর্ব্ববিষয়ে পঙ্গু হইতে থাকে।[২২]

এভাবেই উপেন্দ্রনাথ হ্রাসমান হিন্দুর যে সাম্প্রদায়িক দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছিলেন সখারাম অথবা প্রফুল্লকুমারের বয়ানে তার কারণ চিহ্নিতকরণের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। সখারাম এবং প্রফুল্লকুমার প্রতিষ্ঠা করতে চান হিন্দু শরীর ও স্বাস্থ্যের একটি সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব আছে। আর তার প্রজনন ও বংশবৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে হলে সেই বিষয়টিকে অবহেলা করলে চলবে না।

এই বিষয়টি নিয়ে গবেষকরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে ঔপনিবেশিক ভারতে কীভাবে বাঙালি এবং ইংরেজ শরীরের লিঙ্গায়িত সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নির্মিত হয়। যেমন একদিকে পৌরুষদৃপ্ত ইংরেজ, অপর দিকে মেয়েলি বাঙালি জাতির নির্মাণ।[২৩] কিন্তু সমগ্র ঔপনিবেশিক আমল জুড়ে ঔপনিবেশিত এবং ঔপনিবেশিকের মধ্যেই অপরায়ণ সীমিত থেকেছে তা নয়। উপেন্দ্রনাথ নিম্নবর্ণ এবং দলিত শরীরকে যখন দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; অথবা রাধারমণ বা সখারাম প্রমুখরা যখন স্বাস্থ্যের ধারক শরীরটির একটি

---

[২২] প্রফুল্লকুমার সরকার, "জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ," *প্রবাসী,* পৌষ, ১৩২৩, ২৮৭; প্রফুল্লকুমার সরকার *প্রবাসী* পত্রিকায় এই বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধটির নাম "জাতীয় জীবনে ধংসের লক্ষণ," *প্রবাসী,* ফাল্গুন, ১৩২২, ৫০৫-৫০৬; এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম "জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ," *প্রবাসী,* পৌষ, ১৩২৩, ২৮৭-২৮৮।

[২৩] John Rosselli, "The Self-Image of Effeteness: Physical Education and Nationalism in Nineteenth-Century Bengal," *Past and Present* 86, no. 1 (1980): 121–48.; Mrinalini Sinha, *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century* (New Delhi: Kali for Women, 1995).; Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History : Gender and the Politics of Culture in Colonial Bengal*, SOAS Studies on South Asia (Delhi: Oxford University Press, 2001).

সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি করে দেখাচ্ছেন সেই সংস্কৃতির মাপকাঠিতে দলিতরা উত্তীর্ণ হতে পারছে না, ফলত তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, ফলত তখন সেখানে দলিত শরীরকে দুর্বল হিসেবে শনাক্ত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। দৃশ্যত এই প্রেক্ষিতে আমরা সাবর্ণ হিন্দুদের বয়ানে অবহেলিত, দুর্বল, সুস্থ সন্তান প্রজননে অক্ষম দলিত পুরুষের অবধারণাটিকে জন্ম নিতে দেখছি। আর তাই এই ক্ষেত্রেও অপরায়ণের প্রক্রিয়াটি ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হতে দেখা যাচ্ছে।[২৪] প্রসঙ্গত সম্প্রতি উত্তর ভারতে দলিত শরীর সম্পর্কে দেশীয় সাবর্ণ সম্প্রদায় এবং ঔপনিবেশিক শাসনের সামাজিক নির্মাণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে যেখানে দেখা যায় দলিত পুরুষদেহকে দুর্বল, অপরাধপ্রবণ হিসেবে দেগে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা কার্যকর থেকেছে।[২৫]

উল্লেখ্য বিশ শতকের একের দশক থেকে তিনের দশকের মধ্যে অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ সম্পর্কে এই আলোচনাগুলি মূলত দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছে। এক, সভ্যতার সংঘাতের ফলে হিন্দুর সন্তান উৎপাদনশীলতা কমতে শুরু করেছে। আর্থিক এবং সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকার ফলে এবং নৈতিক মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ না হওয়ার কারণে নিম্নবর্ণ এবং দলিত জনসংখ্যার মধ্যে এই প্রবণতা সর্বাধিক। দুই, অস্পৃশ্যতার কারণে তাঁরা হিন্দু সমাজর মধ্যে নিজেদের উপেক্ষিত মনে করেন। তাই তাঁরা এই সামাজিক বঞ্চনার কারণে ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করছেন। কারণ ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম তাঁদের অস্পৃশ্য করে রাখে না।[২৬] আর এর বিপরীতে আমরা দেখছি এই বয়ানগুলিতে মুসলমান শরীরের এক

---

[২৪] সাম্প্রতিক ফিলিপ কন্সটেবলের গবেষোণায় অপরায়ণের বিভিধ প্রক্রিয়া নজরে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন মহারাষ্ট্র থেকে যখন ব্রিটিশরা সৈন্য নিয়োগ করেছেন তখন কোন জাতি সমরকুশল তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদী উদ্ভাবন কাজ করেনি। বরং ক্ষত্রিয়ত্বের উপর ভিত্তি করে সমাজে যে দীর্ঘ বিভাজন বর্তমান ছিল, তাই উনিশ শতকের শেষভাগে সমরকুশল জাতিতত্ত্বের জন্ম দেয়। Philip Constable, "The Marginalization of a Dalit Martial Race in Late Nineteenth and Early Twentieth Century Western India," *The Journal of Asian Studies* 60, no. 2 (2001): 439–78.

[২৫] চারু গুপ্তা দেখিয়েছেন উত্তর ভারতে হিন্দু সাবর্ণ সংস্কারবাদী এবং ব্রিটিশ বয়ানে দলিত পুরুষদের কখনো মেয়েলি অথবা অপরাধপ্রবণ হিসেবে দেখা হয়েছে। যেখানে সেখানকার সংগঠিত দলিত আন্দোলনে পৌরুষের এক পৃথক খোঁজ লক্ষ করা যায়। Charu Gupta, *The Gender of Caste : Representing Dalits in Print* (Seattle: University of Washington Press, 2016). Chapter 4, Feminine, Criminal, or Manly? Imaging Dalit Masculinities, 111-65.

[২৬] বিশ শতকের দুইয়ের দশকে বাংলায় হিন্দু মহাসভার উত্থানের পর থেকে জাতপাতের প্রসঙ্গে এই আলোচনাগুলি সরাসরি হিন্দু নির্বাচনমূলক রাজনীতির অভ্যন্তরে জোরালোভাবে প্রবেশ করে। হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় স্তরে তো বটেই, বাংলার প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার বার্ষিক সম্মেলন অথবা জেলাস্তরের সম্মেলনগুলিতেও এই বিষয়টি আলোচনার অন্যতম বিষয় হিসেবে উঠে আসে। উত্তর ভাবতে দলিত সমাজের মধ্যে ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতাকেও এই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে

বিপরীত পরিচয় নির্মিত হতে, যারা বলবান, পুরুষালি এবং স্বাস্থ্যবান এবং প্রচুর সংখ্যায় সন্তান জন্মদানে সক্ষম।[২৭] ফলত পৌরুষদৃপ্ত মুসলমান সম্প্রদায় এবং তার ক্রমবর্ধমান সংখ্যার ভীতি এক বিকল্প হিন্দু পৌরুষ নির্মাণের পৃষ্ঠভূমি হিসেবে কাজ করছে।

পুরুষালি মুসলমান – প্রতিপক্ষে হিন্দু পৌরুষ

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় আর্য সমাজের এক সম্মেলনে লালা মুন্সিরাম ভিজির সাথে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ হয়। পাঞ্জাবের আর্য সমাজের উচ্চ পরিচালন পদে আসীন মুন্সিরাম সন্ন্যাস নেওয়ার পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামগ্রহণ করেন এবং এই নামেই প্রসিদ্ধ হন। প্রথম দিকে তিনি কংগ্রেস রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকলেও বিশ শতকের দুইয়ের দশকে শ্রদ্ধানন্দ উত্তর ভারতে শুদ্ধি আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় তাঁর উদ্যোগেই হিন্দু মহাসভার সংগঠন উন্মুক্ত হয়।[২৮] কলকাতায় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাথে শ্রদ্ধানন্দের যখন প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন উপেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধানন্দকে তাঁর বই এবং হিন্দু হ্রাসমানতার তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করান। শ্রদ্ধানন্দ তৎক্ষণাৎ উপেন্দ্রনাথের বক্তব্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। শ্রদ্ধানন্দ পরবর্তীকালে *Hindu Sangathan : Savior of the Dying Race* শিরোনামে একটি গ্রন্থ লেখেন যা শুদ্ধি আন্দোলন এবং হিন্দু মহাসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্তেহার হিসেবে পরিগণিত হয়।[২৯] *A Dying Race* গ্রন্থটির প্রায় উনিশ বছর পর প্রকাশ পাওয়া হিন্দুর 'উদ্ধারকারী'র দাবিদার এই *Hindu Sangathan* ইস্তেহারটি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পরিণত হয়ে ওঠার যাত্রাপথের ছবিকে নানা

দেখার প্রবণতা লক্ষ করেছেন চারু গুপ্তা। Gupta. Chapter 5, Intimate and Embodied Desires: Religious Conversions and Dalit Women, 166-207.

[২৭] হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রতর্কে মুসলমান পুরুষকে অতিপুরুষালি এবং অতিযৌনলিপ্সু হিসেবে চিহ্নিত করার একটি দীর্ঘ এবং জটিল যাত্রাপথের কথা পাওলো ব্যাকেটা আলোচনা করেছেন যা আলোচ্য প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি দেখিয়েছেন প্রাচ্যবাদীদের বয়ানে মুসলমান পুরুষদের যেভাবে অতিপুরুষালি হিসেবে দেখা হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন হিন্দু পুরুষকে যেভাবে অতিযৌনলিপ্সু হিসেবে চিত্রিত করেছে এই দু-শ্রেণীর ধারণা একটি সময়ে এসে মুসলমান পুরুষদের উপর আরোপিত হয়েছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা হিন্দুদের উপর আরোপিত যৌনলিপ্সুতার অপবাদটিকে মুসলমান পুরুষদের উপর বদলি করে দিয়েছে৷ সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে যৌনআগ্রাসীর তকমা। Paola Bacchetta, "When the (Hindu) Nation Exiles Its Queers," *Social Text*, no. 61 (1999): 141–66.

[২৮] বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ঢাকা, Proceeding of Meetings in Dacca 23/1928, File no 80E/28 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau).

[২৯] Shraddhananda Sanyashi, *Hindu Sangathan : Savior of the Dying Race*, 1926.

আঙ্গিকে সামনে আনে। বিশ শতকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকের মধ্যবর্তী সময় ধরে মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে যে একটি সাম্প্রদায়িক ভীতির নির্মাণ হয়েছে তা শ্রদ্ধানন্দের এই ইস্তেহারটিতে এবং সমকালীন বঙ্গদেশে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধ, বই বা ইস্তেহারের মতো জনপরিসরে আসা বয়ানে লক্ষ করা যায়।

আলোচ্য সময় পর্বে বিবিধরূপে মুসলমান পুরুষ সম্পর্কে এই ভীতিকে আমরা নির্মিত ও বিবর্তিত হতে দেখি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯২৫ সালে ফরিদপুরে হিন্দু মহাসভার সভাপতির বক্তৃতায় বলছেন—

> সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের দাস হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের অনেক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে। বাংলাদেশের নদীতে অবিরত বড় বড় স্টিমার যাতায়াত করে এবং ইংল্যন্ড এবং আমেরিকার জাহাজ প্রতিনিয়ত সমুদ্রবক্ষে চলিতেছে। ইহাদের সারঙ্, খালাসী প্রভৃতি পূর্ব বাংলার চাষী মুসলমান শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। মুসলমান রেঙ্গুন, আকায়াব, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দূর দেশে শ্রমিকভাবে যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে এবং দেশে পাঠায়। ... তা ছাড়া পদ্মায় চড় পড়িলেই দুঃসাহসিক মুসলমান আসিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মুসলমান চাষী আসামের উর্ব্বরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে। কিন্তু হিন্দু অলস ও কুসংস্কার জালে জড়িত, ছুৎমার্গ ও জাতিচ্যুতির ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সে পৈত্রিক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে রাজি নয় এই কারণে সে দরিদ্র ও নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে।[৩০]

জীবন-জীবিকায় মুসলমান পুরুষদের দুঃসাহসিক অভিযান এবং সাফল্যের বিপরীতে হিন্দু পুরুষের অসহায়তা ব্যক্ত করার এটি খুব প্রচলিত ভঙ্গি, যা প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে। ইতিপূর্বে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনাগুলিতে আমরা মুসলমান পুরুষ সম্পর্কে যে চরিত্রচিত্রণ হতে দেখি তার অনেক কিছুই আমরা উনিশ শতকের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী প্রতর্কের মধ্যে মূর্ত হতে দেখেছি।[৩১] উপেন্দ্রনাথের রচনায় মুসলমান পুরুষ সম্পর্কে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আরও প্রকট হতে দেখা যায় তা হল যূথবদ্ধতা, কৌমচেতনা এবং

---

[৩০] প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা, সভাপতির অভিভাষণ, ২রা মে, ১৯২৫।

[৩১] এই ক্ষেত্রে আমি বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ‘ধর্মতত্ত্ব’-এর কথা উল্লেখ করব যেখানে তিনি ধর্ম হিসেবে ইসলামের মানুষের মধ্যে সামাজিক একতাবোধ তৈরি করতে পারার ক্ষমতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এক ধর্ম, এক ঈশ্বর, এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান— ইসলাম সম্প্রদায় সম্পর্কে তৈরি হওয়া এই নির্মাণটির সাথে বিশ শতকে অন্যান্য বৈশীষ্ট্যগুলি যুক্ত হতে দেখা যায়। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী বয়ানে ইসলামের এই নির্মাণ সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism* (New Delhi: Parmanent Black, 2001). Chapter 5, Imagiing Hindu Rastra: The Hindu and the Muslim in Bankimchandra’s Writings, 163-90.

ভাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ, আলস্যহীন, কর্মঠ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হওয়ার প্রবণতা। এরপর থেকেই আমরা মুসলমান পুরুষ সম্পর্কে এই একই ন্যারেটিভের পুনরাবৃত্তি বার বার অসংখ্য রচনা ও বক্তৃতায় হতে দেখি যার লক্ষণ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বয়ানেও প্রত্যক্ষ করা যায়। আর এর বিপরীতে হিন্দু পুরুষের নিপীড়িত হয়ে চলার বৈচিত্র্যপূর্ণ বয়ান আলোচ্য সময়ে তৈরি হয়। জীবন-জীবিকায় পিছিয়ে পড়া সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বর্ণনাটি এর মধ্যে এক প্রকার।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বহুল প্রচারিত *Hindu Sangathan* ইস্তেহারটিও মুসলমান পুরুষদের সম্পর্কে একই গোত্রের ন্যারেটিভ উপস্থাপন করে যার বহুবিধ রকমফের আমরা আলোচ্য দশকে বহু বাংলা রচনাতেও লক্ষ করি। শ্রদ্ধানন্দের বয়ানটি বহুল পরিমাণে ইতিহাস আশ্রয়ী। সেখানে ভারতে আগত তুর্কী-আফগান-মুঘল আক্রমণকারী অথবা শাসকদের ধর্মান্ধ, ধর্মান্তরকরণে বদ্ধপরিকর ও নারী নির্যাতকের চরিত্রে চিত্রিত করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এহেন ঐতিহাসিক মুসলমান চরিত্র নির্মাণেরও উনিশ শতকীয় অতীত আমরা লক্ষ করি।[৩২] বিশ শতকে এই বিষয়টি আরও কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমনে আসে।[৩৩] কিন্তু এর পাশাপাশি যে বিষয়টি আলোচ্য সময়ে সংযুক্ত হতে দেখা যায় তা হল সমকালীন মুসলমান পুরুষদের ধর্মান্ধ,[৩৪] ধর্মান্তরকরণে উৎসাহী[৩৫] এবং হিন্দু নারী অপহরণকারী[৩৬] হিসেবে চিত্রিত করার প্রবণতা।[৩৭] মুসলমান পৌরুষ সম্পর্কে এই নির্মাণটি দ্বিতীয় আর এক ধরনের ভীতি যেখানে বাঙালি হিন্দু পৌরুষ সরাসরি হুমকির মুখোমুখি হয়।

---

[৩২] Sarkar, উক্ত বিষয়টির জন্য দ্রষ্টব্য Chapter 5 Imagining Hindu Rastra: The Hindhu and the Muslim in Bankimchandra's Writings, 163-90.

[33] শমিতা সেন বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন, বিশ শতকে বাঙালি হিন্দু সাহিত্যে মুসলমান পুরুষ সম্পর্কে গতে বাঁধা নির্মাণগুলি তাদের কীভাবে যৌন অতিলিপ্সু হিসেবে চিত্রিত করে। Samita Sen, "Honour and Resistance: Gender, Community and Class in Bengal, 1920-1940," in *Bengal: Communities, Development and States*, ed. Williem Van Sehendel, Sekhar Bandyopadhyay, Abhijit Dasgupta (New Delhi: Monohor Publications, 1994), 209–54.

[৩৪] "সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ," *মাসিক বসুমতি*, বৈশাখ, ১৩৩৩, ১৯০-৯৭।

[৩৫] মহেশচন্দ্র ঘোষ, "মালাবারের ধর্ম্ম," *প্রবাসী*, শ্রাবণ, ১৩৩২, ৫০৫। এই প্রবন্ধটিতে লেখক দেখাচ্ছেন মোপলা বিদ্রোহের ফলে অগুনতি জনজাতি মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

[৩৬] এই বিষয়ে বাংলার প্রেক্ষিতে প্রদীপকুমার দত্ত এবং অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশদ আলোচনা করেছেন। Pradip Kumar Datta, Chapter 4, 'Abductions' and the Constellation of a Hindu Communal Bloc, 148-237; Aparna Bandyopadhyay, "Of Sin, Crime and Punishment: Elopement in Bengal, 1929," in *Intimate Others: Marriage and Sexualities in India*, ed. Samita Sen, Ranjita Biswas, and Nandita Dhawan (Kolkata: Stree, 2011), 98–117. উত্তর প্রদেশের প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি নিয়ে চারু গুপ্তা বিশদে আলোচনা করেছেন, Gupta, *Sexuality, Obscenity, Community : Women, Muslims, and the Hindu Public in Colonial India*, 243–59.

সম্প্রতি এই ভীতির সাথে উপনিবেশ-উত্তর ভারতে হিন্দুত্ববাদী পৌরুষের সম্পর্কটি কীভাবে সংযুক্ত তা চন্দ্রিমা চক্রবর্তী একভাবে উন্মুক্ত করেছেন। সমকামভীতি সম্পর্কে মিশেল কিমেলের তত্ত্বায়ন থেকে প্রসঙ্গ টেনে তিনি দেখিয়েছেন সমকামভীতি হল এমন এক ভয় যেখানে মনে হয় অন্য পুরুষটি আমাদের মুখোশ খুলে ধরবে, আমাদের শক্তিহীনতা প্রমাণ করে দেবে, আমাদের সমগ্র দুনিয়ার কাছে এটা গোচর হয়ে যাবে যে আমরা কোনো মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য নই, প্রকাশ হয়ে যাবে আমরা প্রকৃত পুরুষই নই। চন্দ্রিমা চক্রবর্তীর মতে এই সমকামভীতি, যার অর্থ অন্য পুরুষদের নিয়ে ভয়, তা হিন্দুত্ববাদী পৌরুষকে জাগরূক রাখে, তার উদ্দীপকের ভূমিকা নেয়। তাঁর মতে হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে পৌরুষ প্রদর্শনের ব্যগ্রতা উঠে আসে বিফল হতে পারার গভীর দুশ্চিন্তা, হিন্দুদের অক্ষমতার ধারণা থেকে তৈরি হওয়া অস্বস্তি এবং মেয়েলিত্বের লজ্জা থেকে।[৩৮] আমরা যদি বিশ শতকের একের দশক থেকে তিনের দশকের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়াটি এই আঙ্গিকে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে একটি পূর্ব আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছু নতুন পর্যবেক্ষণ পেশ করতে পারব। তা হল বাঙালি পুরুষের উপর আরোপিত মেয়েলিত্বের ধারণা। বিশ শতকের দুইয়ের দশকে হিন্দুনারী অপহরণ এবং ধর্ষণের ঘটনাগুলির সাম্প্রদায়িকীকরণ বাংলায় মুসলমান ভীতি তৈরির মাধ্যম হয়ে ওঠে। হিন্দু পরিচালিত গণমাধ্যমগুলিতে এই ঘটনাগুলির জন্য মুসলমান জনগোষ্ঠীকেই দায়ী করা হয়, এবং যার মাধ্যমে এই সাম্প্রদায়িক বৈরিতাকে উসকে দেওয়া হয়।[৩৯] তার পর থেকে গণপরিসরে এই বিষয়টি আলোচনার এক সাধারণ বিষয় হয়ে ওঠে। হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক সভা থেকে গ্রামভিত্তিক মিটিং প্রায় সবক্ষেত্রেই এই বিষয়টি আলোচনার সাধারণ অ্যাজেন্ডা হতে থাকে। এর প্রতিরোধে বহু মহিলা প্রতিরক্ষা সমিতি তৈরি হতে শুরু করে। মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য বহু শারীরিক ব্যায়াম ও অস্ত্রবিদ্যা শেখানো শুরু হয়। এই প্রেক্ষিতেই হিন্দু মহাসভার ঢাকা জেলা অধিবেশনের এক বক্তা হিন্দু বাঙালি পুরুষদের প্রতি একটি বক্রোক্তি করেন যার সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয়। বক্তা এক জায়গায় বলেন, "পোড়া জাত আজ

---

[৩৭] বিশ শতকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী দৃষ্টিতে মুসলমান পুরুষদের যে ভাবমূর্তি নির্মাণ হয় সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

[৩৮] Chandrima Chakraborty, *Masculinity, Asceticism, Hinduism : Past and Present Imagining of India* (Ranikhet: Permanent Black, 2011), 176.

[৩৯] প্রদীপকুমার দত্ত এই বিষয়ে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র ভূমিকা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। যদিও এর সাথে *সঞ্জীবনী* পত্রিকার সম্পাদক কে কে মিত্রর কথা উল্লেখ করেছেন যিনি Women's Protection League-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। Pradip Kumar Datta, *Carving Block: Communal identity in Early Twentieth-century Bengal*, ১৫০-৫২.

মহিষ-মর্দ্দিণীর আদর্শ ছেড়ে কলা বৌ'এর আদর্শকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। নারী যদি সেই মহিষ-মর্দ্দিণীর আদর্শে নিজ্‌কে গড়িয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলে এদেশের ছেলেগুলিও মৃত্যুঞ্জয়ী শিব হইতে পারিত"।[৮০] উনিশ শতক থেকেই বাঙলি পুরুষের মেয়েলিত্বের নির্মাণটিকে যেভাবে আত্মীকরণ করা হয়েছিল বিশ শতকে এসে সেই বিষয়টিই যে একটি সাম্প্রদায়িক মোড় নিয়েছে তা উদ্ধৃত অংশটি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু একই সাথে এই বিষয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সামনে আনা প্রয়োজন; চন্দ্রিমা চক্রবর্তী যে হিন্দুত্ববাদী পৌরুষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তা স্বাধীনতা-উত্তর গোলওয়ালকারীয় হিন্দুত্ববাদী পৌরুষের ধারণা, যার পৃষ্ঠভূমি মূলত উত্তর ভারতের গোবলয়। কিন্তু আমরা যদি বাঙালি হিন্দু সাম্প্রদায়িক পৌরুষের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি তাহলে একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় হল এই যে এখানে মেয়েলিত্ব সম্পর্কিত ভীতিটি কোনো সম্ভাব্য হুমকির মতো করে সামনে আসে না। বরং এটি ইতিমধ্যে আত্মস্থ করে নেওয়া একটি 'অপবাদ' যার থেকে নিস্তার পাওয়াই এখানে পৌরুষের মূল প্রতিবন্ধকতা। আর এই বিষয়টিকে আমরা শুধু সমকামভীতির সাথে একাত্ম না করে তুলনা করতে পারি *internalized* সমকাম্ভীতি(homophobia) এবং রূপান্তরকামভীতির (transphobia)-র সাথে। এখানে বৈরিতা শুধু মুসলমান পৌরুষের সাথে নয়, একই সাথে নিজের আত্মস্থ করে নেওয়া মেয়েলিত্বের অপবাদের সাথেও বজায় থাকতে দেখা যায়।

মুসলমান পৌরুষের থেকে প্রতিস্পর্ধা তৈরি হওয়ার আর একটি ক্ষেত্র হিসেবে আমরা ধর্মান্তরকরণের প্রসঙ্গটিকেও দেখতে পারি, যেটিকে প্রাথমিকভাবে লিঙ্গায়িত সম্পর্কের নিরিখেই দেখার ঝোঁক নজরে আসে। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়েই উদ্বেগের সঙ্গে লেখেন, "জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক বলেন, ২৪ পরগনায় যে যে ৪০ জন হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করে, তম্মধ্যে ২২ জন প্রণয়াসক্ত হইয়া, ৮ জন দরিদ্রতানিবন্ধন এবং অবশিষ্ট অন্য কারণে হিন্দু ধর্ম্ম পরিহার করিয়াছিল। জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বলেন, দিনাজপুরে প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় হিন্দু-রমণী প্রায়শঃ মুসলমানের প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া থাকে"।[৮১] মুসলমান ধর্মান্তরকরণের বিষয়টি সম্পর্কে বয়ান যদিও একই ধাঁচের তা নয়। বলপ্রয়োগের

[৮০] Proceedings of Meeting held in Dacca, 23/1928, 80E/28 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau).

[৮১] উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ধ্বংসন্মুখ জাতি*, ৭।

মাধ্যমে ইসলামে ধর্মান্তকরণের ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ যেমন অনেকের আলোচনায় পাওয়া যায়।[৪২] পাশাপাশি জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতাকেও ইসলামে ধর্মান্তরকরণের প্রধান কারণ হিসেবে দেখেছেন অনেকেই।[৪৩] দুইয়ের দশকে হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরকরণের *ন্যারেটিভ* আর শুধু প্রণয় অর্থাৎ হিন্দু মেয়েদের সহমতের সহিত ধর্মান্তরকরণ বয়ানের মধ্যে সীমিত থাকে না। সেখানে মহিলা অপহরণের বিষয়টি দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ও সাম্প্রদায়িক সম্মানের প্রশ্নে এসে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে যেমন অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখান যে আন্তঃধর্মীয় প্রেমের ক্ষেত্রে মুসলমান প্রেমিকের সাথে হিন্দু নারীর পলায়নকে অপহরণের ঘটনা হিসেবে প্রতিপন্ন করা একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে ওঠে যেখানে মেয়েটি মুসলমান পুরুষের আগ্রাসনের শিকার হিসেবে গণ্য হয়। প্রেম এবং প্রেমিকের সাথে নিজের ইচ্ছায় পলায়নের মধ্যে নারীর যে *এজেন্সি* থাকে তা হিন্দু গণমাধ্যমের তৈরি *ন্যারেটিভ* সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়।[৪৪] চারু গুপ্তা এই একই ধরনের অভিজ্ঞতা উত্তর প্রদেশের দলিত মেয়েদের ক্ষেত্রে লক্ষ করেছেন, যদিও দলিত নারী হিসেবে তাঁদের নিয়ে তৈরি হওয়া বয়ানের চরিত্র অনেকটাই ভিন্ন।[৪৫] প্রফুল্লকুমার সরকার *প্রবাসী* পত্রিকায় লেখেন, "এই সমস্যার (অস্পৃশ্যতা) সঙ্গেই জড়িত, মুসলমান কর্তৃক বলপূর্বক অপহৃতা ও নির্যাতিতা হিন্দু নারীর সমস্যা। একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত মুসলমানের কাজই হইয়াছে ছলে-বলে হিন্দু নারীকে অপহরণ করিয়া তাহার ধর্ম্ম নাশ করা। এই সমস্ত দুর্ভাগিনী হিন্দুসমাজে পতিতা বলিয়া গণ্য হয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ অথবা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন ছাড়া আর তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। ঐ শ্রেণীর মুসলমানরা ইহা জানে এবং সেইজন্যই ছলে-বলে কৌশলে যে-কোনও প্রকারে হউক, অসহায় হিন্দু নারীদিগকে তাহারা অপহরণ করিয়া তাহাদের ধর্ম্মনাশ করে এবং পরে ঐসমস্ত হতভাগিনীদিগকে মুসলমানী করিয়া নেকাহ করে"।[৪৬] এই বয়ানটি হিন্দু সম্প্রদায়কে উস্‌কে দেওয়ার একাধিক প্রয়াসের একটি যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের দক্ষতাকেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, প্রশ্ন করা হচ্ছে তার পৌরুষকেই।

---

[৪২] প্রফুল্লকুমার সরকার, "হিন্দু সমাজ কি আত্মহত্যা করিবে?," *প্রবাসী,* চৈত্র, ১৩৩৩, ৮৮৮-৮৪৬।

[৪৩] প্রফুল্লকুমার সরকার, ঐ, ১৩৩৩, ৪৮৮; প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা, সভাপতির অভিভাষণ, ২রা মে, ১৯২৫।

[৪৪] Bandyopadhyay, "Of Sin, Crime and Punishment : Elopement in Bengal, 1929."

[৪৫] Gupta, *The Gender of Caste : Representing Dalits in Print*. Chapter 5, Intimate and Embodied Desires: Religious Conversions and Dalit Women, 166-207.

[৪৬] প্রফুল্লকুমার সরকার, "হিন্দু সমাজ কি আত্মহত্যা করিবে?," *প্রবাসী,* চৈত্র, ১৩৩৩, ৮৪৪।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আর্যসমাজীদের মধ্যে অন্যতম যিনি শুদ্ধি এবং সংগঠন আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হন। তাঁর ইস্তেহারে বস্তুত শুদ্ধির মধ্য দিয়ে নিম্নবর্ণ, আদিবাসী এবং ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীকে হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত করাকেই 'ধ্বংসন্মুখ জাতি/Dying race'-এর 'উদ্ধরকর্তা/Savior'-এর প্রধান পথ হিসেবে বুঝিয়েছেন এবং তার জন্য 'সংগঠন/Hindu Sangathan'-ভিত্তিক আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যক্ত করেছেন। মূলত পাঞ্জাব এবং ইউনাইটেড প্রভিন্সেই আমরা আর্যসমাজের মাধ্যমে এই আন্দোলনগুলির বিস্তার লক্ষ করি।[৪৭] চারু গুপ্তার আলোচনাতে উত্তর ভারতে এই আন্দোলনের সাথে মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দু পৌরুষের সংযুক্তির বিষয়টি সামনে এসেছে যেখানে তিনি দেখান ধর্মান্তরকরণের বিষয়টি কীভাবে পৌরুষের প্রতিস্পর্ধা-ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।[৪৮] বাংলায় দুইয়ের দশকের মধ্যভাগে হিন্দু মহাসভার উত্থানের পর থেকে এই আন্দোলনটির প্রসার লক্ষ করা যায়।[৪৯]

---

[৪৭] Prabhu Bapu, *Hindu Mahasabha in Colonial North India, 1915-1930 : Constructing Nation and History* (London ; New York: Routledge, 2013), 47–60.

[৪৮] Charu Gupta, "Anxious Hindu Masculinities in Colonial North India: Shuddhi and Sangathan Movements," *Cross Currents* 61, no. 4 (2011): 441–54.

[৪৯] এই বিষয়ে হিন্দু মহাসভার নানা ইস্তেহার এবং বিভিন্ন মিটিংয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। Proceedings of Meetings in Burdwan, 41/1928, 80X128 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau); Proceedings of Meeting held in Dacca, 23/1928, 80E/28 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau); Report of Bengal Provincial Hindu Conference at Malda, 80Y/28 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau)। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বাংলায় হিন্দু মহাসভার প্রতিটি প্রদেশ, জেলা এবং অঞ্চলভিত্তিক এমনকি গ্রামস্তরেও মিটিংয়ের আলোচ্য সূচীগুলিতে লক্ষ করা যায় বাধ্যতামূলকভাবে মহিলা অপহরণ রোধের চেষ্টা, এর জন্য পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে আখড়াভিত্তিক শরীরচর্চা করার প্রচেষ্টা, এবং হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরকরণের জন্য শুদ্ধি আন্দোলনকে বলশালী করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। *প্রবাসী* পত্রিকাতেও এই বিষয়ে ঘন ঘন প্রতিবেদন প্রকাশ পেতে দেখা যায়। "ফরিদপুরে হিন্দুত্ব," *প্রবাসী,* ১৩৩২, *জ্যৈষ্ঠ,* ২৯৫।

কিছু কিছু নথিতে দেখা যায় শুদ্ধি এবং সংগঠন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুসলমান বিদ্বেষকে উসকে তোলার চেষ্টা করা হয় এবং জাগিয়ে তোলা হয় হিন্দু পৌরুষের প্রতিস্পর্ধা। যেমন ঢাকায় ১৯৩২ খ্রি. বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক সভায় বক্তৃতায় বলা হয়, 'এদেশ হিন্দুর দেশ। যাহারা মুসলমান তাহাদের অধিকাংশই এদেশের হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধদের বংশধর। বাহিরের মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য। 'ভারতের হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধ যেমন ভারতের অধিবাসী ভারতের মুসলমানরাও তাই" এ সত্যটী আজ মুসলমান বুঝিয়া গিয়াছে। তাই পরকীয়া স্বদেশ প্রীতির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া মুসলমান নেতা বলিতেছেন "I am first Mahommedian then Indian" মুসলমান যদি এ মনোভার ত্যাগ না করেন তাহা হইলে হিন্দুকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে "হিন্দুস্থানে আকবরের সম্মিলিত ভারত হয়তো সম্ভব হইতে পারে কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মুসলমান-ভারত আকাশ কুসুমের মতো শূণ্যে বিলীন হইয়া যাইবে"। অপর পক্ষে শিবাজীর সাধনা এটুকু বুঝাইয়া দিয়াছে হিন্দুস্থানে হিন্দুসাম্রাজ্যের সংস্থাপন অসম্ভব নয়।' Proceedings of Meeting held in Dacca, 23/1928, File. No 80E/28 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau).

এই আলোচনা যদিও শুধু হিন্দু মহাসভার মধ্যেই যে কেবল সীমাবদ্ধ থেকেছে তা নয়। পত্রপত্রিকায় এই বিষয়গুলি দুশ্চিন্তা বা জনপ্রিয় বিতর্কের বিষয় হিসেবেও প্রকাশ পেয়েছে।[৫০]

যদিও হিন্দু মহাসভার শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন দুটি হল সেইসব পরিসর যেখানে হিন্দু পৌরুষকে খেপিয়ে তোলার নজির পাওয়া যায়। যেমন ঢাকা হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের বক্তৃতার সময় বক্তা হিন্দু সাম্প্রদায়িক জিগির উসকে দেবার জন্য বলেন—

> দুর্দ্দিনে হিন্দুজাতিকে সঙঘবদ্ধ হইয়া বাঁচিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে হিন্দু মহাসভা। গত বৎসরের বাংলায় হিন্দু মহাসভার আনুকূল্যে ২৭৫ জন ক্রিশ্চিয়ান, ৮৮৭ মুসলমান, ও ৬১৫৪ জন অহিন্দুকে শুদ্ধি করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান রানা প্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতি হিন্দু বীরগণের স্মৃতি বার্ষিকী ঘোষণা করিয়া জাতিকে অতীত গৌরবের ত্যাগী বীর্য্যে ও মহত্ত্বে উদ্বোধিত করিবার মহৎ প্রচেষ্টা করিয়াছে। বস্তুতঃ বীরের স্মৃতি হৃদয়ে না জাগিলে জাতির প্রাণে সাহস ও শক্তির সঞ্চার হয় না, এবং শক্তিহীনতাই যে সকলের চেয়ে বড় অপরাধ সে কথা বর্তমান জগৎ স্বীকার করিয়াছে ও করিতেছে; তাই দার্শনিক Nietzsche ‘The weak has no right to live.’ আজ আর্য্য বীর্য্যভস্ম গায়ে মাখিয়া এই সমস্ত বীরের স্মৃতি তর্পণ করিতে হইবে।[৫১]

সংগঠন আন্দোলনকে মজবুত করে তোলার জন্য বারে বারে আলোচনা হয় আখড়ার বিস্তার ও শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে হিন্দু পুরুষকে বলশালী করে তোলার বিষয়ে, যাতে তারা মুসলমানের সাথে টক্কর দিতে সফল হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভার ১৯২৯ সালের সুরাট অধিবেশনে অভিযোগ করছেন হিন্দুরা একসময় ব্রিটিশ সৈন্যদলে ব্যাপক পরিমাণে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু সৈনিকের জীবিকায় নিযুক্তির নীতিতে বদল আসার ফলে হিন্দু সৈনিকের সংখ্যা কমেছে। তুলনায় মুসলমান সৈনিকের সংখ্যা বেড়েছে। সভাপতির ভাষণে তিনি এই নীতির বদলের জন্য সওয়াল করেন যাতে হিন্দুরা সৈনিকের চাকরিতে আসতে পারে এবং তাদের ক্ষাত্রশক্তি তার যোগ্য স্বীকৃতি পায়।[৫২] ইতিপূর্বে মালাবারের দাঙ্গার পর থেকেই হিন্দু মহাসভা হিন্দুর আত্মরক্ষার উপর জোর দিতে থাকে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মহাসভার বেনারস অধিবেশনে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যেখানে

---

[৫০] “হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ,” *প্রবাসী,* বৈশাখ, ১৩৩৩, ৪৭-৬০। জনৈক হরিপদ ঘোষাল মধ্যযুগে বাংলায় বহু মুসলমান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এই তথ্য দিয়ে হিন্দু পরম্পরায়ও ধর্মান্তরকরণ প্রচলিত ছিল তা প্রমাণ করতে চান। হরিপদ ঘোষাল, “প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পুরুষকার ও স্বদেশিকতা,” *মাসিক বসুমতি,* আষাঢ়, ১৩৩৩, ৪৮৫-৮৮।

[৫১] Proceedings of Meeting held in Dacca, 23/1928, File no. 80E/28 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau).

[৫২] Presidential Address, All India Hindu Mahasabha, Surat 30th March, The Indian Quarterly Register, Jan to June, 1929, vol 1. 356-58.

সংগঠন আন্দোলনের অংশ হিসেবে আখড়া তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়। বারো থেকে সতেরো বছরের বালকদের জন্য হিন্দু কুমার দল এবং আঠেরো এরং তার ঊর্ধ্বের বয়সের পুরুষদের জন্য হিন্দু সেবাদল তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিপূর্বে গয়া সম্মেলনে হিন্দু রক্ষা মন্ডল তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।[৫৩] ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মহাসভার বেলগ্রামের বিশেষ অধিবেশনে এর সঙ্গে বালকদের ব্রহ্মচর্য পালনের বিষয়ে জোর দেওয়ার প্রস্তাবও পাশ হয়।[৫৪] বস্তুত ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা এবং বাংলার অন্যান্য অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি হওয়ার পর হিন্দু মহাসভার শাখা দ্রুত বাড়তে থাকে যাদের মধ্যে ষাটটি মজবুত হিন্দুসভার অস্তিত্ব এই প্রদেশে লক্ষ করা যায়।[৫৫] শুধু ঢাকা শহরেই ছাব্বিশটি আখড়া এই সময় উন্মুক্ত হয় যারা লাঠিখেলা ও ছুরিখেলার ব্যাপক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রস্তুত করতে শুরু করে।[৫৬] ফরিদপুরের মাদারিপুর অঞ্চলে হিন্দুসভার স্থানীয় সমিতিগুলির উদ্যোগে শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক চালানোরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে থাকে।[৫৭] এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল হিন্দু মহাসভার শাখা সংগঠনগুলি, যেমন হিন্দু রিলিফ কমিটি, হিন্দু মিশন প্রভৃতি এই কাজে সবচেয়ে বেশি করে যুক্ত হয় এবং সামাজিক স্তরে অনেক বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। মূলত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে স্থানীয় ক্লাব, সমিতি অথবা মঠ স্তরে সামাজিক সংগঠন হিসেবে তারা ক্রিয়াশীল হয়, যেখানে মহাসভার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলি সরাসরি সামনে আসে না। যেমন বরিশালের বাখরগঞ্জের অনেক জায়গায় স্বামী আত্মানন্দ এবং নিশিকান্ত গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে শঙ্কর মঠে শারীরিকভাবে বলশালী স্থানীয় যুবকদের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যারা লাঠিখেলা দেখানোতে পারদর্শী।[৫৮] মঠের মতো ধর্মীয় সংগঠনের নৈকট্যে এই শরীরচর্চা ও বাহুবল আস্ফালনের প্রক্রিয়াটি পৌরুষ প্রদর্শনের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করে। রাফায়েল ভক্স ভারত সেবাশ্রম সংঘের এই ধরনের কার্যকলাপের প্রসঙ্গ টেনে

---

[৫৩] Bhuwan Kumar Jha, “Forging ‘Unity’: Hindu Mahasabha and the Quest for ‘Sangathan,’” article, *Proceedings of the Indian History Congress* 68 (2007): 1071.

[৫৪] Resolutions in Special Session, All India Hindu Mahasabha, Belgaum, December 27th, 1924, The Indian Quarterly Register, July to December, 1924, vol 2. 488.

[৫৫] Formation of Akharas in Bengal for Lathi Play, 354/26, 1926 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau).

[৫৬] Ibid.

[৫৭] Ibid.

[58] Ibid.

দেখিয়েছেন, এই সংগঠনগুলিতে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শারীরিক কসরতের মধ্য দিয়ে সমরলিপ্সুতার আস্ফালন কীভাবে পৌরুষ প্রদর্শনকারী পরিবেশ তৈরি করে।[৫৯]

হিন্দু পুরুষকে এই যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার সংকেত এবং পূর্বোদ্ধৃত বক্তৃতায় শুদ্ধির মধ্য দিয়ে হিন্দু সেনা বৃদ্ধির রূপকের ব্যবহার বহুভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা উপেন্দ্রনাথের বক্তব্য রোমন্থন করলে খেয়াল করতে পারব যে তিনি কিন্তু বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে শারীরিকভাবে সবল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন নিম্নবর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষদেরই। উপেন্দ্রনাথ আদিবাসীদেরও এই একই গোত্রে ফেলেছিলেন। শুধু তিনি নন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও হিন্দু মহাসভার ভাষণে বলেছেন, "এই অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত, অশিক্ষিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণী আমাদেরই রক্তমাংস। দৈহিক শক্তি বল হিন্দু সমাজে যাহা কিছু তাহা ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান, ইহাদিগকে বাদ দিয়া হিন্দুসমাজ কোথায় দাঁড়াইবে?"[৬০] এগুলি নেহাতই দু-একটি উদাহরণ মাত্র। হিন্দু মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের মধ্যে এই চিন্তার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায় আলোচ্য সময়ে যেখানে আদিবাসী, দলিত এবং মুসলমান পুরুষকেই দৈহিক বলের আধার হিসেবে দেখেছেন তাঁরা।[৬১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রান্তিকায়িত পুরুষদের দেহের যে অবধারণা

---

[৫৯] Raphael Voix, "Social Services, Muscular Hinduism and Implicit Militancy in West Bengal: The Case of the Bharat Sevashram Sangha," in *Cultural Entrenchment of Hindutva: Local Mediations and Forms of Convergence*, ed. Pralay Kanungo, Daniela Berti, Nicolas Jaoul (New Delhi: Routledge, 2011), 209–38. উনিশ শতকের অন্তিম পর্বে বিবেকানন্দ শরীরচর্চা ও হিন্দু ধর্মচর্চার মধ্যে সংযোগটির প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন যার মধ্যে শরীরচর্চার সংস্কৃতি বিশেষ গুরুত্ব পায়। Amitava Chatterjee and Souvik Nahar, "The Muscular Monk: Vivekananda, Sports and Physical Culture in Colonial Bengal," *Economic and Political Weekly* 49, no. 11 (2014): 25–29.

[৬০] প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা, সভাপতির অভিভাষণ, ২রা মে, ১৯২৫।

[৬১] এই প্রসঙ্গে গুরুসদয় দত্তের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি সায়ন্তনী অধিকারী দেখিয়েছেম বাংলায় শরীরচর্চার পরম্পরাকে উজ্জীবিত করতে গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী আন্দোলনের যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে বাংলার নানা লোকশিল্পের মধ্যে বাঙালির দৈহিক বল ও রণকুশলতার অতীত গৌরব সন্ধান করছিলেন তিনি। বাঙালি দৈহিক দুর্বলতার অপবাদ থেকে মুক্ত করতে তিনি এই লোক পরম্পরাগুলির উদ্ভাবন এবং তার চর্চার মধ্য দিয়ে ব্রতচারী আন্দোলনকে গড়তে চেয়েছিলেন। Sayantani Adhikary, "The Bratachari Movement and the Invention of a 'Folk Tradition,'" *South Asia* 38, no. 4 (2015): 656–70.

এক্ষেত্রেও যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটি হল এই যে গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশের মধ্যে রণনিপুণ নৃত্যের লক্ষণ নজরে এনেছেন। তিনি এই রণনিপুণ নৃত্যশৈলীর উৎস খুঁজে পাচ্ছেন বীরভূমের দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তিনি এই নাচ সম্পর্কে লিখছেন, "অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিলাম, ডোম-বাউরী জাতীয় নিম্নশ্রেণীর একদল লোক একধরণের নাচ করে, ইহাকে রাইবিশি নৃত্য বলে। আমি ইহাদের নৃত্য দেখিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় একটি বন্ধু আমাকে তাদের নৃত্য দেখাইবার আয়োজন করিলেন। ... যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। ... ইহাদের নৃত্য দেখিবার প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই মনে আমার সন্দেহ রহিলনা যে, এই নৃত্যকলার উৎস, জাতির জীবনের এবং জাতির ইতিহাসের একটি বিশেষ উচ্চস্থানে। ... কি সুন্দর বীরচিত ভাবভঙ্গী, -- কি

আমরা আলোচ্য প্রতর্কগুলিতে পাই সেই দেহের সাথে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টিকে যুক্ত করে দেখা হয় তা হল তার শ্রম। ফলত দলিত, আদিবাসী বা মুসলমান দেহের সাথে তার শ্রমশীলতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।[৬২] ফলে সমাজের এই অংশের জনতাকে শুদ্ধির মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মে রুপান্তরিত করার ফলেই হিন্দু সৈনিকের ছাউনি বৃদ্ধি করা সম্ভব। যে যুদ্ধের নেতৃত্বে অবশ্যই আমরা হিন্দু মধ্যবিত্ত পুরুষদের ব্যতিক্রম হিসাবে দেখব না। আমি হিন্দু মহাসভার কার্যকলাপের বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছি কীভাবে দুইয়ের দশকে বাংলায় মহাসভার নেতারা শুদ্ধি এবং সংগঠনমূলক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শরীরচর্চার সংস্কৃতি সম্পর্কে ওকালতি করতে শুরু করেন। বাংলার বহু প্রান্তে আখড়া তৈরি হয়, এবং হিন্দু পুরুষদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার কাজ করতে থাকে মহাসভা এবং তার শাখা সংগঠনগুলি।

নিম্নবর্ণের সামাজিক সংস্কার, নেতৃত্বের নৈতিকতা এবং সাবর্ণ পৌরুষ

আমরা বিশ শতকের একের দশক থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সাধারণ জ্ঞানের উত্থান নিয়ে ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। সেখানে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে যে আলোচ্য সময়ে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে যে বিষয়টি নিয়ে সবচাইতে বেশি আলোচনা হয়েছে তা হল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও জাতিভেদব্যবস্থার সংস্কার। আমরা উনিশ শতকের শেষ অংশে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রারম্ভিক পর্বে বাঙালি মধ্যবিত্তকে যে-বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে দেখেছি তা ছিল তাদের উচ্চবর্ণের অস্মিতা। বিষয়টিকে এভাবে দেখা যায় যে সেই সময় ঔপনিবেশিক পৌরুষের বিপরীতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ যে পৌরুষকে নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছিল, নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদ সেই প্রক্রিয়ায় একটি অক্ষের (অ্যাক্সিস) ভূমিকায় ছিল। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু বিশ শতকে এই অস্মিতাবোধের চরিত্রে একটা পরিষ্কার সরণ চোখে পড়ে। স্বদেশি আন্দোলনোত্তর সময় থেকেই এই ক্ষেত্রটিতে দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ করা

সংযম, -- কি আনন্দ ছন্দ...” গুরুসদয় দত্ত, *বাংলায় বীরযোদ্ধা রায়বেঁশে, বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য* (কলকাতা : ছাতিম বুক্স্‌, ২০০০ খ্রি.), ২৩১।

[৬২] এই প্রসঙ্গে উমা চক্রবর্তীর নিম্ন উদ্ধৃত মন্তব্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখছেন, “The essence of caste also is the requirement that laboring bodies be reproduced in order that they can be subordinated to maintain the upper castes in their purity. All the injunctions of dharma are predicted upon the laboring lower castes and their subordination and the reproduction of the laboring being as well as the reproduction of the person’s subordination.” Uma Chakravarty, *Gendering Caste : Through a Feminist Lens* (New Delhi: Sage Publications, 2018), 14.

যায়, যার কেন্দ্রীয় কারণ সম্ভবত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান। বিশ শতকের আলোচ্য অংশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী পরিসরে জাতিভেদ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নগুলি আত্মপ্রকাশ করে, তা উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী বয়ান থেকে স্পষ্টত ভাবেই আলাদা। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের, দীগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পাশাপাশি বহু অনামি অখ্যাত ব্যক্তিদের বয়ান আমাদের নজরে আসে যাঁরা হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মজবুত করার স্বার্থেই বাংলায় জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে তাঁদের অস্বস্তি নথিভুক্ত করতে থাকেন। দুইয়ের দশকের সূচনায় ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধির উত্থান এবং তাঁর অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মসূচীগুলিও মধ্যবিত্ত বাঙালির একাংশকে প্রভাবিত করে।[৬৩] একই সময় প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে দলিত সম্প্রদায়গুলির অংশগ্রহণের দাবি জোরালো হতে থাকে এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও এই দাবিদাওয়াগুলিকে মান্যতা দিতে শুরু করে।[৬৪] রাজনীতির এই পটপরিবর্তন মধ্যবিত্ত হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিকূল হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে সেমন্তি ঘোষ দেখিয়েছেন যে ১৯২৫ পর্যন্ত বাঙালি হিন্দু রাজনীতি আদর্শগত দিক দিয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু বাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক যাত্রাপথে বিরোধাভাস আরও স্পষ্ট হতে থাকে।[৬৫] জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে দলিতরা ভারতীয় নির্বাচনমূলক রাজনীতিতে এক সংগঠিত অংশ হিসেবে সামনে আসতে শুরু করেন এই একই সময়ে।[৬৬] বিপরীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভারতীয় আইন সভায় সংরক্ষণের বিবর্ধমানতা, তাঁদের সাথে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক বৈরিতা, দাঙ্গা, এমনকি পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে হিন্দু জমিদার-মহাজন এবং মুসলমান কৃষকদের মধ্যে দাঙ্গাগুলির ক্রমশ সাম্প্রদায়িকীকরণ,[৬৭] দুইয়ের দশক থেকেই সাবর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে

---

[৬৩] এই বিষয়ে দুইয়ের দশকে বহু পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যেমন— "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও জাতীয় অবনতি," *প্রবাসী,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, ৩০৯-১০; "মহাত্মা গান্ধীর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম," *বঙ্গশ্রী,* মাঘ, ১৩৩৯, ২৪৬; শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, "মহাত্মা গান্ধী ও জাতিভেদ," *মাসিক বসুমতি,* চৈত্র, ১৩৩০, ৮২২-২৬।

[৬৪] Sekhar Bandopadhyay, *Caste, Politics, and the Raj : Bengal, 1872-1937,* (Calcutta: K.P. Bagchi, 1990). 149.

[৬৫] Semanti Ghosh, *Different Nationalisms: Bengal, 1905-1947,* New Delhi: Oxford University Press, 2016. লেখিকার এই বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য Chapter II, Promises and Politics of a New Nation, 1912–25, 92-151.

[৬৬] Sekhar Bandopadhyay, *Caste, Politics, and the Raj : Bengal, 1872-1937,* 164-65.

[৬৭] বাংলায় বিশ শতকের প্রথম থেকে দাঙ্গার ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক চরিত্রটি সুরঞ্জন দাস বিস্তারিতভাবে উত্থাপন করেছেন, যেখানে সুগত বসু দেখিয়েছেন যে তিনের দশক থেকে এই দাঙ্গাগুলি কীভাবে গ্রামীণ কৃষি সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ককে সাম্প্রদায়িক করে তোলে। Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal: 1905-1947* (Delhi: Oxford University Press, 1993);

চাগাড় দিতে থাকে। দুইয়ের দশকের মাঝামাঝি বাংলায় হিন্দু মহাসভার উত্থান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে হিন্দু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার কাজ শুরু করে। জয়া চ্যাটার্জী দেখান যে দুইয়ের দশক থেকে হিন্দু নেতারা উচ্চবর্ণ এবং পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দূরত্ব কমানোর যে নীতি নেন তাতে হিন্দু মহাসভাকে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়।[৬৮] যদিও হিন্দু মহাসভার এই নীতিতে প্রথম থেকেই বহু স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়।[৬৯] এই সংযোগের যে দিকটিকে আমরা বিশেষ করে নজরে আনতে চাইছি তা হল জাতিব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কিছু সংস্কারের মাধ্যমে দলিত এবং নিম্নজাতির মানুষকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অংশ করতে চাওয়ার চেষ্টা।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে বিশ শতকের একের দশক থেকেই বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে মোড় ঘুরেছিল, সেখানে হিন্দু উচ্চবর্ণ মধ্যবিত্ত চিন্তাবিদদের চোখে নিম্ন জাতিগোষ্ঠীগুলি হিন্দু সমাজের সবচেয়ে করুণ, দুর্দশাগ্রস্ত, দুর্বল, পুরুষত্বহীন অসংরক্ষিত অংশ হিসেবে ধরা দেয়। ফলত এখানে নিম্নবর্ণের এই পশ্চাদপদতাকে জাতীয়তাবাদী সমাজসংস্কারী হিন্দু সাবর্ণ নেতৃত্ব স্পষ্টভাবেই লৈঙ্গিক দৃষ্টি দিয়েই বিচার করে যার কেন্দ্রে থাকে দলিত পুরুষের শরীর।

Sugata Bose, *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure, and Politics, 1919-1947* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 181–232.

[৬৮] Joya Chatterji, Bengal Divided, 192.

[৬৯] রিচার্ড গর্ডন দেখিয়েছেন, ১৯১৫ সালে হিন্দু মহাসভা তৈরির পিছনে একটি হিন্দু মঞ্চ তৈরির অনেক দিনের খোঁজ কাজ করেছিল। সংস্কারবাদী সংগঠন হিসেবে পরিচিত আর্য সমাজ এবং গোঁড়া গোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্বকারী সনাতন ধর্ম সম্মেলনের মধ্যে অনেক প্রচেষ্টার ফলে যে সমঝোতায় আসা সম্ভব হয়েছিল তার থেকেই হিন্দু মহাসভার জন্ম। ফলত এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দুটি গোষ্ঠীর কেউই তাদের পূর্ব পরিচিতি এবং কর্মসূচিগুলিকে ত্যাগ করেননি। পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁরা নানা ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে সংঘাতে রত থেকেছেন। এই বিষয়ে ইন্দ্র প্রকাশের বয়ান থেকে জানা যায় এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি নিয়ে এই গোষ্ঠী দুটির মধ্যে বিরোধ তৈরি হয় তার মধ্যে অন্যতম হল নিম্নজাতিকে কী পদ্ধতিতে হিন্দু বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এই প্রসঙ্গটি। বিশেষত এখানে যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে তা হল অস্পৃশ্যতাকে কীভাবে দেখা হবে ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে মেলামেশার ধরন কী হবে এবং এক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিগুলিকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে। হিন্দু মহাসভা এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসেবে এড়িয়ে যেতে পারেনি, কারণ এর সাথে হিন্দু সংখ্যার বিষয়টি গভীরভাবে যুক্ত ছিল। ফলত একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে তারা বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্যমত তৈরির চেষ্টা করে এসেছে। হিন্দু মহাসভার প্রতিটি সম্মেলনে তাই এই বিষয়ে আলোচনা এবং বিতর্ক লক্ষ করা যায়। ভূবন কুমার ঝা দেখান এ-বিষয়ে নানা রাজনৈতিক রণকৌশল এবং শব্দের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে নেতৃত্ব দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সেতু নির্মাণের প্রয়াস চালাতেন। Richard Gordon, “The Hindu Mahasabha and the Indian National Congress, 1915-1926,” Modern Asian Studies 9, No. 2. 1975, 160; Indra Prakash, *A Review of the History and Work of the Hindu Mahasabha and Hindu Sangathan Movement*, (New Delhi: Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha, 1938), 161-223; Bhuwan Kumar Jha, “Forging ‘Unity’, 1079.

উপেন্দ্রনাথ হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের কারণ হিসেবে মূলত যে বিষয়টিকে দায়ী করেছেন তা হল সমাজে অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদব্যবস্থার উপস্থিতি। মুসলমান সমাজের অগ্রগতি এবং হিন্দু সমাজের পশ্চাদপদতার যে ধারণাটি আলোচ্য সময়ে তৈরি হয়েছিল, তার প্রধান কারণ হিসেবে উপেন্দ্রনাথের মতো অনেকেই চিহ্নিত করেছিলেন হিন্দু সমাজের জাতিভেদব্যবস্থাকে।[৭০] জাতিভেদহীন মুসলমান সমাজকে 'সাম্যবাদী' সমাজ বলে উল্লেখ করেছেন অনেকে যা তাঁদের মতে মুসলমান অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করেছে।[৭১] বিপরীতে তাঁরা দেখেছেন জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক ব্যধির শিকার হিন্দু সমাজকে, যার ফলে দলিত ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায় সবধরনের বঞ্চনা ও পশ্চাদপরতার শিকার। দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দু মধ্যবিত্তের এই বিশেষ সহানুভূতির মধ্য দিয়ে তাঁরা জাতিব্যবস্থায় যদিও ব্যাপক কোনো রূপান্তর আনতে চাননি। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে ১৯১০-এর পর থেকে তাঁরা হিন্দু সমাজের প্রথা এবং গঠনের ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন আনার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে হিন্দুর সংজ্ঞায় কিছু পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। সেখানে জাতপাতের পার্থক্যকে বজায় রেখেও হিন্দু সমাজের মূলগত ঐক্যকে সুনিশ্চিত করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। হিন্দুদের এমন একটি সমাজ রূপে তুলে ধরা হয় যাঁরা জাতপাতের বিষয়ে নমনীয় মনোভাব পোষণ করেন এবং সামাজিক নানান বৈচিত্র্যকে ধারণ করতে পারেন। যদিও সুমিত সরকার এই বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে গোচরে এনেছেন যে সমকালীন জনপরিসরে এই বিষয়ে যে আলোচনাগুলি লক্ষ করা যায় সেখানে জাতপাত নির্ভর সামাজিক বৈষম্যগুলিকে বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই বৈষম্যগুলিকে অটুট রেখেই হিন্দু ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ খোঁজা শুরু হয়।[৭২] শুধু বাংলায় নয় এই প্রবণতা সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতেও লক্ষ করা যায়। ক্রিস্টোফার জেফ্রিলট দেখিয়েছেন যে হিন্দু মহাসভা বর্ণব্যবস্থার পুনঃব্যাখ্যার মাধ্যমে হিন্দু সমাজের মধ্যে ঐক্য এবং সমানাধিকার সম্পন্নতার কথা বললেও তাঁদের পক্ষে সামাজিক উচ্চতর ক্রমকে কোনোভাবেই শিথিল করা সম্ভব ছিল না।[৭৩]

---

[৭০] প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা, সভাপতির অভিভাষণ, ২রা মে, ১৯২৫; '"শুদ্ধি" ক্রিয়ায় হিন্দুর অধিকার," *ক্ষত্রিয়,* পৌষ-চৈত্র, ১৩৩৩, ২১৩-২১; "হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ," *প্রবাসী,* বৈশাখ, ১৩৩২, ৪৯-৬০।

[৭১] প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা।

[৭২] Sarkar, *Beyond Nationalist Frames : Postmodernism, Hindu Fundamentalism, History*. 84-85

[৭৩] Christophe Jaffrelot, *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to the 1990s : Strategies of Identity-Building, Implantation and Mobilisation* (London: Princeton University Press, 1996), 21.

আলোচ্য দুই দশকের হিন্দু উচ্চবর্ণ পরিচালিত পত্রপত্রিকা দেখলে স্পষ্ট হয় - এখানে মূল লক্ষ ছিল জাতপাত জনিত ব্যাপক বৈষম্যের ক্ষেত্রে একটা প্রলেপ লাগানো, দলিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নয়, বর্ণহিন্দু নেতৃত্বই হিন্দু সমাজের অভিভাবকের ভূমিকাটি সুনিশ্চিত করতে চায়। এক্ষেত্রে পশ্চাদপদ দলিত সমাজের মানোন্নয়নের নৈতিক দায়িত্বটি তাঁরা গ্রহণ করতে চান যার মধ্যে পিতৃসুলভ বাসনাগুলি লক্ষ করা যায়। এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির আবির্ভাবের প্রেক্ষিতে দলিত সম্প্রদায়কে হারানোর ভয় এই বর্ণহিন্দু রাজনৈতিক পরিসরে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে থাকে। ফলত দলিত সম্প্রদায়ের সাথে রাজনৈতিক বৈরিতার যে লক্ষণগুলি সামনে আসে তার অনুসন্ধান এবং সমাধানের পথ তৈরি করার তৎপরতা এই চিন্তাবিদদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। মহেন্দ্রনাথ দত্ত নামক জনৈক লেখক এই বিষয়টি যথার্থভাবেই লক্ষ করেন যে নমঃশূদ্রদের মতো সংগঠিত গোষ্ঠী হিন্দু উচ্চবর্ণের সাথে রাজনৈতিক সম্বন্ধ তৈরিতে অনিচ্ছুক। এই কারণে তাঁরা স্বরাজের ধারণায় বিশ্বাসী নন কারণ, "তাদের অনেকেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে, স্বরাজ অর্থ তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা"।[৭৪] পরিসংখ্যানের নিরিখে সাবর্ণ হিন্দুরা সংখ্যায় যে কম এবং তুলনায় দলিত-আদিবাসীরা সংখ্যায় যে অনেক বেশি এই বিষয়টি তাঁদের অনেককেই বিচলিত করে। ১৯২১ সালের আদমসুমারির ভিত্তিতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক্ষেত্রে দুটি উদ্বেগকে *প্রবাসী* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু অধ্যুষিত জেলাগুলির সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মুসলমান অধ্যুষিত জেলার তুলনা টেনে তিনি দেখান যে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। ফলত পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি যেখানে তাঁর কাছে দুশ্চিন্তার একটি কারণ, তেমনি অন্যটি হল বাঁকুড়ার মতো পশ্চিমবঙ্গের যে জেলাগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম, সেখানেও জনবণ্টনের চেহারা তুলে ধরলে দেখা যায় যে বাগ্‌দি এবং সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সর্বাধিক।[৭৫] সুতরাং হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে এই পর্যবেক্ষণগুলি বিবিধ আশঙ্কার জন্ম দেয়। এক্ষেত্রে দলিত আদিবাসি সমাজকে হিন্দু বন্ধনির মধ্যে আনার প্রচেষ্টা বিশ শতকের দুইয়ের দশক থেকে একটি

---

[৭৪] মহেন্দ্রনাথ দত্ত, "পাবনায় নমঃশূদ্র-সমস্যা," *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, ২২৭।

[৭৫] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু জেলা," *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩৩০, ৮৮৩।

সংস্কার আন্দোলনের চেহারা নিতে থাকে, যেখানে হিন্দু মহাসভা অথবা হিন্দু মিশনগুলির মতো হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করে।[৭৬]

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে মুসলমান পুরুষ যদি বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের কাছে এক অপর হিসেবে চিহ্নিত হয়, তাহলে দ্বিতীয় অপর হয়ে উঠতে দেখি দলিত পুরুষকে। এখানে মুসলমান পৌরুষের সাথে যেমন দূরত্ববৃদ্ধির দিকে জোরটা পড়ে, অন্যদিকে তেমনি দলিত সমাজের সাথে দূরত্ব কমানোর প্রতি তাগিদ বাড়তে থাকে। কিন্তু দূরত্ব কমানোর উদ্দেশ্যটি একটি সমানাধিকারসম্পন্ন (egalitarian) হিন্দু সমাজ তৈরির দিকে ছিল না, বরং ছিল দলিত সমাজের মানোন্নয়নের মধ্য দিয়ে হিন্দুর সংখ্যা সুনিশ্চিত করার দিকে, যে কর্মকাণ্ডে এক দয়াশীল নৈতিক দায়িত্বের ভূমিকায় আমরা অবতীর্ণ হতে দেখি হিন্দু সাবর্ণ মধ্যবিত্ত নেতৃত্বকে। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্পষ্টভাবে দলিতদের প্রতি উচ্চবর্ণের নৈতিক অবস্থানকে প্রদর্শন করে। তিনি শিক্ষিত বাঙালি জিজ্ঞাসা করছেন—

> বাগ্‌দীর জীবন কিরূপ? শারীরিক অবস্থায় রুগ্ন, অভাব, অনাহারে, পান দোষে ও অন্যান্য দুষ্কার্য্য তাহার স্বাস্থ্যকে একেবারে ভঙ্গ করিয়া ফেলে। মানসিক অবস্থায় পাশ্বাদির অপেক্ষা সে শ্রেয়ঃ কিসে? শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর। নীতি বিজ্ঞানেও তথৈবচ। ইহারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্পেষিত – বিধ্বস্ত। বহুবৎসরের অবনত অবস্থা ইহাদিগের হৃদয় হইতে সদ্বৃত্তি সমূহকে বিনষ্ট করিয়াছে।
>
> যে সকল কথা বাগদীদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা নিম্ন শ্রেণীর সকল জাতির পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। মুচি, কেওড়া, বাউড়ি, তেওর, পোদ, রাজবংশী, চন্ডাল, মারো, ধোবা, চামার, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি জাতি – যাহাদিগের সংখ্যা সমগ্র হিন্দু সমাজে শতকরা ৫৬ জন হইবে – সমাবস্থাপন্ন।[৭৭]

---

৭৬ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভায় অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের সংঘাত চোখে পড়ে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভা কনফারেন্সের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ সনাতনী গোষ্ঠীর পক্ষে কথা বলেন। তাঁর মত ছিল হিন্দু মহাসভা শাস্ত্র সম্পর্কে যথার্থ সম্মান দেখায়নি এবং ব্রাহ্মণ সমাজকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বিফল হয়েছে। তার পরের বছরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভা কনফারেন্সের সভাপতি এন. সি. কেলকার বক্তৃতায় বলেন হিন্দু জাতপাতের বিভাগগুলি থেকে বের হয়ে এসে চতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজ গড়ার দিকে জোর দিতে হবে। এই সম্মেলনে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই প্রস্তাব আনেন যে সকল বাঙালি হিন্দুকেই ব্রাহ্মণ হিসেবে দেখতে হবে। প্রচুর বিবাদের পর এই প্রস্তাবের ওপর নির্বাচন হয় যাতে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়। Bengal Provincial Hindu Sabha Conference, Mymensingh, 21st April, 1928. The Indian Quarterly Register, Jan to June, 1928, vol I, 432; Bengal Provincial Hindu Sabha Conference, Dacca, 27th August, 1929. The Indian Quarterly Register, July to December, 1929, vol 2. 336, 339.

৭৭ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্বংসোন্মোখ জাতি, ৪৫।

দুইয়ের দশকেও হিন্দু উচ্চবর্ণের মধ্যে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রবণতাটি অব্যাহত থাকতে দেখি। যদিও তার সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টি সংযোজিত হতে শুরু করে তা হল দলিত রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটি নিয়ে এক ধরনের ভীতি। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু শুদ্ধি অন্দোলনের সপক্ষে সওয়াল করে *প্রবাসী* পত্রিকায় 'হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণের একটি কারণ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শিরোনামেই লেখক একদম সোজাসুজি মূল প্রশ্নটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে কেন নীচু জাতির মানুষদের হিন্দুধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় বা ত্যাগ করে থাকলে পুনরায় ফিরে আসা উচিত। প্রবন্ধকার খুব পরিচিত কারণটিই উল্লেখ করেছেন যে "ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসকলে এবং ভারতীয় সাধুসন্তদিগের বাণীতে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ্ নিহিত আছে, তাহা অতুলনীয়,"[78] কিন্তু লেখক দলিত সম্প্রদায়ের অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া এবং তা প্রতিরোধের বিষয়টি উত্থাপন করতে গিয়ে যে পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছেন তা বেশ অনন্য। প্রবন্ধটি সাবর্ণ এবং দলিত দুই শ্রেণীকেই সম্বোধন করে লেখা। হিন্দু নেতৃত্বকে তিনি হিন্দুর পরিসংখ্যান দেখিয়ে সচেতন করছেন, সমাজে উচ্চবর্ণ হিন্দুর সংখ্যা কম এবং দলিতদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। অতএব উচ্চবর্ণকে সামাজিক উদারতা দেখিয়ে অস্পৃশ্যতা ত্যাগ করতে হবে। তাহলে হিন্দু সমাজে যে একতা তৈরি হবে তাতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য হুমকি থেকে সাবর্ণ হিন্দু সুরক্ষিত থাকতে পারবে। অন্যদিকে দলিত সম্প্রদায়কে লেখক বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে মহত্তম ধর্মীয় সামাজিক পরিবেশে বাস করার সুবিধে থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করবে। এই ধর্মীয় পরিবেশেই তাদের সবচাইতে বেশি উন্নতির সম্ভাবনা। আফ্রিকার মানুষের মতো তারা (দলিতরা) 'জঙ্গলি' 'বর্বর' প্রজাতি নয়। তাই ঠিক শিক্ষা দিতে পারলে দলিতদেরও সামাজিক উত্থান সম্ভব। প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রায় ছয় বছর আগে এই একই পত্রিকায় অনেকটা একই ধাঁচে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন জনৈক বিনোদলাল ঘোষ। মূলত ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ জেলার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লেখেন যে সেই অঞ্চলে এতদিন ধরে সমস্ত জমিদারি নিজেদের পেশীশক্তি দিয়ে রক্ষা করে এসেছে নমঃশূদ্র সর্দাররা। আদমসুমারি থেকে দেখা যায় যে তারাই এই অঞ্চলের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। কিন্তু বর্তমানে নমঃশূদ্ররা বর্ণহিন্দুদের ঘৃণা করা শুরু করেছে এবং তাদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতাও লক্ষ করা যাচ্ছে। এই দুশ্চিন্তা থেকেই তিনি বর্ণহিন্দুদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে লিখছেন, "আমরা জিজ্ঞাসা করি উচ্চবর্ণ হিন্দুগণ নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণের

---

[৭৮] "হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণের একটি কারণ," *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, ২৯৪।

নৈতিক আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক উন্নতির জন্য এপর্যন্ত কি করিয়াছেন?”[৭৯] বিনোদলাল এক্ষেত্রে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে যে পরামর্শগুলি দিচ্ছেন তার মধ্যে প্রধান পরামর্শ হল, নমঃশূদ্র গ্রামে বালকদের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয় তৈরি করতে হবে। তাছাড়া তাদের জন্য ব্যায়ামাগার নির্মাণ, নৈশ বিদ্যালয় তৈরি, দাতব্য চিকিৎসালয় বানানো এবং সমবায় ব্যাংক নির্মাণের পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি। ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে বাঁচানোর জন্য পাঞ্জাব প্রদেশে আর্য সমাজ এই একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অস্পৃশ্য মেঘ নামক পশ্চাদপদ জনজাতির উন্নয়নের প্রক্রিয়া কীভাবে শুরু করেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন আর এক লেখক। তিনি লিখছেন, “আর্য সমাজ বুঝিয়াছে একমাত্র শিক্ষা বিস্তারেই মানুষকে মানুষ করিয়া তোলে; ...তাই তাঁহারা মেঘদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। দেশের ভিতর স্থানে স্থানে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কয়েকটি কারখানাও স্থাপিত হইয়া সূতা, কামার, দর্জির কাছে মেঘদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে।”[৮০] যদিও লেখক প্রথমেই উল্লেখ করেছেন এই গোষ্ঠীর জাতিগত জীবিকাই হল ছুতার, তাঁতি, দর্জি-র কাজ। এমনি এক পরিকল্পনার প্রতিধ্বনি শোনা যায় মহেন্দ্রনাথ দত্ত নামক জনৈক লেখকের প্রবন্ধে। পাবনা জেলায় সীতারাম সরকার নামক এক ‘অশিক্ষিত’ নমঃশূদ্র নেতার কথা তিনি উল্লেখ করেন যাঁর উদ্যোগে সেই অঞ্চলে প্রচুর নমঃশূদ্র ধর্মান্তরিত হচ্ছেন। লেখকের মতে নমঃশূদ্রদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়েই তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন খ্রিস্টান মিশনারিরা। তাই পূর্ববঙ্গের বহু জেলায় *অবনত জাতির উন্নতি বিধায়িনী সমিতি* প্রতিষ্ঠা করার সংবাদ দিচ্ছেন লেখক। এই সমিতির মাধ্যমে অনুন্নত গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে শাস্ত্র, নৈতিক শিক্ষা এবং মূলধারার বিদ্যাচর্চার প্রসার ঘটাতে তৎপর হয়েছে এই সংগঠন।[৮১] এই সমিতির কর্মকাণ্ডে দেখা যায় হিন্দুসভার সদস্য সত্যচরণ শাস্ত্রী, সত্যমাতা নামক কাশ্মীরী সন্ন্যাসিনী, মাদ্রাজের ব্যায়াম শিক্ষক ও ব্রহ্মচর্য প্রচারক অধ্যাপক নাইডুকে সংযুক্ত থাকতে।[৮২] আলোচ্য পর্বে আমরা গ্রামে গ্রামে হিন্দু মহাসভার যে কর্মসূচী এই সময় ছড়িয়ে পড়তে দেখি তা হল দলিত সম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে ইস্কুল, পড়াশুনোর জন্য বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রক্রিয়া

---

[৭৯] বিনোদলাল ঘোষ, “নমঃশূদ্র জাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি?,” *প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩১৬, ৫০০।

[৮০] হেমেন্দ্রলাল রায়, “নিম্নশ্রেণীয়ের উন্নয়ন,” *প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩২১, ৭৮৩।

[৮১] মহেন্দ্রনাথ দত্ত, “পাবনার নমঃশূদ্র সমস্যা,”, *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, ২২৩-২৭।

[৮২] মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ, ২২৩-২৭।

চালু করা। হিন্দু মহাসভার তৎকালীন সম্পাদক পদ্মরাজ জৈনকে লেখা এমন বহু চিঠির হদিশ মেলে যেখানে দুঃস্থ নমঃশূদ্র মানুষরা তাঁদের জন্য বিদ্যালয় এবং এইধরনের কল্যাণকর উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান খোলার আবেদন জানান। মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তির আবেদনও আসতে থাকে, যা থেকে বোঝা যায় কিছু দূর পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার শাখা সংগঠন হিন্দু রিলিফ কমিটি পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় কিছু সাফল্যও পেয়েছিল।[৮৩] কিন্তু সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশ হিসেবে তাঁদের সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা এখানে লক্ষ করা যায় না। বরং দ্বৈপায়ন সেন মনে করেন যে এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলিতদের রাজনৈতিক অধিকারের সমর্থন করা উচ্চবর্ণের কাছে অভাবনীয় ছিল, কারণ তাহলে সকল 'হিন্দুর' জন্য সরব হওয়ার যে ভণিতা সাবর্ণ নেতৃত্ব করছিলেন তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না।[৮৪] তিনি দেখান পুণা চুক্তিকে বাংলার কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার কোনো উচ্চবর্ণের নেতাই মেনে নিতে পারেননি। বাংলার প্রাদেশিক আইন সভায় এই বিষয়ে প্রবল বিরোধ ওঠে। এই সকল নেতৃত্বের মধ্যে তাঁরাও ছিলেন যাঁরা দলিত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারের বহু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।[৮৫]

আমরা সাবর্ণ হিন্দু নেতৃত্বের সামাজিক আধিপত্যের ঝোঁকের মধ্যে যে পালাবদলের সূচনা হতে দেখি, উক্ত প্রেক্ষাপটে তার জটিল চরিত্রটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই আধিপত্যবাদী মানসিকতা শুধুই জাতিবাদী নয় একাধারে লৈঙ্গিক, পৌরুষকেন্দ্রিকও (masculinist) বটে। কারণ যেমন একদিকে সাবর্ণ হিন্দু নেতৃত্ব দলিত সম্প্রদায়কে তাঁদের রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে দেখতে চাননি, জাতিব্যবস্থার সংস্কারকে শুধুই তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বুঝতে চেয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি দলিত পুরুষদের সাবর্ণ নেতৃত্ব দেখেছেন নৈতিকভাবে পতিত, অশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞানহীন হিসেবে, যাঁরা পারম্পরিকভাবে বলশালী, কখনো কখনো রণলিপ্সু হিসেবে পরিচিত হলেও বর্তমানে 'শারীরিক শক্তিতে দুর্বল' হয়ে চলেছেন। সাবর্ণ নেতৃত্বের চিন্তায় বেশিরভাগ

---

[৮৩] Letter from Kamal Kumar Das, Orakandi, Faridpur to Padmaraj Jain, Secretary of Hindu Relief Committee, Calcutta. Hindu Mahasabha, Faridpur, 64/1925, File No 279H/25 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau); Letter from Murari Mohan Ghorui of Midnapur to the Replaced Secretary of the Bengal Provincial Hindu Sabha, Hindu Mahasabha, Midnapur, 15/1925, File no. 279A/25 (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau)

[৮৪] Dwaipayan Sen, *The Decline of the Caste Question : Jogendranath Mandal and the Defeat of Dalit Politics in Bengal* (New Delhi: Cambridge University Press, 2018), 25.

[৮৫] Ibid., 48–49.

সময়েই তাঁরা পরিচিত হয়েছেন নির্বোধ, কখনো কখনো অপরাধপ্রবণ পুরুষ হিসেবে। আর প্রতিটি উচ্চবর্ণের নেতৃত্বকে তাঁদের প্রতি দয়াশীল হতে আহ্বান করার এই প্রকল্পের মধ্যেই পৌরুষপূর্ণ নৈতিক শ্রেষ্ঠতার অস্মিতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আর সাবর্ণ পৌরুষের এই নৈতিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠায় উপযোগী হয়ে ওঠে ব্রহ্মচর্যের ধারণা, কারণ ব্রহ্মচর্য হল সেই আশ্রমজীবন যা সাবর্ণ পুরুষকে আদর্শ, নৈতিক ও পিতৃসুলভ হিন্দু হয়ে ওঠার পাঠ দিয়ে থাকে। এই প্রেক্ষিতে আমরা সাবর্ণ হিন্দু আধিপত্যকামী পৌরুষের প্রতীকী উপস্থিতি লক্ষ করতে পারি যার কেন্দ্রে আছে ব্রহ্মচর্যের মতো বর্জনমূলক (exclutionary) জাত নির্ভর আচার।[৮৬] আর এর মধ্য দিয়ে সাবর্ণ পুরুষ তাঁর নৈতিক তথা রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন, তৈরি করেন মুসলমান এবং নিম্নবর্ণ-দলিত অপরের।

আলোচ্য সময়ে ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে যে তালিমি বইগুলি লেখা হয়েছে সেগুলি বর্ণাশ্রম প্রথাকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে মান্যতা দিয়েছে। যেমন কৈলাশচন্দ্র নিয়োগী তাঁর *ব্রহ্মচর্য* শিরোনামের বইটির ভূমিকায় লিখছেন, হিন্দুজাতির মেরুদণ্ড যে বর্ণাশ্রমপ্রথা তা এখনও অনেকের বোঝার বাইরে। কারণ আগের মতো ব্রহ্মচর্য আশ্রম আর নেই। আর এই ব্যবস্থাকে বহাল করার নিমিত্ত তিনি কলম ধরেছেন।[৮৭] এই ধরনের বইগুলিতে জাতিবাদী সমাজের সমালোচনা কোথাও চোখে পড়ে না, ফলত তা এক অর্থে স্থিতাবস্থার সপক্ষেই সওয়াল করে। অস্পৃশ্যতার বিরোধী হলেও আমরা আলোচ্য সময়ের সাবর্ণ নেতৃত্বদের থেকে খুব কম দৃষ্টান্তই পেতে পারি যেখানে জাতিভেদ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।[৮৮] হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতর্কে যে বিষয়টি অনেক স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থেকেছে তা হল অস্পৃশ্যতা জনিত সামাজিক দূরত্বের অবসান ঘটিয়ে হিন্দুদের

---

[৮৬] উচ্চবর্ণের বর্জনমূলক জাতভিত্তিক আচারগুলি পৌরুষকেন্দ্রিক প্রতীকী আধিপত্যের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করতে পারে। এই প্রতীকী আধিপত্য প্রসঙ্গে উমা চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখছেন, “An important aspect of caste system is that those who have dominated the means of production have also tried to dominate the means of symbolic production. This symbolic hegemony then allows them to control the very standards by which their rule is evaluated, so that the perspective of the lower castes has no place in it.” Chakraborty, *Gendering Caste : Through a Feminist Lens*, 7. বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার এবং তার প্রতীকী গুরুত্ব কীভাবে পৌরুষের নির্মাণ করে সেই বিষয়ে সম্প্রতি জররোড হুইটেকার আলোচনা করেছেন। Jarrod L. Whitaker, *Strong Arms and Drinking Strength: Masculinity, Violence, and the Body in Ancient India* (New Delhi: Oxford University Press, 2011).

[৮৭] কৈলাশচন্দ্র নিয়োগী, *ব্রহ্মচর্য্য* (আনুমানিক ১৯২২ খ্রি.)

[৮৮] এমন একটি রচনা, “বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও জাতীয় অবনতি”, যেখানে জনৈক লেখক জাতিভেদ ব্যবস্থার অবসান দাবি করছেন এমন গান্ধির সংস্কারবাদী আন্দোলনেরও কড়া সমালোচনা করছেন। “বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও জাতীয় অবনতি,” *প্রবাসী*, ১৩৩২, জ্যৈষ্ঠ, ৩০৯-১০।

মধ্যে এক সামাজিক ঐক্য তৈরি করার চেষ্টা। প্রদীপকুমার দত্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বয়ানের মধ্যে যে বিষয়টি লক্ষ করেছেন তা হল তিনি জাতিব্যবস্থার উচ্চতর ক্রমকে অস্বীকার করলেও হিন্দু সমাজে তার অস্তিত্বকে নাকচ করেননি। বরং বিবিধ উপাসক সম্প্রদায়ের মতোই জাতিব্যবস্থাকেও হিন্দু সমাজের বিবিধতার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। যদিও জাতিব্যবস্থার উচ্চতর ক্রমকে অস্বিকার করে জাতিব্যবস্থার বাস্তবিক সামাজিক বৈষম্য জনিত *টেনশনকে* পাশ কাটিয়ে যাওয়া উপেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং এই বিষয়ে উপেন্দ্রনাথের আলোচনায় নানা *টেনশন* লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই প্রয়াসের মাধ্যমে তিনি আদতে যেটা করার চেষ্টা করেছিলেন তা হল জাতিপ্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে তাকে হিন্দু সমাজের বৈচিত্র্যের প্রকাশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা।[৮৯] উপেন্দ্রনাথের এই ভাবনাটি খানিকটা সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পায় *প্রবাসী* পত্রিকার জনৈক লেখকের রচনায়। তিনি লেখেন, "হিন্দুধর্ম্মে এই বিশেষত্ব যদিও তাহাকে ইস্‌লামধর্ম্মের ন্যায় মতের ঐক্য-জনিত একটি দৃঢ়-সম্বদ্ধ শক্তিতে পরিণত হইতে দেয় নাই, তথাপি তাহার সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনশীলতা তাহাকে অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা দিয়াছে। তাহারই ফলে অতিপ্রাচীন এশিরিয়া, মিশর ও বাবিলন, এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা লুপ্ত হইয়া গেলেও, সুপ্রাচীন ভারতীয় আর্য্যজাতি আজিও তাহার বিশিষ্ট সভ্যতা ও ঐতিহ্য লইয়া জগৎসমক্ষে সগর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে"।[৯০] আর লেখক এই 'সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনশীলতা'-র যে প্রসঙ্গ এখানে আনছেন তাই হল জাতিভেদ সম্পর্কে হিন্দু নেতৃত্বের সাম্প্রতিক নৈতিক দায়িত্ব। যে পরিবর্তন আনার মধ্য দিয়ে তাঁরা হিন্দুধর্মকে জীবিত রাখার দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু এই দায়িত্বটি তাঁদের হাতেই কারণ এই ধরনের সামাজিক পরিবর্তন আনতে হলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন উচ্চবর্ণ হিসেবে তাঁরাই সেই জ্ঞানচর্চার অধিকারী থেকেছেন। এভাবেই উচ্চবর্ণের পৌরুষের কাছে ব্রহ্মচর্য একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিকল্প (paradigm) হিসেবে প্রতিভাত হয়, আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী ভুমিকা রাখে। এখানে একাধারে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং পৌরুষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় একে অপরের পরিপূরকের ভূমিকা পালন করে। ফলত ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত জীবনবোধ চর্চার মধ্য দিয়ে হিন্দু সাবর্ণ পুরুষ এই সামাজিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুর সঙ্কট মোকাবিলায় সক্ষম হবেন এই আকাঙ্ক্ষা আলোচ্য পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর ব্রহ্মচর্য এখানে সাবর্ণ

---

[৮৯] Datta, *Carving Block: Communal Identity in Early Twentieth-Century Bengal*, 36-37

[৯০] "হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ," *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩৩২, ৫৭।

পৌরুষের প্রতীকী আধিপত্যকামিতার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে। পাশাপাশি সাবর্ণ পৌরুষের বিপরীতে দলিত এবং মুসলমান পৌরুষ অপরের ভূমিকায় নির্মিত হয়।

হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তায় পৌরুষের এই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাষ্য যেভাবে বিকশিত হয় তার প্রতি সমকালীন বাংলার দলিত সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল সেই দিকটি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত না করলে অবশ্য আলোচ্য বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদিও এই বিষয়টি সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা তো আছেই, পাশাপাশি সেই আলোচনাকে বিস্তৃত করার পরিসরও এখানে সীমিত। সেক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের নেতৃত্বের মধ্যে যে পুরুষালি আধিপত্যকামী প্রবণতার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করলাম তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান করা যেতে পারে।অথবা অন্যভাবে বললে এই ব্রহ্মচর্য নির্ভর ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষের পাশাপাশি পৌরুষ সম্পর্কে দলিত সম্প্রদায়ের কোনো ভাষ্য তৈরি হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে আমরা প্রাথমিক কিছু অনুসন্ধান করতে পারি। বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে নিম্ন জাতিগোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহণের সামগ্রিকভাবে কোনো নির্দিষ্ট ধাঁচ অনুধাবণ করা মুশকিল, এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবনারও অতীত। কিন্তু বাংলার প্রেক্ষিতেও লক্ষ করা যায় যে অনেক দলিত গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের বিশ্বদর্শনকে সামগ্রিকভাবে বর্জন করতে চেয়েছেন,[৯১] অথবা সমাজে নিজেদের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত হয়েছেন।[৯২] আবার বিশ শতকের হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিও তাঁদের সার্বিক সমর্থন আদায় করা সর্বদা সম্ভব হয়নি।[৯৩] কখনো আবার কিছু দলিত সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ফলত এই বিষয়টি তুলনায় অনেকটাই জটিল। বাংলার জাতিভিত্তিক রাজনীতির এই জটিল সমীকরণকে অস্বীকার না করেও আমরা বাংলার তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পিছিয়ে থাকা দলিত জাতিগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিষয়ে কিছুদূর পর্যন্ত আলোচনা

---

[৯১] Partha Chatterjee, “Caste and Subaltern Consciousness,” in *Subaltern Studies VI Writings on South Asian History and Society*, ed. Ranajit Guha (Delhi: Oxford University Press, 1989), 169-209.

[৯২] বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবনতাকে ‘ideological community’ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন যেটা তার মতে অনবরত পরিবর্তনশীল একটি চেতনা। Sekhar Bandyopadhyaya, *Caste, Protest and Identity in Colonial India : The Namasudras of Bengal, 1872-1947* (Richmond, Surrey: Curzon, 1997), 6, 8, 63.

[৯৩] Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Culture, and Hegemony : Social Domination in Colonial Bengal* (New Delhi: Sage Publications, 2004).

এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কারণ এঁদের মধ্যে একাধারে জাতভিত্তিক আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাথে সংযোগের কিছু লক্ষণ ঐতিহাসিকরা নির্দিষ্ট করে লক্ষ করেছেন।[৯৪]

বিশ শতকের গোড়াতে জাতভিত্তিক যে সংগঠিত আন্দোলনগুলি দানা বাঁধতে শুরু করে,[৯৫] তার মধ্যে বাংলায় রাজবংশীরা অন্যতম দলিত সম্প্রদায় যাঁরা ক্ষত্রিয় সমরপটু জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দাবি করে সংগঠিত হতে শুরু করেন। ক্ষত্রিয় আথবা ব্রাহ্মণ পরিচয়কে দাবি করে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনগুলিকে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ কারণেই অনুকরণমূলক 'সংস্কৃতকরণ'[৯৬]-মুখী প্রবণতা বলতে রাজি নন। বরং তাঁর মতে এটি সেই সামাজিক বিধির প্রতি দলিতদের প্রতিবাদ যা তাঁদেরকে সমাজে নীচু অবস্থান ও হীন সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে এবং কিছু বিশেষ ধরনের শ্রম চাপিয়ে দিয়েছে।[৯৭] অন্যদিকে ফিলিপ কন্সটেবেল প্রায় কাছাকাছি মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে দলিত সম্প্রদায় যুদ্ধের পরম্পরার প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করে ক্ষত্রিয় পরিচয় দাবি করতে থাকলে এই প্রবণতাটিকে যদি উচ্চ জাতিপরিচয় অনুকরণের প্রয়াস মনে করা হয়, তাহলে অনেকগুলি ভুল করা হবে। কারণ এখানে ধরেই নেওয়া হয় দলিত সৈনিকরা অন্যদের যুদ্ধের পরম্পরাকে অনুকরণ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের মধ্যে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। এতে করে এই ধারণার জন্ম হয় যে দলিত সিপাইরা অন্যদের তৈরি প্রাচ্যবাদী, ঔপনিবেশিক বা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সংস্কৃতির সাথে অনবরত খাপ খাইয়ে নিতে চায়। নিজেদের উদ্যোগে তারা কোনো ধরনের সামাজিক বয়ান তৈরি করে উঠতে পারে না। ফলত দলিত সংস্কৃতি কোথাও গিয়ে অধিকন্তু হিসেবে রয়ে যায়, বৃহত্তর ঔপনিবেশিক জ্ঞান নির্মাণে তাদের স্বাধীন ও

---

[৯৪] রাজবংশী আন্দোলনের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন স্বরাজ বসু। তিনি দেখান ক্ষত্রিয় জাতিগত পরিচয়কে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি রাজবংশী সম্প্রদায়ের আন্দোলনকে একটি পর্যায় পর্যন্ত সংগঠিত করেছিল। এই প্রেক্ষিতে তিনি লক্ষ করেন, ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও হিন্দু মহাসভার রাজনীতির সাথে তারা নিজেদের সংযুক্ত করেছিল। Swaraj Basu, *Dynamics of a Caste Movement: The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947* (New Delhi: Manohar, 2003), 106; শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ও হিন্দু মহাসভার সাথে তিরিশের দশকের পর থেকে রাজবংশীদের নৈকট্য লক্ষ করেছেন। Bandyopadhyay, *Caste, Culture, and Hegemony : Social Domination in Colonial Bengal*, 214-15.

[৯৫] Lucy Carroll, "Colonial Perceptions of Indian Society and the Emergence of Caste(s) Associations," *The Journal of Asian Studies* 37, no. 2 (1978): 233–50. Bandyopadhyaya, *Caste, Politics, and the Raj : Bengal, 1872-1937*, 142-99.

[৯৬] সংস্কৃতায়নের তত্ত্ব এম এন শ্রীনিবাস বিকশিত করেন। M N Srinivas, "A Note on Sanskritization and Westernization.," *Far Eastern Quarterly* 15, no. 4 (1956): 481–96.

[৯৭] Bandyopadhyaya, *Caste, Protest and Identity in Colonial India : The Namasudras of Bengal, 1872-1947*, 34.

স্বকীয় অংশগ্রহণের ধারণাটিকে ভেবে ওঠা যায় না।[৯৮] রাজবংশী আন্দোলনেও সংস্কৃতকরণের থেকে বৃহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করেছে যার মধ্যে অবশ্যই আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস অন্যতম।

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজবংশীরা তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয়কে সামনে রেখে আন্দোলন সংগঠিত করেন। ফলত তাঁরা নিজেদের যে বংশপঞ্জি তৈরি করতে শুরু করেন সেখানে নিজেদের মূলত সমরকুশল জাতি হিসেবে পরিচয় দেন। অতএব সমরকুশল জাতিত্বের সাথে ক্ষত্রিয় পরিচয়কে সংযুক্ত করার তাঁদের এই প্রয়াস পৌরুষের এক বিশেষ রূপকে ব্যক্ত করার শামিল হয়ে ওঠে, যার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের জাতিগত আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। নিজেদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা একাধিক ক্ষত্রিয় আচার, যেমন পইতে ব্যবহার, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সংস্কারের মতো অনেক নীতি গ্রহণ করেন। একাধারে তাঁদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির এই প্রয়াসে নানা জাতনির্ভর আচারকে গ্রহণ করার পাশাপাশি বহু আধুনিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা যায়। যেমন রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ তৎপরতা, কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত আর্থিকভাবে অনগ্রসর রাজবংশীদের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির জন্য ক্ষত্রিয় সমিতির তত্ত্বাবধানে সমবায় তৈরি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ব্রিটিশ সমরবাহিনীর অংশ হিসেবে সৈনদলে যোগ দেওয়ার প্রবণতা, এবং সর্বপরি পিছিয়ে থাকা জাতি হিসেবে সংগঠিত হয়ে রাজনীতিতে অংশ নেওয়া। উত্তর ভারতের দলিত জাতিগুলির এই ধরনের কার্যকলাপগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সম্প্রতি চারু গুপ্তা দেখিয়েছেন যে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে প্রকটভাবে না হলেও জাতিগতভাবে পৌরুষকে প্রতিপন্ন করার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস কার্যকারী থেকেছে।[৯৯] আমরা রাজবংশীদের কার্যকলাপের মধ্যেও এই প্রয়াস প্রত্যক্ষ করতে পারি। বিশেষ করে বিশ শতকের শুরুর দশক থেকে তাঁরা সংগঠন তৈরি করে, সম্মেলন-সমিতিতে মিলিত হয়ে,

---

[৯৮] Constable, "The Marginalization of a Dalit Martial Race in Late Nineteenth and Early Twentieth Century Western India," 442.

[৯৯] দলিত পুরুষদেহের প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে সম্প্রতি চারু গুপ্তা ঔপনিবেশিক ভারতে পৌরুষ নিয়ে গবেষণার পরিচিত অবধারণাকে কিছুটা বিঘ্নিত করেছেন। একদিকে তিনি দেখান ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী বয়ানে দলিত শরীরের ধারণাকে মেয়েলি, অপরাধপ্রবণ, নির্বোধ, অনুগত এমন একাধিক পরস্পরবিরোধী চরিত্রে চিত্রিত করা হয়েছে। এই ধরনের অবধারণাগুলি তৈরির পিছনে কাজ করেছে দলিত শরীরের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা। কিন্তু এর বিপরীরে উত্তর ভারতে দলিত পরিচয় এবং দলিত আন্দোলনের দিকে নজর ফিরিয়ে গুপ্তা দেখেছেন যে দলিতরা তাঁদের সামাজিক মর্যাদা এবং পরিচিতির জন্য যেভাবে নিজেদের প্রকাশ করছিলেন তার মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে পৌরুষের একটি দলিত ভাষ্য প্রকাশ পায়। Gupta, *The Gender of Caste : Representing Dalits in Print*. Chapter 4, Feminine, Criminal, or Manly? Imaging Dalit Masculinities, 111-65.

বক্তৃতার মাধ্যমে অথবা অসংখ্য প্রবন্ধ, পত্রিকা এবং পুস্তক প্রকাশিত করে যেভাবে নিজেদের মতামত জনসমক্ষে নিয়ে আসেন তার মধ্যে আমরা তাঁদের পৌরুষ নির্মাণের প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

রাজবংশীদের ক্ষেত্রেও বলা যায় জাতিগত আত্মমর্যাদা এবং পৌরুষ নির্মাণের প্রক্রিয়াটি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকেছে। এই প্রক্রিয়াটি বোঝার ক্ষেত্রে আমরা রাজবংশী আন্দোলনের মধ্যে দুটি বিষয়কে আলাদাভাবে উল্লেখ করতে পারি। এক, শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা এবং দুই, ব্রিটিশ ভারতীয় সৈনদলে অংশগ্রহণের তাগিদ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে তাঁদের সংগঠন 'ক্ষত্রিয় সমিতি' বিশ শতকের একের দশক থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সংগঠনের অধীনে রাজবংশীদের ঐক্যবদ্ধ করতে নেতৃত্ব দেন পঞ্চানন বর্মন। স্বরাজ বসু দেখিয়েছেন রাজবংশীদের মধ্যে খুব সামন্য সংখ্যক মানুষই আর্থিকভাবে অগ্রসর এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং এই অগ্রসর এলিট অংশের উদ্যোগে রাজবংশী সমাজের মধ্যে ক্ষত্রিয় সমিতি সংস্কারের কাজগুলি শুরু করে।[১০০] এই কাজগুলির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগগুলি অন্যতম। মূলত কৃষিমজুর এবং কিছু ক্ষেত্রে সম্পন্ন কৃষিজীবী এই সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থান করতেন। ক্ষত্রিয় সমিতির বহু অধিবেশনে এই বিষয়টিকে তাঁদের অগ্রসরতার পরিপন্থী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য সমিতি নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, হস্টেল নির্মাণ এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থ সাহায্যের প্রচেষ্টাগুলি অন্যতম।[১০১] এই উদ্দেশ্যে রাজবংশী ছাত্রদের জন্য একটি সমিতি তৈরি হয়। এই পন্থাগুলি গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় সমিতি এবং তার এলিট সদস্যরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং জাতি হিসেবে রাজবংশীদের আত্মমর্যাদা সুনিশ্চিত করতে স্বচেষ্ট হন।[১০২] রাজবংশীরা শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা কীভাবে অনুভব করছিলেন তা দিনাজপুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক মৃগেন্দ্রনাথ দেব

[১০০] Basu, *Dynamics of a Caste Movement : The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947*, 46-47.

[১০১] "ক্ষাত্রছাত্র সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য পরিচালনার নিয়মাবলী," *ক্ষত্রিয়,* বৈশাখ, ১৩৩১, ১৭-২০; "ক্ষত্রিয় সমিতি ও ছাত্র সাহায্য," *ক্ষত্রিয়,* বৈশাখ, ১৩৩১, ২০-২১; "ক্ষত্রিয় ছাত্র সমিতি - সপ্তম সম্মেলন ১৩৩০ (প্রতিবেদন)," *ক্ষত্রিয়,* জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, ১৭-২১; *ক্ষত্রিয়,* শ্রাবণ, ১৩৩১ ৬৫-৬৮; "ক্ষাত্রছাত্র বোর্ডিং," *ক্ষত্রিয়,* আষাঢ়, ১৩৩১, ৪৮; "ক্ষাত্র-ছাত্র সমিতির ৯ম বার্ষিক অধিবেশন ১৩৩২," *ক্ষত্রিয়,* ফাল্গুন, ১৩৩২, ২৬১-৬৪।

[১০২] ক্ষত্রিয় সমিতি বহু স্থানে ছাত্রাবাস তৈরি, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ছত্রদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে। "ছাত্র সাহায্য," *ক্ষত্রিয়,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, ৪৪; "ক্ষাত্রছাত্র বোর্ডিং," *ক্ষত্রিয়,* মাঘ, ১৩৩২, ২৩৮-৩৯।

বর্মনের আবেদনপত্র থেকে অনুমান করা যায়। তিনি লিখছেন, “দিনাজপুর বাসী ক্ষত্রিয় মাত্রেই কৃষিজীবি।অন্য কোন প্রকার কাজ করিবার সেরূপ শক্তি সামর্থ্য বা বিদ্যা বুদ্ধি নাই। কেন শক্তি সামর্থ্য বা বিদ্যা বুদ্ধি নাই? কারণ অর্থাভাব। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে সকলকে ভাবিতে হইবে যাহাতে আমাদের সমাজ সুশিক্ষিত হইয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে ও জন সমাজের হিত সাধন করিতে পারে এবং ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি যুদ্ধ অভ্যাস করিতে পারে এমন ব্যবস্থা করা উচিত। ... আমার বিবেচনায় বিবিগঞ্জ ক্ষত্রিয় মন্ডল সমিতিতে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে বহু উপকার সাধিত হইবে তদ্‌বিষয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই।”[১০৩]

পাশাপাশি এই প্রবণতাটির বিষয়েও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য উক্ত উদ্যোগগুলি নেওয়ার পাশাপাশি ক্ষত্রিয় সমিতির মুখপত্র *ক্ষত্রিয়* পত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় যেগুলি মূলত উপদেশমূলক রচনা।[১০৪] যদিও এই রচনাগুলির সবকটি রাজবংশী সদস্যদের রচিত নয়। অনেক সময়েই কোনো হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার অথবা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যক্তিত্বরা *ক্ষত্রিয়* পত্রিকার উদ্দেশে এই ধরনের রচনা প্রেরণ করেছেন। এই ধরনের উপদেশমূলক রচনার বেশিটাতেই আদর্শ ‘হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থার’ বিকাশে রাজবংশী তথা ক্ষত্রিয়দের অবদান স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়। তার মধ্যে আসে আর্যজাতি হিসেবে ক্ষত্রিয়দের বীরত্বের কাহিনী, বর্তমানে হিন্দুদের দুরবস্থার কথা এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খোঁজার মতো পরিচিত পুনরুত্থানবাদী পরিচিত ছক। এই উদ্দেশ্য থেকেই ছাত্রদের জন্য ব্রহ্মচর্যের আদর্শ প্রচারের প্রবণতাও লক্ষ করা যায় *ক্ষত্রিয়*-র পাতায় যেখানে পরাধীন ভারতমাতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য ‘হীনবল সন্তানদের’ বলীয়ান হয়ে উঠতে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা বাতলে দেওয়া হয়।[১০৫] হিন্দু পৌরুষ সুনিশ্চিত করতে ব্রহ্মচর্যের *মেটাফোর* এই রচনাগুলিতে যেভাবে উঠে আসে তা এককথায় হিন্দু আধিপত্যবাদী পৌরুষেরই প্রতিফলন। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে ক্রমশ বিশ শতকের দুইয়ের দশক থেকে ক্ষত্রিয় সমিতির সাথে হিন্দু মহাসভার নৈকট্যও লক্ষ করা যায়। *ক্ষত্রিয়* পত্রিকায় এমন বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত

[১০৩] ক্ষত্রিয় সমিতির ষোলতম বার্ষিক সম্মেলনের প্রতিবেদন থেকে গৃহীত– “দিনাজপুর বাসী ক্ষত্রিয় ভ্রাতৃগণের সমীপে একটি আবেদন,” *ক্ষত্রিয়, জ্যৈষ্ঠ*, ১৩৩২, ৪৭।

[১০৪] রিপুজয় সিংহ, “শিক্ষা ও সংস্কার”, *ক্ষত্রিয়,* পৌষ-চৈত্র, ১৩৩৩, ১০২-০৫; বিপিনচন্দ্র রায়, “ক্ষাত্র-ছাত্র ভ্রাতৃবৃন্দের সমীপে নিবেদন,” চৈত্র, *ক্ষত্রিয়,* ১৩৩২, ২৮৬; মহেন্দ্রনারায়ণ বর্মা, “শিক্ষা সঞ্চালন,” *ক্ষত্রিয়,* শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩২৭, ৭৫-৮০; নবদ্বীপচন্দ্র রায় বর্মা, “সামাজিক অবনতি,” *ক্ষত্রিয়,* শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২৭, ৬৬-৭১।

[১০৫] “ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠায় টি, এল ভাস্বানী,” *ক্ষত্রিয়,* বৈশাখ, ১৩৩২, ২১-২৩। হরিদ্বারের একটি গুরুকুল আশ্রমের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারী টি এল ভাস্বানীর বাণী।

হতে থাকে যেখানে হিন্দুর ক্ষয়িষ্ণুতা এবং সঙ্কটের ধারণাগুলির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।[১০৬] যদিও এই নৈকট্য যে দীর্ঘদিন একই মাত্রায় অব্যাহত থাকে তাও না। পাশাপাশি ওই প্রবণতার বিপরীতেও বেশ কিছু আকর্ষণীয় মতামত আমরা উঠে আসতে দেখি যা থেকে বোঝা যায় রাজবংশী আন্দোলনে পিছিয়ে থাকা জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার তাগিদ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে। আন্দোলনের নেতা পঞ্চানন বর্মন দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয় সমিতির ষোলতম সম্মেলনে রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে 'শিক্ষাশ্রম' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যেখানে পঞ্চানন বলেন—

> আমরা ক্ষত্রিয়। যদি আমাদের ক্ষাত্রভাব, ক্ষাত্রগুণ, ক্ষাত্রধর্ম্ম, ক্ষাত্রতেজ বল, উদ্যম, উৎসাহ না থাকে তবে আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব থাকে না, হীন হইয়া পড়ি। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত গুণ ও ভাবগুলি জাগাইয়া আমাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইতে হইবে, সেই জন্য শিক্ষা দীক্ষার আবশ্যক এবং তজ্জন্য উপযুক্ত শিক্ষার আবশ্যক; উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া না হইলে ঐ রূপ তেজোবল সম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব আমাদের একটী শিক্ষা আশ্রমের আবশ্যক। এই জন্য একটি শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পরের সাহায্য লইয়া বা ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহ প্রাপ্ত সমিতিতে সঞ্চিত অর্থ দ্বারা এইরূপ ক্ষাত্রভাব জাগাইতে পারা যায় না, শিক্ষা হইতে পারে না, আমাদের নিজের উৎসাহ, উদ্যম ও অর্থ দ্বারা এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করতে হইবে।[১০৭]

শিক্ষার পাশাপাশি রাজবংশী আন্দোলনে পৌরুষ এবং আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আর একটি প্রচেষ্টা দেখা যায় নিজেদের সমরপটু জাতি হিসেবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। জাতি হিসেবে ক্ষত্রিয় পরিচয় দাবি করার মধ্য দিয়েই বিশ শতকের গোড়ায় রাজবংশী আন্দোলন সংগঠিত হয়ে ওঠে।[১০৮] এজন্য সেই সময় বহু কুলজী রচনা করা হয়। একাধারে আদমসুমারিতেও জাতি হিসেবে তাদের ক্ষত্রিয় রূপে পরিচিত করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়।[১০৯] নিজেদের এই ক্ষত্রিয় পরিচিতি সুনিশ্চিত করতে এইসময় থেকে তাঁরা নানাভাবে নিজেদের সমরকুশলী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় কুলপরিচয়কে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে *ক্ষত্রিয়* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এই বিষয়ে নানা পৌরাণিক কাহিনী প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে সমিতির পত্রিকাগুলিতে ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক অথবা স্থানীয় সম্মেলনের যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় সেখানে ক্ষত্রিয়

---

[১০৬] "হিন্দুর প্রাচীন গৌরব," *ক্ষত্রিয়,* চৈত্র, ১৩৩১, ২৪৯-২৫১; ""শুদ্ধি" ক্রিয়ায় হিন্দুর অধিকার," *ক্ষত্রিয়,* পৌষ-চৈত্র, ১৩৩৩, ২১৩-২১।

[১০৭] "ক্ষত্রিয় সমিতির ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন সংবাদ—শিক্ষাশ্রম," *ক্ষত্রিয়,* শ্রাবণ, ১৩৩২, ৯৫।

[১০৮] Basu, *Dynamics of a Caste Movement : The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947,* 59.

[১০৯] Ibid., 65-66.

হিসেবে তাদের বীরত্বের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়। এই প্রবণতাগুলি একই সঙ্গে জাতি হিসেবে তাঁদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শারীরিক বল তথা পৌরুষকে ব্যক্ত করার তাগিদকেও প্রকাশ করে।

রাজবংশীদের নির্ভীকতা, আত্মবলিদান ক্ষমতা এবং বীরত্বর প্রমাণস্বরূপ আর একটি দিককে সামনে আনার প্রবণতা তাঁদের আন্দোলনের মধ্যে প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। সেটি হল ব্রিটিশ সৈন্যদলে দাখিল হওয়ার মধ্য দিয়ে রাজবংশী জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের রাজবংশী শৌর্য এবং বীরত্বের পরিচায়ক হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতা। যেমন **১৯১৯** খ্রিস্টাব্দে রংপুরে ক্ষত্রিয় সমিতির দশম অধিবেশনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হওয়ায় রাজা পঞ্চম জর্জকে অভিবাদনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই সুযোগে যুদ্ধে রাজবংশী সৈনিকদের বলিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের প্রতিবেদনে এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে লেখা হয়—

> ক্ষাত্রপ্রতিষ্ঠার লাভের সুযোগ পাইয়া সমাজের ধন্যংমন্য ভাব রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের লাট বাহাদুরের নিকট বিজ্ঞাপন – "মহাসমরে প্রাণ দিয়া সম্রাটের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ও ক্ষাত্রচিত কর্ম্ম করিতে পারিয়া ক্ষত্রিয় সমাজ আজি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে। ক্ষত্রিয়-সমাজের এই ধন্যংমন্য ভাব ও অটলা রাজভক্তি বাঙ্গলার লাট বাহাদুরের নিকট বিজ্ঞাপিত করা হউক।"[১১০]

এই প্রস্তাবের সূচনায় সম্মেলনের সভাপতি বলেন,

> "আমরা ক্ষত্রিয়। কিন্তু নামে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় নহে। চিন্তায় ভাবে প্রাণে ও কর্ম্মে যে ক্ষত্রিয়, সেই প্রকৃত ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় আমরা, বহুদিন ক্ষাত্রোচিত কর্ম্ম করিতে সুযোগ না পাইয়া স্বকর্ম্মচ্যুত, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, মলিন ও দীন হইয়া ছিলাম। ভগবান সুপ্রসন্ন; রাজা অনুকূল; তাই, নরেশের ডাকে ভবেশের ডাক বোধ হইল। ক্ষত্রিয় সমাজে ক্ষাত্র ভাবের উন্মেষ হইল। মলিন প্রাণে দিব্য তেজঃ জ্বলিয়া উঠিল। ভীরুতা অলসতা চলিয়া গেল। প্রাণ উজ্বল তেজোময় হইল। প্রকৃত প্রাণ জাগিয়া চেতিয়া উঠিল। প্রকৃত পুরুষ, প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইবার সুযোগ ঘটিল। ক্ষাত্র তেজোভাবের ভরে ক্ষাত্র যুবকগণ স্বধর্ম্ম সাধন জন্য, পৈতৃকধন ক্ষাত্র প্রতিষ্ঠার উদ্ধারের জন্য যুদ্ধার্থ চলিয়া গেল। মহাসমরে ক্ষাত্রতেজে পরম ভাস্বর নানা স্থানে আত্ম নিয়োগ করিয়া চরিতার্থ হইল।"[১১১]

যুদ্ধের সময় *ক্ষত্রিয়* পত্রিকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজবংশী জাতিভুক্ত সৈনিকদের বীরত্বের কাহিনী মুদ্রিত হয়। সেই সঙ্গে রণক্ষেত্র থেকে সৈনিকদের পাঠানো চিঠিও অনেক সময় *ক্ষত্রিয়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

---

[১১০] *ক্ষত্রিয় সমিতি দশম সম্মিলনী, কার্য্য-বিবরণী,* ১৯২০, ৫।

[১১১] *ঐ,* ৬।

প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে একটি পত্রলেখক রাজবংশী যুবকদের উদ্দেশ করে লেখেন, "আমরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় সন্তান – ক্ষত্রিয়। পরমেশ্বরের কৃপায় এখন আমাদের সেই সুপ্ত ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষার সময় আসিয়াছে। সুতরাং এখন শত শত ক্ষত্রিয় বর্ত্তমান থাকিতে গুর্খা প্রভৃতি অন্য সৈন্যদলে থাকিতে ঘৃণা বোধ করিতেছি। সত্বরই একটা ক্ষত্রিয় রেজিমেন্ট খুলিয়া সমাজের গ্লানি দূর করিতে যত্নপর হউন। সমাজকে ও স্বজাতি প্রেমিক ভ্রাতৃগণকে আমাদের এই গভীর মর্ম্ম বেদনা জানাইতে অবহেলা করিবেন না।"[১১২] এখানে রাজবংশী যুবকদের সৈনিকের জীবিকায় যোগদানের জন্য যেমন উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা নজরে আসে, আবার সৈনিক হিসেবে তাদের প্রশিক্ষণের দাবিও তোলা হয় অনেক সময়।[১১৩] এই প্রবণতাগুলির পিছনে শুধু রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় নির্ভীকতার প্রমাণের তাগিদই প্রকাশ পায় তা নয়। পাশাপাশি সৈনিকের জীবিকায় অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে পিছিয়ে থাকা জাতি হিসেবে সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি অর্জনের তাগিদকেও কাজ করতে দেখা যায়।

রাজবংশীদের জাতিভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যে পৌরুষ এবং আত্মমর্যাদার প্রতি যে ধরনের ঈপ্সা লক্ষ করা যায় তার চরিত্র বিশ শতকে হিন্দু উচ্চবর্ণের সাম্প্রদায়িক প্রতর্কে প্রতিফলিত পৌরুষের ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাষ্য থেকে অনেকটাই পৃথক। হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতর্কে দলিত শরীরকে যেভাবে আলোচনার কেন্দ্রে আনার প্রচেষ্টা হয় তার মধ্যে তার প্রতি নজরদারি, তাকে নিয়ন্ত্রণ এবং শরীরকে আরও প্রজননশীল করে তোলার মধ্য দিয়ে হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির বাসনা কার্যকরী থাকে। কিন্তু রাজবংশীদের বয়ানে ক্ষাত্রশক্তির ধারণাকে যেভাবে তাদের পরিচিতির সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত করে দেখার চেষ্টা করা হয় তার মধ্যে প্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা অর্জনের প্রয়াস স্পষ্ট।

---

[১১২] "ক্ষত্রিয় বীরগণের প্রাণের অনুভূতি ও বেদনা," জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, *ক্ষত্রিয়,* ১৩২৭, ৫৫।

[১১৩] "বাঙ্গলায় বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন," *ক্ষত্রিয়,* কার্তিক, ১৩৩১, ১৪২-৪৪; "ভারতে সামরিক বিদ্যালয়," ফাল্গুন, *ক্ষত্রিয়,* ১৩৩১, ২৩৬-৩৭।

বীর্যবান পৌরুষ, প্রজননশীল পৌরুষ

আমরা প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করেছি কীভাবে উনিশ শতকের আটের দশক থেকে ব্রহ্মচর্য একটি আদর্শ ভারতীয় যৌনজীবন যাপনের পদ্ধতি হিসেবে প্রাধান্যবাদী সামাজিক নিয়মের মান্যতা পেতে শুরু করেছিল এবং তার মধ্য দিয়ে *হেটেরোনরম্যাটিভ* পিতৃতন্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতার বয়ান নির্মাণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আমরা যদি শুধু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বয়ানগুলিতেই নিবিষ্ট হই, তাহলে দেখতে পাব যে বিবাহপূর্ব এবং পরবর্তী জীবনে ব্রহ্মচর্যকে প্রচলন করতে চাওয়ার মূল তাগিদটি আসছে *semen anxiety* অর্থাৎ বীর্য অপচয় সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা থেকে। প্রজিত বিহারী মুখার্জী দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক বয়ানে বাঙালি ভদ্রলোক পুরুষকে যেভাবে মেয়েলি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল, তা এই *semen anxiety* তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নেয়।[১১৪] এর ফলে এই ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে 'অধিক' অথবা 'অপ্রয়োজনীয়' বীর্যক্ষয় বাঙালি পুরুষের পৌরুষত্বহানির কারণ। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। সেখানেই আমরা দেখব যে হস্তমৈথুন, পায়ুকাম, সন্তান উৎপাদন ব্যতীত যৌনাচার, সমকাম ইত্যাদির প্রতি উনিশ শতক থেকে যে ভীতিগুলি তৈরি হচ্ছিল, তার সঙ্গেও এই *semen anxiety* কীভাবে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে উক্ত 'কুঅভ্যাস' এবং মেয়েলিত্বের অপবাদ থেকে নির্মীয়মান জাতির ভবিষ্যৎ, পুরুষকুলকে রক্ষার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বয়ানগুলিতে ব্রহ্মচর্য হয়ে ওঠে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ উপায়। এমন প্রেক্ষাপটে আমরা হিন্দুর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণকে সখারাম গণেশ দেউস্কর, প্রফুল্লকুমার সরকার বা রাধারমণ মুখোপাধ্যায় যেভাবে দেখছিলেন, তার সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের ধারণায় একটা যোগাযোগ লক্ষ্য করতে পারি। এই সমস্ত লেখকরা হিন্দুর প্রজননগত স্বাস্থ্যের ভগ্নদশার জন্য হিন্দুর যে সাংস্কৃতিক তথা নৈতিক অবক্ষয়কে দায়ী করছেন, সেই আদর্শ সাংস্কৃতিক-নৈতিক জীবনযাপনের মডেলটির সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের ধারণাটি খুব সহজেই খাপ খেয়ে যায়। আর এইভাবেই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনা জুড়ে যেতে দেখা যায়। দুটি দিক থেকে এই সংযোগটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। এক, একটি আদর্শ সাবর্ণ হিন্দু জীবনযাপনের মডেল তৈরির চেষ্টা, যে বিষয়ে ঠিক আগের পর্বেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি

[১১৪] Projit Bihari Mukharji, *Nationalizing the Body: The Medical Market Print and Daktari Medicine* (New York: Anthem Press, 2009).

হল হিন্দুদের বংশবৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে নির্মীয়মান হিন্দু পৌরুষের উদ্বেগকে প্রশমিত করার চেষ্টা করা।

১৯১১ সাল নাগাদ জনৈক স্বামী রঘুনন্দন *ছাত্রজীবন* নামে একটি বই লেখেন।[১১৫] আদর্শ ছাত্রজীবন কেমন হওয়া উচিত তা জনতাকে বোঝানোর জন্যই রঘুনন্দনের এই বই। লেখক শুরুতেই বলছেন—

> দীর্ঘকাল - প্রায় ৬/৭ শতবৎসর হইতে বিলাসপরায়ণ জাতির সহিত একত্রাবস্থান প্রযুক্ত, আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিলাসিতা প্রবেশলাভ করিয়াছে। ... তাহারি ফলে নানা বিষয়িনী অভাব আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এ অভাব কেবল অর্থ বা আহার্য্যের নহে। মানুষকে অথবা জাতিকে উন্নত হইতে হইলে, যে যে বিষয় আবশ্যক আমাদের তাহার প্রায়গুলিরই অভাব। ইহাদের মধ্যে, আবার অনেকগুলি অনাবশ্যক অভাব, কল্পনা দ্বারা জাগাইয়া নিয়াছি। ফলে-অভাবসমষ্টীর সম্মিলিত শক্তিদ্বারা আমাদের বোধশক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছে সুতরাং কোনও বিষয়ে সূক্ষ্ম তথ্যানুসন্ধানে সক্ষম হওয়া, ইদানিং আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ... যাঁহারা, যে মহামনস্বী ঋষিপুঙ্গবেরা, যুগ-যুগান্তর কালস্থায়ী সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি, এবং তদুপরিস্থ অত্যুচ্চ শিখর সংবলিত সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে অক্লান্ত কর্ম্ম, অসাধারণ-আত্মত্যাগী, অসীম-উৎসাহবান ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষেরা, শত বিপ্লবের প্রবলাভিঘাতে ও সুরক্ষিত, যুগ-যুগান্তর ব্যাপী আর্য্য জাতির জাতীয় জীবন সংগঠন করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষেরা ইহার ভবিষ্যৎ পতনাশঙ্কা ও পুনর্গঠন প্রয়োজন বোধে, তাহার গঠন প্রণালীও অমরাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।[১১৬]

রঘুনন্দনের এই বয়ান অনুযায়ী ভারতে ইসলাম আগমনের পর থেকে মুসলমানদের সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে নানা কুঅভ্যাস অনুপ্রবেশ করেছে। তিনি ভারতীয় 'আর্য অতীতে' বীর ধর্মজ্ঞ পুরুষদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি করা সেই সাংস্কৃতিক সম্পদের অবক্ষয় নিয়ে বিলাপ করছেন। লেখকের মতে মুসলমান এবং খ্রিস্টান সংস্পর্শে প্রাপ্ত যে কুঅভ্যাসগুলির ফলে হিন্দুরা তাঁদের সাংস্কৃতিক সম্পদকে হারাতে বসেছেন তার মধ্যে প্রধান হল ব্রহ্মচর্যচর্চায় অনীহা। রঘুনন্দনের বয়ান থেকে সাম্প্রদায়িক চেতনার সেই বিবর্ধমান প্রবণতাই স্পষ্ট চোখে পড়ে। তা হল সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমান এবং হিন্দু শরীরের মধ্যে একটি ভিন্নতাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা, এবং এর মধ্য দিয়ে মুসলমান শরীরকে অপর হিসাবে নথিবদ্ধ করার প্রবণতা। তাই তাঁর

---

[১১৫] স্বামী রঘুনন্দন, *ছাত্রজীবন,* বৈশাখ, কলকাতা, ১৩১৮।

[১১৬] ঐ, ২৫-২৬।

অসুবিধা হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘ শতাব্দী যাবৎ পাশাপাশি থাকার ইতিহাস নিয়ে। তিনি বলছেন এর ফলেই নাকি বাঙালি তথা ভারতীয়দের নৈতিক জীবন তথা স্বাস্থ্য সঙ্কটাপন্ন। তাঁর মতে হিন্দুর স্বাস্থ্যহানি এবং প্রজননক্ষমতা হ্রাসের আপাত কারণ ম্যালেরিয়ার মতো মহামারী মনে হলেও মূল 'অভাব'টি অন্যত্র লক্ষণীয়। সভ্যতার সংঘাতহেতু আর্য ঋষিগণ কর্তৃক নির্ধারিত ধর্মীয় সাত্ত্বিক জীবনযাত্রা থেকে পদস্খলনের ফলেই এই অভাবের জন্ম। বলা বাহুল্য, এই অভাবটি তাঁর মতে ব্রহ্মচর্য শিক্ষার অভাব। তাঁর ব্যখ্যা এইরূপ: ব্রহ্মচর্য পালন না করে অত্যধিক বীর্যপাতের ফলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। এই দুর্বল শরীর তাই ম্যালেরিয়ার মতো রোগে আক্রান্ত হয় সহজে। ফলত লেখক এখানে বীর্যব্যয়ের ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝাতে চাইছেন, যার প্রতিকার পাওয়া যাবে ব্রহ্মচর্যে।

শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে বীর্যব্যয়ের এহেন সংযোগকে উল্লিখিত হতে দেখা যায় সমকালীন বহু রচনায়। যেমন যোগেন্দ্রমোহন ঘোষের লেখা *ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও যুবক গণের নৈতিক বিধানার্থে* বইটির কথাই ধরা যাক। লেখক বইটি শুরুই করছেন এইভাবে—

> হে বঙ্গীয় বালক ও যুবক ভ্রাতাগণ, আমরা কে স্মরণ করিয়া দেখ, **আমরা ভুবন পূজিত আর্য্য সন্তান।** ... তথাকথিত বর্ত্তমান সভ্য জাতিগণের নিকট আমরা মনুষ্য বলিয়া গণ্য নই, ... আমাদের অস্তিত্ব দিন দিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। ... ভাইরে, ছিল যা তাহা কই। ... কীরূপ এই জাতি উঠিবে, ... বহু কারণ সম্পাতে আমাদের বর্তমান দুর্দশা। ... যতগুলি কারণে ভারতের এই দুর্দশা, ব্রহ্মচর্যহানি তার মধ্যে প্রধানতম কারণ"।[১১৭]

এই প্রসঙ্গে আর দুটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল ব্রহ্মচর্যকে যে যথার্থ যৌনজীবনের বিধি হিসেবে লেখক তুলে ধরেছেন তার বিপরীতে আমরা দেখি সন্তান উৎপাদন বহির্ভূত সকল ধরনের যৌনাচার সম্পর্কে ভীতি তৈরির প্রবণতা। লেখক লিখছেন, "স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা বার বৎসর বয়স থেকেই বীর্যনষ্ট করতে শুরু করেছে। পাঁচটা ছেলে একত্র হলেই সচরাচর অশালীন বিষয়েই আলোচনা হতে থাকে। অনেক বালক হস্তমৈথুন দ্বারা প্রত্যহ আত্মহত্যা করিয়া থাকে। অনেকে পুংমৈথুনে অভ্যস্ত। যে সব ছেলে দেখতে একটু সুশ্রী তাদের সর্ব্বনাশ। কামান্ধ বয়স্ক লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে – সুবিধে পেলেই তাদের মাথা খাবে"।[১১৮] আর দ্বিতীয়

[১১৭] যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, *ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও যুবক গণের নৈতিক বিধানার্থে,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩১৬, ১-৪।
[১১৮] ঐ, ৮।

বিষয়টি হল ব্রহ্মচর্যের বিধান শুধু বিবাহপূর্ব জীবনের জন্য দেওয়া হচ্ছে তা নয়, বিবাহিত জীবনেও তা প্রযোজ্য। বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যের নিয়ম বাতলে দিতে তাই নরহরি কবিরাজ লিখছেন *গৃহীর ব্রহ্মচর্য*।[১১৯] এই ধরনের বইগুলিতে বলা হচ্ছে যে বিবাহিত জীবনে কেবলমাত্র প্রজননের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়ে বীর্যপাত করলেই নাকি সুস্থ পুরুষ সন্তানের জন্ম সম্ভব। আর প্রতিটি বইতেই প্রায় অবশ্যিকভাবে ফিরে আসতে দেখা যায় বিবাহের মূল উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন - এই আপ্তবাক্যটি। ফলত সুস্থ, বলবান সন্তান উৎপাদনের তাগিদের সঙ্গে হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রকল্পটি মিলে যেতে থাকে। আর এক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্যচর্চার প্রতি ঝোঁক উক্ত প্রকল্পের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় খুব সহজেই।

বিধবা বিবাহ ও প্রজনন প্রসঙ্গে

হিন্দুর প্রজননবৃদ্ধির জন্য পুরুষের যৌনাচারকে কীভাবে নিয়মবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় সেই বিষয়ে আমরা আগের পর্বে আলোচনা করলাম। এই একই উদ্দেশ্য থেকে নারীর যৌনতার উপরেও নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রবণতা আলোচ্য সময়ে পরিলক্ষিত হয়। যদিও নারীর যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গটি শুধু হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনায় নয়, অন্যান্য প্রেক্ষিতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থেকেছে।[১২০] তবে বর্তমান প্রসঙ্গে তার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সুস্থ নারীর গর্ভই পারে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে - এই পরিচিত বচনটি জাতীয়তাবাদী বয়ানে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হতে দেখা গেছে। সুপ্রিয়া গুহ দেখিয়েছেন মেয়েদের প্রজননগত স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা আলোচ্য সময়ে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[১২১] এই কারণেই নারীর প্রজননগত স্বাস্থ্যের প্রতি নজর পড়েছে জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ ও ডাক্তারদের। সখারাম গণেশ দেউস্কর, ডাক্তার চুনিলাল বসু,

---

[১১৯] নারায়ণহরি বটব্যাল, *গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য*, (?)

[১২০] মেয়েদের যৌনবাসনা অনিয়ন্ত্রণযোগ্য এই পুরুষালি উদ্বেগটি হিন্দু সাংস্কৃতিক পরম্পরায় সর্বদাই বর্তমান থেকেছে। তাই এর উপর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও অনবরত অনুভূত হয়েছে। Uma Chakravarty, “Whatever Happened to the Vedic Dasi? Orientalism, Nationalism and a Script for the Past,” in *Recasting Women: Essays in Colonial History*, ed. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (New Delhi: Kali for Women, 1989), 35. উনিশ শতকে সমাজ সংস্কারের যে প্রয়াসগুলি নেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়েও সামাজিক নিয়মানুবর্তিতা এবং মেয়েদের শরীর ও বাসনার উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকেই সুনিশ্চিত করার চেষ্টা কার্যকরী থেকেছে। Sekhar Banerjee, “Caste, Widow-Remarriage and the Reform of Popular Culture in Colonial Bengal,” *Bharati Ray (Ed) From the Seams of History*, 1993, 29.

[১২১] Supriya Guha, “‘The Best Swadeshi’: Reproductive Health in Bengal,1840-1940,” in *Reproductive Health in India: History, Politics, Controversies*, ed. Sarah Hodges (Hyderabad: Orient Longman, 2006), 139–66.

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, রাধারমণ চট্টোপাধ্যায়ের মতো আরও অনেক ব্যক্তি এবং অনেক সংগঠন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। যুক্তি ছিল মেয়েদের দেহ পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিয়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। কারণ পরিণত বয়সেই মেয়েরা সুস্থ, দীর্ঘজীবী সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হতে পারবে। বিশেষ করে হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের কারণ বুঝতে গিয়েও নারীর প্রজননগত স্বাস্থ্য প্রসঙ্গটি নানাভাবে উত্থাপিত হতে শুরু করে।[১২২] এই বিষয়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই ধরনের আলোচনার মাঝে বিশ শতকের দুইয়ের দশক থেকে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গে আলোচনা জনপরিসরে ব্যাপক হারে বাড়তে শুরু করে। সেখানে মূলত যে যুক্তিটি সামনে আসতে দেখা যায় তা হল বিধবা মেয়েদের পুনরায় বিয়ে দিয়ে তার দেহকে পুনরায় সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যায় এবং এর মধ্য দিয়ে হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

উনিশ শতকে বিধবাবিবাহ প্রচলনের যে উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়, এবং এই উদ্দেশ্যে যে আইন পাশ করা হয় তাতে বাংলায় বিধবাবিবাহকে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হয় না। বরং মনে করা হয় এই উদ্যোগটির 'বিফলতা অপরিহার্য' ছিল।[১২৩] লক্ষণীয় বিষয় হল বাংলায় নিম্নজাতির মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন থাকলেও বিশ শতকের দোর গোড়ায় এসে সেই রীতিতেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। উচ্চবর্ণের প্রথাগুলি আত্মস্থ করতে গিয়ে এইসময় থেকে মধ্য থেকে নিম্ন জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিধবাবিবাহের রীতি লুপ্ত হতে শুরু করে।[১২৪] উল্লেখ্য পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী বয়ানে বৈধব্যর অবধারণায় কিছু বিষয় সংযুক্ত হয়। যেমন সেই প্রতর্কে সংযমী বৈধব্যকে অনবরত আদর্শায়িত করা হয়। তনিকা সরকার যেমন মনে করেন জাতীয়তাবাদের কাছে সংযমী বিধবার অবধারণা গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ জাতীয়তাবাদী সংকেততত্ত্বে (semiotic) বিধবা ছিলেন ঔপনিবেশিকতার ছোঁয়া মুক্ত এক আদর্শ চরিত্র।[১২৫] গান্ধি এই ভাবনাটিকে আরও বৈধতা দেন। কারণ তাঁর কাছে বিধবা যৌনবাসনা এবং ইহলৌকিক সুখের ঊর্ধ্বে অবস্থান করা এক চরিত্র। এই গুণ ভারতীয় নারীত্বকে

---

[১২২] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা," *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩৩০, ৮৪৩-৫০; "হিন্দু মহাসভা," *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৩১, ৫৭০-৭১।

[১২৩] Asok Sen, *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones* (Calcutta: Riddhi-India, 1977), 6.

[১২৪] Bandyopadlqay, "Caste, Widow-Remarriage and the Reform of Popular Culture in Colonial Bengal."

[১২৫] Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 41-42.

আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ বেদিতে স্থাপিত করেছে বলে সুজাতা প্যাটেল মনে করেন।[১২৬] উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিধবাবিবাহের মধ্য দিয়ে তাকে সন্তান প্রজননের উপযোগী করে তোলার যুক্তি উক্ত জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বিপরীত মনে হলেও এখানে একটি মূলগত মিলের স্থান আছে। তা হল জাতির প্রয়োজনে বিধবার শরীরের ওপর পুরুষালি নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার বাসনা।

এখানে সবার প্রথমে বলা প্রয়োজন বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গটিও পরোক্ষভাবে উত্থাপন করেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাংলায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধির যে তিনটে কারণ তিনি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন তার একটি ছিল মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন। কিন্তু প্রজননক্ষমতা সম্পন্ন হিন্দু বিধবার পুনরায় বিবাহ দিয়ে হিন্দুর সংখ্যা যে বৃদ্ধি করা যায় এই উপায়টি তাঁর ভাবনায় আসেনি। বস্তুত ঠিক সেই সময় যাঁরা হিন্দুর সংখ্যাহ্রাস নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাঁদের অনেকেই বিধবাবিবাহের সেই অর্থে সমর্থক ছিলেন না। উদাহরণ হিসেবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর সখারাম গণেশ দেউস্করের কথা বলা যায়। বিদ্যাসাগর এবং বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে *প্রবাসী* পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর সখারাম গণেশ দেউস্করের মধ্যে এক দীর্ঘ বিতর্ক চোখে পড়ে, যেখানে সখারাম বিধবাবিবাহের প্রায় বিরোধী হয়েই কথা বলছেন।[১২৭] আর এই বিতর্কে দুই তরফের কারও বয়ানেই বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গটির মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক দিকটি প্রকাশ পায় না। এক দশক পরে বিশ শতকের দুইয়ের দশকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে এই সাম্প্রদায়িক যুক্তিক্রমটি প্রকাশ পায়।[১২৮] একের দশকে এই বিষয়ে সেই অর্থে আলোচনা সত্যিই কম চোখে পড়ে। যেমন জনৈক প্রভাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে *প্রবাসী* পত্রিকায় লোকতত্ত্ব শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের কারণ খুঁজতে গিয়ে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ তুলে দেখান যে পূর্বে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করা হতো এই যুক্তিতে যে সমাজে পুরুষের অপেক্ষা মেয়েদের সংখ্যা বেশি। ফলত বিধবাবিবাহ দিলে কুমারী মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে

---

[১২৬] Sujata Patel, “Construction and Reconstruction of Women In Gandhi,” in *Ideals, Images, and Real Lives : Women in Literature and History*, ed. Alice Thorner and Maithreyi Krishna Raj (Mumbai: Orient Longman, 2000), 313.

[১২৭] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং সখারাম গণেশ দেউস্করের এই বিতর্কটির জন্য দ্রষ্টব্য— বনমালী বেদান্ততীর্থ, “বালিকা বিধবার বিবাহ”, *প্রবাসী*, শ্রাবণ, ১৩১৬, ২৫৭-৫৯; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, “বিদ্যাগরের স্মৃতিস্তম্ভ”, *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩১৬, ২৬০; সখারাম গণেশ দেউস্কর, “বিদ্যাসাগরের স্মৃতিস্তম্ভ (ক'একটী প্রশ্ন)”, *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩১৬, ৩৫৩-৫৪; “সম্পাদকের বক্তব্য”, *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩১৬, ৩৫৫-৫৬; সখারাম গণেশ দেউস্কর, “বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ”, *প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩১৬, ৫২৫।

[১২৮] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, “বালবিধবার বিবাহ”, *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, ২৮২; “নারীরক্ষা-সমিতি”, *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ২৮২-৮৪।

সুযোগ কমতে থাকবে। কিন্তু বর্তমান আদমসুমারিতে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের থেকে কম প্রদর্শন করছে। এক্ষেত্রে বিধবা মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের যুক্তি আর খাটে না।[১২৯] এই আলোচনাগুলি বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও সরাসরি বিধবাবিবাহের হয়ে সওয়াল করার শামিল হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

১৯২৪ সালে বাংলায় হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই তাদের উদ্যোগে মেদিনীপুরে 'মেদিনীপুর বিধবা-বিবাহ সমিতি' তৈরি হয়, যাঁরা হিন্দু বাল্যবিধবার বিয়ের উদ্যোগ নেন।[১৩০] তিন বছরের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই সমিতির চারটি শাখা খোলা হয় যাঁরা দুবছরে ৫২ জন বাল্যবিধবার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।[১৩১] এই সমিতির একটি ইস্তেহার অনুযায়ী, "... আমরা দেখিতে পাই গত ১৩২৯ সালের চৈত্র মাসে (১৯২২ খ্রি.) সাধারণ কথোপকথনের ফলে দেশের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচারকল্পনা পুনঃজাগ্রত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হইয়া গেল।"[১৩২] এরপর জেলায় জেলায় বিধবাবিবাহ সমিতিগুলির নির্মাণের উদ্যোগ নেন তাঁরা। এমনই একটি সমিতি তৈরি হতে দেখা যায় কুমিল্লা জেলায় যার নাম 'বিধবা বিবাহ সহায়ক সমিতি'।[১৩৩] ১৯২৬ সালে তাঁদের ইস্তেহারে তাঁরা লেখেন যে হিন্দুর সংখ্যা যেভাবে কমছে তাতে বাল্যবিধবাদের বিয়ে দেওয়া সময়ের দাবি হয়ে উঠছে।[১৩৪] মেদিনীপুরের সমিতিটির ইস্তেহারি মুখবন্ধে লেখা হয়, "বিধবা বিবাহ অপ্রচলনের জন্য আমাদের হিন্দু জাতি মরণের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সন্তান প্রজননক্ষমা বহু রমনীকে আমরা বিবাহিত জীবন হইতে বঞ্চিত করিয়া, দেশের লোক সংখ্যা

---

[১২৯] প্রভাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, "লোকতত্ত্ব", *প্রবাসী,* ভাদ্র,১৩২০, ৬১২-১৮।

[১৩০] Letter from Sanatan Chandra Das of Midnapur to Padmaraj Jain, Secretory of Hindu Relief Society, Hindu Mahasabha, Midnapur, 15/1925, File no. 279A/25 (West Bengal State Archives Intelligence Bureau).

[১৩১] শ্রীভগবত চন্দ্র দাশ, *বিধবা-বিবাহ,* মেদিনীপুর বিধবা-বিবাহ সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীরাসবিহারী ভঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৩১ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৩। এই ইস্তেহারটি লাহোর বিধবা-বিবাহ-সভার আনুকূল্যে মুদ্রিত হয়, যা থেকে আন্দাজ করা যায় লাহোর ও মেদিনীপুরের সংগঠন দুটির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এখানে উল্লেখ্য এই ইস্তেহারের প্রথম সংস্করণে ১০০০টি কপি এবং দ্বিতীয় সংস্করণেও ১০০০টি কপি ছাপানো হয়। বিধবাবিবাহের সপক্ষে এধরনের ব্যপক প্রচার থেকে সমাজের এক অংশের কাছে এর জনপ্রিয়তার আভাস পাওয়া যায়।

[১৩২] শ্রীভগবত চন্দ্র দাশ, *বিধবা-বিবাহ* ।

[১৩৩] বিধবা-বিবাহ, (গৌহাটীর সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর কালীচরণ বিদ্যাভূষণ, বি, এল মহাশয় সংকলিত "বিধবা-বিবাহ" নামক বিধবা-বিবাহ-এর বিরুদ্ধবাদী পুস্তিকার সমালোচনা) কুলিল্লা-বিধবা-বিবাহ–সহায়ক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩৩।

[১৩৪] ঐ।

হ্রাস করিয়া, জাতির জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়া দিতেছি..."[১৩৫] এই একই বছর ত্রিপুরা নিবাসী হরিদাস রক্ষিত *সমাজ ও বিধবা-বিবাহ* বইটি শেষ করছেন এই সচেতন বার্তা দিয়ে যে এখনও যদি সমাজকর্তারা বিধবাবিবাহকে মেনে না নেন, তাহলে হিন্দু জাতির ধ্বংস অনিবার্য।[১৩৬] এছাড়া প্রায় প্রতি বছরই হিন্দু মহাসভার বঙ্গীয় বার্ষিক সম্মেলনের আলোচনায় বিধবাবিবাহ সম্পর্কে পৃথকভাবে পরিসংখ্যান পেশ করতে দেখা যায়। জেলায় জেলায় এই বিধবাবিবাহ সমিতিগুলি ছাড়াও, পৃথকভাবে হিন্দু মহাসভা এই বিষয়গুলির প্রচার ও প্রসারে তৎপর হয়।[১৩৭]

১৯২২ সাল থেকে বিধবাবিবাহের উপর পুনরায় আলোচনা প্রবলভাবে শুরু হচ্ছে বলে মেদিনীপুরের সংগঠনটি যে দাবি করছে তার তাৎক্ষণিক কোনো কারণ আছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা মুশকিল। কিন্তু ১৯২১ সালের আদমসুমারি প্রকাশ হওয়ার পর সমকালীন গণমাধ্যমগুলিতে আবার করে হিন্দুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়।[১৩৮] এই ধরনের প্রায় প্রতিটি রচনায় বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গটি অবধারিতভাবে এসেছে।[১৩৯] এছাড়া আলোচ্য সময়ে বিধবাবিবাহ শিরোনামে অসংখ্য বইয়ের তালিকাও দেওয়া যায়।[১৪০] হিন্দুর

---

[১৩৫] শ্রীভগবত চন্দ্র দাশ, *বিধবা-বিবাহ* ।

[১৩৬] *সমাজ ও বিধবা-বিবাহ,* শ্রীহরিদাস রক্ষিত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মহেশপুর, ত্রিপুরা, ১৩৩৩।

[১৩৭] জেলাস্তরে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনের এমন অনেক ইস্তেহার পাওয়া যায়, যেখানে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। যেমন, শ্রীশৈলেশনাথ শর্মা বিশী, 'হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা', সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (সাল অনুল্লিখিত)

[১৩৮] ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি নিয়ে আলোচনা পাওয়া যায় সমকালীন অনেক প্রবন্ধে। যেমন, "হিন্দু ক্ষয়িষ্ণু কিনা?," *প্রবাসী,* আষাঢ়, ১৩৩২, ৪৪৪-৪৫।

[১৩৯] *প্রবাসী* পত্রিকায় ১৩২৯ ব. (১৯২২ খ্রি.) থেকে ১৩৩৩ ব. (১৯২৫ খ্রি.)-এর মধ্যে প্রকাশিত "বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান," "হিন্দু মুসলমানের হ্রাস বৃদ্ধি," "কলিকাতার বালবিধবা," "স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবাদের অবস্থা" শীর্ষক প্রতিবেদনগুলি এর কিছু উদাহরণ মাত্র যেখানে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গটি এসেছে।

"বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান," *প্রবাসী,* পৌষ, ১৯২৯, ৪১২; "হিন্দু মুসলমানের হ্রাসবৃদ্ধি," *প্রবাসী,* পৌষ, ১৩২৯, ৪২৯; "কলিকাতার বালবিধবা," *প্রবাসী,* ১৩২৯, ফাল্গুন, ৭১১; "স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবাদের অবস্থা," *প্রবাসী,* আষাঢ, ১৩৩৩, ৫৩৯-৫০। প্রথম ও শেষ প্রতিবেদনের সন্ধান ভাস্বতী চক্রবর্তীর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত। তাঁর গবেষণার কিছু পর্যবেক্ষণ বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতেও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেখানে তিনি দেখান ১৯৩০-এর দশক থেকে দ্বিতীয় দফায় শুরু হওয়া সমাজ সংস্কারের প্রয়াসে হিন্দু সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়েছিল। Bhaswati Chakrabarty, The Second Social Reform Movement: Gender and Society in Bengal 1930's-50's. Unpublished PhD Thesis, (University of Calcutta: 2016), 180-86.

[১৪০] *বিধবা-বিবাহ,* শ্রীসনাতন দাস কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, বরিশাল, ১৩৩৪; *বিধবা-বিবাহ,* শ্রীভগবান চন্দ্র দাশ, মেদিনীপুর বিধবা-বিবাহ সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীরাসবিহারী ভঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৩১ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৩; *সমাজ ও বিধবা-বিবাহ,* শ্রীহরিদাস রক্ষিত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মহেশপুর, ত্রিপুরা, ১৩৩৩ ব.; *বিধবা বিবাহ,* মহাত্মা গান্ধী লিখিত, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, অভয় আশ্রম, কুমিল্লা, ১৩৩২ ব.।

হ্রাসমানতা জনিত উদ্বেগের প্রেক্ষিতে এত ব্যাপক হারে বিধবাবিবাহ নিয়ে চর্চা ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি।[১৪১] সম্ভবত এইসময় বাংলায় হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা এই প্রয়াসগুলিকে একভাবে ত্বরান্বিত করে। আলোচ্য সময়সীমায় সংবাদপত্র, পত্রিকা, ইস্তেহার, পুস্তিকা বা সভা-সমিতির আলোচ্য হিসাবে বিধবাবিবাহের পুনঃপ্রচলনের বিষয়টি যেভাবে বহুধা চর্চিত হতে শুরু করল তার সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্কটি একেবারে সরাসরি যুক্ত হতে দেখা যায়। যদিও একই সাথে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ্ করা প্রয়োজন যে শুধু হিন্দু নারীর বিধবাবিবাহ নয়, বিশ শতকের দুইয়ের দশকে সামগ্রিকভাবে হিন্দু মহিলার সাথে মুসলমান পুরুষের সম্পর্কের *ন্যারেটিভ* ব্যাপকভাবে এক সাম্প্রদায়িক মোড় নেয়। প্রদীপকুমার দত্ত,[১৪২] শমিতা সেন,[১৪৩] চারু গুপ্তা,[১৪৪] সকলেই দেখিয়েছেন বিশ শতকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কীভাবে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে স্পষ্ট করে তোলে। আর সাম্প্রদায়িক বয়ানগুলিতে মেয়েরা হয়ে ওঠেন হিন্দু সাম্প্রদায়িক সম্মানের ধারক, যাকে ধর্ষণ অথবা হরণ করা মানে সমগ্র সম্প্রদায়ের সামগ্রিক সম্মান হানি করা। প্রদীপকুমার দত্ত দেখিয়েছেন *অমৃতবাজার পত্রিকা* কীভাবে নারীহরণের ঘটনাগুলিকে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়া শুরু করে। আর সেখানে মুসলমান পুরুষ চিহ্নিত হতে থাকে অপহারক অথবা ধর্ষক রূপে। হিন্দু বিধবার ইসলাম অথবা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা এই সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে। শুধু *অমৃতবাজার পত্রিকা* নয়, আমরা আলোচ্য পর্বের বহু পত্রপত্রিকায় এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রক্রিয়াটি বহুভাবে মূর্ত হতে দেখি। এই সামগ্রিক প্রেক্ষিতে আমরা যদি বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গটি বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে বিবর্ধমান সাম্প্রদায়িক উদ্বেগগুলির সাথে প্রজনন এবং পৌরুষের সম্পর্কটিকে আর একটু বিস্তারিতভাবে উন্মোচন করতে সম্ভব।

আলোচ্য সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় *প্রবাসী* পত্রিকায় নারী অপহরণ, ধর্ষণ, মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ ইত্যাদি থেকে মেয়েরা নিজেদের কীভাবে সুরক্ষিত করতে পারেন সেই বিষয়ে 'নারীরক্ষা-সমিতি' নামে একটি

---

[১৪১] ১৯১০ খ্রি. এবং ১৯২২ খ্রি.র মধ্যে এই বিষয়ে খুব কম আলোচনাই চোখে পড়ে। যেমন মহারাজা-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব রচিত *বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি, না?* বইটি যা ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক এই সালেই ৬ই আগস্ট কলকাতার ওভারটুন হলে বিধবা-বিবাহ-মীমাংসার্থ একটি সভায় এবিষয়ে একটি বক্তৃতাও দেন। উল্লিখিত বইটিতে আদমসুমারি, হিন্দু মুসলমানের সংখ্যাতত্ত্ব ও তার সঙ্গে বিধবাবিবাদের সংযোগটিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১৪২] Pradip Kumar Datta, Chapter 4, 'Abductions' and the Constellation of a Hindu Communal Bloc, 198-237.

[১৪৩] Sen, "Honour and Resistance: Gender, Community and Class in Bengal, 1920-1940."

[১৪৪] Gupta, *Sexuality, Obscenity, Community : Women, Muslims, and the Hindu Public in Colonial India*, 239–59.

ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি বিধবাবিবাহের সপক্ষে জনমত তৈরি করতে গিয়ে লিখছেন, "নারীনির্য্যাতন বন্ধ করিতে হইলেও বিধবাবিবাহের প্রচলন একান্ত আবশ্যক। কেহ যদি নারীনির্য্যাতনের সমুদয় ঘটনার বিবরণ পড়িয়া অত্যাচারিতাদিগের মধ্যে বিধবা কয়জন, তাহা গণনা করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ দেখা যাইবে, যে, বিধবার সংখ্যাই বেশী। অনেক স্থানে বালবিধবার প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর, রক্ষক স্বামীর অভাবে, সুরক্ষিতা হন না, অথচ নানা প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে বাড়ির বাইরেও আসিতে হয়। তখন তাঁহারা দুর্ব্বৃত্ত লোকেদের লোভের বস্তু হইয়া পড়েন । অনেক স্থানে অত্যাচারীরা মুসলমান বটে।"[১৪৫] যদিও রামানন্দ পাঠকদের এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে সব ক্ষেত্রে এই 'দুর্ব্বৃত্ত'রা মুসলমান নন। হিন্দুও হতে পারেন। কিন্তু হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকায় প্রথমত এই যুবতী বিধবাদের 'রক্ষক' স্বামী থাকেন না। দ্বিতীয়ত মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে এবং ধর্ষিতা নারীরও বিবাহ প্রচলিত আছে। এমন অবস্থায় সেই হিন্দু নারী হয় দেহব্যবসায় বাধ্য হন অথবা কোনো মুসলমান পুরুষকেই বিয়ে করেন। রামানন্দের মতে "অনেক সময়, যদি তিনি কোনও মুসলমান কর্তৃক অত্যাচারিতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য হন"।[১৪৬] রামানন্দ এখানে ইসলামকে বলপূর্বক ধর্মান্তরকারী হিসেবে চিহ্নিত করার বিবর্ধমান প্রবণতাকেই শুধু মান্যতা দিচ্ছেন না, একই সাথে তিনি মুসলমান পুরুষের দেহকেও যৌনলিপ্সুর ভূমিকায় চিত্রিত করছেন, যখন তিনি মুসলমানকে ধর্ষক প্রতিপন্ন করার পাশাপাশি লিখছেন যে এর মধ্য দিয়ে "মুসলমান সমাজেরও অকল্যাণ হয়। কারণ, এরূপ ঘটনায় কার্য্যতঃ অসভ্য দেশের ও অসভ্য যুগের বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার প্রথা (marriage by capture) অনুসৃত হয়। যে সমাজে ঐ প্রথা অনুসৃত হয় তাহা সভ্যতার ও সুনীতির নিম্ন স্তরেই আবদ্ধ থাকে"।[১৪৭] এখানে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনটি তুলনায় অনেক পরিশীলিত কারণ তিনি একমাত্র মুসলমান পুরুষদের হিন্দু বিধবাদের যৌননিগ্রহের জন্য দায়ী করেননি। যদিও তিনি সরাসরি তাদের উপর ধর্মান্তরিতকরণের অপবাদ দিয়েছেন। কিন্তু *প্রবাসী* পত্রিকায় আর একটি রচনায় আরও প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান পুরুষদের দায়ী করতে দেখা যায়। এই প্রবন্ধের লেখক প্রফুল্লকুমার সরকার লিখছেন—

[১৪৫] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "নারীরক্ষা-সমিতি," *প্রবাসী*, ১৩৩১, জ্যৈষ্ঠ, ২৮৩।

[১৪৬] ঐ, ২৮৩।

[১৪৭] ঐ,২৮৩।

> লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, যে-সমস্ত হিন্দু রমণী মুসলমান গুন্ডাগণ কর্ত্তৃক অপহৃতা বা ধর্ষিতা হন, তাঁহাদের অধিকাংশই বিধবা। পল্লিগ্রামে দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থদের ঘরের এই সমস্ত বিধবারা প্রায়ই সহায়হীনা ও অরক্ষিতা; এমনকি কোন কোন পল্লীতে পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। এরূপ অবস্থায় মুসলমান গুন্ডাদের পক্ষে ঐসমস্ত অসহায় অরক্ষিতা বিধবাদিগকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করা বা তাদের ধর্ম্ম নাশ করা খুব সহজ কাজ। বিশেষতঃ, নেকাহ করিবার উদ্দেশ্যে সধবা অপেক্ষা বিধবাদের হরণ করাই তাহারা সুবিধাজনক মনে করে। ... এই সমস্ত সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায় হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন করা।[১৪৮]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শুধু মুসলমান পুরুষদের প্রতি প্রত্যক্ষ অভিযোগ তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৌশলী হলেও প্রজননের প্রসঙ্গে হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি পার্থক্যের কথা বলছেন, যা আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হিন্দু সমাজে বিধবা মেয়েদের 'সুরক্ষিত' করার জন্য তাদের পুনরায় বিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বিধবাবিবাহের আরও একটি যৌক্তিকতা তুলে ধরছেন যা সেইসময় বিধবাবিবাহের সপক্ষে সবচেয়ে প্রচলিত বয়ান ছিল। কিন্তু তিনি যেভাবে বিষয়টির উত্থাপন করছেন তা বেশি গুরুতপূর্ণ। তিনি লিখছেন, "যেসকল হিন্দু বিধবারা এইপ্রকারে (ধর্ষণ ও বলপূর্বক বিবাহ) মুসলমানের পত্নী হন, তাঁহারা দৈহিক পূর্ণতা প্রাপ্তির পরই বিবাহিত হন ও সন্তানের জননী হন। সুশ্রুতের মতে ষোল বৎসরের কম বয়সের নারীর মাতা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তদূর্দ্ধ বয়সের মাতার সন্তান অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও আয়ুষ্মান্ হয়। ... হিন্দু বিধবাদের বিবাহ হিন্দু সমাজে চলিত নাই। চলিত থাকিলে তাহারা অনেকেই বলিষ্ঠ সন্তানের মাতা হইতে পারিতেন। পূর্ণবয়স্কা যেসব হিন্দু বিধবারা মুসলমান সমাজের অংশ হন, তাঁহাদের সন্তান অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হন"।[১৪৯] এখানে বিধবা নারীর দেহটি অবলীলায় শুধু দুটি সম্প্রদায়ের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হয়ে উঠছে না, দুটি সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ পৌরুষকে সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথার গুরুত্ব বিচারেরও এক তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। যেমন লতা মনি লক্ষ করেছেন যে সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত বিতর্কে মেয়েদের জীবন চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না, বরং তারা হয়ে ওঠে পরম্পরাকে বুঝতে চাওয়ার নিছকই একটি ক্ষেত্র।[১৫০]

---

[১৪৮] প্রফুল্লকুমার সরকার, "হিন্দু সমাজ কি আত্মহত্যা করিবে?," *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩৩৩, ৮৪৪-৪৫।

[১৪৯] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "নারীরক্ষা-সমিতি," ২৮৩-৮৪।

[১৫০] Lata Mani, "Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India," in *Recasting Women: Essays in Colonial History*, ed. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (New Delhi: Kali for Women, 1989), 88–126.

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষ করার মতো তা হল সামাজিক প্রথা হিসেবে বিধবাবিবাহ উচ্চবর্ণের মধ্যে অপ্রচলিত হলেও নিম্নবর্ণের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি একটি প্রচলিত প্রথা হিসেবেই বহাল থেকেছে। কিন্তু সামাজিক চলমানতার (social mobility) কারণে উনিশ শতকের বহু নিম্নবর্ণের মধ্যে সামাজিক প্রথা হিসেবে বিধবাবিবাহ ত্যাগের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।[১৫১] এক্ষেত্রে হিন্দু সংগঠনগুলির কাছে বিধবাবিবাহকে সামাজিকভাবে শুধু প্রচলন করাই একমাত্র চ্যালেঞ্জ থাকছে না। যে জাতিগোষ্ঠীগুলি এই প্রথা বর্জন করতে শুরু করেছে তাদের ক্ষেত্রে বর্জিত প্রথার পুনরুত্থান ঘটানোও একই সাথে জরুরি হয়ে পড়ছে। হিন্দু মহাসভার একটি জেলা সম্মেলনে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কিছু পর্যবেক্ষণে জাতিব্যবস্থা প্রসঙ্গে এমনই একটি পর্যবেক্ষণ সামনে আসে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন—

> এখন বুঝা যাইতেছে কেন হিন্দুর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সমাজের লোক সংখ্যা হ্রাসের আর একটী প্রধান কারণ এই ইদানিং আবার সমাজের নিম্নস্তরের হিন্দুগণ আভিজাত্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্নের চেষ্টা করিতেছে। ইহার প্রধান ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে উচ্চবর্ণের লোকেরা যে প্রকার সামাজিক রীতিনীতি ও চালচলন অনুসরণ করে ইহারাও সেই পথাবলম্বী হইতেছে। কতকগুলি তথাকথিত নিম্নশ্রেনীর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন তাহারা ইহা বর্জ্জন করিয়াছে। এই কারণে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে কেবল উৎপাদিকা শক্তি কমিতেছে তাহা নহে, ভ্রূণ ও শিশুহত্যা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে। ১৯২১ সালের আদমসুমারিতে দেখা যায় সমগ্র বাংলার লোকসংখ্যার মধ্যে মোটামুটি দুই কোটী হিন্দু এবং ২।।০ কোটী মুসলমান, ... অথচ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭২ খৃঃঅব্দে) হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল।[১৫২]

ফলত হিন্দু মহাসভার কর্মসূচীতে পৃথকভাবে নিম্নবর্ণের বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৫৩]

---

[১৫১] সম্প্রতি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে পুনরায় উত্থাপন করেছেন যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, উনিশ শতক থেকে জাতে ওঠার আন্যতম পন্থা হিসাবে বহু নিম্ন জাতভুক্ত সম্প্রদায় উঁচু জাতের বহু রীতিনীতিকে গ্রহণ করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে প্রচলিত থাকা বিধবাবিবাহের রীতি রদ করা এদের মধ্যে অন্যতম। Bandyopadhyay, *Caste, Culture, and Hegemony : Social Domination in Colonial Bengal*. Chapter 3, Caste and Social Reform: The Case of Widow Remarriage, 77-107.

[১৫২] প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা : সভাপতির অভিভাষণ, ২রা মে ১৯২৫।

[১৫৩] হিন্দু মহাসভার সদস্য কেশবলাল সমাজপতি ফরিদপুরে নমঃশূদ্র বিধবাদের বিবাহের তালিকা ও পরবর্তী পরিকল্পনা জানিয়ে হিন্দু মহাসভার কলকাতার অফিসে চিঠি লেখেন। Letter of Kesablal Samajpati of Sitarampur, Report of Inspector of Police, Gopalgunj, Hindu Mahasabha, Faridpur, 64/1925, File no 279H/25, (West Bengal State Archives Intelligence Bureau).

জনৈক প্রফুল্লকুমার সরকার বিশ শতকের দুইয়ের দশকে হিন্দু সমাজের সঙ্কটের প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে 'হিন্দু সমাজ কি আত্মহত্যা করিবে?' প্রবন্ধটি বহু দিক থেকে দৃষ্টান্তমূলক। এই প্রবন্ধটি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চিন্তায় সনাতনপন্থী এবং সংস্কারবাদী যে দুটি ভাবধারা বর্তমান ছিল তার মধ্যে দ্বিতীয় ধারার প্রতিনিধিত্ব করে।[১৫৪] বস্তুত আলোচ্য সময়ে সংস্কারপন্থীদের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। প্রফুল্লকুমার সরকারের উল্লিখিত এই প্রবন্ধটি সংস্কারপন্থী হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তার সেই অর্থে প্রতিনিধিত্ব করার কারণ মূলত তার ঔদার্যগুণ বা নমনীয়তা। তিনি প্রবন্ধ শুরুই করছেন এই ভঙ্গিতে যে হিন্দু যখন সঙ্কটের মুখে, তখন সনাতনপন্থীদের মতো যদি পুরাতন সকল ব্রাহ্মণ্যবাদী নিয়মনীতি শক্তভাবে লাগু রাখতে চাওয়া হয়, তাহলে হিন্দু সমাজ আত্মহত্যার পথে পা বাড়াবে। তিনি এই প্রেক্ষিতেই তাঁর কিছু পর্যবেক্ষণ এই প্রবন্ধে লিখেছেন যা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আভ্যন্তরীণ যুক্তিক্রম বোঝার জন্য খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখছেন, "যে-সমাজ জীবন্ত, সে যুগে যুগে পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে, শাস্ত্র, সমাজ-ব্যবহার, আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষা আবশ্যক মত পরিবর্তন করিয়া নেয়। ... আর এই বিশাল হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ যে এখনো টিকিয়া আছে তাহার একমাত্র কারণ সে জীবন-ধর্ম্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া যুগে যুগে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছে"।[১৫৫] কিন্তু "বৌদ্ধ বিপ্লব, মুসলমান বিপ্লবে হিন্দু সমাজের সম্মুখে যে জটিল সমস্যার উদয় হইয়াছিল এই বিংশ-শতাব্দীতে বাহির হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে এবং ভিতর হইতে যে 'নব্য ইসলামের জাগরণের' আবির্ভাব সেইরূপ বা তদপেক্ষা জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে"।[১৫৬] এই জটিল সমস্যাটি তৈরি হয়েছে একদিকে "হিন্দু সমাজের অন্তর্নিহিত দৌর্বল্যের ফলে" যাকে তিনি অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ বলে চিহ্নিত করছেন। অন্যদিকে এর ফলে, "এক দিকে মুসলমান ধর্ম্ম, অন্যদিকে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, - উভয়েই হিন্দু সমাজের অনুন্নত জাতিদিগকে আকর্ষণ করিতেছে" যা

---

[১৫৪] বস্তুত উনিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে যে নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীকে আমরা প্রথম অধ্যায়ে চিহ্নিত করেছিলাম, তাঁরাই এই বিশ শতকে সনাতনপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। অনেকে তাঁদের গোঁড়াপন্থী হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। এঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদী নীতিগুলির সাথে কোনো ধরনের সমঝোতায় আসতে তখনও রাজি ছিলেন না। যদিও আলোচ্য সময়ে এঁদের সংখ্যা এবং সামাজিক গুরুত্ব কমতে থাকে। *আর্য্য-দর্পণ* পত্রিকাকে এঁদের প্রায় মুখপাত্রর ভূমিকায় দেখা যায়। সনাতনী এবং সংগঠনীদের মধ্যে বিতর্কগুলির জন্য দ্রষ্টব্য– "অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ," *বঙ্গশ্রী*, ১৩৩৯, ফাল্গুন, ২৪৫; পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন ও হিন্দু সমাজ," *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২০, ১৩৩- ৪২।

[১৫৫] প্রফুল্লকুমার সরকার, "হিন্দু সমাজ কি আত্মহত্যা করিবে?," ৮৪১।

[১৫৬] ঐ, ৮৪২।

ছিল সমকালীন ধর্মান্তরকরণ বিষয়ে পরিচিত যুক্তি। এই উদ্দেশ্যে লেখক গান্ধিকৃত অস্পৃশ্যতা নিবারণের আন্দোলনকে ন্যায্য মনে করেছেন। এই একই আলোচনায় তিনি মেয়েদের প্রসঙ্গটিও এনেছেন। পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি তিনি কীভাবে মুসলমান পুরুষকে হিন্দু বিধবার অপহরণকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই একই বন্ধনীতে তিনি বিধবাবিবাহের সাথে প্রজননের প্রসঙ্গ এনে লিখছেন, “এই ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে হইবে। হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরে আজ উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, অনেক নিম্নস্তরের জাতি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, কন্যার অভাবে এবং পণের দায়ে তাদের মধ্যে পুরুষরা বিবাহ করিতে পারিতেছে না। ... এই নিশ্চিত জাতিক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে বিধবা বিবাহ প্রচলন অত্যাবশ্যক”।[১৫৭] এই প্রবন্ধেই বাল্যবিবাহ বন্ধ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা এবং ‘পতিতা’ মেয়েদের সমাজে স্থান করে দেওয়ার ব্যবস্থার আবশ্যকতার কথা তিনি লিখছেন। হিন্দু সমাজে জাতিব্যবস্থা এবং বিধবাবিবাহ সমেত মেয়েদের জন্য তৈরি করা নানাবিধ সামাজিক অনুশাসনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকে তিনি যে যুক্তিতে যথাযোগ্য মনে করছেন তা উল্লেখ করা এখানে যথাযথ। তিনি লিখছেন—

> অতীতে হিন্দু সমাজের সমাজপতি ও স্মৃতিকারগণ জীবন্ত সমাজের সাথে পরিচিত ছিলেন, তাই তাঁহারা যুগ প্রয়োজন অনুসারে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও অনুশাসনের পরিবর্ত্তন করিতে ভীত হন নাই, ... ভবিষ্যতে যেসব স্মৃতিকার আসিবেন, তাঁহারা সমাজের গতিই অনুকরণ করিতে বাধ্য হইবেন এবং যেসমস্ত নতুন রীতিনীতি আচার-ব্যবহার বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া নব যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও অনুশাসন রচনা করিবেন। মোটকথা কিছু সমাজ গোঁড়াদের যুক্তি শুনিয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিবেন, সে ভয় আমাদের নাই; কেননা এযুগের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার মত প্রাণশক্তি তাহাদের আছে এবং তাহার লক্ষণও চারিদিকে দেখিতেছি।[১৫৮]

এখানেই আমাদের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার দুটি অক্ষকে কার্যকারী হতে দেখি। যে অক্ষের একদিকে মেয়েদের যৌনতার প্রতি নিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে জাতপাতগত সামাজিক বিভাজনকে বজায় রাখার প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে। ফলত ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের যে তাত্ত্বিক কাঠামোটি উমা চক্রবর্তী উত্থাপন

[১৫৭] ঐ, ৮৪৫।

[১৫৮] ঐ, ৮৪৬।

করেছেন তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।[১৫৯] হিন্দু সন্তান উৎপাদনশীলতার মতো একটি সাম্প্রদায়িক উদ্বেগের সামনাসামনি হয়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব যেভাবে প্রচলিত জাত এবং লিঙ্গবিধিগুলির পুনর্মূল্যায়নের পথে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে তার মধ্যে থেকেই আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রে পৌরুষ এই অবতারকে অনুধাবন করতে পারি। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিধবাবিবাহের বিষয়ে যতটা আলোচনা আমরা এই মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের লেখনীতে নজর করতে পারি, অসাবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা ততটা জোরালোভাবে চোখে পড়ে না।[১৬০] যদিও বিধবা মেয়েদের পুনরায় বিবাহ করার এই সুযোগ যাতে তাদের যৌনসুখের ছাড়পত্র হিসেবে বিবেচিত না হয় সেই উদ্বেগ এই সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার মধ্যে সবসময়ই বহাল থাকে। যেমন বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনীর ষষ্ঠ অবিবেশনে রাজকৃষ্ণ দত্ত বলেন, "কোনও কোনও জাতিকে রক্ষা করিতে অক্ষত যোনি বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিৎ বলিয়া মনে করি। তবে এই বিধবা বিবাহ ইয়ুরোপীয় জাতির বিধবা বিবাহের মত না হয়।"[১৬১]

---

[১৫৯] Uma Chakravarti, "Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, Caste, Class and State," *Economic and Political Weekly* 28, no. 14 (1993): 579–85.

[১৬০] যদিও অসবর্ণ বিবাহের সপক্ষেও একেবারে সওয়াল করা হয়নি তা নয়। ভাস্বতী চক্রবর্তী দেখিয়েছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিদের উদ্যোগে এবিষয়েও সভা সমিতির আয়োজন করা হয়েছিল। এঁরা বুঝেছিলেন অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুদের জাতগত বৈষম্যকে প্রতিরোধ করবে এবং ঐক্যকে সুনিশ্চিত করবে। কিন্তু এই চেতনার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার সপক্ষে তথ্য পাওয়া দুস্কর। Bhaswati Chakrabarty, পূর্বোক্ত। আমরা *প্রবাসী* পত্রিকাতেই একমাত্র অসবর্ণ বিবাহের হয়ে সওয়াল উঠতে দেখি। কিন্তু এই প্রচেষ্টার প্রবল বিরোধিতা হিন্দু মহাসভার ভেতর থেকেই উঠতে থাকে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার বর্ধমান অধিবেশনে সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী রাধাকৃষ্ণণের উদ্ধৃতি তুলে বলেন, "if a member of a first class family marries another of poor anticidents, the good inheritance of the one is debased by the bad inheritance of the other, with a result that the child starts life with a heavy handicap. If the parents are of about the same class, the child will be practically the equal of the parents... parhaps it will be admited that Prof. Radhakrisnan's analysis is a great argument against inter-caste marriage. harmony between individual and social good– that is what Hinduism has always striven for. It does the same even today. Those who advocate intercaste marriage only think of individual happiness of the shadow of happiness without ever caring for social and collective welfare." 6th Provincial Hindu Conferance, Burdwan, Presidencial Address by Maharaja Sris Chandra Nandy of Kasimbazar, Proceedings of Meetings in Burdwan, 41/1928 File no. 80X/28, (West Bengal State Archives Intelligence Bureau).

[১৬১] বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনী, ষষ্ঠ অবিবেশন, বর্ধমান, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের অভিভাষণ, Proceedings of Meetings in Burdwan, 41/1928 File no. 80X/28, (West Bengal State Archives Intelligence Bureau).

উপসংহার

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখলাম ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনার দোসর হিসেবে বংশবৃদ্ধিকেন্দ্রিক এবং সংখ্যাবৃদ্ধিকেন্দ্রিক আলোচনাগুলি যখন আত্মপ্রকাশ করল - সেখানে লিঙ্গ, জাতপাত আর সাম্প্রদায়িক চেতনাগুলি যেভাবে উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলি একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে থেকেছিল। একে অপরকে নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিপূরকের কাজ করেছিল। আর এই প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্যের ধারণাটি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং পৌরুষের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং এই সংযোগের বৃহত্তর সূত্রগুলি থেকে আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যকামী পৌরুষ এবং *হেটেরোনরম্যাটিভ* যৌনতার নির্মাণের প্রক্রিয়াটির প্রসঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাকে লক্ষ করলাম। সেখানে প্রথমে যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল হিন্দু সাম্প্রদায়িক সাধারণজ্ঞানের সাথে যে বিষয়টি গভীরভাবে জুড়ে যেতে থাকে সেটি হল প্রজনন ও হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রসঙ্গ। যৌনতা এখানে একমাত্র প্রজননের সাথে সম্পর্কিত। আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের অর্থ সেখানে সুস্থ বলবান সন্তান উৎপাদনের কামনা করা। ফলত সন্তান উৎপাদন ব্যতীত এই পৌরুষের কাছে অন্যান্য যৌনবাসনা সম্পূর্ণ প্রান্তিক হতে থাকে এবং হিন্দু পৌরুষের উক্ত চরিত্রকে বজায় রাখাই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম উদ্বেগ হিসেবে সামনে আসে।

আলোচ্য অধ্যায়ে দ্বিতীয় যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানে ব্রাহ্মণবাদী পৌরুষের অস্তিত্ব দুদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একাধারে হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করা এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে দিশা দেওয়ার ক্ষেত্রে তার নেতৃত্বের নৈতিক তথা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতর্কে পিতৃসুলভ হয়ে ওঠার এই তাগিদের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণবাদী পৌরুষের উদ্বেগ মোচনের উপায়গুলি মূর্ত হতে দেখি। একদিকে হিন্দুর দুর্বলতা এবং হ্রাসমানতার কারণকে নিম্নজাতির জনতার দেহে প্রথিত করা এবং তার থেকে উদ্ধারের জন্য জাতিব্যবস্থায় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার মধ্যে সেই নৈতিক পৌরুষের প্রকাশকে আমরা লক্ষ করতে পারি যা এক আধিপত্যকামী চেহারা নিতে থাকে।

এখানে আমরা হিন্দু সাবর্ণ মধ্যবিত্ত বাঙালির সাম্প্রদায়িক বয়ানে একাধিক পুরুষালি 'অপরকে' চিহ্নিত হতে দেখি যে প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। যেমন একাধারে মুসলমান পৌরুষকে 'অপর' হিসেবে কখনো সদর্থক চরিত্রে চিত্রিত করা, কখনো নঞর্থক ভূমিকায় কল্পনা করার প্রবনতা। অপরদিকে শ্রমশীল দলিত দেহকে দুর্বল,

নৈতিক এবং সুস্থ সন্তান প্রজননে অক্ষম হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস। এখানে সর্বোপরি যে প্রবনতাটি সবচেয়ে বেশী নজরে আসে তা হল দলিত পুরুষ এবং হিন্দু মেয়েদের যৌনতা, তথা দেহের উপর নিয়ন্ত্র বহাল করার বাসনা। এই নিয়ন্ত্রণের পশ্চাতে আমরা সাবর্ণ হিন্দু নেতৃত্বের নৈতিক ভিত্তিকে প্রতিভাত হতে দেখি একটি বর্জনমূলক পৌরুষের অবধারণার মধ্যদিয়ে। এখানে ব্রহ্মচর্য হয়েওঠে সেই বর্জনমূলক সাবর্ণ পৌরুষের ভিত্তি যা চর্চার মধ্যদিয়ে উচ্চবর্ণ হিন্দু পুরুষ নেতৃত্ব দলিত পুরুষ এবং হিন্দু মেয়েদের নিয়ন্ত্রণের জন্য তার নৈতিক আধিপত্যটি দাবি করতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রতীকী নৈতিক জোরটি আহৃত হয় ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে পুনর্নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে। যদিও আমরা এই বিষয়টিও লক্ষ করলাম যে এই আধিপত্যবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষ নির্মাণের প্রক্রিয়া অপর অধঃস্তন পুরুষ গোষ্ঠী এবং নারীদের উপর কতটা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় সেই বিষয়ে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষত রাজবংশী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানে ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদী যে পৌরুষ নির্মাণ করা হয় তা নির্বিঘ্নে সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু এই পৌরুষনির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আধিপত্যকামনা যে স্পষ্ট লক্ষ করা যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আধিপত্য দাঁড়িয়ে আছে একটি বর্জনমূলক নীতির উপর।

তৃতীয় অধ্যায়

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের অন্তর্জগৎ ও পৌরুষ :
অনুশাসন, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভুতি প্রসঙ্গে, ১৯০৫-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ

সূচনা

বিপ্লবীদের কাছে জন্মভূমির শৃঙ্খল মুক্ত করাই ধর্ম। স্বামীজির প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবীদের মনে এ ধরণের ভাবধারা সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেয়েছেন। বিপ্লবীরা কর্মযোগীর ন্যায় স্বাধীনতা লাভের তপস্যাব্রতী। তাদের সরল অনাড়ম্বর কৃচ্ছ্র জীবন তার প্রমাণ। বিপ্লবীরা ধর্মতপস্বী।

(ঐ সময়ে) একটি যুবক লাঠিখেলা বা শরীর চর্চার সমিতিতে ব্যায়াম করতে করতে বিপ্লবী ভাবধারায় দীক্ষা গ্রহণ করে ফেলেছে অজ্ঞাতসারে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মতনই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা ছিল বিপ্লবীদের আদর্শ কর্ম। ব্রহ্মচর্য্য পালন করার অধ্যায়ে তারা নানান ধরণের পুঁথি পড়তেন। প্রথম পর্যায়ে স্বামীজির লেখা পুঁথি, বিশেষ করে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, বীরবাণী পত্রাবলী প্রভৃতি পুস্তক পড়তে হত।...

ধর্মশিক্ষার সাথে পড়া হত ভারতবর্ষের আদি ইতিহাস কথা। অনেক সময় বহু নতুন কর্মী একত্র হয়েই পাঠ গ্রহণ করত। আমার মনে আছে যেদিন "দেশের কথা" পড়া শেষ করি, সেদিন আমি পুরোপুরি বিদ্রোহী। আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ, কর্তব্য নির্দ্ধারিত – পথ উন্মুক্ত। অজানা ভবিষ্যৎ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যেন বলছে, এগিয়ে এস। [১]

দুর্জয় সস্নেহে তাকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে চাপড় দিয়ে বল্লে, তবে, আমি, আর সুধীর চল্লুম সদরপথে, তোমরা একটু পরেই, যেমন বল্লুম করবে।

একসঙ্গে মরার আনন্দ সুধীরের মুখে চোখে ফুটে উঠল। এই যে তার সেই দুর্জয়দা, যে তাকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করেচে, তার চোখ খুলে দিয়েচে, তার অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে! আজ তারই সঙ্গে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পাশাপাশি মৃত্যুশয্যায় চিরনিদ্রার আয়োজন, - তার মোহ, তার লোভ, তার আকর্ষণ কি কম!...

অল্পক্ষণেই মধ্যেই সার্চ লাইট জ্বলে উঠল। দুর্জয় বল্লে, এবার ধরা পড়ে গেচি; ... আমার অসমাপ্ত ব্রত, তুমি ছাড়া কেউ উদ্‌যাপন করতে পারবে না, তোমার দাদার শেষ অনুরোধ রাখো, এখনও পালাও। ...

"আর 'কিন্তু' নেই। 'কিন্তু' পরজন্মে যখন আবার আমরা মিলব, তখন সেখান থেকে স্বাধীন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আমাদের 'কিন্তু' হবে। এই জন্মে আদর করতে পারিনি, ভালোবাসার অবসর পাইনি, নিশ্চিন্ত হয়ে দু দণ্ডের জন্য মিলতে পারিনি – সব 'কিন্তু' সেই দিন, সেইখানে। কেমন?"

সুধীর, তোর পিস্তলে গুলি আছে? দেখি, যা, এইবার তুই পালা। পিস্তল নিজের ললাটের উপর লক্ষ্য করল, তার অগ্নিমুখ অধর সেখানে মৃত্যু-চুম্বন এঁকে দিল। সুধীর নিস্পলক চোখে চেয়ে রইল।

দুর্জয় শুয়ে শেষ কথা বলল, ওরা এসে পড়েচে। পালা পালা। সত্যিই তারা এসে পড়েছিল, সুধীর গুপ্তপথে পালালো। পুলিশের কর্তা প্রবেশ করলেন, দুর্জয়ের দুর্জয় প্রাণ তখনো অবশিষ্ট ছিল। কথা দিয়ে নয়

---

[১] নরেন দাস, *বিপ্লবী আন্দোলনের জিজ্ঞাসা* (কলকাতা : সুজন পাবলিকেশনস্, ১৯৮৩ খ্রি.), ২৯-৩০।

জীবনের শেষ হাসি দিয়ে সে তাঁর অভ্যর্থনা করল। পুলিশের বড়কর্তা টুপি খুলে এই বীবের প্রতি তাঁর শেষ সম্মান দেখালেন।[২]

> আমি আজ তার (রাধারাণী দেবী) চরিত্র অনুধবণ করিয়া দেখি – লোকে শাস্ত্র ও আচার রক্ষা করিবার জন্য যেন একটা মহাকাণ্ড বাধাইয়া তুলে, কিন্তু শাস্ত্র ও আচার তাঁর জীবন অনুসরণ করিত। তিনি সত্যই ছিলেন তপস্যার সিদ্ধমূর্ত্তি। ব্রহ্মচর্য্যব্রত তিনি এক কথায় গ্রহণ করিলেন – কোনও দিন আর তাঁর মনে দ্বিধা দেখি নাই। ... তাঁর কাছে চালাকি করিয়া পার পাওয়ার উপায় ছিল না। তাঁর সত্য-দৃষ্টি হৃদয় ভেদ করিত। তিনি আমার কথায় উঠিতেন, আমার কথায় বসিতেন, সে কেবল শ্রদ্ধা ও প্রত্যয়ের মহিমায়; কিন্তু আমিই সতত শঙ্কিত হইতাম, অনেক মিথ্যাকে আমি আশ্রয় দিতে বাধ্য হইতাম।
>
> ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁর সুকুমার-রসবৃত্তি ঠাকুর-ঘর হইতে তুলসীতলা, শয়নগৃহ, রন্ধনশালা, সর্ব্বত্রই পবিত্র আলপনা লেপন করিয়া রাখিত। ... নিদারুণ গ্রীষ্মে রন্ধনশালায় অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিতে প্রহরের পর প্রহর তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি| অটল ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বাবস্থায় তিনি চিরশান্তিময়ী ছিলেন। দ্বন্দ্ব বাধিত কেবল আমায় লইয়া; সে অপরাধ আমারই – তাঁর অমৃতময় হৃদয়খানিতে বিক্ষোভ সৃষ্টি করার অধিকার আমারি ছিল, তাহা বুঝি অত্যাচারের কষ্টিপাথরে তাঁর নির্দ্বন্দ্বতা পরীক্ষা করিতে বিধাতা আমায় যন্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। ... তিনি যে কখন ভোজন করিতেন, কখন চরণপ্রান্তে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন, তাহা আমার লক্ষ্যে পড়িত না; যেন মনে – দেহটুকুর রক্ষার্থে তপস্বিনী হাতের মুঠোয় যাহা ধরে তাহাই ভোজন করেন, আর শ্রমক্লান্ত শরীরের শ্রান্তি দূর করার জন্যই একবার আমার কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়েন। ... তাই সঙ্ঘতীর্থে তাঁর আধ্যাত্ম-সন্তানদের নতজানু স্তুতি শুনিয়া আমার আশীর্ব্বাদই আমার মুখ দিয়া বাহির হয় – "হে অমৃতস্য পুত্রাঃ, তোমরা মহাতপস্বিনীর অমৃত-প্রসূ তপস্যারই উত্তরাধিকারী। তোমাদের বন্দনা ব্যর্থ হইবার নয়।"[৩]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে যে স্বদেশি আন্দোলন দানা বাঁধে তা বিশ শতকের একেবারে শুরুর বছরগুলিতে কলকাতা এবং বাংলার অন্যান্য কিছু জেলায় গড়ে ওঠা বিপ্লবী সমিতিগুলির কার্যকলাপকে প্রকৃত অর্থে সক্রিয় করে তোলে। গুপ্তসমিতি হিসেবে তারা সঠিক অর্থে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।[৪] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ঐতিহাসিকরা এই সংগঠনগুলির বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রেক্ষাপট ও চিন্তাধারার একাধিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৫] কিন্তু সেই অর্থে কেউ

---

২ শিবরাম চক্রবর্তী, *ছেলে বয়সে, শিব্রাম অমনিবাস,* চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৯৪ খ্রি.), ২৬-২৮।

৩ মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী,* প্রথম খণ্ড (কলকাতা : প্রবর্ত্তক পাবলিসার্স, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৭৫), ১৩৯-৪১।

৪ Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908* (New Delhi: People's Publishing House, 1973), 470–74.

৫ Amalesh Tripathi, *The Extrimist Challenge: India Between 1890 and 1910* (New Delhi: Orient Longman, 1967); Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*; Peter Heehs, *The Bomb in Bengal : The Rise*

বিপ্লবীদের অভ্যন্তরীণ দুনিয়া, সেখানকার সাংগঠনিক অনুশাসন এবং বিপ্লবীদের মধ্যে পৌরুষের অবধারণার প্রতি তেমনভাবে আলোকপাত করেননি। আর কিছু ক্ষেত্রে যখন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে গবেষোণামূলক অগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, সেই পর্যবেক্ষণেও বিপ্লবীদের আভ্যন্তরীণ জগৎ, তাদের পৌরুষের অবধারণাকে বোঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংকীর্ণ নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন রজতকান্ত রায় শুরুর পর্বের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ, সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন বিপ্লবীদের বীরত্ব এবং আত্মবলিদান শিক্ষিত বাঙালিদের মনে বাঙালি পৌরুষের চেতনাকে উদ্দীপিত করলেও আদতে এই আন্দোলনের অনেক 'কালো দিকও' ছিল। বিপ্লবী দলগুলিতে ব্রহ্মচর্যের মতো উচ্চ আদর্শকে পালন করা বাধ্যতামূলক করা হলেও অনেকেই এই শপথগুলিকে পালন করতেন না। দলের মধ্যে পুরুষ বিপ্লবীদের যৌন অন্তরঙ্গতার হদিশ মিলত।[৬] আমরা বর্তমান অধ্যায়টিতে বাংলার প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির জীবনচর্চার জন্য নির্ধারিত বিধি এবং জীবনচর্যাগত অভিজ্ঞতাগুলিকে উদ্ঘাটন করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে পৌরুষের অবধারণাটিকে বোঝার চেষ্টা করব এবং এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত ধারণাগুলি থেকে সরে আসতে চাইব। আমরা দেখার চেষ্টা করব কীভাবে দেশ এবং দেশমাতৃকার জন্য ত্যাগের মন্ত্রে বলিপ্রদত্ত, ব্রহ্মচর্যের মতো আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শকে অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ে বিপ্লবীদের অনুশাসনগুলি বিকশিত হয়েছিল। পাশাপাশি জীবনচর্যায় বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, রাজনৈতিক শিষ্যত্ব, গভীর অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতিপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিফলনও তাঁদের বিপ্লবী কার্যকলাপের পাথেয় হয়ে উঠেছে-- এর মাধ্যমে তাঁরা বিপ্লবে একে অপরকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। একাধারে কাম্য জীবনবিধি ও জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে কীভাবে বিপ্লবী পরিসরে পুরুষ বিপ্লবীর অবধারণাটির জন্ম হয়েছে তাই আমরা এই অধ্যায়ে বোঝার চেষ্টা করব। ফলত সমান্তরালভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণকারী এবং আত্মত্যাগী পুরুষ হয়ে ওঠার অনুশাসন, পুরুষদের মধ্যেকার অন্তরঙ্গতার অভিজ্ঞতা ও কিছু বিপ্লবী পুরুষের গার্হস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করার মাধ্যমে

---

of Revolutionary Terrorism in India, 1900-1910 (New Delhi: Oxford University Press, 1993); Shukla Sanyal, *Revolutionary Pamphlets, Propaganda and Political Culture in Colonial Bengal* (Delhi: Cambridge University Press, 2014); David M Laushey, *Bengal Terrorism & the Marxist Left : Aspects of Regional Nationalism in India, 1905-1942* (Calcutta: Firma KLM Private Limited, 1975).

৬ Rajat Kanta Ray, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927* (Delhi: Oxford University Press, 1984), 184–85.

আমরা তুলনায় বিপ্লবী পৌরুষের নির্মাণের একটি জটিল প্রক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করব। এবং এর মধ্য দিয়েও আলোচ্য পরিসরে ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে পৌরুষের বিশেষ ধরনটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

এই প্রসঙ্গে প্রথমে উদ্ধৃত তিনটি রচনাংশের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করতে হয়। এই তিনটি রচনার উদ্ধৃত অংশর মধ্যে একটি বিষয় সাধারণ। তিনটি ক্ষেত্রেই বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী পুরুষের বয়ানে আবেগ ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমটিতে বিশ শতকের দুইয়ের দশকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত হওয়া নরেন দাস তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *বিপ্লবী আন্দোলনের জিজ্ঞাসা*য় আগের প্রজন্মের বিপ্লবীদের জীবনচর্চা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে ত্যাগ-কৃচ্ছ্রসাধনা-বীরত্ব-আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং দেশের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কাহিনী রোমন্থন করছেন। এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের কর্মজীবনের সাথে তাঁর পূর্বসূরীদের আত্মত্যাগের কাহিনীকে সংযুক্ত করে নিজের জাতীয়তাবাদী আবেগটিকে ব্যক্ত করছেন। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দুটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী পুরুষ চরিত্রর মধ্যে আবেগপূর্ণ কথোপকথন এবং অনুভূতির আদানপ্রদান লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রকাশ পাচ্ছে দুই পুরুষ চরিত্রের মধ্যের নৈকট্য, অন্তরঙ্গতা। শিবরাম চক্রবর্তীর *ছেলে বয়সে* উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত এই অংশের চরিত্র দুটি দুই বিপ্লবী যুবকের। পুলিশের সাথে মুখোমুখি গুলি বিনিময়ের সময় দুই বিপ্লবীর বিচ্ছেদের করুণ মুহূর্ত এখানে লেখন ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি দেশের জন্য শাহাদাত দেওয়া বিপ্লবী বীরের প্রতি পুলিশের বড়কর্তার গভীর সম্মানবোধকেও তুলে ধরেছেন লেখক। তৃতীয় উদ্ধৃতিটি এক প্রাক্তন বিপ্লবী এবং পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের পরিচিত মুখ মতিলাল রায়ের আত্মজীবনী *জীবনসঙ্গিনী* থেকে নেওয়া। এখানে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে এক দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা মতিলালের তাঁর মৃত স্ত্রী রাধারাণী দেবীর প্রতি ব্যক্ত অনুভূতি ও সম্ভ্রমমিশ্রিত অভিব্যক্তি লক্ষণীয়।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মধ্যে কীভাবে উনিশ শতকের শেষ দশকগুলি থেকে আদর্শ পৌরুষের সংজ্ঞা হিসেবে ব্রহ্মচর্যের মতো আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক বিধিটি মান্য হয়ে ওঠে সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনার পরিসরটি উন্মুক্ত করেছি। বিপ্লবীদের মধ্যে এই প্রবণতাটি কী রূপে সংযুক্ত থাকে সেই বিষয়ে আমরা অধ্যায়ের অভ্যন্তরে বিস্তারিত আলোচনা করব। কিন্তু তার সাথে যে বিষয়টি তুলনায় স্বল্প আলোচিত অর্থাৎ অনুভূতি, অন্তরঙ্গতার প্রসঙ্গটি সেই বিষয়ে সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক আলোচনা সম্পর্কে দু-এক কথা শুরুতেই উপস্থাপন করা জরুরি। ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলায় অনুভূতি বিষয়ে ঐতিহাসিক

আলোচনা খুবই সাম্প্রতিক এবং সূচনার পর্যায়ে রয়েছে,[৭] আর পৌরুষের সাথে অনুভূতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা আরও বিরল।[৮] যদিও পৌরুষ এবং অনুভূতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আশীষ নন্দীর আলোচনা থেকে অনুধাবণ করা যায় যে ঔপনিবেশিকতা পৌরুষের সাথে যুক্তিপ্রবণতা, সাহস, প্রাপ্তবয়স্কতাকে এক করে দেখার প্রবণতা তৈরি করেছে।[৯] ফলত উপনিবেশবাদ যে একভাবে পৌরুষের একটি একমাত্রিক ছক তৈরি করতে চেষ্টা করেছে তা অনুধাবনযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বিগত কয়েক দশকে নারীবাদী এবং পৌরুষ সম্পর্কে সমালোচনাত্মক বিদ্যাচর্চায় যুক্ত গবেষকরা এই সমালোচনাটি সামনে এনেছেন যে আত্মসংযমী, প্রকাশ্যে অনুভূতি ব্যক্ত করতে অক্ষম পৌরুষের যে ভাবমূর্তি, তা আদতে পশ্চিমী, শ্বেতাঙ্গ, বিসমকামী পৌরুষের ধারণা, যার কোনো সার্বজনীন ভিত্তি নেই।[১০] এই আলোচনাগুলিতে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে এসেছে তা হল পৌরুষের নির্মাণ কখনোই সংস্কৃতি এবং ইতিহাস নিরপেক্ষ নয়।[১১] বর্তমানে

---

৭ Rajat Kanta Ray, *Exploring Emotional History : Gender, Mentality and Literature in the Indian Awakening* (New Delhi: Oxford University Press, 2001); Mimasha Pandit, *Performing Nationhood: The Emotional Roots of Swadeshi Nationhood in Bengal, 1905-1912* (Delhi: Oxford University Press, 2019).

৮ Swapna M. Banerjee, "Everyday Emotional Practices of Fathers and Children in Late Colonial Bengal, India," in *Childhood, Youth and Emotions in Modern History: National, Colonial and Global Perspectives*, ed. Stephanie Olsen (London: Palgrave Macmillan, 2015), 221–41.

৯ Ashis Nandy, *Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self under Colonialism*, Oxford India Paperbacks (New Delhi ; Oxford: Oxford University Press, 1983), 80, 84.

১০ বব পিস্ তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন, পুরুষরা কম অনুভূতিপ্রবণ, এই ধারণাটা পশ্চিমী স্কলারশিপ থেকে আসে। আদতে এই মডেলটি পশ্চিমী শ্বেতাঙ্গ, বিসমকামী পুরুষদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। তা কখনোই পুরুষের সার্বজনীন ক্যাটেগরি নয়। Bob Pease, "The Politics of Gendered Emotions: Disrupting Men's Emotional Investment in Privilege", *Australian Journal of Social Issues* 47, no. 1 (2012): 227. সম্প্রতি এই বক্তব্য অন্য গবেষকদের আলোচনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন Sam de Boise and Jeff Hearn, "Are Men Getting More Emotional? Critical Sociological Perspectives on Men, Masculinities and Emotions," *The Sociological Review (Keele)* 65, no. 4 (2017): 9. সারা আহামেদ এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন যে পশ্চিমী সংস্কৃতিতে পৌরুষকে চিন্তাশীলতা এবং যুক্তিশীলতার সাথে সম্পৃক্ত করে দেখা হয়, যেখানে নারীত্বের সাথে আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণতাকে যুক্ত করা হয়। Sara Ahmed, *Cultural Politics of Emotion* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004). দারিউজ গালাসিনসকি মনে করেন, পশ্চিমে পৌরুষ এবং অনুভূতি সম্পর্কে কিছু বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। সেখানে অনুভূতিকে যৌক্তিকতার পরিপন্থী হিসেবে দেখা হয়েছে। ফলত তা গণ্য হয়েছে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয় হিসেবে যা একাধারে মানুষের দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে যা সমাজের জন্য বিপজ্জনক। অন্যান্য গবেষকদের আলোচনা থেকে উদ্ধৃতি তুলে তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমে অনুভূতিপ্রবণতার সাথে যুক্ত করে দেখা হয়েছে প্রাকৃতিক এবং শারীরবৃত্তীয় প্রবৃত্তিকে যা সভ্যতার পরিপন্থী। পাশবিক প্রবৃত্তিকে তাই অনুভূতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হয়েছে সেখানে। Dariusz Galasiński, *Men and the Language of Emotions* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004), 12.

১১ লেখিকা আমাল ট্রেচার কাবেস স্থানিক পরিবেশে এবং তার বিশেষ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় পৌরুষ কীভাবে ক্রিয়াশীল হয় তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। আরব দুনিয়ায় একাধারে পূর্বপুরুষদের যৌথ স্মৃতি এবং উপনিবেশবাদ, ৯/১১ এবং আরব স্প্রিং পরবর্তী পরিস্থিতি পুরুষদের অনুভূতির জগৎকে কীভাবে আকার দিয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি

পৌরুষ নিয়ে সমালোচনাত্মক বিদ্যাচর্চায় এই ধারণাটি ফলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিশেষে পৌরুষের ধারণায় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে থেকেছে।[১২] যদিও একই পংক্তিতে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সর্বদা অনুভূতিপ্রবণতা পৌরুষের আধিপত্যবাদী হওয়ার সম্ভাবনার পরিপন্থী হয়ে থাকে তা নয়। *এফেক্ট* নিয়ে উদীয়মান গবেষোণা এই বিষয়টি সামনে এনেছে যে আবেগ পৌরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করতে পারে।[১৩] অনুভূতি এবং ক্ষমতার সম্পর্ক উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বব পিস্ দেখিয়েছেন যে সামাজিক গোষ্ঠী (আমাদের আলোচনায় পুরুষরা) ক্ষমতার নিরিখে উপরের দিকে থাকে, তাদের সদর্থক অনুভূতি অনেক বেশি। বিপরীতে মেয়েরা যেহেতু ক্ষমতার ক্রমে নীচের দিকে থাকেন তাই জীবনে তাঁদের নঞর্থক অনুভূতির অভিজ্ঞতা বেশি হয়।[১৪] অন্যদিকে সম্প্রতি সারা আহমেদ তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণায় সুখ প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখিয়েছে, মানুষ কিসে খুশি হবে সেই অনুভূতিটি সামাজিকভাবে পূর্ব নির্ধারিত। তাই একটি পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশে বা বর্ণবাদী সমাজে সুখের ধারণাটি বর্ণবাদ বা পিতৃতান্ত্রিকতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।[১৫] সুতরাং একটি বিশেষ সময়পর্বে অনুভূতি এবং আবেগের সাথে সামাজিক ক্ষমতা কীভাবে সম্পর্কিত হতে পারে তার অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

উপরে উল্লিখিত সূত্রগুলিকে স্মরণে রেখে আমরা একাধারে যেমন বিপ্লবী পরিসরে পৌরুষের পরিভাষা তৈরিতে ব্রহ্মচর্যের ভূমিকাটিকে চিহ্নিত করতে চাইব, একই সাথে এই বিধিগুলির পাশাপাশি বিপ্লবী পরিসরের দৈনন্দিন আবেগ সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী পৌরুষের নির্মাণে কী ভূমিকা নিয়েছিল তা বোঝার চেষ্টা করব। ফলত বাংলায় বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বিকশিত প্রথম পর্বের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী পরিসরে পৌরুষের ধরনটি

দেখিয়েছেন, অভিবাসন বিষয়ক প্রতর্ক আরবীয় পুরুষদের 'অপর' করার মধ্য দিয়ে তাঁদের মনোজগতে কীভাবে গভীর ছায়াপাত করেছে। Amal Treacher Kabesh, *Postcolonial Masculinities : Emotions, Histories and Ethics* (Farnham, 2013), 3.

[১২] এই আলোচনাটির জন্য পূর্ব উল্লেখিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের সঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, Galasiński, *Men and the Language of Emotions*.

[১৩] সম্প্রতি এফেক্ট এবং পৌরুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার নতুন ক্ষেত্র উদ্ঘাটনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে Todd W. Reesera এবং Lucas Gottzén উল্লেখ করেছেন, "Hegemony works in part by playing on affective intensities, by coopting them. A scholar could study how affect is channeled into 'anger' and how that channeling functions as a tool serving hegemonic ends." Todd W Reeser and Lucas Gottzén, "Masculinity and Affect: New Possibilities, New Agendas," *Norma : International Journal for Masculinity Studies* 13, no. 3–4 (2018): 151.

[১৪] Pease, "The Politics of Gendered Emotions: Disrupting Men's Emotional Investment in Privilege," 132.

[১৫] Sara Ahmed, "'Happy Objects,'" in *The Affect Theory Reader*, ed. Melissa Gregg and Gregory J. Seigworth (Durham; London: Duke University Press, 2010), 29–51.

বুঝতে গিয়ে আমরা বর্তমান অধ্যায়ে তাঁদের মধ্যে অনুশাসন, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতি-- এই তিনটি বিষয়ের উপস্থিতির ওপর মূলত আলোকপাত করব। এইক্ষেত্রে আমরা যেমন বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তির দীর্ঘ সূত্রগুলিকে অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ, ব্রহ্মচর্যের সঙ্কল্প নেওয়া বিপ্লবী পৌরুষের আদিকল্পটি বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বিকশিত হয়। কৃচ্ছ্রসাধনা, আত্মসংযম, ত্যাগের অভ্যাসের মতো বিষয়গুলি যার সাথে অনুশাসনমূলক প্রকল্পের সংযোগ রয়েছে সেগুলি অভ্যাসের পাশাপাশি এই পৌরুষের অভিব্যক্তিতে দেশমাতৃকার প্রতি আবেগ, সহ-বিপ্লবীদের সাথে বন্ধুত্ব এবং গভীর ভালোবাসা প্রবলভাবে বর্তমান থেকেছে। অতএব আমরা এই অনুশাসনমূলক প্রকল্প, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতির প্রবল উপস্থিতির সহাবস্থানকে উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম পর্বে বাংলায় পৌরুষ নির্মাণের একটি ধারাকে বোঝার চেষ্টা করব। বিপ্লবীদের মধ্যে কীভাবে অনুশাসন, অনুভূতি এবং আবেগ পৌরুষের নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে তা বোঝার চেষ্টা করব। এখানেও আমরা যে প্রশ্নটিকে সামনে রাখার চেষ্টা করব তা হল এই পরিসরে ব্রহ্মচর্যকে যেভাবে চর্চা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অথবা সামগ্রিকভাবে বিপ্লবীদের মধ্যে যেভাবে পৌরুষের চর্চা হয়েছে তা পৌরুষের কী ধরনের উচ্চতর ক্রমের ধারণার ওপর বিকশিত হয়েছে?

আমরা এই অধ্যায়কে মূলত ছটি পর্বে বিন্যস্ত করে আলোচনাটি এগিয়ে নিয়ে যাব। প্রথম অধ্যায়ে বিপ্লবী পরিসরে লিঙ্গায়িত জাতীয়তাবাদ কীভাবে ক্রিয়া করেছে সেই বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিপ্লবীদের মধ্যে পুরুষালি বন্ধন তৈরির প্রক্রিয়াকে উদ্ঘাটন করব। পরের তিনটি পর্বে আমরা সম-সামাজিক (homo-social) পরিসরে বিপ্লবীদের মধ্যে গড়ে ওঠা অন্তরঙ্গতা, বন্ধুত্ব এবং রোমান্টিকতার ধরন নিয়ে আলোচনা করব। এর পাশাপাশি আদর্শ বিপ্লবী পুরুষের আদিকল্প সম্পর্কে আলোচনা করে দেখার চেষ্টা করব বিপ্লবী সম-সামাজিক পরিসরে তা কীভাবে আদর্শ পৌরুষের নির্মাণ করে। অন্তিম দুটি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা কেন্দ্রীভূত করব বিপ্লবী এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব মতিলাল রায় এবং তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবীর গার্হস্থ্য সম্পর্কের উপর। সম-সামাজিক পরিসরের পাশাপাশি দাম্পত্য প্রসঙ্গে আলোচনা সম্প্রসারিত করে আমরা মূলত দেখতে চেষ্টা করব দাম্পত্যের পরিসরে পৌরুষের ধারণাটি কীভাবে কল্পিত এবং চর্চিত হয়। একই ধরনের আদর্শগত পরিবেশে সম-সামাজিক পরিসরে পুরুষদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং গার্হস্থ্যের মতো পরিসরে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে উদ্ঘাটন করার মাধ্যমে আমরা অনুশাসন, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতির সাথে পৌরুষের সম্বন্ধটি বুঝতে

চাইব। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি উদ্ঘাটন করতে গিয়ে প্রথাগত ঐতিহাসিক উপাদানের পাশাপাশি আমরা আত্মজীবনীমূলক রচনাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করব। বাঙালি তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসকে মুদ্রিত করার ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিজীবনের নির্মাণকে বুঝতে আত্মজীবনী রচনার ধারাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সুদীপ্ত করিরাজ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে বাঙালি মধ্যবিত্তের নতুন সামাজিক জীবনে এর ভূমিকা অনন্য। এটি একাধারে জীবনকে বর্ণন করে চলে, একটি বাস্তব জীবন সম্পর্কে আত্মবাচক (reflexive) ভঙ্গিতে মতামত রাখে।[১৬] সম্প্রতি পৌরুষ এবং অনুভূতির ইতিহাস রচনায় এই বোধের সৃজনশীল ব্যবহার করেছেন স্বপ্না ব্যানার্জী যেখানে তিনি দেখিয়েছেন আত্মজীবনীকে আমরা 'প্রামাণ্য' প্রাথমিক উপাদানের মতো করে ব্যবহার না করে বরং তাকে দেখতে পারি সামাজিক জীবনকে যেভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয় তার মাধ্যম হিসেবে; যাকে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করা যাবে বহু মাত্রায়। তিনি প্রজন্ম এবং সামাজিক মর্যাদার তারতম্যের নিরিখে বাঙালি বিদ্বজ্জন নিজেদের শৈশবের অভিজ্ঞতাকে কীভাবে আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে পিতা এবং পুত্রের মধ্যেকার অনুভূতিমূলক সম্পর্কের একটি ইতিহাসও যে রচনা সম্ভব সেকথাও তুলে ধরেছেন।[১৭] ফলত এই রচনাগুলি আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের প্রাথমিক সূত্র নির্বাচন এবং তাদের পাঠের পদ্ধতিগুলিকে নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছে।

জাতি, ভারতমাতা ও বিপ্লবী পুরুষ

ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে একটি ইস্তেহার *বিপ্লব কোন পথে* বিপ্লবী মহলে ব্যাপক হারে প্রচারিত হয়। মূল বাংলা ইস্তেহারটি এখন আর পাওয়া না গেলেও তার কিছু অংশ তৎকালীন গোয়েন্দা প্রতিবেদনের জন্য করা অনুবাদ থেকে পাওয়া যায়। সেই অনুবাদটির এক স্থানে লেখা হচ্ছে--

> In the second part, "Musings of a Lunatic," we find an admission that the Bengalis are at a disadvantage in the way of muscular development. That is to be made good by training, so far as training can do so. There must be greater muscular development, but if the time or their disposal is not sufficient to secure such development, there is consolation in the

---

১৬ Sudipta Kaviraj, *The Invention of Private Life: Literature and Ideas* (Ranikhet: Parmanent Black, 2014), 302.

১৭ Banerjee, "Everyday Emotional Practices of Fathers and Children in Late Colonial Bengal, India."

> thought that not much muscle is required to kill a European with revolver or rifle, or to kill many Europeans with a Maxim gun. It does not take much strength to pull a trigger; even a Bengali can do that.[১৮]

উনিশ শতকের বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন কীভাবে শারীরিকভাবে দুর্বল এক বাঙালি জাতির ধারণা তৈরি করেছিল সেই বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি ঔপনিবেশিক বয়ানে বাঙালি পুরুষের দেহকে 'মেয়েলি' এবং ব্রিটিশ দেহকে 'পুরুষালি' প্রতিপন্ন করার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন কীভাবে নিজের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই সূত্র ধরে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে নিজেদের দেহ সম্পর্কে যে সন্দিগ্ধতার বোধ তৈরি হয়েছিল, উপরি উক্ত ইস্তেহারের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃত অংশ সেই দিকটির প্রতিই ইশারা করে। মেয়েলিত্ব এবং শারীরিক দুর্বলতা বাঙালি দেহ সম্পর্কে যে অবধারণার জন্ম দিয়েছে তাকে প্রতিহত করার জন্য বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে শরীরচর্চার সংস্কৃতির প্রতি জোর দিতে থাকে,[১৯] তা একাধারে দু'টি বিষয় সামনে আনে। একদিকে তা বাঙালির মেয়েলিত্বের অপবাদকে আংশিকভাবে স্বীকার করে নেওয়ার পরিচায়ক, অন্যদিকে এই অপবাদের পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্যেও বাঙালি মধ্যবিত্ত তার বীর অতীত এবং বর্তমান নির্মাণের দিকে তৎপর হয়-- যে বিষয়টি ইন্দিরা চৌধূরী বিশ্লেষণাত্মকভাবে সামনে এনেছেন।[২০] বাঙালিরা শারীরিকভাবে দুর্বল-- এই আত্মচেতনা (self perception) যে বিশ শতকের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির মানসিকতাতে প্রবলভাবে বদ্ধমূল হয় সেই দিকটি বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড এবং তাঁদের প্রচারিত বই

---

[১৮] H. L. Salkeld, "Anushilan Samiti, Dacca: Part II," in Amiya K Samanta, *Terrorism in Bengal, Vol II* (Calcutta: Government of West Bengal, 1995), 103.

[১৯] John Rosselli, "The Self-Image of Effeteness: Physical Education and Nationalism in Nineteenth-Century Bengal," *Past and Present* 86, no. 1 (1980): 121–48.

[২০] Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History : Gender and the Politics of Culture in Colonial Bengal*, (Delhi: Oxford University Press, 2001). এছাড়া এই বিষয়টি নিয়ে প্রায় একই ধরনের আলোচনা করেছেন অমিতাভ চ্যাটার্জী, অভীক রায় এবং মিশেল হেমার। অমিতাভ চ্যাটার্জী এক্ষেত্রে খেলাধূলার চর্চা কীভাবে বাঙালি পৌরুষের নির্মাণের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন। আর অভীক রায় এবং মিশেল হেমার আলোচনা করেন বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে বিকল্প পৌরুষের চেতনা নিয়ে। Amitava Chatterjee, "The Man Arrives: Breaking Off the Notion of Effeminacy in Colonial Bengal," *International Journal of the History of Sport* 32, no. 3 (2015): 409–21; Abhik Roy and Michele L Hammers, "Swami Vivekananda's Rhetoric of Spiritual Masculinity: Transforming Effeminate Bengalis into Virile Men," *Western Journal of Communication* 78, no. 4 (2014): 545–62. বিশ শতকে এই দিকটি কীভাবে বাঙলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ও ইস্তেহার থেকে খুব স্পষ্ট। পাশাপাশি বিপ্লবীদের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয় এক অভীপ্সিত পৌরুষকে অর্জনের খোঁজ, যার প্রতিফলন ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য তৈরি হওয়া সমিতিগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায়। এই অভীপ্সিত পৌরুষ নির্মাণের প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে হলে আমাদের নজর দিতে হবে বিপ্লবীদের আদর্শগত অনুপ্রেরণা, তার মধ্যেকার লিঙ্গচেতনা এবং সর্বোপরি বিপ্লবীদের আন্তঃসম্পর্কের উপর।

প্রথম পর্বের বিপ্লবী সমিতিগুলির মধ্যে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার প্রবল উপস্থিতির কথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই হিন্দুধর্মের সাথে সমিতিগুলির সংযোগ কিরূপ সেই বিষয়ে আলোচনা করা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী নিজের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচারণায় লিখছেন—

> সে কালে ধর্মের প্রতি বিপ্লবীদের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। স্বদেশ-সেবা, দেশের উদ্ধারকার্যে আত্ম-বিসর্জন, জনসেবা, পরহিতে আত্মদান সমস্তই ধর্ম-সাধনার অঙ্গ বলে বিপ্লবীরা মনে করতেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন সমিতির সদস্যদের অবশ্যপালনীয় ছিল। সমিতির ছেলেদের আকর্ষণ করার প্রথম সোপান হিসেবে এবং প্রাথমিক সভ্যদের সঙ্গে আলোচনার প্রধান বিষয়ই হ'ত ধর্ম এবং ব্রহ্মচর্য। তাছড়া পৌরাণিক কাল থেকে সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যাঁরা জনহিতকর কিংবা অন্য কোন মহৎ কার্যে আত্মদান করেছিলেন তাদের উপাখ্যান হ'ত সকলের প্রধান পাঠ্য এবং আলোচনার বিষয়।
>
> সমিতি ধর্ম-সংঘ নয়, কিন্তু ধর্মই ছিল প্রাণ স্বরূপ।...কাজেই সাধুসন্ন্যাসীদের উপর বিপ্লবীদের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। বাংলার বিপ্লবীদের বিপ্লব সাধনার ভিত্তি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, ভগবৎগীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা।[২১]

বিপ্লবীদের মধ্যে দেশের জন্য আত্মবিসর্জন এবং ধর্মসেবাকে একই বিষয় মনে করার যে প্রচলিত মনোভাবের কথা প্রতুলচন্দ্র বলছেন, সেখান থেকেই দেশকে মাতৃদেবতা রূপে বন্দনা করার সূত্রটি অনুসন্ধান করা যায়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র যা পরে *আনন্দমঠ* উপন্যাসের অন্তর্গত হয়ে যায়, সেখানেই এই দেশমাতৃকার ধারণাকে আমরা আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। তার দু-দশক পরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা পর্বে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা বহু আলোচিত 'ভারতমাতা' দেশমাতৃকার এক নান্দনিক অবয়ব সামনে আসে। বাংলার বিপ্লবী সমিতিগুলির কার্যালয়ের নানা

[২১] প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, *বিপ্লবীর জীবন দর্শন* (কলকাতা: ১৩৮৩), ১৮৮।

শৈলীতে ভারতমাতার চিত্ররূপের উপস্থিতির কথা ঔপনিবেশিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনকারীদের নজরে এসেছে[২২], এবং বিপ্লবী সমিতিগুলিতে ইস্তেহার ও পাঠ্য বইগুলিতেও এই মাতৃকাপূজাকে বারংবার বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আচার হিসেবে প্রকট হতে দেখা যায়। এখানে তিনটি দিক বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দেশকে মা হিসেবে কল্পনা, এই মায়ের সাথে মাতৃদেবতার ধারণাকে এক করে দেখা, এবং এই কল্পিত দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে সন্তানদের ত্যাগ বা আত্মবলিদানের ধারণাকে একটি যূথবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আবেগে রূপান্তরিত করা। ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যের গবেষকরা দেশমাতার অবয়ব কীভাবে লিঙ্গায়িত (Gendered) সেই বিষয়টি নানান আঙ্গিকে দেখেছেন। এখানে ঔপনিবেশিত ভারতের দুরবস্থাকে দর্শাতে গিয়ে দুটি পরস্পরবিরোধী নারীচরিত্রের অবয়ব জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে লক্ষ করেছেন তনিকা সরকার। একটি হল অসহায়, বেচারী, ভারতমাতার আদি রূপ-- যিনি বিবর্ণ, ভীত, দুর্বল। অন্যটি ভীতিহীন, ক্রুদ্ধ কালীর অবয়ব।[২৩] বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কল্পনায় এই ক্রুদ্ধ, ভীতিহীন মাতৃকার কল্পনা অনেক প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়, যা বিপ্লবী কর্মসূচীতে দৈহিক ও মানসিক বল বা শক্তি চর্চার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার কাজ করেছে। বিপ্লবীদের বয়ানে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মেদিনীপুরের বিপ্লবী সংগঠন পরিদর্শন করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেন বিপ্লব কেন্দ্রে এক ভয়াল কালীমূর্তির উপস্থিতি। বারীন্দ্রকুমারের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় অরবিন্দ ঘোষ ভবানী মন্দির নামক ইস্তেহারে সন্তানদের জন্য দুর্গম পর্বতে ভবানীর যে মন্দির ও মঠ নির্মাণের কল্পনা করেছিলেন, তা তাঁদের বিশেষভাবে অনুপ্রানিত করে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা মধ্য ভারতের নর্মদা উপত্যকায় জঙ্গলবেষ্টিত পর্বতে গুরুর অন্বেষণে যান। উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব কার্যে আধ্যাত্মিক দিশার নির্ধারণ করা।[২৪] অরবিন্দ ঘোষের লেখা *ভবানী মন্দির* নামাঙ্কিত ইস্তেহারটি এই বিষয়টিকে বোঝার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। এই ইস্তেহারের ‘What is a Nation? The Sakti of Its Millions’ অংশে অরবিন্দ লিখছেন--

---

[২২] ঢাকা অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রের খানা তল্লাসিতে সমিতির দেওয়ালে ভারতবর্ষের মানচিত্রের মধ্যে ভারতমাতার এমন একটি চিত্ররূপ পুলিশের নজরে আসে। একই সাথে বহু ধরনের কালীর ছবি পুলিশ দেখতে পায়। পুলিশের মতে বিপ্লবীদের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানগুলি এই চিত্রগুলির সামনে করা হতো। H. L. Salkeld, “Anushilan Samiti, Dacca: Part II,” in Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939, Vol II*, 146.

[২৩] Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism* (Bloomington: Indiana University Press, 2001), 255.

[২৪] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী: ধর পাকড়ের যুগ* (কলকাতা : ১৩২৯), ৩, ৮৬।

> For what is a nation? What is our mother-country? It is not a piece of earth, not a figure of speech, nor a fiction of the mind. It is a mighty Shakti, composed of the Shakti of all the millions of units that make up the nation, just as Bhawani Mahisha Mardini sprang into being from the Shakti of all the millions of gods assembled in one mass of force and welded into unity. The Shakti we call India, Bhawani Bharati, is the living unity of Shaktis of three hundred million people; but she is inactive, imprisoned in the magic circle of Tamas, the self-indulgent interior and ignorance of her sons. To get rid of Tamas we have but to wake the Brahma within.[২৫]

অরবিন্দ বা সমকালীন অন্যান্য বিপ্লবী ব্যক্তিত্বরা এই আত্মশক্তি জাগরণের উপায় কীভাবে সন্ধান করছেন সেই বিষয়ে পরে আলোচনা করব। কিন্তু বিপ্লবী কার্যকলাপের অনুপ্রেরক হিসেবে মাতৃশক্তিকে বিপ্লবী *সন্তানরা*[২৬] কীভাবে কেন্দ্রীয় স্থানে দেখছেন সেই বিষয়ে প্রাথমিক কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। নারীবাদী গবেষক Eve Sedgwick তার *Between Men: English Literature and Male homo-social Desire* গ্রন্থে homo-sociality বা সম-সামাজিকতার[27] ধারণাকে বিকশিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন একজন নারী আদানপ্রদানের বস্তু হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে পুরুষদের মধ্যে সম্পর্ক বিকশিত হয়ে থাকে। পুরুষদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা বন্ধনের সম্পর্ক তৈরিতে নারী এখানে লেনদেনের বস্তু হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকেন। আর এইভাবেই *homo-social* পরিবেশ ও সম্বন্ধগুলি তৈরি হয়। তাঁর মতে যেকোনো ধরনের নারী বিনিময়ের প্রেক্ষিতে পিতৃতান্ত্রিক বিসমকামিতাকে সর্বোত্তমভাবে বোঝা যেতে পারে : এটিকে পুরুষদের মধ্যে বন্ধনকে দৃঢ় করার প্রাথমিক উদ্দেশ্যে মেয়েদের বিনিময়যোগ্য, সম্ভবত প্রতীকী সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করার

---

২৫ Aurobindo Ghose, *Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Vol I,* Popular ed (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1972), 65.

২৬ বিপ্লবীদের সন্তান বলে গণ্য করার ধারণাটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* উপন্যাস থেকে জনপ্রিয় হয়। শুক্লা সান্যাল প্রথম পর্বের বিপ্লবীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রভাবের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। Sanyal, *Revolutionary Pamphlets, Propaganda and Political Culture in Colonial Bengal*, 65-69.

২৭ সেজউইকই প্রাথমিকভাবে 'সম-সামাজিকতা'(homo-sociality) সম্পর্কে গবেষণার দরজা উন্মুক্ত করেন। Eve Kosofsky Sedgwick, *Between Men : English Literature and Male Homosocial Desire*, Gender and Culture (New York, NY, 1985). এই বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার নিরিখে ক্রিস হেউড এবং তার সহ-লেখকরা সম-সামাজিকতার মূলত তিন ধরনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। একদিকে এই ধারণাটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে মূলত পুরুষরা নিজেদের মধ্যের সম্পর্ক ও বন্ধনকে দৃঢ় করার মধ্য দিয়ে কীভাবে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে পুরুষের অবস্থানকে অটুট রাখে এবং পিতৃতন্ত্রকে মজবুত করে এই দিকটি বোঝার জন্য, অন্যদিকে সম-সামাজিকতার এক ক্যুয়ার পাঠ হয়ে থাকে যেখানে একে পুরুষদের মধ্যে সম্পর্ক এবং পারস্পরিক আকর্ষণের এক নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়। তৃতীয়ত মেয়েদের মধ্যের সম্পর্কের চরিত্র বুঝতে গিয়ে সম-সামাজিকতা — এই ক্যাটেগরিটিকে ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য, এই তিনটি ব্যাখ্যা একে অপরের সাথে সম্পর্কবিহীন নয়। Chris Haywood, Thomas Johansson, and Nils Hammarén, *The Conundrum of Masculinity : Hegemony, Homosociality, Homophobia and Heteronormativity* (New York: Routledge, 2018), 59.

প্রবণতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।[২৮] সুমথি রামস্বামী জাতীয়তাবাদী চিত্রকলাগুলিতে ভারতের মানচিত্র, ভারতমাতা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতির যে অনুপাত লক্ষ্য করেছেন তা আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে লক্ষণীয়। সেই চিত্রগুলিতে একাধারে নারীচরিত্র হিসেবে একমাত্র দেশমাতা এবং পুরুষ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আধিক্য লক্ষণীয়। ভারতমাতা সেই ছবিগুলিতে পুরুষ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে কখনো বাৎসল্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ, কখনো দেশের সন্তান হিসেবে জাতীয়তাবাদী নেতারা আত্মবলিদানের ক্রিয়ায় রত, কখনো মূর্ছাগত মাতার উদ্ধারে তৎপর। ফলত রামস্বামী মনে করেন এই দেশাত্মবোধক ছবিগুলিতে পুরুষদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলত এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একটি সত্যই দৃশ্যত সামনে আসে, তা হল জাতীয়তাবাদ একটি পুরুষালি প্রকল্প, কল্পনা এবং আশা।[২৯] বাংলায় বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে মাতৃরূপী ভারতজননীকে কল্পনা করার ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায়। একদিকে তা ভীতিহীন যুদ্ধরত কালী বা দুর্গার মতো শাক্ত দেবীদের উপাসনাকে নিজেদের পৌরুষ শক্তি 'উদ্ধারের' উপায় হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু একই সাথে এই শাক্ত দেবতাকে উপাসনার মধ্য দিয়ে পুরুষ দেহে শক্তি আনয়নের কল্পনা করেছেন। অরবিন্দ ঘোষ ভবানী মন্দিরের এক অংশে লিখছেন—

> What is it that so many thousand of holy men, Sadhus and Sanyasis, have preached to us silently by their lives? What was the message that radiated from the personality of Bhagawan Ramakrishna Paramahansa? What was it that formed the kernel of the eloquence with which the lion-like heart of Vivekananda sought to shake the world? It is this, that in every one of these three hundred millions of men, from Raja on his throne to the coolie at his labor, from the Brahman absorbed in his Sandhya to the Pariah walking shunned of men, GOD LIVETH. We are all gods and creations, because the energy of God is within us and life is creation; not only the making of new forms is creation, but preservation is creation, destruction itself is creation. It rests with us what we shall create; for me are not, unless we choose, puppets dominated by Faith and Maya; we are facets and manifestation of Almighty Power.[৩০]

অরবিন্দের পূর্ব উদ্ধৃত অংশের সাথে যদি বর্তমান অংশটিকে আমরা মিলিয়ে দেখি তাহলে এটা স্পষ্ট হবে যে মাতৃদেবতাকে শক্তির আধার হিসেবে দেখলেও তিনি এটাও মনে করছেন ঔপনিবেশিক বিজাতীয়

---

[২৮] Sedgwick, *Between Men : English Literature and Male Homosocial Desire*, 29.

[২৯] Sumathi Ramaswamy, *The Goddess and the Nation : Mapping Mother India* (New Delhi: Zubaan, 2011), 178.

[৩০] Ghose, *Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Vol I*, 65-66.

সভ্যতার প্রভাবে সেই মাতা 'তমসাচ্ছন্ন' এবং এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে 'সন্তানরাই' পারবে তাঁকে উদ্ধার করতে। এই দৈবিক মাতৃশক্তি পুনরুদ্ধারকার্যে রত মানুষ হিসেবে অরবিন্দ উল্লেখ করছেন ভারতীয় সাধু, সন্ন্যাসীদের, রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দর মতো মাতৃদেবতার উপাসকদের এবং অবশ্যই বিপ্লবী সন্তানদের। এখানে শক্তির ধারকরা হলেন সাধুসন্ন্যাসী অথবা বিপ্লবীরা, যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। এখানে মতিলাল রায় সম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়, যা সম্ভবত কাকতালীয় নয়। জীবনের প্রথম পর্বে চন্দননগরের বিপ্লবী দলের অন্যতম আদর্শগত নেতা মতিলাল রায় অরবিন্দকে তাঁর গুরু হিসেবে বিবেচনা করতেন। ১৯১০ নাগাদ অরবিন্দ পন্ডিচেরীতে প্রস্থানের আগে মতিলালের চন্দননগরের বাড়িতেই গোপন আশ্রয় পেয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই অরবিন্দের সাথে মতিলালের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। মতিলাল মনে করতেন দেবীরূপী কালীর থেকেই অরবিন্দের মধ্যে শক্তি প্রবাহিত হয়েছে। মতিলাল রায় লিখছেন, "আগস্ট মাসের গোড়ায় শ্রীঅরবিন্দের পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ১৫ই আগস্ট কালীর জন্মদিন। ঐ দিনটি পালন করার সঙ্কেত পাইয়া পুলকিত হইলাম। তখন শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং "কালী" নামেই তাঁহার পত্রগুলিতে স্বাক্ষর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা জানিতাম– ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দেরই জন্মদিন। তাঁর মধ্যে দিব্যভাবে স্বয়ং কালীশক্তিই অবতীর্ণা। স্থির করিলাম-- ১৫ই আগস্টের উৎসব মহানিশাতে অনুষ্ঠিত হইবে। এইদিন আমরা কলিকাতায় বিপ্লবের কোনোরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিব বলিয়াও প্রতিশ্রুতি করিলাম। ১৫ই আগস্টের মধ্যরাত্রে চন্দননগরে বিপ্লবীগণ একসঙ্গে সমাগত হইল"।[৩১] অরবিন্দ এবং মতিলালের বয়ান থেকে বোঝা সম্ভব এই জাতীয়তাবাদী প্রকল্পটিতে প্রাথমিকভাবে নারীদেহ থেকে পৌরুষ বল আহরণ করতে চাইলেও অবশেষে পুরুষদেহই শক্তির 'সঞ্চয়কারী' হয়ে উঠছে।[৩২] জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে মাতৃদেবতা এবং পুরুষ নেতৃত্বের

---

[৩১] মতিলাল রায়, *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী* (কলকাতা : ১৯৫৭ খ্রি.), ৭০।

[৩২] জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অন্তর্নিহিত এই লিঙ্গায়িত সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারীবাদী পণ্ডিত সিন্থিয়া এনলয়ে যথার্থভাবেই লিখেছেন, "[women] have often been treated more as symbols than as active participants by nationalist movements organised to end colonialism and racism". Cynthia H. Enloe, *Bananas, Beaches and Bases : Making Feminist Sense of International Politics* (Berkeley, California: University of California Press, 2000), 42. বিশেষত দেশমাতৃকার এই প্রতীকী অস্তিত্বের বিপরীতে প্রকৃত নারীর সামাজিক অবস্থান যে কতটা ভিন্ন এবং এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী বয়ানে পুরুষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চরিত্রটি যে উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে প্রায় সার্বজনীন সেই বিষয়টি উত্থাপন করতে গিয়ে এলেকে বোহেমার লিখছেন, "In contrast, the figure of the woman in the drama of national tropes is

এই সম্পর্কের চরিত্রকে তনিকা সরকার কিছুটা ভিন্নভাবে উত্থাপন করেছেন যা বর্তমান আলোচনার নিরিখে যথার্থ। তিনি দেখাচ্ছেন একবার যখন মা, তাঁর ক্রোধের মাধ্যমে অথবা তাঁর শান্ত দৃঢ়তার মাধ্যমে নিজের ছেলেদের জাগিয়ে তোলেন, তারপর নেতৃত্বের জন্য মায়ের সংগ্রাম আর নিজের হাতে থাকে না। ছেলেদের হাতে চলে যায়। সুতরাং এখানে শেষপর্যন্ত মেয়েদের ভূমিকা একটি নির্দিষ্ট এবং সীমিত গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রয়ে যায়। এখানে নারীর কোনো চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ সীমালঙ্ঘন হয় না।[৩৩] এখানে উল্লেখযোগ্য, একদিকে ভারতমাতা রূপী নারীচরিত্রের ভূমিকা শক্তিচর্চাকে সন্তানের মধ্যে সঞ্চালিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। একই সাথে আবার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নারী, পুরুষদের মধ্যেকার পুরুষালি বন্ধন তৈরিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আসছেন, যে বিষয়টি *ইভ সেজউইকের* তত্ত্বায়ন থেকে খুব স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। আর এই পুরুষালি বন্ধন তৈরির প্রক্রিয়ায় মাতৃশক্তির প্রতি যৌথ অনুভূতির নির্মাণ প্রক্রিয়াটি খুব উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি বাংলায় স্বদেশি অন্দোলনের ক্ষেত্রে বিবিধ স্বদেশি সাংস্কৃতিক প্রদর্শন কীভাবে বাঙালি জনতার মধ্যে একটি যৌথ ব্রিটিশ বিরোধী অনুভূতি তৈরি করে সেই প্রক্রিয়াটিকে উত্থাপন করেছেন মিমাসা পণ্ডিত। তিনি দেখান সমকালীন জনপ্রিয় আবেগ, যা সাধারণ মানুষের অন্তর্নিহিত আবেগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাকে জাগ্রত করা হয় কেবলমাত্র মূল সাংস্কৃতিক

---

usually seen as generalised and generic (not to say generative also). Often set in relation to the figure of her nationalist son, her ample, childbearing, fully *representative* maternal form typically takes on the status of *metaphor*. Cast as originator or progenitress, a role authorised by her national sons, she herself, however, is positioned *outside* the central script of national self emergence.

In general, then, the woman – and usually the mother – figure *stands for* the national territory and for certain national values: symbolically she is ranged above the men; in reality she is kept below them. If male filial figures experience the gravitational pull to the national ground, women constitute part of its gravid mass. As, for example, in the iconography of Hindu nationalism, in many forms of African nationalism, as also in Pan-Africanism, the elevated woman figure takes on massive, even continent-wide proportions. She is the Great Mother, Durga, Mama Afrika, embracing each and every one of her peoples in her generous arms. This *family romance*, in which the male leader, citizen-hero or writer addresses himself to his national mother (land, home) in tones variously deferential or reverential and gains her protection, repeatedly reproduces itself in the literature and history of national movements. At the same time, however, it is the case that right across the continent and the sub-continent women, subsisting as they may despite the bright myths of motherhood, make up the greater part of these territories' illiterate, oppressed and poor." Elleke Boehmer, *Stories of Women : Gender and Narrative in the Postcolonial Nation* (Manchester: Manchester University Press, 2005), 29. এই বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত আলোচনার জন্য Chapter 1 Motherlands, Mothers and Nationalist Sons: Theorising the En-gendered Nation, 22-41 দ্রষ্টব্য।

[৩৩] Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 257.

মেটাফোরটিকে উসকে দিয়ে। মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার মধ্যে সাধারণ সাংস্কৃতিকভাবে শনাক্তযোগ্য *মোটিফগুলি* এইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যার মাধ্যমে সেই মূল সাংস্কৃতিক *মেটাফোরটি* আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার ভূমিকায় থাকে। এইভাবেই স্বদেশি আবেগকে সংঘবদ্ধ করতে স্বদেশি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনে এমন বহু *মেটাফোরকে* ব্যবহার করা হয় যার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে উসকে দেওয়া হয়।[৩৪] এই ক্ষেত্রে ভারতমাতৃকার *মোটিফটি* স্বদেশি বিপ্লবীদের কাছে শক্তির সেই মূল মেটাফোরের মতো কাজ করে যার মধ্যদিয়ে একটি সম-সামাজিক পরিসরে বিপ্লবীদের মধ্যে আবেগ তৈরি এবং সংঘবদ্ধ হয়। আমরা যদি বিপ্লবী সংগঠনগুলির অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কাঠামো, তাদের নানান কর্মকাণ্ড ও পালনীয় নিয়মকানুন, বিপ্লবীদের মধ্যেকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দেশ ও জাতি নিয়ে তাদের আদর্শ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ইত্যাদির প্রতি নজর দিই, তাহলে এই *সম-সামাজিকতা* কীভাবে পৌরুষচর্চার পরিবেশকে নির্মাণ করছে সেই বিষয়টি বুঝতে সুবিধে হবে।

সম-সামাজিক পরিসর, অন্তরঙ্গতা ও অনুভূতি

ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে বিশ শতকের প্রথম দশকে যে বিপ্লবীচক্র ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল তার অন্যতম সদস্য ছিলেন মতিলাল রায়। ১৮৮২ খিস্টাব্দে চন্দননগরে মতিলাল রায়ের জন্ম। তাঁরা ছিলেন চৌহান বংশীয় ছেত্রী রাজপুত। উত্তরপ্রদেশ থেকে তাঁর প্রপিতামহ এখানে আসেন এবং চন্দননগরে বসতি শুরু করেন।[৩৫] স্থানীয় পাঠশালা, কলকাতার প্রিচার্চ ইন্সটিটিউশন এবং চুঁচুড়া ট্রেনিং অ্যাকাডেমি থেকে মতিলাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। যদিও তিনি ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হননি।[৩৬] তাঁর পিতা বিহারীলাল রায় ছিলেন একজন অসফল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মতিলাল নিজেও কিছুদিন এক সওদাগরী অফিসে (জর্জ হ্যান্ডারসন কোম্পানি) ক্ষুদ্র কেরানির চাকরি করেছিলেন।[৩৭] ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি বিপ্লবী কার্যকলাপের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন যা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সক্রিয় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে আংশিক ভাবে যুক্ত থাকলেও তাঁর পরিচিতি ছিল মূলত

---

[৩৪] Pandit, *Performing Nationhood: The Emotional Roots of Swadeshi Nationhood in Bengal, 1905-1912*, xix.

[৩৫] ইন্দুভুষণ রায়, *সংঘগুরু শ্রী মতিলাল : জীবন-পঞ্জী* (কলকাতা: ১৯৬৬ খ্রি.), ১-২।

[৩৬] ইন্দুভূষণ রায়, ঐ, ২।

[৩৭] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, প্রথম খণ্ড, ৯১।

বিপ্লবীদের আদর্শগত ও বৌদ্ধিক নেতা হিসেবেই বেশি।[৩৮] ফরাসী উপনিবেশ হওয়ার সুবাদে চন্দন নগর ব্রিটিশ নজরদারির প্রত্যক্ষ আওতায় যেহেতু আসত না, তাই এখানে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড তুলনায় নিরাপদে প্রসার লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল। মতিলাল বহু অল্পবয়সি তরুণদের সাথে শহরের বহু প্রান্তে শরীর চর্চা, খেলাধূলা, অস্ত্রবিদ্যাচর্চা, এমনকী গোপনীয় ভাবে বোমা তৈরির কর্মকাণ্ডেও যুক্ত হতে থাকেন। জীবনের শেষ প্রান্তে লেখা *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী* নামক গ্রন্থে তিনি এই পর্বের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে লিখেছেন কীভাবে তাঁর বাড়ি এক অর্থে বিপ্লবীদের একজোট হওয়া, আশ্রয় নেওয়া এবং আড্ডা আলোচনার নিরাপদ আস্তানা হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে বিপ্লবী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠা রাসবিহারী বসুর সাথে মতিলালের বিপ্লবী জীবনের মধ্যভাগে পরিচয় হয়। রাসবিহারীর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার কাহিনীকে মতিলাল যেভাবে তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে তুলে ধরেছেন তা বহু দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী* গ্রন্থের *রাসবিহারীর দীক্ষা* পর্বের শুরুর দিকে মতিলাল লিখছেন,

> মাতৃবিয়োগ হেতু এবার রাসবিহারী ছুটি লইয়া আসায় (চন্দননগরে), শ্রীশচন্দ্রের (অন্য এক বিপ্লবী সহকর্মী) সহিত তাহার বিপ্লব বিষয়ে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ উপস্থিত হইল। আমি এই সময় স্থানীয় তরুণদের লইয়া “ভেল-দিগ্‌-দিগ্‌” (কপাটি খেলা) নামে দেশীয় খেলার পুনঃ-প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলাম। ... এই প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় আমি পুরোভাগে থাকিয়া অপর ৬ জন খেলোয়াড়ের সহিত কলিকাতা হইতে প্রতিয়োগী বাসন্তী দলের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলাম। আমার বয়স তখন ৪০ (যদিও এই গ্রন্থের সম্পাদকের বক্তব্য অনুযায়ী মতিলালের বয়স তখন তিরিশের কোটায়)। রাসবিহারী এই খেলা সন্দর্শন করিতেছিল। এই খেলায় আমাদের জয় হইল। ঢাল লইয়া আমরা সগৌরবে বাড়ী ফিরিলাম। শ্রীশচন্দ্রের সহিত রাসবিহারীও সঙ্গে-সঙ্গে আসিল। আমার বাড়ী ছিল বিপ্লবকেন্দ্র। সন্ধ্যর পর রাসবিহারীর সহিত শ্রীশচন্দ্র আমার পরিচয় করাইয়া দিল। সে এই বয়সে আমার ক্রীড়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। তার উপর আমি বিপ্লবের নেতা বলিয়া শ্রীশচন্দ্র পরিচয় প্রদান করিলে, আমার প্রতি তাহার আকর্ষণ সমধিক বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর কথা শুরু হইল।[৩৯]

---

[৩৮] প্রবর্তক ছাপাখানা সংক্রান্ত গোয়েন্দা দস্তাবেজে মতিলাল রায়কে চন্দননগরের বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম নেতৃত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। Change of Name of the Sadhana Press to Chandernagore to Prabartak Press, Appendix II, A Brief Note of the Prabartak Sangha Chandernagore. File No 165/26. 1926. (West Bengal State Archives, Intelligence Bureau). অন্যদিকে চন্দননগরের বিপ্লবী কার্যকলাপের বৌদ্ধিক নেতা হিসেবে মতিলালকে চিহ্নিত করেছে অপর একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন। “Notes on Situation in Chandernagar” in Amiya K Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939,* Vol III (Calcutta: Government of West Bengal, 1995), 279.

[৩৯] মতিলাল রায়, *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী,* ৭৫-৭৬।

ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলায় পুরুষ সম-সামাজিক পরিসরের চরিত্র, পুরুষদের ঘনিষ্ঠতা অথবা আবেগ-অনুভূতির সাথে পৌরুষের সম্পর্কের সামগ্রিক চরিত্রটিকে কীভাবে অনুধাবন করা সম্ভব তার কোনো স্পষ্ট দিশা এখনও ঐতিহাসিক নিরীক্ষণে সামনে আসেনি। যদিও অতি সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা এই বিষয়গুলিকে আংশিকভাবে স্পর্শ করেছে, যেখান থেকে আমরা ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতীয় সমাজের কিছু অংশের মধ্যে পুরুষ সম-সামাজিক অন্তরঙ্গতার ধরনটি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ছক অনুধাবন করতে পারব। যেমন উনিশ এবং বিশ শতকে বাংলায় বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক জাগরণের যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং তার মধ্যে পুরুষ সম-সামসামাজিক পরিসর এবং অন্তরঙ্গতার ধারাকে সম্প্রতি মিলিন্দ ব্যানার্জী চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মূলত বাংলায় ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল সদস্যদের অভ্যন্তরীণ অন্তরঙ্গ দুনিয়াটি বিশ্লেষণ করে একদিকে দেখিয়েছেন যে এই সম-সামসামাজিকতার একটি প্রাক্-ঔপনিবেশিক ধারা সুফি সাধনার দুনিয়ায় গুরু-শিষ্যের অন্তরঙ্গতার মধ্যে অষ্টাদশ শতকে লক্ষ করা যায় যা ডিরোজিওর চেতনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং অন্যদিকে তিনি দেখান যে এই নৈকট্যের ধারাটি বিশ শতকের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক-আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে।[৮০] সামান্য প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলা প্রয়োজন যে এই নৈকট্যগুলি উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে কীভাবে পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে উদ্ঘাটন করা যায় তা উক্ত গবেষণার পরিধির বাইরে থেকেছে। যদিও ডিরোজিও আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ জগৎ অথবা উনিশ শতকের শেষ পর্বের জাতীয়তাবাদী বয়ানের মধ্যেমে উদীয়মান যুব সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাসকে যে রচনা করা যায় সেই দিকটি স্বপ্না ব্যানার্জী দেখিয়েছেন,[৮১] যা আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক।

দুটি পুরুষের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক তৈরির মধ্য দিয়ে যে সম-সামাজিক অন্তরঙ্গতা বিকশিত হওয়ার সম্ভবনার কথা উপরে উল্লিখিত হল তা প্রাথমিকভাবে মতিলালের উদ্ধৃত বয়ান থেকে অনুধাবন করা সম্ভব। আর শুধু মতিলাল এবং রাসবিহারীর সম্পর্কে নয়, আমরা দেখতে পাব বাংলায় প্রথম পর্বের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিতে এই ধরনের অন্তরঙ্গতার বহু বয়ান বিপ্লবীরা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের আত্মজীবনীতে। উক্ত প্রসঙ্গে রাসবিহারী বোসের সাথে মতিলালের প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয়ের মুহূর্তের ছবি মতিলাল রায় যে ঢঙে

[৮০] Milinda Banerjee, “The Trial of Derozio, or the Scandal of Reason,” *Social Scientist* 37, no. 7/8 (2009): 60–88.

[৮১] Swapna M. Banerjee, “Emergent Youth Culture in 19th Century India: A View from Colonial Bengal,” in *Lost Histories of Youth Culture*, ed. Christine Feldman-Barrett (New York: Peter Lang, 2015), 199–216.

উপস্থাপিত করেছেন সেখানে গুরু-শিষ্যের অন্তরঙ্গতার পাশাপাশি একটি উপাদানকে চিহ্নিত করা যায় যার মধ্য দিয়ে এক *সম-সামাজিক* নৈকট্যে পৌরুষনির্ভর বন্ধন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হতে দেখা যায়। তা হল খেলাধূলার মাধ্যমে সম-সামসামাজিক পুরুষালি বন্ধন তৈরীর প্রক্রিয়াটি। ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে যে শুধুই পৌরুষের প্রতিয়োগিতামূলক প্রতিস্পর্ধার বহিঃপ্রকাশ হয় তা নয়, সমান্তরালভাবে খেলাধূলা পুরুষদের মধ্যে পারস্পারিক বন্ধন, একে অপরের দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং স্বীকৃতির পরিসরকেও উন্মুক্ত করে।[৪২] রাসবিহারী বোস মতিলালের খেলাধূলার দক্ষতা দেখে যেভাবে তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন বলে মতিলাল ব্যক্ত করছেন তা পৌরুষনির্ভর বন্ধন এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে মান্যতা দেওয়ার একটি পরিচিত পদ্ধতি, যা আমরা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বহুবার লক্ষ করে থাকি।[৪৩] এখানে উল্লেখ্য হল এই যে খেলা দেখে মুগ্ধ হওয়া এবং তাঁকে রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে গুরু হিসেবে গ্রহণ করা একাধারে সম-সামসামাজিক পরিসরে বন্ধন এবং সেই বন্ধনের পৌরুষপূর্ণ চরিত্রটিকে সামনে আনে। আমরা যদি বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের কথা স্মরণে রাখি তাহলে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাঁদের সম-সামসামাজিক নৈকট্যকে বুঝতে হলে খেলাধূলাই একমাত্র পরিসর নয়। একই সাথে শরীরচর্চা, অস্ত্রবিদ্যাচর্চা, ডাকাতির মতো অনেক কার্যকলাপের উল্লেখ করা যায় যার মধ্য দিয়ে এই পৌরুষভিত্তিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হওয়ার অবকাশ ছিল।

শরীরচর্চার এই সকল পরিসরকে পুরুষদের দৃঢ় বন্ধন তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বেশ কিছু বিষয়ের উপর আমরা আলোকপাত করতে পারি যা সম-সামসামাজিক পরিসরে পুরুষালি বন্ধন তৈরিকে অনুকূল করে তোলে। এর মধ্যে অবশ্যই অন্যতম রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা, তার চর্চার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নৈকট্যের বিষয়টি। এই বিষয়টির আলাদাভাবে আলোচনা প্রায় অবান্তর যে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিসরটি আলোচ্য সময়ে একেবারেই পুরুষ অধ্যুষিত ছিল। আর বিশেষ করে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মধ্যে এই পর্বে নারী সহকর্মীদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না, যেখানে বিশ শতকের দুইয়ের দশক থেকে

---

[৪২] এই দিকটি নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য– Michael Meuser, “Serious Games: Competition and the Homosocial Construction of Masculinity,” *Nordic Journal for Masculinity Studies* 2, no. 1 (2012): 38–51.

[৪৩] এখানে আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস *শ্রীকান্ত*-র কথা উল্লেখ করতে পারি। শ্রীকান্তর সাথে তার পরম বন্ধু ইন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটিও এমন একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এখানে উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির আবির্ভাবই হয় খেলার সময় শুরু হওয়া গোলোযোগ থেকে শ্রীকান্তকে উদ্ধার করার মতো একটি ‘chivalrous’ কাজের মধ্য দিয়ে।

সামান্য পরিবরর্তন লক্ষ করা যায়। তখন থেকে মেয়েরা বিপ্লবী দলগুলিতে ধীরে ধীরে অংশ নিতে থাকেন।[৪৪] কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক পরিসর, সেই রাজনীতির ভাষা ও বিষয় সবকিছু মূলগতভাবে ছিল পুরুষালি। আলোচ্য সময়ের রাজনৈতিক ভাষ্য, রাজনৈতিক সাহিত্য ইত্যাদির মধ্যে অন্তর্নিহিত পুরুষালি গঠন একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের উল্লিখিত বিপ্লবীদের আত্মজীবনী, স্মৃতিচারণ ইত্যাদির দিকেই শুধুমাত্র আলোচনা কেন্দ্রীভূত করি তাহলেও এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারব। বারীন্দ্রনাথ ঘোষের লেখা *বোমার যুগের কাহিনী*, *ধর পাকড়ের যুগ*, *বোমার যুগের কথা*, প্রতুল গাঙ্গুলীর *বিপ্লবীর জীবনদর্শন*, মতিলাল রায়ের *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী* গ্রন্থে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের যে বয়ান লিপিবদ্ধ হয়েছে সেখানে বিপ্লবীদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে পুরুষালি বন্ধন তৈরির নানা দৃষ্টান্ত লক্ষ করতে পারব যার প্রেক্ষাপট হল রাজনৈতিক নৈকট্য। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে আলোচনা করা যায় ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক দিকটিকে যেখানে পুরুষদের মধ্যে বৌদ্ধিক আদানপ্রদানের মুখ্য বিষয় হিসেবে আলোচনার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সকল বিপ্লবীই তাঁদের স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন কোনো কিশোর বা যুবককে বিপ্লবী সংগঠনে নিয়ে আসার জন্য তাদের আখড়ামুখী করার পাশাপাশি আরও বহু পন্থার সাহায্য নেওয়া হতো। তার মধ্যে ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা, দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণ বোঝার চেষ্টা, দেশের ইতিহাস এবং অতীত গৌরব নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি। বিপ্লবী সংগঠন থেকে বাজেয়াপ্ত বইগুলির একটা বড় অংশ ছিল এই ধরনের সাহিত্য যা বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য হতে গেলে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে গণ্য হতো এবং সমিতির গ্রন্থাগার থেকে বিতরণ করা হতো।[৪৫] এই ধরনের রাজনৈতিক সাহিত্য বিপ্লবীদের রাজনৈতিক বোধকে গঠন করার পাশাপাশি একে অপরের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার

---

[৪৪] বিশ শতকে বাংলার বিপ্লবী সংগঠনে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি প্রথম পর্বে খুবই সীমিত ছিল। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এই পরিমাণ কিছুটা বাড়তে শুরু করে। যদিও সেখানেও লিঙ্গায়িত বিভাজন কার্যকর ছিল। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনে মেয়েদের কিছুটা দেরিতে অংশগ্রহণ, তাদের লিঙ্গায়িত ভূমিকা এবং তাতে নানা রদবদল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Tirtha Mandal, *The Women Revolutionaries of Bengal, 1905-1939* (Calcutta: Minerva Associates, 1991); Ishanee Mukherjee, “Scaling the Barrier: Women, Revolution and Abscondence in Late Colonial Bengal,” *Indian Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (1999): 61–78.

[৪৫] এমন একটি বৃহৎ বইয়ের তালিকা এবং গ্রন্থাগার থেকে তার বিতরণের খতিয়ান দিয়েছেন এইচ. এল. সালকেল্ড তাঁর ঢাকা অনুশীলন সমিতির জন্য তৈরি করা গোয়েন্দা প্রতিবেদনে। এখানে বিবিধ প্রকার বইয়ের তালিকা তিনি দিয়েছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *দেশের কথা*, *কৃষকের সর্বনাশ*, *বর্তমান সমস্যা ও স্বদেশী আন্দোলন*, *জাতীয় সমস্যা*, *বিপ্লব কোন পথে*, *বর্তমান রণনীতি*, *ছত্রপতি শিবাজী*, *শিখের বলিদান*, *প্রতাপ সিংহ*, *বাংলার পুরাবৃত্ত*, *জালিয়াত ক্লাইভ*, *বাজিরাও*, *ঝাঁসির রাজকুমার*, *গীতা*, *ব্রহ্মচর্য্য*, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি। H. L. Salkeld, “Anushilan Samiti, Dacca: Part II,” in Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939,* Vol II, 78-79, 95.

ভিতরেও নিশ্চিতভাবে নানা আদানপ্রদান ঘটাত। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন দেওঘরে তাঁর শৈশবের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়। সেই সময় সখারাম গণেশ দেউস্কর ছিলেন তাঁদের নীচু ক্লাসের শিক্ষক। তখন সখারাম তাঁকে এবং তাঁর বহু সহপাঠীকে বিপ্লবী হতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেই সময় সখারামের লেখা *দেশের কথা* গ্রন্থটি সকল ধরনের ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক পরিসরেই জনপ্রিয়তা পায়। এছাড়া হিন্দুর হ্রাসমানতা তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর রচনা নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বারীন্দ্রের সাথে সখারামের সম্পর্ককে বারীন্দ্র যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন সেখানে গুরু-শিষ্যের রেটরিক প্রবলভাবে উপস্থিত। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন সখারাম তাঁদের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে নানাভাবে শুধু অবগত করতেন না, তাঁদের মধ্যে ডিবেটিং ক্লাবও তৈরি করেছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা শরীরচর্চা-লাঠিখেলা শেখাতেন, দেওঘরের পাহাড়ে দল বেঁধে শিবাজী আর ঔরঙ্গজেবের সেনায় ভাগ হয়ে যুদ্ধের ছদ্ম প্রস্তুতি নিতেন।[৪৬] কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল উপরোক্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে সখারামের আর বারীন্দ্রকুমারের মধ্যে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক-আদর্শগত অনুপ্রেরক-অনুপ্রাণিতের বন্ধন, যার স্মৃতি বারীন্দ্রনাথ প্রবল আবেগের সাথে রোমন্থন করেছেন।

বিপ্লবের সাথে বৃহত্তর বৌদ্ধিক-আধ্যাত্মিক সংযোগের প্রসঙ্গটি রাজনৈতিক সম্পর্কের অন্তরঙ্গতাকে বোঝার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বারীন্দ্রকুমার নর্মদা নদীর তীরবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে এক গুরুর সন্ধানে গিয়ে খুব আশাহত হয়েছিলেন। কারণ সেই গুরু ধর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানে মাহির হলেও বারীন্দ্রের মতো রাজনীতির দিকে ঝুঁকে থাকা মানুষের বৈদ্ধিক-আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য যথার্থ ব্যক্তি ছিলেন না।[৪৭] বিপ্লবের পথে স্থির থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা এই প্রশ্নটি যে তাঁর সদ্য কৈশোর পার হওয়া মনকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করেছিল, তা তাঁর রচনায় খুব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি নিজের স্মৃতিচারণায় খুব অকপটে তাঁর

---

[৪৬] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বোমার যুগের কাহিনী*, সংকলন-জয়ন্তী মুখোপাধ্যায় (কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৬ খ্রি.), ৩১।

[৪৭] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী: ধর পাকড়ের যুগ* (কলকাতা : ১৩২৯), ৪।

বয়ঃসন্ধি কালের দুটি সংশয় তাঁর মনকে কীভাবে উদ্বেলিত করেছিল তার বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। প্রথম বিষয়টি হল তাঁর অদম্য যৌনবাসনা।[৪৮] তিনি এক জায়গায় লিখছেন—

> কুসঙ্গে মিশে অস্বাভাবিকভাবে শক্তি ক্ষয় করার অভ্যাস আমার হয়েছিল। সেই সময় আমার জীবনে পাশাপাশি বইছিল পঙ্কিল ও নির্ম্মল জল। অশ্বিনীবাবুর ভক্তি যোগ পড়ে আমি এত উৎকট নীতিবাগীশ হয়েছিলুম যে মেয়ে লোকের পা ছাড়া মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতুম না। কামচেষ্টা দমন করবার জন্য নাম জপ, সংখ্যা গণনা, জোরে জোরে হাত পা নাড়া, এমন কত কান্ডই করতুম। কিছুতেই কামবৃত্তি ঘুচতো না।[৪৯]

দ্বিতীয় বিষয়টি স্মৃতিচারণামূলক সাহিত্যে তুলনায় একটু বিরল। তা হল বিপ্লব আর উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রতি যাত্রা এই দুটি একসাথে জীবনে আর্জন করা যায় কিনা, আর সেটা সম্ভব না হলে এই দুটির মধ্যে কোন পথটিকে বেছে নেওয়া তাঁর পক্ষে সমুচিত এই প্রশ্নটি উঠে আসা। বারীন্দ্রকুমার এক্ষেত্রে প্রথম জীবনে বিপ্লবকে বেছে নিলেও তাঁর জীবনের বিপ্লবী পর্বেও আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়নি। তাঁর রচনায় তিনি তাঁর নিকট বিপ্লবী বন্ধু দেবব্রতর কথা খুব বিস্তারিতভাবে লিখে গিয়েছেন, যিনি বিপ্লবের সাথে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সুচারু মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। ফলত দেবব্রত বারীন্দ্রের বয়ানে খুব অনুপ্রেরণা আর শ্রদ্ধার স্থান নিয়েছেন। দেববব্রতকে বারীন্দ্রকুমার তুলে ধরেছেন তাঁদের বিপ্লবী দলের প্রায় এক গুরুর মতো যিনি বহু যুবককে সম্মোহিত করতে পারতেন। বিপ্লবীদের মধ্যে এক উচ্চ জীবনদর্শনকে প্রোথিত করতে পারতেন।

এই প্রসঙ্গে বারীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার কথা শেষ করার আগে আর একটি প্রাসঙ্গিক দিকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতাকে বারীন্দ্রনাথ খুব অকপটভাবে এবং কখনো কখনো ব্যঙ্গরসাত্মক ভঙ্গিতে পাঠকের সামনে পেশ করেছেন। সেই অকপট ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তিনি যুবকদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের কাজটি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন—

[৪৮] উল্লেখ্য এই যৌনবাসনা এবং তাকে নিয়ে আত্মদংশনের কথা সুভাষচন্দ্র বসু, গোপাল হালদারের মতো সমকালীন বেশ কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা লিখে গেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু, "ভারত পথিক", *সমগ্র রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড (কলকাতা: ১৩৯৫), ২২; গোপাল হালদার, *রূপনারায়ণের কূলে,* দ্বিতীয় খণ্ড: *যৌবনের রাজটীকা* (কলকাতা : এইচ্ এল সাহা : ১৯৭৪ খ্রি.), ১১০-১২।

[৪৯] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *আমার আত্মকথা* (কলকাতা : ১৩৩৮), ১১৯।

সেটা ছিল নিছক ভাবের ও ভাব প্রচারের যুগ, দ্বারে দ্বারে এই আজগুবি পিলে চমকানো কথাটা বলে বেড়ান ও নেশায় বুদ্ধি ঘুলিয়ে গিয়ে মানুষকে বিপ্লব তন্ত্রে পাকড়াও করাই ছিল তখনকার কাজ।

রীতিমত চেষ্টা-চরিত্র করে এই মানুষ ধরা বিদ্যাটি শিখতে হত, ধরার পন্থাটাও ছিল বিলক্ষণ জটিল। রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, রণনীতি, জীবন চরিত এই সব পড়ে মাল মশলা সংগ্রহ করে ক্রমশ যুক্তি তর্কে আমরা এক একটা দুর্দ্ধর্ষ তর্ক চঞ্চু হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের আড্ডায় যাঁরা এই দেশোদ্ধার যজ্ঞে অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী ছিলেন তাঁদের কেউ যদি খবর আনতেন যে, অমুক লোকটিকে ধরলে ও বোঝাতে পারলে খুব ভালো কাজ হয়, তাহলে আড্ডার মাথা যিনি তাঁর আদেশে তাঁকে ধরার জন্য ছেলেধরা বেরুত। যখন আমরা ১৫৯ নং বাড়ীতে তখন এ রকম শিকারী আমরা মাত্র চারজন, আমি, সখারাম বাবু, দেবব্রত ও আর একজন।[৫০]

বারীন্দ্রকুমারের এই রসবোধপূর্ণ বর্ণনাটি বিপ্লবীদের সদস্য সংগ্রহ পদ্ধতিকে যে সাবলীল ঢঙে উপস্থাপন করেছে তা কিন্তু বিপ্লবী দলের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের মাধ্যমে নির্মীয়মান রাজনৈতিক সাহচর্য, নৈকট্য ও বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রক্রিয়াটির প্রতি ইঙ্গিত দেয়। একই সাথে বিপ্লবীদের মধ্যে আনুগত্য তৈরির প্রক্রিয়াকেও তা দর্শায়। বিপ্লবী সমিতিতে নতুন সদস্যদের আকর্ষিত করার বিষয়ে দেবব্রতের দক্ষতা প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার লিখছেন--

দেবব্রত মানুষটি ছিল কিছু আসাধারণ। অত শান্ত ধীর অল্প ভাষী অথচ গভীর জ্ঞানী আমি আমার এই মানুষ চরানো জীবনে খুব কমই দেখেছি। কৈশোর জীবন থেকে সে দার্শনিক ও সাধক, হেগেল, কান্ট, সোপেন হায়ার ও আমাদের গীতা, উপনিষদ তার ছিল কণ্ঠস্থ। শুধু কি তাই? দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা অমন অনেকেই করে, সে সম্পর্কে পাণ্ডিত্য ঢের মানুষের আছে; কিন্তু এই সূক্ষ্মদর্শী দীপ্ত শিখা intuitive মানুষটির ভেতরের জ্ঞাননাড়ী সাধনায় খুলে গেছিল বলে তার ভাবগত তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান ছিল বড় নিখুঁত, বড় অসাধারণ প্রকট ও ব্যাপক।

স্বল্পভাষী স্বভাব মৌনী হলেও দেবুর আলাপ কথাবার্তার মাঝে একটা মাদক টান ছিল। সে দেশ বা ধর্ম্মের সম্বন্ধে কথা বলতে বসলে মানুষের ভিড় লেগে যেত, যে একবার তার কথা শুনতে বসতো সে সহজে উঠতে চাইতো না। ... তার কথায় মানুষ খেটে মরতো, চরকার পাকে ঘুরে ঘুরে সারা হতো, সে বসে বসে কলকাটি নাড়তো।[৫১]

---

[৫০] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বোমার যুগের কাহিনী*, ৪৯-৫০।

[৫১] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ঐ, ৫০-৫২।

এই প্রসঙ্গে মতিলাল রায়ের গ্রন্থে *রাসবিহারীর দীক্ষা* পর্বের কিছু অংশ আবার উল্লেখ করা যায় যেখানে তিনি রাসবিহারী বোসের সাথে তাঁর দীর্ঘ ধর্মালোচনা এবং তার মধ্য দিয়ে রাসবিহারীর মনে আধ্যাত্মিকতা এবং বিপ্লব দুটি বিষয়েই প্রত্যয় তৈরি করতে পেরেছিলেন।

> আমি গীতার যোগতত্ত্ব অনর্গল বলিলাম। রাসবিহারী আমার কথায় অনুপ্রাণিত হইল, ইহা অনুভব করিলাম। ... আজ আমার আধ্যাত্মভাবপূর্ণ কথাগুলি রাসবিহারী মন দিয়া শুনিল এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিল "কোন সময়ে আপনার সহিত দেখা হবে?"... রাসবিহারীর চক্ষে সেদিন বিশ্বাসেরই আগুন জ্বলিতে দেখিয়াছিলাম। ... তাহাকে পুনরায় আসিবার কথা বলিলাম।
>
> ... যথাসময়ে শ্রীশচন্দ্রের সহিত রাসবিহারী এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ... সে মন দিয়া আমার সমস্ত কথা শুনিল। তারপর স্থির হইয়া বলিল "তোমার আত্মসমর্পণ-যোগের অর্থ একটা অটোমেশন ভিন্ন কিছু নয়। যাহা কিছু হয়, তাহা ঈশ্বর করেন। এই অর্থে অটোমেশন"। রাসবিহারী সারা অন্তর দিয়া আত্মসমর্পণ-যোগের মর্ম্ম এইভাবে উপলব্ধি করিয়া লইল এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি দুইই যেন বদলাইয়া গেল।[৫২]

রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কনিষ্ঠ, সদ্য দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সাথে এই ধরনের সম্পর্ক তৈরির উদাহরণ শুধুই যে বিপ্লবী দলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা অবশ্যই নয়। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে গান্ধিবাদী রাজনীতির অনুসারী এবং পরবর্তী জীবনে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেশচন্দ্র নিজের স্মৃতিকথায় এমন বহু রাজনৈতিক নৈকট্যের কাহিনী লিখেছেন যেখানে তিনি ছিলেন উপদেষ্টার ভূমিকায়। বিশ শতকের দুইয়ের দশকে কলকাতার বহু মেসবাড়ি ছিল তাঁর আস্তানা যেখানে বহু ছাত্রের সমাগম হতো। এমন সম-সামাজিক পরিসরে তিনি ছাত্রদের দেশসেবার মিশনে অনুপ্রাণিত করতেন এবং আধ্যাত্মিকতার পাঠ দিতেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র বসুও তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[53] শুধু কলকাতার স্কুল কলেজের ছাত্ররা নয়, জেলার ছাত্ররাও তাঁর কাছে রাজনৈতিক নানা পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখতেন। সুরেশচন্দ্র এক জায়গায় লিখছেন—

> এখন থেকে এ-সব জায়গার (কৃষ্ণনগর) ছেলেরা আমার কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করিল। এ-সব চিঠির উত্তরে দুইটি জিনিসের উপর আমি বেশী জোর দিতাম। প্রথম ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় ধ্যানধারণা, সত্যিকার

---

[৫২] মতিলাল রায়, ঐ, ৭৬-৭৭।

[৫৩] সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *জীবন-প্রবাহ* (শ্রীমন্তপুর: সবিতা মিশন, ১৯৮৯ খ্রি.), ৮০।

দেশসেবা যে কত কঠিন, এ-ধারণা তখন স্পষ্ট না থাকলেও সারাজীবন বিবাহ না করিয়া পবিত্র থাকিতে হইলে এ-দুটির উপর যে বিশেষ জোর দেওয়া দরকার, সে সম্বন্ধে আমাদের কাহারো কোন সন্দেহ ছিল না ... এই সব বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম। অথচ দায়ে পড়িয়া বলিতে ও লিখিতে হইত বড় বড় কথা। যাদের কাছে চিঠি লিখিতে হইত তাহাদের বয়স আমার চেয়ে অনেক কম হইলেও তাহাদের অধিকাংশই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিমান কৃতি সন্তান, এই দায়িত্ববোধই আমার লেখার সম্বন্ধে সাবধান করিত।[৫৪]

আদর্শবান-পাণ্ডিত্যপূর্ণ-আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন এক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের কথা সমকালীন প্রায় সকল বিপ্লবীর স্মৃতিরোমন্থনেই বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে বর্তমান। এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে নজরে আনা প্রয়োজন সেটি হল এই যে বিপ্লবীরা এমন একটি সম-সামাজিকতার কথা বলছেন যেখানে এই রাজনৈতিক চিন্তা বা দর্শনের আদানপ্রদানের প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে তাঁদের মধ্যে পুরুষালি সম্পর্কগুলিও নির্মাণ ও আদানপ্রদান হচ্ছে। এই সম-সামসামাজিকতাকে দুভাবে চিহ্নিত করা যায়। একটি উল্লম্ব সম-সামসামাজিকতা (vertical-homosociality), অন্যটি আনুভূমিক সম-সামসামাজিকতা (horizontal-homosociality)। প্রথমটির ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করব যে এই সম্পর্কগুলির মধ্যে ক্ষমতার উচ্চতর ক্রম কাজ করে, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সম্পর্কের ভিত্তি সমমর্যাদার, যেখানে অনুভূতিপ্রবণতা, নৈকট্য ও অলাভজনক বন্ধুত্বের বন্ধনই সম্পর্কের ভিত্তি।[৫৫] প্রতিটি বিপ্লবী সমিতিতেই নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং সদ্য নিযুক্ত সদস্যদের মধ্যে যে ক্ষমতার ব্যবধান পরিলক্ষিত, সেখান থেকেই এই উল্লম্ব- সম-সামাজিকতার ধরনটি বোঝা সম্ভব। সম্ভাব্য সদস্যদের বেছে নেওয়া, কমবয়সি ছেলেদের উপর যারা সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে (যাদের বারীন্দ্রকুমার ছেলেধরা বলে উল্লেখ করেছেন), তাঁদের মাধ্যমে সমিতির নীচু স্তরে তাদের অন্তভুক্ত করা। এরপর প্রথম দিকে শুধুই শরীরচর্চা বা আখড়ায় তাদের নিয়োগ এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন শপথ গ্রহণ বা দীক্ষাদানের মধ্য দিয়ে দলের উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিগুলি ক্ষমতার এই উচ্চতর ক্রমকে সুনিশ্চিত করে। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকা অনুশীলন সমিতির কথা বলা যায় যেখানে এমন তিন পর্যায়ের শপথ নেওয়ার রীতি বহাল ছিল। বয়স এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আদ্য প্রতিজ্ঞা, অন্ত প্রতিজ্ঞা এবং বিশেষ প্রতিজ্ঞা এই তিন ধরনের শপথ গ্রহণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই প্রতিজ্ঞাগুলি থেকে বিচ্যুত হওয়া দণ্ডনীয় হিসেবে গণ্য হতো। এই সদস্যদের

---

[৫৪] সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঐ, ৮০।

[৫৫] এই ধারণাটি আমি ক্রিস হেউড এবং তাঁর সহ-লেখকদের রচনা থেকে গ্রহণ করেছি। Haywood, Johansson, and Hammarén, *The Conundrum of Masculinity: Hegemony, Homosociality, Homophobia and Heteronormativity*, 67.

নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে রাখার জন্য এবং তাদের মধ্যে নজরদারি কায়েম করার জন্য প্রতি দশ জন সদস্য পিছু একজন দলপতি নিযুক্ত হতেন। আর এই প্রক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য উচ্চপদস্থ এক পরিদর্শক নিযুক্ত হতেন। যে শপথ বাক্যগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে দলের নিয়মকানুন লঙ্ঘন না করার ব্রতের পাশাপাশি উচ্চপদস্থ সদস্যদের মেনে চলা, খেলাধূলা এবং শরীরচর্চায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো বিষয়ের সাথে সাথে হস্তমৈথুন, পুনঃমৈথুন না করা, মেয়েদের দিকে না তাকানো বা দলের কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক তৈরি না করার মতো বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলির অন্যথা হলে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনার নজিরও আছে।[৫৬] প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত না থাকলেও অনেকের সাথে সমিতিগুলি খুব গভীরভাবে সংযুক্ত ছিল, বৌদ্ধিক-আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যাঁরা গভীর ধারণা রাখতেন।[৫৭] মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁরা বিজ্ঞ পরামর্শদাতার ভূমিকায় থাকতেন। যদিও আমাদের এই বিষয়টিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে এই দু-ধরনের সম-সামাজিকতার মধ্যে সেইভাবে কোনো স্পষ্ট সীমারেখা টানা মুশকিল।[৫৮] যেকোনো সম-সামাজিক পরিসরে বিভিন্ন মাত্রায় এই দুটি উপাদানই উপস্থিত থাকতে পারে। যেমন ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করলাম যে বিপ্লবীদের পরিমণ্ডলে এই পুরুষালি উল্লম্ব সম-সামাজিকতাগুলি নির্ধারিত হয়েছে রাজনৈতিক গুরু-শিষ্যের ধাঁচে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং রাজনৈতিক পাণ্ডিত্য যেখানে কাজ করেছে সম্মোহনের মতো, ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে অন্যদের। যদিও সেখানে সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার বিন্যাসগুলি যে রূঢ় তা বিপ্লবীদের বয়ান থেকে সর্বদা প্রমাণ করা মুশকিল। আর এর বিপরীত প্রমাণও বিপ্লবীদের বয়ান এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে আঁচ করা সম্ভব। যেমন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বিপ্লবী সংগঠনের যে আভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো উল্লিখিত হয়েছে সেগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লবীদের মধ্যের উচ্চতর ক্রমসম্পন্ন সাংগঠনিক ধাঁচ লক্ষ করা যায় এবং এর ব্যতিক্রমকে অনেক সময়ই কড়া হাতে দমন করার কথাও সেখানে বলা হয়েছে।[৫৯] ঢাকা অনুশীলন

[৫৬] H. L. Salkeld, "Anushilan Samiti, Dacca, Part-I," in Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939,* Vol II, 5-74.

[৫৭] এই ক্ষেত্রে মতিলাল রায়ের কথা বলা যায়, গোয়েন্দা রিপোর্টে তাঁকে এই ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, "Note on the Situation in Chandernagore," in Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939,* Vol III, 294.

[৫৮] এই পর্যবেক্ষণটি ক্রিস হেইউডদের আলোচনাতেও উল্লিখিত হয়েছে। Haywood, Johansson, and Hammarén, *The Conundrum of Masculinity : Hegemony, Homosociality, Homophobia and Heteronormativity*, 67.

[৫৯] H. L. Salkeld, "Anushilan Samiti, Dacca, Part-I," in Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939,* Vol II, 38.

সমিতির স্মৃতি উল্লেখ করতে গিয়ে বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সেখানে বিপ্লবী দাদাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[৬০] বারীন্দ্রকুমার ঘোষও বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বয়সে বড় নেতৃস্থানীয়দের ক্ষমতা ব্যবহারের ঘটনাটি বহুবার উল্লেখ করেছেন।[৬১] ফলত প্রজন্মের নিরিখে দলগুলির মধ্যে কনিষ্ঠ সদস্যদের উপর অগ্রজ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া যে ক্রিয়াশীল ছিল তা অনুধাবন করা যায়। সেখানে উল্লেখ্য যে এই নিয়ন্ত্রণের মাপকাঠিগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই বিসমকামী লিঙ্গায়িত নীতিগুলি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য থেকেই জাত। এই ধরনের উল্লম্ব সম-সামাজিকতার পাশাপাশি বিপ্লবীদের মধ্যে যে বহুবিধ আন্তরিক, স্বার্থবিহীন, আবেগপূর্ণ সম্পর্ক উপস্থিত ছিল তার একাধিক উদাহরণ আমরা ইতিপূর্বেই নানা প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছি। ফলত এখানে দু-ধরনের সম্পর্কই বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রিত হতে দেখা যায়। ফলত এর মধ্য দিয়ে একাধারে যেমন পৌরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত তৈরি হয়, অন্যদিকে সীমিত অর্থে উচ্চতর ক্রমবিহীন সম্পর্কের ভিত্তিও তৈরি হতে দেখা যায়। ফলত এর থেকে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল যে এই পরিসরের মধ্য দিয়ে যে ধরনের পৌরুষের ভাষ্য তৈরি হয় তা আধিপত্যবাদী কিনা। কিন্তু এই বিষয়টা উল্লেখ করা যায় যে বিপ্লবীদের অন্তরঙ্গতায় পৌরুষের যে অবয়ব ব্যক্ত করে তার মধ্যে আধিপত্যবাদী প্রবণতার কিছু লক্ষণ থাকলেও সেই পৌরুষের ভিত্তি হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানে তৈরি হওয়া পৌরুষের ভাষ্যের মতো কোনো বর্জনমূলক নীতির উপর দাঁড়িয়ে নেই।

পৌরুষ ও আবেগ : সম-সামাজিকতা থেকে সম-রোমান্টিকতা?

আমরা বিপ্লবীদের মধ্যে তৈরি হওয়া সম-সামাজিকতা নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছি সেখানে আর একটি দিক সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন না করলে এই বিষয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তা হল এই সম-সামাজিক পরিমণ্ডলে বিপ্লবীদের মধ্যে তৈরি হওয়া সম্পর্কগুলির মধ্য দিয়ে আমরা পুরুষালি বন্ধন তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে যে ধরনের অন্তরঙ্গতা তৈরির সম্ভাবনা দেখছি সেই বিষয়টিকে আমরা কীভাবে পাঠ করব? বহু বিপ্লবী বৈপ্লবিক রাজনীতিকালীন সময়ে, জেল জীবনে অথবা জীবনের অন্য পরিস্থিতিতে অন্যদের সাথে সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে যেমন নিজেদের রাজনৈতিক জ্ঞানবৃদ্ধির কাহিনী লিখেছেন, তার পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে

[৬০] প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, *বিপ্লবীর জীবন দর্শন* (কলকাতা: ১৩৮৩), ১-২।

[৬১] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বোমার যুগের কাহিনী*, ২৫।

তৈরি হওয়া বন্ধুত্বের গভীরতার কথাও গভীর আবেগের সাথে ব্যক্ত করেছেন। এই বন্ধুত্বগুলির মধ্যেও বহুবিধ রকমফের লক্ষ করা যায়। অনেকেই এই সম্পর্কগুলিকে জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া হিসেবে দেখেছেন। আমরা আগের অংশে উল্লেখ করেছি মতিলাল রায় রাসবিহারী বোসকে রাজনৈতিক কর্মের সাথে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমান অংশে সেই রাত্রে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের গভীরতা বৃদ্ধির দৃশ্যটি যেভাবে মতিলাল বর্ণনা করেছিলেন তা উদ্ধৃত করা জরুরি।

> আমি তাহার সহিত বাড়ী ফিরিলাম। আত্মীয়তার গভীর অনুভূতি লাভ করিয়া, সেদিন শ্রীশচন্দ্রের সহিত সেও একত্র আমার সহিত ভোজনে বসিল। ভোজন সমাপ্ত হইলে, সে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বলিল "আমি যে এইমাত্র ভোজন করিলাম ... ইহার কর্ত্তা আমি নহি, সব অটোমেশনে হইতেছে। এই অটোমেশনের দ্বারাই আমি বুঝিতেছি ভারতের বিপ্লব-সাধন আমার লক্ষ্য ও আদর্শ। ভারতের স্বাধীনতাই আমার ভিতর দিয়া ঈশ্বর চাহিতেছেন। তুমি আমায় বিপ্লবের কর্ম্মে পুরাপুরী পাইবে, এই বিষয়ে এক বিন্দু সংশয় রাখিও না"।[৬২]

আধ্যাত্মিকতা এবং বিপ্লবের সংযোগ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে রাসবিহারী ও মতিলালের ঘনিষ্ঠতা যেন এক পূর্ণতা পেল। রাসবিহারী মতিলালকে বলেন, "...তুমি আমায় এক মুহূর্তে বুঝাইয়া দিয়াছ আত্মসমর্পণ-যোগের মর্ম্মকথা। ... আজ হইতে আমি তোমাকে 'প্রকাশ' নামে অভিহিত করিব। মর্ম্মপ্রকাশের এমন ভাষা ও ছন্দঃ আমি আর কোথাও দেখি নাই। তুমি এই সকল কথাই সকলকে বলিও, আর বিপ্লবের অন্যান্য কর্ম্ম আমরা সম্পন্ন করিব।" রাসবিহারীর বিপ্লবের দীক্ষা সেইদিন এইরূপ সম্পন্ন হইল। আমরা দুইজনে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইলাম সেই জ্যোৎস্না-রাত্রে, সেই অপরিসর গৃহ-প্রাঙ্গণে"।[৬৩]

যদিও রাসবিহারী আর মতিলালের মধ্যে তৈরি হওয়া ঘনিষ্ঠতা দুই পরিণতবয়স্ক যুবকের মধ্যেকার নৈকট্যকে দর্শায়। অন্যদিকে গবেষকরা দেখেছেন মূলত কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের এই সম-সামাজিক বন্ধনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে এই পুরুষালি বন্ধনের মধ্যে জীবনের সবচেয়ে 'সুবর্ণ সময়'কে খুঁজে পাওয়ার কথা অনেকের বয়ানে ব্যক্ত হতে দেখা যায়। এই অভিজ্ঞতাটি জীবনের অন্য কোনো পর্যায়ে আর যেন অনুভব করা

---

[৬২] মতিলাল রায়, *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী*, ৭৭।

[৬৩] মতিলাল রায়, ঐ, ৭৭।

যায়নি।[৬৪] ঘটনাচক্রে বেশিরভাগ আত্মজীবনীমূলক রচনাতেই এই কৈশোর বা সদ্য যৌবনের বন্ধুত্বকেই লেখকরা সবচেয়ে বেশি 'রোমান্টিকতার' চশমায় দেখেছেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখছেন—

> ... শৈলেন পড়তো আমার নীচের ক্লাসে, তার সঙ্গে হয় আমার রোমান্টিক বন্ধুত্ব। একজন আর একজনকে ছেড়ে দুদণ্ড চোখের আড় করে থাকতে পারতুম না। তার মধ্যে আমার ভালোবাসাই ছিল খুব কবিত্ব ভরা ও নিঃস্বার্থ, কারণ শৈলেন ছিল বয়সে আমার অনেক ছোট ও অপরিপক্ক! কত যে চিঠি তাকে দু'বছর ধরে লিখেছি! ...
>
> আমার জীবনের সেই সব স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্খার ভাগ শৈলেন নিতো না, সে ছিল নিতান্তই সাদামাটা ছেলে, ... তবু তাকে যে কি মোহের চোখে দেখতুম, তার মুখ দেখে আমি আমার সব স্বদেশ হিতের ও মানব কল্যাণের ব্রত ভুলে যেতুম, মনে হ'তো একে বন্ধুরূপে আর সেই তাকে (বারীন্দ্রকুমারের অপর এক প্রেমাস্পদ) জীবন সঙ্গিনীরূপে পেলে মানুষের আর কি সুখের উপকরণ দরকার হতে পারে?[৬৫]

জীবনের অন্তিম প্রান্তে এসে বারীন্দ্রকুমার তাঁর আত্মজীবনীতে যেভাবে ছেলেবেলার বন্ধুত্ব আর প্রেমকে ব্যক্ত করেছেন তার ভাষা এবং অভিব্যক্তির চরিত্রটি নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তৈরি হয়। এখানে কি শৈলেনের প্রতি তৈরি হওয়া 'রোমান্টিকতার' সাথে তাঁর অপর প্রেমাস্পদর (নারীর) কোনো তফাত করতে পারছেন না বারীন্দ্রকুমার?

জীবনের উক্ত পর্যায় সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের অভিব্যক্তি চোখে পড়ে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে। যদিও সুরেশচন্দ্র এহেন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বহুবার গিয়েছেন, এবং সেই বিষয়ে তাঁর অভিব্যক্তিতেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সুরেশচন্দ্রের রচনায় তাঁর ইস্কুলের যে পড়ুয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেন তিনি কুলচন্দ্র। তার সাথে সুরেশচন্দ্রের পরিচয় হওয়া, ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, তাঁকে নিয়ে চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকা, মধুর সময় কাটানো, অন্যদের সাথে কুলচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিতে তৈরি হওয়া ঈর্ষা-প্রতিহিংসা এবং সম্পর্ক বিচ্ছেদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সুরেশচন্দ্র দিয়েছেন তাঁর লেখায়। কিন্তু জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে এক নারীর প্রতি সুরেশচন্দ্রর তৈরি হওয়া আবেগের সাথে তিনি কুলচন্দ্র সম্পর্কে গড়ে ওঠা অনুভূতির তুলনা কিছুটা অন্যভাবে

---

[৬৪] Scott Fabius Kiesling, "Homosocial Desire in Men's Talk: Balancing and Re-Creating Cultural Discourses of Masculinity," *Language in Society* 34, no. 5 (2005): 702.

[৬৫] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *আত্মকথা* (কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৪০৩), ৭৭।

করেছেন। এই বিষয়টিকে সুরেশচন্দ্র যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বয়ানের সাথে মিলের জায়গাটি বুঝতে সুবিধে হয়।

> **প্রথম দেখা :** আমি রাজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম-- তোমাদের ক্লাসে পরীক্ষায় প্রথম হচ্ছে কে হে? সে বলিল কূলচন্দ্র। ... তাহাকে দেখার জন্য মন চঞ্চল হইল। পরদিন আমি যাইতেছি..., দেখি অপর দিক হইতে তিন চারটি ছেলে সহ রাজেন্দ্র আসিতেছে। তাহাদের পাশ কাটাইয়া যাইতেই একজন তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া আমার সাথে চলিতে লাগিল। প্রাণের মাঝে কে যেন বলিল এই 'কুলচন্দ্র'। ... সন্ধ্যা অবধি সারা শহর পাশাপাশি হইয়া এভাবে ঘুরিলাম। কিন্তু কোন কথাই হইল না আমাদের মাঝে।[৬৬]
>
> **ঘনিষ্টতা :** রাজেন্দ্রর সাথে গেলাম এক বাসায় যাত্রা শুনিতে। ... দেখি – পাশে কুলচন্দ্র দাঁড়ানো। অজ্ঞাতে আমার বাঁ হাতখানা উঠিল তাহার কাঁধের উপর। দু-চার মিনিটের কথায় বুঝিলাম-- কাহার সে কণ্ঠস্বর। এক নতুন ভাব তড়িৎ বেগে সারা হৃদয়ে খেলিয়া গেল। ... (সেই রাতে) খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুইতে গেলাম-- ঘুম আর আসে না। রহিয়া রহিয়া শুধু বন্ধুত্ব এই কথাটি বাজিতে লাগিল আমার কানের গোড়ায়, হৃদয়ের মাঝে। আনন্দে যেন দম আটকে আসে। ... বাহির হইয়া পড়িলাম রাস্তায়। মেটে মেটে জ্যোৎস্নায় সারা পৃথিবী ভরা ... প্রাণের আনন্দ আরও বাড়িল। ...[৬৭]
>
> **গভীর সংযোগ :** ...এরপর তাহার ভাবে প্রেম এমনি মজিল যে এক মুহূর্তেও তাহাকে ছাড়িয়া ভালো লাগিত না। অনেক দিন সকাল কাটিত তাহাদের বাসায়। ইস্কুলের ঘণ্টার ফাঁকে ফাঁকে দেখা হওয়া চাই। ছুটির পর প্রথম একদফা কাটিত তাহার সাথে খাওয়ার আগে অবধি রাত নটা পর্যন্ত। খাওয়ার পর আবার বাহির হইতাম বাগানের রাস্তায়-- অনেক আঁকা বাঁকা পথ পার হইয়া উপস্থিত হইতাম আমাদের মিলনস্থলে, চকের কাছে একটা উঁচু পুলের উপর। ... এমনি মত্ত অবস্থায় ছয় মাস কাটিল।[৬৮]
>
> **বিচ্ছেদ :** গেলো মাস খানেক-- তারপর আর তাহার কোনও পাত্তা নাই। না আসে সে আমার কাছে, না দেখাযায় তাহার টিকিটি। ... একলা কাটাইতে লাগিলাম টানা দিনগুলি প্রাণের মাঝে বিরহের কালো মেঘ বহিয়া। ... এরপর হঠাৎ একদিন তাহার দেখা পাওয়া গেল আমার সহপাঠী জ্ঞান দত্তের বাসায়। সে খেলিতেছিল তাস। ... আমার বয়সী একটি ছেলের সাথে। ... কুল আমার পানে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ছেলেটির নাম ভূপালচন্দ্র ঘোষ...।[৬৯]
>
> **সম্পর্কের যবনিকা :** কয়েকদিন পরের কথা। দেখি স্কুলের কাছের পথে কুলচন্দ্র হন্‌হন্‌ করিয়া যাইতেছে পোষ্টাফিসের দিকে। উপরের পকেটে উঁকি মারা একখানি এন্‌ভেলপ ছোঁ মারিয়া লইয়া দেখি ভূপালের কাছে

---

[৬৬] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *জীবন প্রবাহ*, ২৫।

[৬৭] ঐ, ২৫-২৬।

[৬৮] ঐ, ২৬-২৭।

[৬৯] ঐ, ২৭।

লেখা। পড়িয়া দেখিলাম কুলচন্দ্রের প্রাণ এখন ভূপালের প্রেমে ভরা। রাগে কুটি কুটি করিয়া ছুড়িয়া ফেলিলাম পত্রখানি তাহার গায়ে মুখে। ... রাগে গর্‌ গর্‌ করিয়া তাহার গায়ে কয়েক ঘা ঘুসি মাষি মারিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বিদায় নিলাম।

সে-রাত্রে মনে ভারী দুঃখ হইল-- কেন তাহাকে মারিলাম? ভূপালকে ভালবাসিয়া সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে...। ... ক্ষমা চাহিয়া তাহার কাছে লেখা পত্র খানি পরদিন ডাকে দিলাম। উত্তরে সে লিখিল-- তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, তোমার ও আমার খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ। খাদ্য খাদকের বন্ধুত্ব আসম্ভব। ... উত্তরে লিখিলাম-- ব্রাহ্মণের অভিমান মনে আমার কোনদিনই নাই। যদি সত্যি ব্রাহ্মণ হই, তবে এরজন্য তোমায় একদিন আমার পা ছুঁইয়া ক্ষমা চাইতে হইবে।[৭০]

একদিন আচমকা নজরে পড়িল, আমাদের পাশের বাড়ীর একটি হৃদয় লতার নিভৃত পাতার নিরালা আড়ালে ফুটিয়া ওঠা প্রেম কলিটির লাল পাঁপড়িগুলি আমারি পানে চাহিয়া মেলিতে শুরু করিয়াছে। তাহাদের বাড়ীর পাশ কাটিয়া যাইতে দেখিলাম, বার বছরের একটি সাদা ফুট্‌ ফুটে আমাকে দেখা মাত্র লাল মুখে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পালাইতেছে। দেখিয়াই আমার প্রাণের ভিতরটায় কেমন যেন একটা আঁচড় মারিয়া উঠিল। সাথে সাথে মনে যে-ভাবের উদয় হইল, সে-ধরনের কতকটা ভাব আমার অনুভব হইয়াছিল, কুলচন্দ্রের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময়।[৭১]

এখানে যে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা হল সুরেশচন্দ্র দুজনের মধ্যে তৈরি হওয়া আবেগের মধ্যে একেবারেই তফাত করতেই চাননি। বরং এই দুটি ক্ষেত্রেই যে এক রোমান্টিক প্রেম, ভালোবাসার অভিব্যক্তি আছে সেই বিষয়ে সুরেশচন্দ্র কোনো ধরনের ধোঁয়াশা রাখেননি। যদিও বারীন্দ্রকুমার এবং সুরেশচন্দ্র দুজনের বর্ণনা থেকেই আমরা সম-সামাজিকতা এবং সম-রোমান্টিকতার মধ্যে এক নিরবিচ্ছিন্নতা লক্ষ করি। পশ্চিমী পণ্ডিতরা পুরুষ সম-সামাজিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন এটি এমন একটি সম্পর্ক যা দুই বিসমকামী অথবা সমকামী পুরুষের মধ্যে অ-যৌন অন্তরঙ্গতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যবহৃত হয় যেখানে সমকামিতা ব্যবহৃত হয় দুটি পুরুষের মধ্যের যৌন সম্পর্ককে ব্যক্ত করতে গিয়ে।[৭২] কিন্তু আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে এই দুই ধরনের সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন রেখা আঁকা মুশকিল। বরং এখানে অন্তত অন্তরঙ্গতা

---

[৭০] ঐ, ২৮।

[৭১] ঐ, ৫১-৫২।

[৭২] Haywood, Johansson, and Hammarén, *The Conundrum of Masculinity : Hegemony, Homosociality, Homophobia and Heteronormativity*, 70–71.

এবং বাসনার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে অনেক ধোঁয়াশা প্রকট, যে বিষয়টি বহু ভারতীয়/দক্ষিণ এশীয় তাত্ত্বিকেরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন।[৭৩]

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সম-সামাজিক পরিবেশে বিকশিত বন্ধুত্ব এবং তার মধ্যের সম-রোমান্টিক আবেগের আদানপ্রদানকে কেন্দ্রকরে বিবর্তিত শিবরাম চক্রবর্তীর *ছেলে বয়সে* উপন্যাসটি এই বিষয়টিকে বোঝার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হতে পারে। তার মুখ্য কারণ সমকালীন আত্মজীবনীর মধ্যে এই সমলিঙ্গের মানুষদের মধ্যে গড়ে ওঠা নৈকট্যগুলিকে যেভাবে লেখকরা ব্যক্ত করেছেন, *ছেলে বয়সে* উপন্যাসটির ক্ষেত্রে তার সঙ্গে অনেক মিল লক্ষ করা যায়। যদিও গল্প হিসেবে এখানে কল্পনার দিগন্ত বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আমাদের কাছে এই উপন্যাসটি সমকালে সম-সামাজিক পরিসর এবং তার সাথে সম-রোমান্টিকতার ধোঁয়াটে হয়ে থাকা ছেদবিন্দুর চরিত্রটি বুঝতে চাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম।

ছেলে বয়সে উপন্যাসটি বিবর্তিত হয়েছে মূলত চারটি চরিত্র, মোহন-অশান্ত এবং সুধীর-দেবেনের বন্ধুত্ব এবং ‘প্রণয়’-এর কাহিনীকে কেন্দ্র করে। এখানে মোহন আর অশান্ত চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সি দুই কিশোর। কলকাতার এক সিনেমা হলে প্রথম সাক্ষাৎ হলেও তাদের বন্ধুত্ব বিকশিত হয় মালদার এক বোর্ডিং-এ পড়াশুনা করতে এসে। সুধীর আর দেবেন ছিল বাল্যবন্ধু। সুধীরের প্রতি দেবেন সেই সময়ে (শৈশবে) প্রবল আকর্ষণ অনুভব করার স্মৃতিচারণা করেছে। উপন্যাসে তারা একুশ-বাইশ বছরের যুবক। এখানে তাদের পাওয়া যায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী হিসেবে। এই বয়সে এসে সুধীরের প্রতি দেবেনের ভালোবাসা অনেক সংযত। সেখানে আবেগে ভেসে যাওয়ার অবকাশ কম, সেই ভালোবাসা অনেকটাই বিপ্লবী আদর্শে স্নাত। বলা বাহুল্য, প্রথম

---

[৭৩] বিশেষত ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সম-সামাজিকতা এবং সম-রোমান্টিকতার মধ্যের নিরবচ্ছিন্নতার বিষয়টি বিশ্লেষণাত্মকভাবে আলোচনা করেছেন তপোব্রত ঘোষ, *গোরা* উপন্যাসটির একটি পাঠে। তপোব্রত ঘোষ, *গোরা ও বিনয়* (কলকাতা : প্রতিভাস, ২০১৩) এছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশে সম-সামাজিক এবং সমকামী নৈকট্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতার সূত্রগুলি সম্প্রতি গবেষকরা নানা আঙ্গিকে দেখেছেন। যেমন আর রাজ রাও সম-সামাজিক পরিসরে ইয়ারানার ধারাকে উত্থাপন করে দেখিয়েছেন এর মাধ্যমে সমকামী আকাঙ্ক্ষা কীভাবে ব্যক্ত হয়। তাঁর মতে ইয়ারানার মাধ্যমে সম-সামাজিক এবং সম-রোমান্টিকতার মধ্যে সেতু তৈরি হয়। R. Raj Rao, “Memories Pierce the Heart : Homoeroticism, Bollywood-Style,” *Journal of Homosexuality* 39, no. 3–4 (2000): 299–306. এই একই ধরনের আকাঙ্ক্ষার কথা অখিল কটিয়াল উত্তর ভারতের প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। তিনি উত্তর ভারতে লন্ডেবাজির ধারার কথা উল্লেখ করে দেখান যে ‘বাজি’র মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে যা কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। Akhil Katyal, *The Doubleness of Sexuality : Idioms of Same-Sex Desire in Modern India* (New Delhi: New Text, 2016).

দুজনের ক্ষেত্রে বোর্ডিং এবং দ্বিতীয় দুজনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি সেই সম-সামাজিক পরিবেশটি রচনা করেছে, যেখানে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক বিকশিত হতে দেখা যায়। খুব চমকপ্রদভাবে, গল্পের প্রায় সকল চরিত্রই একে অপরের প্রতি নানা আকর্ষণ বোধ করে, যাকে কাহিনীকার 'ভালোবাসা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন দেবেন আর অশান্ত-- এই দুই ভিন্ন বয়সি যুবক ও কিশোরের মধ্যেকার ভালোবাসাকে বর্ণনা করতে গিয়ে কাহিনীকার লিখছেন—

> নরনারীর জীবনে চোদ্দোবছর বয়স একটা বিশেষকাল। এই সময়ে প্রথম ভালোবাসতে শেখে, আত্মহারা হয়ে ভালোবাসে, আদরের স্পর্শে একেবারে গলে পড়ে; এমন কি, পরিচয়হীন লুব্ধ-শিকারীর লালসার ফাঁদেও সহজে ধরা দেয়। এই জন্য এই বয়সেই মানুষের পরম পরিপূর্ণতা ও চরম সর্বনাশের সূচনা হয়-- যার জের তারা সারাজীবন টেনে চলে। অশান্তর বয়স এই বয়স।
>
> প্রথম যৌবন আর এক বিচিত্র কাল। এই বয়সে সুন্দরের পূজা, সৌন্দর্যের স্বপ্নই সমস্ত মন জুড়ে থাকে। চোখে যাকে দেখতে ভালো লাগে, তাকেই একান্ত করে ভালোবাসতে চায়। এই বয়সে সহজেই পরাজয় মানে, তাই জয় করাও এই বয়সে সবচেয়ে সহজ। সহজেই আকৃষ্ট হয়, তাই সহজেই আকর্ষণ করে। এই বয়স দেবেনের।[৭৪]

কিন্তু কাহিনীতে প্রায় প্রতিটি প্রধান এবং অপ্রধান চরিত্রের মধ্যেই একে অপরের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও কোনো চরিত্রের মধ্যেই ঈর্ষার জন্ম হতে দেখা যায় না। মোহনের প্রতি গল্পের প্রধান খলনায়ক তারেশর আকর্ষণ আছে জেনে, অশান্তর যে প্রতিক্রিয়া হয় সেখান থেকে বিষয়টা কিছুটা অনুধাবন করা যায়। অশান্ত মোহনের উদ্দেশে জানায়, "আমি সব জানি, গোড়া থেকে জানি সে (তারেশ) তোমাকে ভালোবাসে। প্রথম প্রথম আমার বড় রাগ হতো, কিন্তু ভেবে দেখলুম তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলেই হয়, - আরো কতো ছেলে তো তোমাকে আমার মত ভালোবাসতে পারে, সে অধিকার তাদের আছে"।[৭৫] ফলত এই উপন্যাসে ভালোবাসা একমুখী নয়, একগামী তো নয়ই। বরং এই দুজোড়া চরিত্রর মধ্যেকার ভালোবাসাকে গল্পে কেন্দ্রীয় হিসেবে মান্যতা দেওয়া হলেও ভালোবাসার বহুমুখী অভিব্যক্তি ও অভিজ্ঞতার সম্ভাব্যতাকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে/উন্মুক্ত রেখেছেন লেখক। কিন্তু মোহন এবং এলাকার অন্যান্য 'রাঙা ছেলেদের' প্রতি তারেশের ভালোবাসা শুধুই শারীরিক আকর্ষণ হওয়ায় তাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়েছে।

---

[৭৪] শিবরাম চক্রবর্তী, *ছেলে বয়সে,* ৯।

[৭৫] শিবরাম চক্রবর্তী, *ছেলে বয়সে,* ৩৮।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কাহিনীকার শিব্রাম গল্পের সূচনাতেই এই ভালোবাসার অনুভূতিকে মূলত বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই তিনি লিখছেন—

> শ্রীকান্ত বড় হলে, লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করল যে তার জীবনে কাকে এবং তাকে কে প্রথম ভালোবেসেচে, -- শ্রীকান্ত দুটি চোখে স্মৃতির স্বপ্ন ভরে নিয়ে ... উত্তর দিল, রাজলক্ষ্মী। ...
>
> প্রশ্নকর্তা উত্তর শুনে বিমুগ্ধই হলেন, ... কিন্তু বিমূঢ় হলেন কেবল বিধাতা – হতভাগ্য ইন্দ্রনাথকে স্মরণ করে।
>
> শ্রীকান্ত সারা জীবন ধরে রাজলক্ষ্মীরই পূজা করে চলল, এবং তার জীবনে ইন্দ্রনাথের ঋণ-স্বীকারের কোনো চেষ্টা পর্যন্ত দেখা গেল না বটে, কিন্তু এটাও তো অস্বীকার করা চলে না যে ছেলেবয়সে ইন্দ্রনাথই তাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। এবং তার আকর্ষণে মৃত্যুর মুখ পর্যন্ত সে বারবার অভিসারে বেরিয়েচে, সেই প্রথম-প্রিয়ের প্রতি তার প্রথম প্রেম যে প্রথম প্রিয়ার চাইতে কিছুমাত্র কম ছিল তাই বা কে বলবে?
>
> শ্রীকান্তর বয়সে, আমাদের এই আখ্যায়িকার অশান্তকে যদি প্রশ্ন করা যেত তাহলে সেও তার মোহনের কথা ভুলে গিয়ে কোনো মানসীর নামই করত হয়ত, কিন্তু সেই বয়সটা আসতে তার কিছু বাকি আছে, তখন তার বয়স চৌদ্দ কি পনেরো।[৭৬]

ফলত এই উপন্যাসে সমলিঙ্গের মধ্যেকার প্রেমকে একটি নির্দিষ্ট বয়সের অভিজ্ঞতা হিসেবেই বোঝা হয়েছে যার প্রতিফলন আমরা পেতে পারি সমকালীন আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিতেও যে রচনাগুলির কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এই কিশোর বয়সের অভিজ্ঞতাটি অশান্ত আর মোহনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, যার খুব বিরল পরিণতি আমরা এই কাহিনীতে প্রত্যক্ষ করি। বোর্ডিংয়ে তাদের সম্পর্ক নিয়ে যে কুৎসা এবং অসহনীয় অপমান তারা পেতে শুরু করে, তার থেকে বাঁচার জন্য কাউকে না জানিয়ে দুজনে পালিয়ে যায় কলকাতার উদ্দেশে। কিন্তু সুধীরের প্রতি দেবেনের ভালোবাসা কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত যাত্রা করার অবকাশ পায় উপন্যাসে। ফলত আমরা একটা দীর্ঘ সুযোগ পাই তাদের সম্পর্কের কিছুটা বিস্তৃত পথকে পর্যবেক্ষণ করার। কৈশোরে দেবেন সুধীরের প্রতি যে-মাত্রায় আসক্ত হয়েছিল, সেই বিষয়ে তার এক রাজনৈতিক বন্ধু সতীশের

---

৭৬ শিবরাম চক্রবর্তী, ঐ, ৩।

সাথে যে কথোপকথন হয় তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে সুধীর আর দেবেনের ভালোবাসার চরিত্রটি কিছু মাত্রায় বোঝা সম্ভব হবে—

> (সতীশ)... তুমি কি ছেলেবেলা থেকেই তাকে (সুধীর) এমনি ভালোবেসেচ?
>
> (দেবেন) ছেলেবেলায় তাকে আরো বেশি ভালোবাসতুম, সে ভালোবাসার কেবল স্বপ্নটুকু এখন আমার মনে জাগে, -- তেমন ভালোবাসা আমি এপর্যন্ত কাউকে ভালোবাসতে পারিনি, বোধ হয় কেউই তেমন ভালোবাসতে পারেনা।
>
> (সতীশ) বটে? কি রকম?
>
> (দেবেন) ... বারো বছর বয়সে যেদিন আমি স্কুলে ভর্তি হই পঞ্চম শ্রেণীতে, সেই দিনই আমি আমার এই পরম সুন্দর সহপাঠীটিকে ভালবেসে ফেলি – যাকে বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম। কিশোর দেবকুমার – তার হাসিতে, চাউনিতে, কথাবার্তায়, চলাফেরায় যেন অপরূপ রূপ অনুক্ষণ ঝরে পড়ত!
>
> (সতীশ) বল কি? এ তো ভারি রোমান্টিক!
>
> (দেবেন) দুই বছর আমি তার সঙ্গে পড়েছিলুম, সেই দুই বছর আমার যেন স্বপ্নে স্বপ্নেই উড়ে গেল। পড়াশুনা কিছুই করতুম না, দিনরাত কেবল তার কথাই ভাবতুম। তার নাম লিখে লিখে আমার খাতাপত্র ঘরের দেওয়াল সব ভরে গেছল, তাকে একটুখানি দেখবার জন্য বিশেষ বিশেষ জায়গায় কতক্ষণ অপেক্ষা করতুম। আড়ালে আবডালে জানালার ফাঁকে তাকে একটু দেখে নিতে পারলে নিজেকে কত ধন্য মনে করতুম, - সে ছিল এক অদ্ভুত ভালোবাসা। এখনো আমি তাকে সারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি বটে, কিন্তু ছেলেবয়সের সেই ভালোবাসার কথা মনে হলে আমারই হাসি পায়![৭৭]

উদ্ধৃত দীর্ঘ কথোপকথনটি থেকে সুধীরের প্রতি দেবেনের ভালোবাসার চরিত্র যে খুব অনন্য প্রকৃতির, তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই কথোপকথনের আর একটি দিক লক্ষ করার মতন। তা হল শৈশবের সাথে এই পরম ভালোবাসার প্রথম উপলব্ধিকে যুক্ত করে দেখার প্রবণতা, যা বন্ধুত্বের গত হয়ে যাওয়া এক 'স্বর্ণ যুগের' উপলব্ধির মতো দেবেনের স্মৃতিচারণায় উপস্থিত হয়। যেমনটি শিব্রাম উপন্যাসের শুরুতেই বলেছেন, যে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের জীবনে এসেছে বলে হয়তো শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের কথা ভুলে গেছেন। 'কিন্তু এটাও তো অস্বীকার করা চলে না যে ছেলেবয়সে ইন্দ্রনাথই তাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে, যা লেখককে তাড়িত করেছে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও নিজের সকল স্বার্থ ত্যাগ করার মতো যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের শুরুর জীবনের গল্প, প্রথম ভালোবাসা, বন্ধুত্বের গল্পকে নথিভুক্ত করাতে। পুরুষের

---

[৭৭] শিবরাম চক্রবর্তী, ঐ, ৭৫।

বড় হয়ে ওঠার সন্ধিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে যেখানে এক সম-সামাজিক পরিবেশেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব-- এমন একটি উপলব্ধি থেকে।

শৈশবের সেই ভালোবাসা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে স্মরণে এলে দেবেনের 'হাসি পায়', কারণ এখন তাদের সম্পর্কে একটা উত্তরণ হয়েছে। এই উত্তরণের মাধ্যম দেশপ্রেম, বিপ্লব, স্বাধীনতার বাসনা। দেবেনের ভাষায়, "বিপ্লবের পথে পা দিয়ে সে আর আমি দুজনেই কলেজ ছেড়েচি, সে আগে ছেড়েছিল, পরে সেই আমাকে দলে টেনে নিল, তার কাছে আমার স্বাধীনতার প্রথম মন্ত্রদীক্ষা! আমি তাকে এখনো তেমনি ভালোবাসি, কিন্তু তার প্রেমের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ-- যতটা তাকে চাই ততটা যেন আমি পাই না, সে ভালোবাসে, কিন্তু তার মধ্যে ব্যবধান একটা কেমন যেন ঘোচেনা"।[৭৮] এখানে লক্ষণীয় যে দেবেন আর সুধীরের মধ্যেকার সম্পর্কের চরিত্র বয়স পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলানোর মধ্যে দিয়ে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের নিস্পাপ সুবর্ণকালের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু আর একটি উদ্দেশ্য তাদের বন্ধুত্বের গভীরতাকে অর্থবহ করে তোলে। তা হল দেশসেবা, বিপ্লব। এখানেও সুধীর দেবেনকে পথ দেখায়। খুব চমকপ্রদ বিষয় হল এই দুজনের বন্ধুত্বের মধ্যে বৈষ্ণব আদর্শ খুঁজে পান লেখক। "বৈষ্ণব কবিদের প্রেমের গাথায় অনেকটা এই ভাবের পরিচয় আছে। সৌন্দর্য ও প্রেমের আকর্ষণে দেখছি লিঙ্গভেদ নেই!"[৭৯] বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের সাথে এখানে মিশে যায় দেশের অবধারণা। দেবেন বলে, "আমি তাকে ভালোবাসি আমার প্রাণের মত, আমার দেবতার মত, আমার দেশের মত। আমি মনে মনে তার পূজা করি..."[৮০] দেবেনের অজান্তেই সুধীর কারাবন্দী হয়, ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণ করে শাহাদত দেয় দেশের জন্য।

সমস্ত উপন্যাসটিতে সমলিঙ্গের ভালোবাসাকে উচ্চ আসন দেওয়া হলেও বন্ধুত্ব আর যৌনতা দুটিকে রাখা হয় বিপরীত যুগ্মে। তারেশ এখানে খলনায়কের ভূমিকায়, কারণ সে যৌনবাসনায় আসক্ত। বহু কিশোরকে বিপথে চালিত করেছে, বিশেষত পায়ুকাম এবং হস্তমৈথুনে তারা আসক্ত। বিপরীতে সুধীর-দেবেন তো বটেই, মোহন, অশান্ত, সতীশ কারও আচরণেই যৌনাচার, বিশেষত শারীরিক অন্তরঙ্গতার কোনো প্রকাশ নেই এবং এই নিরিখেই তারা 'চরিত্রবান'।

---

[৭৮] শিবরাম চক্রবর্তী, ঐ, ৭৬।

[৭৯] শিবরাম চক্রবর্তী, ৭৬।

[৮০] শিবরাম চক্রবর্তী, ৭৫।

চমকপ্রদ বিষয় হল ঢাকা অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগের একটি প্রতিবেদনে প্রতিবেদনকারী বিপ্লবী সমিতির এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা বয়ান করতে গিয়ে একটি ব্যতিক্রমী কারণকে সামনে আনেন। জে. ই. আর্মস্ট্রং অভিযোগ আনেন সমিতির সদস্যদের মধ্যে সমকামিতা জনিত প্রতিহিংসা এই মৃত্যুর কারণ।[৮১] কিন্তু কৌতুহলজনক বিষয় হল, প্রতিবেদনকারী ইংরেজ গোয়েন্দা তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, ভারতীয় বিপ্লবীরা আপাতভাবে ব্রহ্মচর্যের মত উচ্চ নৈতিক জীবনচর্চা করেন বলে মনে হলেও তারা আসলে যৌনবিকৃতির শিকার| সমিতিতে একসাথে মেলামেশার সুবাদে যুবক ও বালকেরা সহজেই একে অপরের সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়। বিপরীতে সুপরিকল্পিতভাবেই তারা নিজেদের ব্রহ্মচারী বলে পরিচয় দেয় কারণ এর আড়ালে তারা তাদের যৌনাচারগুলি অভ্যাস করে যেতে পারে। কিন্তু জনসমক্ষে ব্রহ্মচারী হিসেবে তারা নিজেদের সৎ ও নৈতিক ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতির আভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া এই হত্যাকাণ্ডটির সাথে সমকামিতার সংযোগের অভিযোগটির সত্যতা পর্যবেক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব এবং তা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়ও নয়। কিন্তু আর্মস্ট্রং এই ঘটনাটির প্রতিবেদন তৈরি করার সময় যেভাবে বিপ্লবীদের ভাবমূর্তির সাধারণীকরণ করছেন, তা থেকে প্রান্তিক যৌনাচরণ এবং বিপ্লবীদের সম্পর্কে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়। কিন্তু একই সাথে বিপ্লবী সমিতিগুলির ক্ষেত্রেও সন্তান উৎপাদন ব্যতীত আর সমস্ত রকমের যৌনাচারের প্রতি যে ঠিক একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান ছিল তা প্রকাশ পায় ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে নেওয়া একটি শপথ বাক্যে। সমিতির সদস্য হতে গেলে যে প্রতিজ্ঞাগুলি বাধ্যতামূলক ছিল তার একটিতে বলা আছে—

> I will never in my life indulge in any kind of smoking or intoxicating drugs; that I will never use any narcotics, never have any sexual intercourse with prostitutes, or with the wife of another, or widow or maiden; that I never practice masturbation or have any unusual sexual intercourses with any man, and that I will try my level best and spare myself no pains to check those works in my friends and relations and kinsmen and in all whom I am acquainted with, and to remove those proponents.[৮২]

---

[৮১] J. E. Armstrong, "An Account of the Revolutionary Organization in Eastern Bengal with Special Reference to the Dhacca Anushilan Samiti: Part I and Part II," in Samanta, *Terrorism in Bengal: A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939*, Vol II, 393-95.

[৮২] H. L. Salkeld, "Anushilan Samiti, Dacca: Part II," in Samanta, *Terrorism in Bengal: A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939*, Vol II, 36.

এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল যেকোনো ধরনের যৌনাচার, যার মধ্যে অবশ্যই সমকামিতাও অন্তর্ভুক্ত, তার অভ্যাসের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মতো বিপ্লবী সংগঠনগুলিও নিয়মবদ্ধ বিধি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী থেকেছে। স্পষ্টভাবে এক আদর্শ বিপ্লবী পুরুষের আদিকল্প নির্মাণের প্রক্রিয়া সেখানে কার্যকরী থেকেছে যে বিষয়ে আমরা পরের অংশে আলোচনা করব। কিন্তু তার পাশাপাশি পুরুষ সম-সামাজিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রস্ফুটিত এই বিপ্লবী পরিসরে বিপ্লবীদের মধ্যেকার অন্তরঙ্গতা, নৈকট্য এবং আবেগ আমরা যেভাবে বিকশিত হতে দেখছি তাও বিপ্লবী পৌরুষ নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সামনে আসে। সেখানে সমকামী যৌনাচার বর্জনীয় হলেও সম-রোমান্টিক অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতিকে ব্যক্ত করার পরিসরটি উন্মুক্ত থাকতে দেখা যায়। বিপ্লবীদের বয়ানে তাকেও একভাবে আদর্শায়িত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, বিপ্লবী পৌরুষের চরিত্রটি নির্মাণে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

ব্রহ্মচারী ও শহীদ : আদর্শ বিপ্লবীর দুই আদিকল্প

বিপ্লবী আন্দোলনে বিপ্লবে আত্মনিবেদনের যে ধারণা বিপ্লবীদের পুরুষালি চরিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে থাকতে দেখা গেছে তাকে ঘিরেই আমরা বিপ্লবীদের জন্য কাঙ্ক্ষিত আদর্শ চারিত্রিক গুণগুলিকে পুঞ্জিভূত হতে দেখতে পারি, যেখানে বিপ্লবের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করার ধারণা জীবিত জীবনে মূর্ত হতে পারে ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়ে, আর বিপ্লবের জন্য জীবন বিসর্জন দিলে তাকে আমরা মূর্ত হতে দেখব শহীদ হিসেবে। ফলত এই আত্মনিবেদনের নির্ধারক হিসেবে ব্রহ্মচারী ও শহীদ-- এই দুটি আদিরূপ (archetype) বিপ্লবীদের পরিসরে অন্তত বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় যা বিপ্লবীদের দুনিয়ায় আদর্শ পৌরুষের ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রথমে শহিদের ধারণাটি নিয়ে কিছুটা কথা বলা যায়। যদিও এই বিষয়টি একটু বিতর্কিত যে হিন্দু পরম্পরায় শহীদের ধারণাটির কোনো অস্তিত্ব আদৌ বর্তমান ছিল কিনা। সিলভাস্টিন দেখিয়েছেন মুসলমান ও খ্রিস্টান সংস্কৃতির মতো হিন্দু সংস্কৃতিতে আত্মত্যাগ বা শহীদের ধারণাটি জনপ্রিয় ছিল না।[৮৩] কিন্তু সুমথি রামস্বামীর মতে ইন্দো-ইসলামিক পরম্পরায় বলিদানের ধারণা প্রচলিত ছিল এবং বিশেষ করে উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাবে

---

[৮৩] Michael Silvestri, “The Bomb, Bhadralok, Bhagavad Gita, and Dan Breen: Terrorism in Bengal and Its Relation to the European Experience,” *Terrorism and Political Violence* 21, no. 1 (2009): 1–27. 14-16.

মুসলমান ও শিখদের মধ্যে এই শহীদ-সন্তের ধারণা জনপ্রিয়তা পায়।[৮৪] এই আত্মবলিদান পরম্পরার সূচনা কী, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সিলভাস্টিন সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আলোচ্য পর্বে এই আত্মবলিদান ও শহীদের ধারণাটি নতুন রূপ পায়। হিন্দু পরম্পরায় সন্ন্যাসের যে ধারণা, সন্ন্যাসীদের মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধনার যে অনুশীলন, তাকেই এই পর্বে যুক্ত করা হয় শহীদের আত্মত্যাগের সাথে।[৮৫] বিপ্লবী সমিতিগুলির কার্যালয়ে বহু ধরনের পুরুষ চরিত্রের ছবি এবং জীবনীমূলক গ্রন্থের ব্যাপক পরিমাণে উপস্থিতির কথা নানা গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উপস্থিত। এঁদের মধ্যে নানান সাধু-সন্ন্যাসীর ছবি থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকীর ছবি যেমন সমিতির কার্যালয়ে দৃশ্যমান,[৮৬] তেমনি মাৎসিনী, গ্যারিবল্ডির মতো বহু জীবনীও বর্তমান, যাঁরা বিভিন্ন সময় জাতির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।[৮৭] কুমুদিনী মিত্রর লেখা *শিখের বলিদান* বইটিও এই একই কারণে সম্ভবত বাঙালি বিপ্লবীদের অবশ্যপাঠ্য তালিকায় স্থান করে নেয়, *The Bengali* পত্রিকা যার ভূয়সী প্রসংসা করে, কারণ সমালোচকের মতে এই বইটি পড়লে বাঙালি ছাত্র-যুব সম্প্রদায় আত্মবলিদানের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।[৮৮]

মতিলাল রায় নিজের স্মৃতিচারণায় বেশ কিছু বিপ্লবীর আত্মবলিদানের কাহিনী গভীর বেদনা এবং গর্বের সাথে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে কানাইলাল দত্তের ঘটনাটি সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে তিনি বর্ননা করেছেন। মতিলাল যে সময় থেকে বিপ্লবী সমিতির সাথে যুক্ত হতে শুরু করেন সেই সময়েই তিনি কানাইলাল দত্তের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই সূত্র ধরেই কানাইলালের সাথে কর্মসূত্রের বাইরেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিকশিত হয়েছিল। এই কারণবশত কানাইলালের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সূচনাকাল থেকে ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত তাঁর প্রতি মতিলালের গভীর অনুরাগ ও পরম শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ তিনি তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর

---

৮৪ Ramaswamy, *The Goddess and the Nation : Mapping Mother India*, 224, এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Louis E Fenech, *Martyrdom in the Sikh Tradition : Playing the "Game of Love,"* (New Delhi: Oxford University Press, 2000).

৮৫ Silvestri, "The Bomb, Bhadralok, Bhagavad Gita, and Dan Breen: Terrorism in Bengal and Its Relation to the European Experience," 14-16

৮৬ H. L. Salkeld, "Anushilan Samiti, Dacca: Part II," in Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939,* Vol II, 147.

৮৭ *Mazzini-O-Garibaldir Jivancharit*; J. S Armostrong, "An Account of Revolutionary Organization in Eastern Bengal with Special Reference to the Dacca Anushilan Samiti," Ibid., 357.

৮৮ H. L. Salkeld, "Anushilan Samiti, Dacca: Part II," Ibid., 96.

স্মৃতিচারণার এই অংশে কানাইলালের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বীর, নিজের সম্পর্কে উদাসীন যে চারিত্রিক গুণাবলীর কথা মতিলাল উল্লেখ করেছেন, তার মধ্য দিয়ে একাধারে শহীদ হিসেবে কানাইলালের প্রতি তাঁর ব্যতিগত ঋণ এবং আদর্শ বিপ্লবী হওয়ার দৃষ্টান্ত কী হতে পারে সেই ছবিটি তিনি তুলে ধরেছেন। যদিও শুধু কানাইলাল নন, মুজফ্‌ফরপুর-কাণ্ডের পরে ধৃত সকল বিপ্লবীদের সম্পর্কেই এই পর্বে মতিলাল নানাভাবে তাঁর শ্রদ্ধা মেশানো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে যেসকল বিশেষণ তিনি ব্যবহার করেছেন সেখান থেকেই বোঝা সম্ভব বিপ্লবী পরিমণ্ডলে আত্মবলিদানকারী বিপ্লবীদের প্রতি পোষণ করা আগাধ শ্রদ্ধাবোধের ধরনটি ঠিক কীরূপ। কানাইলালের সাথে আলিপুর জেলে প্রথমবার সাক্ষাৎ করতে গিয়ে মতিলাল সেখানে বন্দি বিপ্লবীদের বর্ণনায় লিখছেন--

> সেই দীর্ঘাকৃতি কানাইলাল, সেই সদাপ্রফুল্ল মুখশ্রী, হাস্যসুন্দর ওষ্ঠপুট, সুদীর্ঘ ললাট, প্রায় আজানুলম্বিত বাহু। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল না যে, বন্দী অবস্থায় সে বিন্দুমাত্রও বিষণ্ন হইয়াছে। সে আমায় চিনাইয়া দিল বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাসকর, হেমেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র প্রভৃতিকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "শ্রীঅরবিন্দ আসেন নাই?"
>
> কানাইলাল বলিল "তিনি বড় কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার করেন না - ধ্যানেই থাকেন – কথাবার্তা কহেন না বলিলেই চলে।"...
>
> আমি অনেককেই দেখিলাম স্বাধীনতা-ব্রতচারী যোগী পুরুষের ন্যায় ইহারা আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুগণের সহিত মুক্তচিত্তে হাস্যপরিহাস করিতেছেন।[৮৯]

কানাইলালের ফাঁসি, মৃতদেহ এবং শবযাত্রার এক হৃদয় বিদারক কিন্তু একই সঙ্গে গর্বে ভরপুর বর্ণনা মতিলাল বয়ান করেছেন।

> দেখিলাম এক আইরিশ ওয়ার্ডারের চক্ষে জল ঝরিতেছে। আশুবাবুর (কানাইলালের বড় দাদা) করমর্দ্দন করিয়া সে বলিল – "মিঃ দত্ত, আপনি কাঁদিবেন না। আপনার ভাই একজন খাঁটি বীর এবং এত বড় নির্ভীক দেশপ্রেমিক আয়ার্ল্যাণ্ডেও মিলিবে না।"
>
> এই আইরিশ ওয়ার্ডার চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আমাদের কানাইলালের অন্তিম কাহিনী বর্ণনা করিল। তাহার মুখে শুনিলাম – "নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পর (যে রাজসাক্ষী খুন করার অপরাধে কানাইলালের ফাঁসি হয়) কানাইলালের ১০৫° জ্বর উঠিয়াছিল। তারপর জ্বরের বিরাম হইলে, তাঁকে ডাক্তার কুইনাইন দিতে চাইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। সেই ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি সিংহের মত সর্ব্বদাই পদচারণা করিতেন। আর

---

[৮৯] মতিলাল রায়, *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী*, ২৫।

তাঁহার জ্বর হয় নাই। তাঁহার মুখে হাসি সর্ব্বদাই দেখিতাম।" সে আরও বলিল – "আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম ফাঁসির সময় এই হাঁসি তারা আর থাকিবে না।" কিন্তু ফাঁসীকাষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার চক্ষু যখন আবৃত করা হইতেছিল, হাসিতে হাসিতে তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন – "তুমি আমায় এখন কেমন দেখিতেছ?"[৯০]

দেখিলাম (মৃতদেহ) – কণ্ঠের দুই পার্শ্বের অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কানাইলালের দৃষ্টি উন্মীলিত। ওষ্ঠপুটে দন্ত রাখিয়া তাহার দৃঢ়তাবঞ্জক বদনমণ্ডল মৃত্যুঞ্জয়ী রুদ্রের মত শোভা পাইতেছে।...আজ তাহার দীর্ঘ সুবিস্তৃত বাহুদ্বয় লক্ষ্য করিলাম। তাহার হাত দুটি মুষ্ঠিবদ্ধ। মরণের জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ে সে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে! ... কানাইলালের এই বীরসজ্জা আজও হৃদয় হইতে আমি মুছিতে পারি নাই। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই বীর শহীদ আমার মনে চিরজাগ্রত থাকিবে।[৯১]

চতুর্দিক হইতে পুষ্পমালা ও পুষ্পগুচ্ছ শবাধারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তরুণের দল আসিয়া শবাধার বরণ করিতে চাহিল। পথের দুই ধারে অগণন দেশবাসী দাঁড়াইয়া জয়-রবে দিঙ্মন্ডল ধ্বনিত করিল। পথের উভয় পার্শ্বে অলিন্দ হইতে কুলকামিনীগণ হুলুধ্বনিরর সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। জাতীয়তাবোধে উম্মত্ত আবালবৃদ্ধবনিতা কানাইলালের চরণ স্পর্শের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।...কানাইলালের চরণ চুম্বন করিয়া কত নারীপুরুষ যে এমন বীর পুত্রের পিতামাতা হওয়ার সৌভাগ্য কামনা উচ্চারণ করিল তাহা বর্ণনা করার নহে।

কানাইলালের চিতা জ্বলিল। চন্দনকাষ্ঠ ভারে-ভারে আসিয়া চুল্লীকে নিভিতে দিল না। হেমন্তের মধ্যাহ্ন মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল। অপরাহ্ন আসিয়া দেখা দিল। কানাইলালের চুল্লী নিভিতে চাহে না, ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। মাঝে-মাঝে হরিধ্বনির সহিত তরুণ কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" শব্দ উঠিতেছে।[৯২]

আত্মবলিদানের এহেন একাধিক বর্ণনা মতিলালের লেখনীতে গভীর আবেগের সাথে ধরা পড়েছে। বিপ্লবী যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এমন শাহাদতের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখছেন,

...স্বাধীনতার জন্য নেতার এমন অনুগত জীবন আমরা সর্ব্বক্ষেত্রে দেখি না। আমার কথা শুনিয়া একজন তরুণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাণ বলি দেওয়ার সঙ্কল্পে তাহার ললাট আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ... আমি তাহাকে বুকে ধরিয়া বলিলাম "প্রাণ বলি দিও, তবু ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিও না।" চক্ষের সে কি প্রখর দৃষ্টি! আমি তাহার প্রস্তরকঠিন মূর্ত্তি আজিও ভুলিতে পারি নাই। ... যোগেন্দ্রনাথের স্মৃতি আমারা চিরদিন গৌরবের

[৯০] মতিলাল রায়, *ঐ*, ৩২।

[৯১] ঐ, ৩৩।

[৯২] ঐ, ৩৫।

সহিত বহন করিব। বিপ্লবসমিতির নির্দ্দেশপালনে তার বলির 'রক্ত' স্বাধীন ভারতে ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠারই চিরদিন প্রেরণা দিবে।[৯৩]

প্রসঙ্গ কানাইলালের হোক আথবা যোগেন্দ্রনাথের, 'দৃঢ়প্রত্যয়', 'চক্ষের প্রখর দৃষ্টি', 'ললাটের আরক্ততা' তিনি যেমন আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত বিপ্লবীর কথা বয়ান করতে গিয়ে বর্ণনা করছেন, সেই একই মেটাফোরে তিনি কানাইলালের বলিপ্রদত্ত মৃতদেহকে বয়ান করতে গিয়েও ব্যবহার করছেন। মৃত্যুর আগে এবং পরে দুই ক্ষেত্রেই বিপ্লবীর দেহ-মন একই লক্ষণায় মহিমান্বিত হয়ে যাচ্ছে, যাকে তাঁর সকল বিপ্লবী সহকর্মী এবং দেশবাসী অমর করে রাখবেন। কানাইলালের শবযাত্রার নারী-পুরুষের ঢল শুধু ভারতবাসীর বীর তর্পণের প্রতীক নয়, ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রার্থী আইরিশ জনতার প্রতীক। জেলের ওয়ার্ডার কানাইলালের বীরত্ব ও আত্মবলিদানের প্রতি সম্ভ্রমের চোখেই কুর্নিশ জানান। বিপ্লবী নিজের বলিদানের মাধ্যমে বিপ্লবী সহকর্মীদের কাছেও আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন।

এই আত্মত্যাগের দ্বিতীয় আদিকল্প ব্রহ্মচারীও একইভাবে বহুমাত্রায় আদর্শ বিপ্লবী পুরুষের চরিত্রকে দর্শায়। আমরা আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত যে অসংখ্য 'ব্রহ্মচর্য' শিরোনামের বইয়ের সন্ধান পাই তার বেশিরভাগই খুব স্পষ্টভাবে দেশের জন্য, আর্যজাতির জাগরণের জন্য, দেশমাতৃকার মুক্তির উদ্দেশে আদর্শ পুরুষ হয়ে ওঠার লক্ষে ছাত্র-যুবকদের ব্রহ্মচর্যচর্চায় আহ্বান জানায় প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। বিপ্লবী সংগঠনে যেসব ব্যক্তিত্বদের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হতো, যাঁদের জীবনী অবশ্যপাঠ্য হিসেবে পাঠের তালিকায় থাকত তাঁদের অনেকের জীবনই ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসীর, যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর বয়ানের বেশ দীর্ঘ অংশ আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যেখানে ব্রহ্মচর্য আর শরীরচর্চাকে বিপ্লবী হয়ে ওঠার প্রথম ধাপ হিসেবে মানা হয়েছে। বিপ্লবীদের দীক্ষাকালে তাই এই বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই ব্রহ্মচারী হওয়ার ব্রত বিপ্লবীদের জীবনে প্রায় আবশ্যিক করার বিষয়টিকে দুটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে— প্রথমত ব্রহ্মচারীর সাথে সাংসারিক দায়বদ্ধতা বিহীন, কোনোরকম প্রণয় সম্পর্কের পিছুটান ছাড়া এক মুক্তপুরুষকে পাওয়া যায় যিনি বিপ্লবের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করার মতো অবস্থায় আছেন। বিপ্লবের জন্য যে আত্মসুখ বর্জিত, কৃচ্ছ্রসাধনার তাগিদ সমকালীন বিপ্লবীরা কল্পনা করেছিলেন তার সাথে ব্রহ্মচারীর চরিত্র মিলে যায়।

---

[৯৩] ঐ, ৮১।

আমরা *আনন্দমঠ*-এর বিবাহিত দম্পতিদের কথাই স্মরণ করতে পারি যাঁরা এই শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে যতদিন না তাঁদের দেশ পরাধীনতা মুক্ত হচ্ছে, ততদিন ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করবেন। *আনন্দমঠ* বিপ্লবী সমিতিগুলির হৃদয়ে এই আদর্শ বিপ্লবীর চরিত্রটি সম্ভবত প্রায় গেঁথে দেয় যাঁদের দেশসাধনার সাথে ব্রহ্মচর্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৯৪] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এক জায়গায় লিখছেন, "...যারা সব ছেড়ে নামত তাদের আমরা ইঙ্গ বঙ্গী খিচুড়ি ভাষায় বলতাম whole time workers – তাদেরই মনে আমাদের কাছে বেশী ছিল। স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর করে চাকরী বজায় রেখে নিজের পাওনা কড়িটি বুঝে নিয়ে দেশ সেবা হয় না তা বলছি নে, হয় খুবই। তিলক তাই করেছেন, গান্ধীজীও তাই করেছেন, কিন্তু অমন মানুষ সর্ব অবস্থাতেই খাঁটি। ... কিন্তু সাধারণ পাঁচমেশালী মানুষের বিষয়ে ও কথা খাটেনা।"[৯৫] ফলত শহিদের চরিত্রের মতোই বিপ্লবীকেও একজন মোহমুক্ত পুরুষের চরিত্রে সবচাইতে অভিপ্রেত ও যোগ্য চরিত্রে হিসেবে দেখার তাগিদটি বিপ্লবী সমিতিতে প্রসারিত হতে থাকে।

বিপ্লবী দলগুলিতে বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে অন্য যে দিকটির উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হতো তা হল শরীরচর্চার সংস্কৃতি, যে বিষয়টি ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আখড়া, লাঠিখেলা এই বিষয়গুলির সাথে হয়তো বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। কিন্তু তা একভাবে বিপ্লবীদের দৈহিক সামর্থ্যকে বাড়াতে সাহায্য করত।[৯৬] আর এই দৈহিক শক্তি হারানোর সাথে শুক্রক্ষয়ের সরাসরি সম্পর্কটি সমকালীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণজ্ঞানে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যেখানে দেখিয়েছি বাঙালি পুরুষের শারীরিক দুর্বলতা সম্পর্কিত গৎবাঁধা ধারণাটির প্রভাব শুক্রক্ষয় জনিত দুশ্চিন্তাকে চাগিয়ে তোলে। পুরুষের শুক্রব্যয় ফলত শক্তি অপচয়ের সমার্থক হয়ে ওঠে সমকালীন চিকিৎসামূলক বয়ানে। বিপ্লবী সংগঠনের কাছেও ফলত ব্রহ্মচর্যের পাঠ

---

[৯৪] H. L. Salkeld, "Anushilan Samiti, Dacca, Part-III, 1909" in Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939,* Vol II, 335-36.

[৯৫] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বোমার যুগের কাহিনী,* ২৬।

[৯৬] গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বহু বার এই বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে যে লাঠিখেলা, ছুরিখেলার মতো যে দৈনিক অভ্যাসগুলির সাথে বিপ্লবীরা যুক্ত ছিল তার সাথে বন্দুক আর বোমা ব্যবহারের জন্য যে দক্ষতা ও অভ্যাসের প্রয়োজন হতো তার কোনো মিল ছিল না। ফলত এই বিষয়টিকে বিপ্লবীদের প্রাথমিক মেলামেশা, নিয়োগের মাধ্যম এবং বিপ্লবী কার্যের জন্য শারীরিক বলবৃদ্ধির পন্থা হিসেবে দেখাই সম্ভবত শ্রেয়। H. L. Salkeld, "Anushilan Samiti, Dacca, Part-I, 1909," in Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939,* Vol II.; "An Account of Revolutionary Organization in Eastern Bengal with Special Reference to the Dhaka Anushilan Samiti," in Samanta, 330-32.

এক্ষেত্রে শারীরিক শক্তিসঞ্চয়ের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুরোধা পুলীনবিহারী দাস *লাঠি খেলা ও অসিশিক্ষা* গ্রন্থের সূচনায় লিখছেন—

> ছাত্রজীবনে ও যৌবন-প্রারম্ভে অনেকেই না বুঝিয়া কুসংসর্গে পড়িয়া চরিত্রবল হারাইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ ও সমস্ত যোগ্যতা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ... যাহাদের চরিত্রবল নাই, তাহারা সাধারণতঃ ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া থাকে। আবার আত্মরক্ষার শক্তির অভাব হেতু যাহারা সর্বদাই ভয়ে ভীরু ও জড়সড় হইয়া থাকে, তাহারা জীবিত হইয়াও মৃত। তাহাদের উন্নতিই কোথায়, সুখই কোথায়, আনন্দই কোথায়, এবং জীবনধারণের সার্থকতা কোথায়?
>
> শরীর ও মনের সুস্থতা-সাধন এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা-হেতু বিভিন্ন ব্যায়াম কৌশল ও শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার মধ্যে লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা অন্যতম। ... সমস্ত শিক্ষার্থীগণকেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান...পরিত্যাগ করিতে হবে-- সত্য-ব্রত-ব্রহ্মচর্য্য ও অভিবাদনপরায়ণ হইতে হইবে,...[৯৭]

এই কারণেই হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন সহ প্রায় সকল প্রকার যৌন অভ্যাসের সংসর্গত্যাগ বেশিরভাগ বিপ্লবী সমিতির শপথ গ্রহণের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য হিসেবে যুক্ত হতে দেখা যায়।[৯৮]

এই প্রসঙ্গে আর একটি পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করে আমরা আবার মূল বিষয়টিতে ফিরে যাব। কিশোর-যুবকদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া সবসময় যে সাধারণ মানুষের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য ছিল তা নয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন জেলফেরত আসামি এবং গুলি-বোমার রাজনীতির সাথে সংযুক্ত হয়েছিলেন বলে তাঁকে অনেকেই নীচু নজরে দেখতেন।[৯৯] ব্রহ্মচর্যর জন্য লেখা নীতিমূলক কিছু কেতাবে রাজনীতির প্রতি যুবকদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণকেও সমালোচনা করা হয়েছে।[১০০] সম্ভবত বিপ্লবীদের সাথে ডাকাতি এবং গুপ্তহত্যার বিষয়টি যেভাবে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল তা তাঁদের ভাবমূর্তিকে বিশেষভাবে কলুষিত

---

[৯৭] পুলিনবিহারী দাস, *লাঠি খেলা ও অসিশিক্ষা*, ১৩৩১, ভূমিকা।

[৯৮] H. L. Salkeld, "Anushilan Samiti, Dacca: Part II," in Samanta, *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939,* Vol II, 36.

[৯৯] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বোমার যুগের কাহিনী*, ৩৯।

[১০০] *ছাত্রজীবন* শিরোনামের বইটিতে লেখক লিখছেন, "এই অভাব দূর করিতে পতনোন্মুখ দেশকে রক্ষা করিতে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়া নানা প্রকার চেষ্টাযত্নের আবির্ভাব করিতেছে, বা করিয়াছে। অত্যধিক রাজনীতিক আন্দোলন ইত্যাদি (Extremely Political agitation &c) তাহার অন্যতম চেষ্টা বা-যত্ন এই অসামরিক এই রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দেশবাসী মধ্য-বিত্ত গণের হতাবশিষ্ট ধন, মান রক্ষা করা কষ্ট সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই বলি কার্য্যতঃ যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এই পতনশীল দেশের পক্ষে, এই জাতীয় উপায় অবলম্বন করা প্রচুর পরিমাণে মঙ্গল সাধক নহে।" স্বামী রঘুনন্দন, *ছাত্রজীবন*, কলকাতা, ১৩১৬, ৫৫। প্রায় একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়, আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, *ছাত্রদিগের নৈতিক অবস্থা ও তার প্রতীকার*, ১৩২২, ২০। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর *সংযম শিক্ষা* গ্রন্থে লেখক ছাত্রদের রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যেতে নিষেধ করছেন। চন্দ্রনাথ বসু, *সংযম শিক্ষা*, কলকাতা, ১৩১১, ১০৭।

করেছিল। বিপ্লবীদের সম্পর্কে মোতিলালের লেখাটি যদি আমরা খুঁটিয়ে পড়ি তাহলে দেখব যে তিনি তাঁদের চন্দননগরের বিপ্লবী দল সম্পর্কে একটি দিককে বারে বারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় যে তাঁদের সাথে ডাকাতি ও ধনসম্পদ লুণ্ঠনমূলক কার্যকলাপের কোনো সংযোগ ছিল না।[১০১] চন্দননগরের কেন্দ্র থেকে, এমনকী তাঁর নিজের বাড়ি থেকেই বোমা বানানোর কাজটি চলত। এবং দেশের, বিশেষ করে বাংলার বহু প্রান্তে তাঁদের তৈরি বোমা বন্টিত হতো এই বিষয়টি তিনি অকপটে স্বীকার করলেও এই কাজটিকে বিচার করার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে নানা দোদুল্যমানতা নজরে আসে। একভাবে তিনি এই ধরনের কাজকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের খুব নগণ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। এর বিপরীতে তিনি বিপ্লবীদের জীবনের আত্মত্যাগ আর্থাৎ আত্মবলিদান এবং ব্রহ্মচারীর ভাবমূর্তিকেই বড় করে দেখেছেন। এখান থেকে কোনো সার্বজনীন সিদ্ধান্তে আসা না গেলেও একটি আগ্রহজনক পর্যবেক্ষণের বিষয়টিকে উত্থাপন করা যায়। বিপ্লবীদের যে ভাবমূর্তিকে, তাঁদের পৌরুষের যে রূপটিকে সমকাল এবং পরবর্তী পর্যায়েও আদর্শয়ায়িত করা হয়, অন্তত মতিলালের লেখনীতে তার যে রূপটি চোখে পড়ে তা বিপ্লবী রাজনীতিতে অকলুষিত আত্মত্যাগী এক যোগী-ব্রহ্মচারীর আদিরূপ। সেখানে এই সকল ডাকাতি, বোমা, বন্দুকের রাজনীতি অনেকটা কিনারার উপাদান। যদিও এর মধ্য দিয়েও বাঙালি তার মেয়েলিত্বের অপবাদকে অবশ্যই ঘোচাতে সফল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাকে অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লবী রাজনীতির মধ্যে এক গুরুত্বহীন *fringe element* হিসেবেই ধরা পড়েছে মতিলালের রচনায়। গুরুত্ব পেয়েছে বিপ্লবীদের শহীদ-ব্রহ্মচারী পুরুষালি চরিত্রটিই।

মতিলাল রায়, আধ্যাত্মিক দাম্পত্য জীবন এবং আবেগ

ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম পর্বে বাংলায় গার্হস্থ্যজীবন এবং দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে বিগত তিন দশকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু গবেষণা আমাদের সামনে এসেছে যা থেকে এই বিষয়ে একটি প্রাথমিক চালচিত্র আমাদের কাছে মজুত আছে। বিশেষ করে উনিশ শতক থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্যজীবনে মেয়েদের অভিজ্ঞতা,[১০২]

---

[১০১] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : প্রবর্তক সঙ্ঘ, ১৪২৪), ৪৫।

[১০২] Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984); Dagmar Engels, *Beyond Purdah? : Women in Bengal, 1890-1939* (Delhi: Oxford University Press, 1996); Judith E Walsh, *Domesticity in Colonial India : What Women Learned When Men Gave Them Advice* (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004).

ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী বয়ানে তাঁদের উপস্থাপনার[১০৩] দিকগুলি নারীবাদী ঐতিহাসিকরা বিস্তারিতভাবে গবেষণা করেছেন।ঔপনিবেশিক সময়পর্বেও গার্হস্থ্যের অবধারণা যে অপরিবর্তিত থাকেনি সেই বিষয়েও আমরা একটি রেখাচিত্র পেয়েছি যেখানে দেখা যায় উনিশ শতকের শেষার্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতর্কে গার্হস্থ্যকে হিন্দু জীবনের কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন কীভাবে গার্হস্থ্যের এই আধ্যাত্মিক কল্পনায় ছেদ আনে।[১০৪] এমনকী ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে গার্হস্থ্যের মধ্যে মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটিও যে কার্যকরী হয়ে ওঠে সেই দিকটিও ঐতিহাসিক আলোচনায় উঠে এসেছে।[১০৫] কিন্তু এই পারিবারিক এবং বৈবাহিক জীবনে পুরুষদের অবস্থান, সাংসারিক জীবনে তাদের অংশগ্রহণের চরিত্র এবং পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিকায় পরিবর্তনের বিষয়ে তুলনায় তেমন আলোচনা চোখে পড়ে না। যদিও শেষ উল্লিখিত দুটি গবেষণায় এই বিষয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে যেখানে দেখা যায় জাতীয়তাবাদী অবধারণায় গার্হস্থ্যে পুরুষের নির্দিষ্ট ভূমিকাকেও বিধিবদ্ধ ও আদর্শায়িত করা হয়। এবং এই রচনাগুলিতে বিস্তারিত আলোচনার সম্ভাব্যতার কথাও প্রস্তাবিত রয়েছে। আমাদের এই পর্বে আলোচনা যদিও ঔপনিবেশিক পর্বে গার্হস্থ্যে পুরুষের অংশগ্রহণের মূল্যায়ন বিষয়ে নয়। বরং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ প্রথম প্রজন্মের বিপ্লবীদের যেভাবে প্রভাবিত করেছিল তার নিরিখে পৌরুষ, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতির আন্তঃসম্পর্ক বুঝতে চেষ্টা করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। সেই প্রসঙ্গেই গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এই নৈকট্যকে আমরা কী রূপে পাঠ করতে পারি তাই আমরা এই পর্বে আলোচনা করব। কিন্তু এই আলোচনাটি করতে গিয়ে আমাদের সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম পর্বে গার্হস্থ্য সম্পর্কে, জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ সম্পর্কে দু-চার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তনিকা সরকারের মতে জাতীয়তাবাদী গার্হস্থ্যের কল্পনায় গৃহকর্তাকে গৃহের শাসক, প্রশাসক ও বিচারকের ভূমিকায় আশা করা হয়।[১০৬] এই ধারণাটিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে আলোচ্য পর্বে যে ধরনের

---

[১০৩] Uma Chakravarty, “Whatever Happened to the Vedic Dasi? Orientalism, Nationalism and a Script for the Past,” in *Recasting Women: Essays in Colonial History*, ed. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (New Delhi: Kali for Women, 1989), 27–87.

[১০৪] Sudeshna Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta, 1880-1947." Unpublished PhD Dissertation (London University, 1997), 80-121.

[১০৫] Swapna M Banerjee, “Debates on Domesticity and the Position of Women in Late Colonial India,” *History Compass* 8, no. 6 (2010): 455–73.

[১০৬] Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism*, 38.

উপদেশমূলক রচনাগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে গার্হস্থ্যের দৈনন্দিন কাজ অথবা ঘরের মেয়েদের খুঁটিনাটি দৈনন্দিনতায় পরিবারের কর্তা হিসেবে পুরুষের অংশগ্রহণকে বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়নি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পারিবারিক জীবনে সাংসারিক গোলযোগ অথবা সমস্যায় পুরুষকে পিতৃসুলভ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় আশা করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো পরিচিত লেখক থেকে শুরু করে অখ্যাত প্রায় সকল নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী লেখকদের আলোচনাতেই নানারূপে প্রজন্মগত বয়সের তারতম্য অনুযায়ী পরিবারে পুরুষদের এই ভূমিকা নির্ধারিত হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায় যেখানে পরিবারের কর্তার অবস্থান অবশ্যই শীর্ষে।[১০৭] যদিও ১৯২০-র পর থেকে নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী এই প্রতর্ক ম্রিয়মান হতে থাকায় গার্হস্থ্যজীবনে পুরুষদের এই কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা যে বদলাতে শুরু করেছিল তা তিনি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছেন।

মতিলাল রায় এবং তাঁর সহ-চিন্তকদের আমরা স্পষ্টভাবেই নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী বিশ্বদর্শনের মধ্যেই চিহ্নিত করতে পারি। ১৯২০-র পর থেকে নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতান্ত্রিকতার ধার্মিক অনুজ্ঞা (injunction) গুলি যে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল তার প্রতিক্রিয়া আমরা মতিলালের রচনায় বিশেষভাবে মূর্ত হতে দেখি।[১০৮] পনেরো বছর বয়সে চুঁচুড়া নিবাসী ন-বছরের রাধারাণী দেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয় (১৮৯৭ খ্রি.)। রাধারাণীর মৃত্যুর (১৯২৯ খ্রি.) পরই মতিলাল তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিতে *জীবনসঙ্গিনী* নামে আত্মজীবনীমূলক বইটি লিখতে শুরু করেন।

মতিলাল কিশোর বয়স থেকেই ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। খুব কম বয়সেই তিনি তন্ত্র, সহজিয়া, বাউল, কর্তাভজা প্রমুখ বাংলার নানান জনপ্রিয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন।[১০৯] জীবনের পরবর্তী সময়ে যদিও তিনি মনে করেছেন যে এই সম্প্রদায়গুলি তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাগুলিকে আংশিকভাবে প্রশমন করতে পারলেও তা তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ধর্মীয় নৈতিকতা বোধ তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।[১১০] কিন্তু প্রথম জীবনে বাংলার এই স্থানীয় লৌকিক সম্প্রদায়গুলির সাথে

---

[১০৭] Banerjee, "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947," 180, 182.

[১০৮] বাংলায় বিশ শতকে হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পাপিয়া চক্রবর্তী একটি অধ্যায়ে মতিলাল রায় এবং প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনায় এই সমালোচনাত্মক দিকটি স্থান পায়নি। পাপিয়া চক্রবর্তীর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Papia Chakravarty, *Hindu Response to Nationalist Ferment : Bengal, 1909-1935* (Calcutta: Subarnarekha, 1992). Chapter 3, Aurobindo to Motilal, Manmaking: The Core of Resurgent Hinduism, 64-114.

[১০৯] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, প্রথম খণ্ড, ৪২-৪৮।

[১১০] মতিলাল রায়, ঐ , ৫৮।

মেলামেশা তাঁর পরবর্তী জীবনের আধ্যাত্মিক বোধকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছিল তা তাঁর নানাবিধ রচনার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ১৯০২ খ্রি. তাঁর আট মাস বয়সী কন্যাসন্তানের মৃত্যুর পর মতিলাল নানাবিধ ধর্মীয় পরীক্ষানিরীক্ষার দিকে আরও ঝুঁকতে থাকেন। ধর্মজিজ্ঞাসার এমন অস্থির পরিস্থিতিতে মতিলাল রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সংস্পর্শে আসেন। এই যোগাযাগগুলি থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মিশনভিত্তিক এই সেবামূলক এবং জনকল্যাণকর উদ্যোগগুলিই আসলে ঈশ্বর উপাসনার অন্যতম পথ। রামকৃষ্ণ মিশনের এই ধরনের সেবামূলক উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে মতিলাল ১৯০৫ সালে চন্দননগরে সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায় তৈরি করেন।[১১১] সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর নির্মাণ হলেও এই সম্প্রদায় স্বদেশি আন্দোলনেও অংশ নেয়।[১১২] জীবনের প্রথম পর্বে যে ধরনের রাজনৈতিক দর্শন মতিলালের চিন্তাভাবনাকে আকার দিতে সাহায্য করে তার মধ্যে প্রথম প্রজন্মের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ভূমিকা অন্যতম। পূর্ববর্তী অংশে আমরা উল্লেখ করেছি তিনি বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির সাথে কীভাবে সংযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে তাঁর অংশগ্রহণের ঘটনাবহুল কাহিনী তিনি জীবনের অন্তিম লগ্নে বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন। অববিন্দ ঘোষকে তিনি নিজের প্রথাগত গুরু হিসেবে চিরজীবন দেখে এসেছেন। অরবিন্দ কারাবাস থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর মতিলালের চন্দননগরের বাড়িতেই অজ্ঞাতসারে আশ্রয় নেন। অ্যানড্রু সারতোরি অরবিন্দের বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে পালাবদলের জন্য অন্তর্বর্তী যে সময়টি চিহ্নিত করেছেন সেই সময় পর্বেই মতিলাল অরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।[১১৩] অরবিন্দের পাশাপাশি অন্যান্য বহু বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের সাথেও তাঁর হৃদ্যতা এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় যা বহু দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলত মিশনারি কার্যকলাপগুলির পাশাপাশি নানা বিপ্লবী সংগঠনের ভাবাদর্শ তাঁর চিন্তাভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

স্ত্রীকে উৎসর্গ করে লেখা মতিলাল রায়ের আত্মজীবনীটি, বিশেষ করে তাঁর সমকালীন বিপ্লবীদের আত্মজীবনী থেকে অনেকটাই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র| গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কে সমকালীন বিপ্লবীরা যেখানে এক অর্থে নীরব থেকেছেন, মতিলালের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। মতিলালের গার্হস্থ্যজীবন নিয়ে এই অংশে আলোচনা করার

---

[১১১] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, প্রথম খণ্ড, ৩৭; *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী*, ১১।

[১১২] মতিলাল রায়, *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী*, ১৫।

[১১৩] Andrew Sartori, "The Transfiguration of Duty in Aurobindo's Essays on The Gita, Modern Intellectual History," article, *Modern Intellectual History* 7, no. 2 (2010): 319.

এটি অবশ্যই একটি কারণ। এক্ষেত্রে একটি পর্যবেক্ষণ উল্লেখ্য যে *জীবনসঙ্গিনী*-তে মতিলাল মূলত তাঁর গার্হস্থ্যজীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক তাকে এই রচনায় তিনি কেন্দ্রে রেখেছেন। একে ঘিরে তার চারপাশে জীবনের অন্যান্য দিক অর্থাৎ রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপগুলি যেভাবে আবর্তিত হয়েছে তা এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে মতিলালের রচনায় মূল বিবেচ্য তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী, তারপর তাঁর জীবনের পাশাপাশি থাকা অন্যান্য নারীরা। তাঁর পুরুষ সহকর্মীদের সাথে তাঁর হৃদ্যতা এবং সম্পর্ক এখানে প্রায় অনুপস্থিত। তিনি স্মৃতিচারণামূলক অন্য যে তিনটি বই লিখেছেন, যথা *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী, বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল* ও *স্বদেশী যুগের স্মৃতি,*[১১৪] সেগুলি যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সেগুলিতে মেয়েদের উপস্থিতি একেবারেই চোখে পড়ে না। বরং সেখানে সম-সামাজিক পরিসর ও নৈকট্যের কাহিনী প্রধান। যে-বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। ফলত এখানে আমরা তাঁর স্মৃতিচারণার বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নির্বাচনের প্রক্রিয়া লক্ষ করতে পারি। আর আমরা পরবর্তী আলোচনায় এই বিষয়টিও লক্ষ করতে পারব যে দুটি ক্ষেত্রে সম্পর্কের ধরন কীভাবে আলাদা আলাদা ভাবে উপস্থাপন করেছেন তিনি। মতিলালের এই উপস্থাপনার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার সূচনায় একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণমূলক সাহিত্য রচয়িতার পক্ষে জীবনের ঘটনাবলীকে কত হুবহু উপস্থাপনা করা সম্ভব তা নিয়ে পণ্ডিতরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে পল দ্য ম্যান-এর আলোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একটি যথার্থ প্রশ্ন তুলেছেন যে আত্মজীবনী লেখার প্রক্রিয়ায় রচনাকার জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে কতটা স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারেন এবং তাঁর জীবন আর সেই জীবনের ঘটনাবলী তিনি যেভাবে পুনঃলিখন করবেন বলে ঠিক করছেন, তার মধ্যে আদতে কতটা সাযুজ্য থাকে।[১১৫] এরিন সয়ার (Erin Sawyer) সেন্ট অগস্টাইনের আত্মজীবনীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই একই ধরনের সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁর মতে আত্মজীবনী লেখার সময় রচয়িতা জীবনের কাহিনীকে সংশোধনবাদী (revisionist) দৃষ্টি থেকে লেখেন যেখানে তিনি জীবনের ঘটনাগুলি নির্বাচন এবং ব্যাখ্যা করতে থাকেন। বিশেষ করে তিনি যে সময়ে বসে নিজের জীবনকে ফিরে দেখছেন তাঁর সেই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অবস্থা তাঁর রচনাকে

---

[১১৪] মতিলাল রায়, *বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল,* ১৯২৩; *স্বদেশী যুগের স্মৃতি* ১৯৩১ খ্রি. (আনু.); *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী,* ১৩৬৪ (আনু.)।

[১১৫] Paul de Man, “Autobiography as De-Facement,” *Modern Language Notes* 94, no. 5 (1979): 920-21.

বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।[১১৬] এক্ষেত্রে লিঙ্গগত ভিন্নতা এবং তার ওপর গড়ে ওঠা ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা আত্মজীবনী রচনায় বিশেষ মাত্রার সংযোজন করে। যেমন তপন রায়চৌধুরী লক্ষ্য করেছেন, উনিশ শতকে রচিত বাংলা আত্মজীবনীগুলির মধ্যে পুরুষ এবং নারীদের রচনায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি বিপরীতমুখী বয়ান পাওয়া যায়। পুরুষদের লেখনীতে কম বয়সে বিবাহ, বাল্যপ্রণয় এবং স্ত্রীর প্রতি প্রবল মানসিক নির্ভরতার সাধারণ কাহিনী তিনি লক্ষ করেছেন, যেখানে মেয়েদের লেখায় তিনি পেয়েছেন স্বামীর সাথে প্রায় সম্পর্করহিত একটি অন্তঃপুর জীবনের ছবি।[১১৭]

আমরা *জীবনসঙ্গিনী* থেকে মতিলালের দাম্পত্য জীবনের যে প্রতীতি পাই তার সাথে তপন রায়চৌধুরীর উল্লেখ করা পর্যবেক্ষণগুলির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাজুয্য লক্ষ করা যায়। এই ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি হল স্ত্রীর প্রতি তৈরি হওয়া গভীর আবেগ প্রকাশের প্রবণতা এবং দ্বিতীয় হল দাম্পত্য যৌন অভিজ্ঞতাগুলি বিশদে ব্যক্ত করার প্রতি ঝোঁক। প্রথম বিষয়টি বর্তমান অধ্যায়টির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল আবেগ এবং আত্মজীবনীতে তা উপস্থাপন করার ধরনের প্রসঙ্গ। পুরুষালি বিষয় (masculine subject) হিসেবে মতিলাল তাঁর স্ত্রীর প্রতি তৈরি হওয়া মানসিক নির্ভরশীলতা, নিজের অসহায়তা এবং এই সম্পর্কিত আবেগকে যেভাবে তাঁর আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেছেন তা হয়তো খুব ব্যতিক্রমী নয়। কিন্তু একজন পুরুষের আত্মকথনে দাম্পত্য সম্পর্ক এবং গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কে ব্যক্ত করা এই আবেগ পুরুষের নৈকট্যের ধরন বোঝার ক্ষেত্রে বেশ কিছু স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করে। মতিলালের আত্মজীবনীটি নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা মূলত এই স্তরগুলির উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করব এবং দেখব একাধারে স্ত্রীর প্রতি নিজের নির্ভরশীলতা এবং আবেগ ব্যক্ত করলেও একই সাথে স্ত্রী ও স্বামীর সম্পর্কের *হায়ারারকি*-কে তিনি কীভাবে বার বার চিহ্নিত করে চলেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

মাত্র ন-বছর বয়সে রাধারাণী দেবীর সাথে মতিলালের বিবাহ হয়। তার এক বছর পর থেকেই রাধারাণী দেবী পিত্রালয় ছেড়ে চন্দননগরে শ্বশুরবাড়িতে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন। এই সময় রাধারাণী দেবীর প্রতি

---

[১১৬] Erin Sawyer, "Celibate Pleasures: Masculinity, Desire, and Asceticism in Augustine," *Journal of the History of Sexuality* 6, no. 1 (1995): 1.

[১১৭] Tapan Raychaudhuri, "Love in a Colonial Climate: Marriage, Sex and Romance in Nineteenth-Century Bengal," article, *Modern Asian Studies* 34, no. 2 (2000): 262-63.

নিজের গভীর প্রণয়, আকর্ষণ এবং সম্ভোগ ইচ্ছা কীভাবে তাঁকে মত্ত করেছিল তা ব্যক্ত করতে গিয়ে মতিলাল লিখছেন—

> আমি মাতিলাম-প্রকৃত সম্ভোগের অনুশীলনে। বালিকা-বধূর যৌবন নিঃশব্দ চরণে অতি শীঘ্র আবির্ভূত হইল। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের বান ডাকিয়াছিল। আমি কালের আবর্তে তাহা ঘুলাইয়া, তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিলাম। তাঁহার জীবন অনুগত হইয়া আমার ভোগবিলাসের অনলকুণ্ডে অধিকতর ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। ... আমি তাঁহাকে যে প্রথম দুই এক বছর পিত্রালয়ে যাইতে হইয়াছিল, এক মাসের অধিক রাখি নাই।[১১৮]

যদিও স্ত্রীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে শুধুই প্রণয়নির্ভর ছিল তা মতিলাল বলতে চাননি। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি ব্রহ্মচর্য পালনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেই ব্রতরক্ষায় সফল হওয়ার কৃতিত্বও রাধারাণী দেবীকে দিয়েছেন।[১১৯] ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের পরও মতিলালের বার বার ব্রত থেকে পদস্খলন এবং তা জনিত আত্মদংশনের থেকে রাধারাণী দেবী কীভাবে মুক্ত করতেন, যৌন সম্ভোগে আকুল মতিলালকে বিরত করে তিনি কীভাবে ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য নিজেই বদ্ধপরিকর হয়ে নিজেদের মধ্যে দৈহিক দূরত্বকে সুনিশ্চিত করেছেন ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে মতিলাল রাধারাণীর প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতাকে ব্যক্ত করেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে গুরু অরবিন্দ ঘোষের সাথে মতিলালের মনোমালিন্য এবং ভুল বোঝাবুঝির পর যখন অরবিন্দ মতিলালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং গুরুর সাথে সম্পর্কবিচ্যুত হয়ে তিনি যখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, এই সময় তিনি লেখেন—

> বায়ুতাড়িত মেঘ যেমন শূন্যাকাশে ভাসিয়া চলে, আমি তেমনই অবধিহীন মহাশূন্যে ছুটিলাম সহায়হীন নিরালম্ব হইয়া। আমায় অনুসরণ করিতে চরণ রক্তাক্ত হইল মহাদেবীর; কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণাও তাঁহাকে বিমুখ করিল না চলার পথ হইতে। কুলবধূ এই দিন হইতে পথে বাহির হইলেন। যেখানে আমি সেখানে তিনি, কায়ার সহিত ছায়ার অনুসরণের ন্যায় তিনি আমার হইলেন সতত সঙ্গিনী। তাঁর বিচ্ছেদহীন সঙ্গ আমায় কত বার অতিষ্ঠ করিয়াছে; কিন্তু শ্রী অরবিন্দ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হওয়ার সন্ধিযুগে তিনিই আমার হইলেন পরম আশ্রয়। আমি যখনি আঘাত পাইয়া ফিরিয়া চাহিয়াছি, দেখিয়াছি তিনি স্থির, গম্ভীর দৃঢ় ওষ্ঠপুটে সকল যন্ত্রণা সংহরণ করিয়া আমার অগ্রগতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। মাঝে মাঝে তাঁর এই মহাদান উপেক্ষার চক্ষে দেখিতাম। কিন্তু আবার অনেক সময়ে কৃতজ্ঞতায় বুক আমার ভরিয়া উঠিত, আমি আপন মনে গলা চিরিয়া গাহিতাম – "দেবী আমার, সাধনা আমার, ধ্রুবজ্যোতিঃ মম জীবনে।"[১২০]

---

[১১৮] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী,* প্রথম খণ্ড, ১৯।

[১১৯] ঐ, ২৮-৩০, ৩৯।

[১২০] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী,* দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪, ৭৫।

রাধারাণীর সাথে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্কের এমন বহু বর্ণনা মতিলাল *নজীবনসঙ্গিনী*-তে তুলে ধরেছেন। এহেন নির্ভরশীলতার যে খুঁটিনাটি হাজারো কাহিনী তিনি লিখেছেন সেখানে মূলত মতিলালের আধ্যাত্মিক নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় একজন সহায়কের ভূমিকায় আমরা রাধারাণীকে পাই। এখানে উল্লেখ্য একদিকে যেমন এই আত্মজীবনীটি কৈশোর থেকে নানা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সাধারণ ব্যক্তি থেকে মতিলালের এক সংঘগুরু হয়ে ওঠার কাহিনী, তেমনি রাধারাণীর ক্ষেত্রেও একইভাবে অকালমৃত্যুর ঠিক আগে 'সংঘ মাতা' হয়ে ওঠার গল্প। আর এখানেই আমরা লক্ষ করব প্রথমে পরিবার এবং পরে সংঘ জীবনে রাধারাণী দেবীর অবস্থানকে তিনি নিজের অবস্থান থেকে পৃথক করছেন। মতিলাল কিন্তু কখনই রাধারাণীর কোনো আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা এখানে ব্যক্ত করেননি। বরং মতিলাল রাধারাণীকে বার বার তুলে ধরেছেন এক অশিক্ষিত কিন্তু বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত কিন্তু পতির নির্ধারিত অধ্যাত্মজীবনে বিনা প্রশ্নে এগিয়ে চলা এক পুরাতনপন্থী নারী হিসেবে। মতিলাল বার বারই এটি উল্লেখ করেছেন যে লৌকিক ধর্মচর্চায় আস্থাবান হলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার প্রতি কোনো প্রাথমিক প্রশিক্ষণ রাধারাণীর ছিল না। মতিলালও এটি অকপটে স্বীকার করেছেন, যে এই বিষয়ে রাধারাণী দেবীকে অবগত করার কোনো তাগিদও তিনি অনুভব করেননি। শুধুই তাঁর নির্দেশ করে দেওয়া পথে স্ত্রীকে এগোতে হয়েছে। তিনি এক জায়গায় লিখছেন—

> সঙ্কল্পের শক্তি আছে। সঙ্কল্প – ব্রহ্মচর্য্যের। আমি পুরুষ – নারীর দেবতা! আমি কায়া; নারী সেবিকা। আমারি ছায়ামূর্ত্তি সে। তাহাকে আমি এই সাধনায় দীক্ষা দিয়াছি-- এই গর্ব্ব ছিল; তাই অন্তর দুর্ব্বল হইলেও, তাহার কোনও অভিব্যক্তি তাঁহার নিকট না প্রকাশ পায়-- এদিকে আমি বিশেষ সতর্ক ছিলাম।...
>
> পত্নীর শিক্ষয়িত্রীর আসন আমি পছন্দ করিতাম না। পত্নীকে মনে করিতাম শিষ্যা, সেবিকা মাত্র। এই ভাব আমাদের কুলগত সংস্কার। বাহ্যত তাঁর শাসন সর্ব্বদা অস্বীকার করিতাম; কিন্তু অভ্যন্তরে তাঁর হিতকামী কষাঘাত অবজ্ঞা করা সাধ্যে কুলাত না-- তাঁহার শাসনে চিত্ত আমার সুসংস্কৃত হইত; শক্ত চরিত্র-গঠনের সুযোগ মিলিত। আত্মশ্লাঘার প্রলেপে স্বভাব পরিচ্ছন্ন করিয়া অনেক দিন পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম "সাধন তোমার কেমন চলছে।"[১২১]

উদ্ধৃত এই অংশে মতিলাল স্ত্রীকে যেভাবে গণ্য করতেন সে সম্পর্কে দুটি কিছু ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী ধারণা পেতে পারি। একজন ভাববাদী সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং উদাসীন ব্যক্তি হিসেবে মতিলাল সর্বদাই নিজেকে চিত্রিত করেছেন। আর তার ঠিক বিপরীত চরিত্রের অধিকারী হিসেবে রাধারাণী দেবীকে। এক্ষেত্রে

[১২১] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, প্রথম খণ্ড, ২৯৮-৩০০।

রাধারাণী শুধু বাস্তববুদ্ধি এবং দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে সংসার এবং আশ্রমিক জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তাকে নীরবে সামলাননি; মতিলাল যখন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনে অসমর্থ হয়েছেন, অরবিন্দের সাথে বিরোধের ফলে যখন তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন, পরকিয়া প্রেমে মতিলাল যখন জড়িয়ে পড়েছেন-- এইসব দাম্পত্য জটিলতা শক্ত মনে সামলেছেন রাধারাণী। ফলত এসকল বিষয়ে তাঁর জীবনে রাধারাণীর লৌহমানবীর ন্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং দৃঢ় মানসিকতাকে অস্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষালি অভিব্যক্তি এখানেই প্রকাশ পায় যখন তিনি আত্মজীবনীতে এই স্বীকারোক্তিটি করেন যে রাধারাণীর কাছে বিষয়টি স্বীকার করতে তিনি অস্বীকৃত ছিলেন। আর সাধারণভাবে স্ত্রীকে পতির সাথে একই আসনে বসিয়ে গ্রহণ করার বিষয়টি তাঁর চেতনায় এই জায়গা থেকেই অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এহেন মানসিকতা তাঁর মধ্যে যে ধরনের আত্মদংশন তৈরি করেছে, তার স্বীকারোক্তি (confession) হিসেবে আমরা এই আত্মজীবনীটিকে দেখতে পারি।

আধ্যাত্মিক দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে যে ধরনের বৈষম্যের ছবি আমরা মতিলালের রচনায় পেয়েছি, সেখানে কিন্তু নারীত্বে এক ভিন্ন গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এক অর্থে রাধারাণী দেবীই তাঁর লেখায় 'আদর্শ হিন্দু নারীর' আদিকল্প হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। পরের অংশে আমরা এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিজের আধ্যাত্মিক জীবনচর্চায় স্ত্রীকে সমগোত্রীয় হিসেবে বিবেচনা না করে তাঁর একটি ভিন্ন ভূমিকা এবং গুরুত্বকে তিনি এখানে চিহ্নিত করেছেন। আগেই আমরা দেখেছি মতিলালের ব্যক্তিগত জীবনে রাধারাণীর গুরুত্বকে তিনি এইভাবে তুলে ধরেছেন যেখানে নানা মানসিক অস্থিরতা বা বিধ্বস্ততার সময় তাঁর স্ত্রীই হয়েছেন তাঁর মূল আশ্রয়, মানসিক বল ও স্থিতাবস্থা ফিরে পাওয়ার প্রধান আধার। এখানে তিনি রাধারাণী দেবীকে মা-স্ত্রীর মতো মেয়েদের মাতৃসুলভ ভূমিকায় দেখেছেন। মতিলাল প্রবর্তক সঙ্ঘ আর্থিক অনটনের সময় তাঁকে তুলনা করেছেন অন্নপূর্ণা হিসেবে, মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামে এক হিন্দু নারীর অপহরণের ঘটনা শুনে তাঁরা যখন সেখানে উপস্থিত হন সেই সময় মুসলমান পুরুষের সামনে রাধারাণীর রুখে দাঁড়ানোর ঘটনা বর্ননা করতে গিয়ে তাঁকে তুলনা করা হয়েছে রণচণ্ডীর সাথে। আবার তাঁদের আশ্রমে অতিথি হয়ে গান্ধি, চিত্তরঞ্জন, পদ্মজা জৈন, রবীন্দ্রনাথ বা বিপিনচন্দ্র পালের আগমনের সময় তাঁর অতিথিপরায়ণতার প্রশংসা করার সময় তিনি উল্লিখিত হয়েছেন গৃহলক্ষ্মী হিসেবে। তাঁর অকালমৃত্যুর কিছু বছর আগে থেকে তাকে প্রবর্তক সঙ্ঘে অরাধনা করা হয়েছে 'সংঘ জননী' রূপে। এই বিষয়ে উল্লেখ্য মতিলাল রামকৃষ্ণ পরমহংসকে নিয়ে একটি পুস্তক রচনা করেন, যার শিরোনাম

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (১৯২৯)। বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মতিলাল লিখছেন, "আজও যে সকল নরনারী দিব্য জীবন ও সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া দিব্য সমাজ ও জাতি সৃষ্টি করার তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিতে চায়, তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার এই পুণ্য-চরিত-প্রসঙ্গ আলোচনা জীবনের দিগদর্শননির্ণয়ে বিন্দু পরিমাণেও সহায়তা করিতে পারে, সেই ভরসায় এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।"[১২২] উল্লেখযোগ্য, বইটি রামকৃষ্ণ এবং সারদা দেবীর দাম্পত্যজীবনকে আদর্শ আধ্যাত্মিক জীবনের পথনির্দেশক হিসেবে ঘোষণা করলেও এখানে মুখ্যত রামকৃষ্ণের সাধনজীবনের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। সারদা দেবীর প্রসঙ্গ মূলত এসেছে রামকৃষ্ণের সাধনায় সহায়ক 'আদর্শ স্ত্রীর' ভূমিকায়। এই প্রসঙ্গে মতিলাল লিখেছেন—

> এক বৎসরের অধিক কাল ঠাকুর শ্রীমার সহিত একত্র দক্ষিণেশ্বরে বাস করিলেন। এই সময় তিনি তাঁহাকে নিজের শয্যাসঙ্গিনী করিয়া লইয়াছিলেন। এই এক বৎসরের অধিক কাল, পরিণীতা ভার্য্যার সহিত একত্র এক শয্যায় রাত্রিযাপন করিয়া তিনি বুঝিলেন – তাঁর চেতনা উচ্চভূমি হইতে অবতরণ করিয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়ভোগাদিতে রত হইতে চাহে না। ... ঠাকুর নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন "ও (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে যদি আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে?..."[১২৩]

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মতিলাল নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই একই বক্তব্য বারে বারে উল্লেখ করেছেন যে রাধারাণী এমন ধর্মপরায়ণ পতিব্রতা না হলে তিনিও ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার পথ অনুসরণ করতে পারতেন না। ফলত মতিলালের আত্মজীবনীতে স্ত্রীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ব্যক্ত করতে গিয়ে দুটি স্তর আমরা লক্ষ করতে পারি। একদিকে তিনি জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে স্ত্রীর প্রতি গভীরভাবে নির্ভরশীল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই অসহায়তাকে তিনি বার বার যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে স্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ সামনে এসেছে। কিন্তু অপরদিকে তিনি স্ত্রীকে সর্বংসহা আদর্শ নারীর আসনে স্থাপন করেছেন তার মধ্য দিয়েই দাম্পত্য সম্পর্কে পুরুষালি নিয়ন্ত্রণশীল সত্তাটিকেও তিনি প্রকাশ করেছেন যেটিও এই আত্মজীবনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

[১২২] মতিলাল রায়, *শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন* (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ : চন্দননগর, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৩), প্রথম প্রকাশ ১৯২৯, ৬।

[১২৩] মতিলাল রায়, ঐ, ১০৯-১০।

নারী, ব্রহ্মচর্য এবং পৌরুষ প্রসঙ্গে

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে মতিলাল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে সংযুক্ত ছিলেন এবং অরবিন্দের আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অববিন্দের সাথে আধ্যাত্মিক সাধনায় বিরোধ তৈরি হওয়ার পর এবং বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরত্ব তৈরি করার পর দুইয়ের দশক থেকে তিনি গান্ধিবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন এবং গান্ধির সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। বিশেষ করে গান্ধির খাদি আন্দোলনে প্রবর্তক সংঘ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হয়। গান্ধির অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনেরও তিনি সমর্থক ছিলেন। যদিও পাশাপাশি হিন্দু মহাসভার রাজনীতির প্রতিও তাঁর সহানুভূতি এবং সংযোগ লক্ষ করা যায়।[১২৪] উল্লেখ্য, আত্মজীবনীতে নিজের অতীত যৌনজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এবং ব্রহ্মচর্যের মতো ব্রতচর্চার পর অতীত জীবন সম্পর্কে উচ্চ নৈতিক অবস্থান নেওয়ার যে প্রবণতা মতিলালের আত্মজীবনীতে লক্ষ করা যায়, সেখানে গান্ধির আত্মজীবনীর গভীর প্রভাব আমরা লক্ষ করতে পারি। এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে পুরুষদের লেখা বাংলা আত্মজীবনীতে এহেন প্রবণতা লক্ষ করা যায় না যেখানে পুরুষ লেখকরা নিজেদের যৌনজীবনচর্যা এবং পরীক্ষানিরীক্ষাকে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু গান্ধি নিজের আত্মজীবনীতে যেভাবে নিজের প্রথম জীবনের যৌনজীবন ও পরে ব্রহ্মচর্যচর্যা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার কথা প্রকাশ করেন[১২৫] তার পর থেকে আমরা বাংলা আত্মজীবনীতেও এর প্রতিফলন লক্ষ করতে পারি। যার উদাহরণ হিসেবে আমরা মতিলাল রায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা প্রকাশচন্দ্র রায়ের[১২৬] আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ করতে পারি। ফলত মতিলালের রচিত আত্মজীবনীর সাথে পৌরুষ কীভাবে সম্পর্কিত সেই বিষয়টির উদ্ঘাটন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পরে।

সম্প্রতি আত্মজীবনী, জাতীয়তাবাদ এবং পৌরুষ সম্পর্কে ফিলিপ হলডেনের করা আলোচনাটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেখান যেখানে উপনিবেশে কর্মরত পশ্চিমী আমলাদের আত্মজীবনীতে পুরুষালি শরীরের উল্লেখ একেবারে

---

[১২৪] দুইয়ের দশক থেকে হিন্দু মহাসভার সদস্যদের সাথে মতিলাল রায়ের যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাথে পদ্মজা জৈনের যোগাযোগ লক্ষ করা যায় এবং মহাসভার রাজনীতিতে তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ পায়। এই দশকে বিশেষত ১৯২৬-এর পাবনা দাঙ্গার পর তাঁর হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু রচনাও প্রকাশ পায় যেখানে হিন্দু আত্মপরিচয় সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে নিজের বক্তব্য উত্থাপন করেন। Chandannagore Inter at Prabartok Sangha, 273/1926, File No. 42-26, WBSA IB, মতিলাল রায়, *হিন্দুত্বের পুনরুত্থান* (কলকাতা: ১৩৪০); মতিলাল রায়, *হিন্দুর জাগরণ*, আনু. ১৯২৬ খ্রি.

[১২৫] Gandhi and Mahadev H Desai, *An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth*, (Ahmedabad: Navajivan Pub. House, 1996).

[১২৬] প্রকাশচন্দ্র রায়, *অঘোর-প্রকাশ* (বাকিপুর: অঘোর পরিবার, ১৯০৭ খ্রি.)।

অনুপস্থিত, সেখানে উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদী পুরুষদের লেখনীতে শরীর প্রায় কখনোই অনুপস্থিত থাকেনি। তাঁর মতে অন্দর ও বহিঃজগতের মাধ্যম হিসেবে তা ঔপনিবেশিকরণের চিহ্নক হিসেবে সামনে এসেছে। যদিও সমান্তরালভাবে তিনি আর একটি প্রক্রিয়াও নজরে আনেন। তিনি দেখান ক্ষুদ্র স্তরে হলেও পুরুষ শরীরের ভাবমূর্তিকে পুনরায় উজ্জ্বল করা এবং তাকে প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করার আশা প্রজ্বলিত করার মধ্য দিয়ে জাতির বিষয় (national subject) হিসেবে শরীরেরে সংস্কারের প্রসঙ্গ আত্মজীবনীগুলিতে উঠে এসেছে।[১২৭] আমরা গান্ধির আত্মজীবনীতে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেতে পারি যেখানে শরীর এবং তার চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টার কথা বারে বারে উঠে আসে যা উপনিবেশবাদী ক্ষমতার বিরুদ্ধে জাতির স্বকীয় সত্তাকে চর্চা করার প্রচেষ্টাকে ব্যক্ত করে। আশীষ নন্দী মনে করেন *অ্যান্ড্রোজেনিটির* উপর জোর দিয়ে গান্ধি পৌরুষের সম্পর্কে তৈরি হওয়া ঔপনিবেশিক প্রতর্ককে অস্বীকার করেছিলেন, পৌরুষের উপনিবেশবাদী যুক্তির মধ্যে প্রবেশই করেননি। ফলত তিনি ক্ষত্রিয় অধি-পৌরুষের (hyper-masculine) প্রতর্কের দিকে ঝুঁকে ঔপনিবেশিকতার ফাঁদে পা বাড়াননি। বরং নারী-পুরুষের বৈপরীত্য থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।[১২৮] ফিলিপ হলডেন যদিও আশীষ নান্দীর এই ব্যখ্যার সাথে সম্পূর্ণ সহমত নন। তিনি দেখান গান্ধি তাঁর আধুনিক 'experiment'-এর মাধ্যমে ভারতীয় 'পরম্পরা'কে যে পদ্ধতিতে বুঝতে চেয়েছেন, তার দরুন ঔপনিবেশিক অনুশাষণমূলক পৌরুষের ধারণা থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখান, যৌনকর্মীদের দেহকে গান্ধির আত্মজীবনীতে বার বার আত্মনিয়ন্ত্রণহীন শরীর হিসেবে দেখার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মতে গান্ধির এই রচনায় নারী সর্বদা পুরুষের শৃঙ্খলাহীন আকর্ষণের বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে যা উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক আত্মজীবনীর একটি পরিচিত বয়ান।[১২৯] গান্ধি যেভাবে নারী যৌনকর্মীদের দেহকে বার বার জাতির জন্য বিপজ্জনক হিসেবে দেখেছেন তার চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অশ্বিনী তাম্বের একটি পর্যবেক্ষণ এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন, গান্ধি জনপরিসরে দেহ রাজনীতিকে (body politic) যেভাবে উত্থাপন করেছেন, সেখানে তাঁর নিজের দেহ হয়ে উঠেছে আদর্শ দেহের পরিচায়ক। আর তাঁর জীবনচর্যা থেকে বৈপ্লবিকভাবে ভিন্ন যৌনকর্মীদের দেহের উল্লেখ একমাত্র এসেছে গান্ধির

---

[১২৭] Philip Holden, *Autobiography and Decolonization : Modernity, Masculinity, and the Nation-State* (Madison: University of Wisconsin Press, 2008), 37.

[১২৮] Nandy, *Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self under Colonialism*, 52-53.

[১২৯] Holden, *Autobiography and Decolonization : Modernity, Masculinity, and the Nation-State*, 78-79.

নিজের দেহকে আদর্শ প্রমাণিত করার উদ্দেশে। এই যৌনকর্মীদের দেহ যে নারী বিষয়ীতার (subjectivity) প্রতিনিধিত্ব করে তা গান্ধির বুনিয়াদি চিন্তাধারাকে নাকচ করায় তিনি অন্যথা যৌনবৃত্তিকে আলোচনার বিষয় হিসেবে স্বীকৃতিই দেননি।[১৩০]

উপরিউক্ত আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা মতিলালের রচনাগুলিকেও পাঠ করতে পারি। যদিও আলোচ্য পরিসরে গান্ধি আর মতিলালের আত্মজীবনীতে একটি পার্থক্য স্পষ্ট: যেখানে গান্ধির আত্মজীবনীতে কস্তুরবা-র অস্তিত্ব প্রায় অনুপস্থিত, সেখানে মতিলালের লেখায় রাধারাণী দেবী কেন্দ্রীয় স্থান জুড়ে আছেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হয় যে রাধারাণীর চরিত্রকে এক আদর্শ ভারতীয় নারী হিসেবে চিত্রিত করার প্রকল্প সেখানে কাজ করেছিল যা নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। মতিলালের ক্ষেত্রেও নারীদেহ এবং তার যৌনতা সর্বদা পুরুষের জন্য বিপজ্জনক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, কৈশোরকালেই তাঁর যৌনসম্ভোগের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের কারণ কলকাতায় পড়তে এসে তাঁরা একটি পতিতাপল্লিতে বাসা নিয়েছিলেন। সেই পল্লির মেয়েদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ ওঠাবসা তাঁর নৈতিক অধঃপতনের কারণ হয়েছিল।[১৩১] কম বয়সে নভেল পড়া, থিয়েটার দেখা, নিরক্ষর এই মহিলাদের হয়ে প্রেমপত্র লিখে দেওয়া ইত্যাদির ফলে তিনি বয়সের তুলনায় কিছুটা পূর্বেই মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেন এবং তাঁর বাল্যবিবাহের কারণই এটি। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি বিষয়কে উল্লেখ করেছেন যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খুব কম বয়স থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি আকর্ষণ তাঁকে বাংলার অন্ত্যজ ধর্মসাধনা মার্গ, যেমন বাউল, তন্ত্র, সহজিয়া, ভৈরবী চক্র ইত্যাদি সম্প্রদায়ের প্রতি আকর্ষণ করেছিল। এই সাধনমার্গগুলির প্রতি এক সাধারণ শ্রদ্ধাবোধ থাকার সাথে সাথে তিনি তাঁদের যৌনজীবন সম্পর্কে বার বার একটি নৈতিক অবস্থান নিয়েছেন। বিশেষ করে এই সাধন পদ্ধতিগুলির সাম্প্রতিকতম রূপ সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি সমালোচনাত্মক হয়েছেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছে অতীতের সাধনপদ্ধতি থেকে বর্তমান সাধনপন্থায় অধঃপতন ঘটেছে। এই দেহতাত্ত্বিক ধর্মীয় মার্গগুলিতে অবাঞ্ছিত যৌনাচার প্রবেশ করে তার মহিমাকে ম্লান করেছে।[১৩২] কিন্তু এদের মধ্য দিয়েই

---

[১৩০] Ashwini Tambe, “Gandhi’s ‘Fallen’ Sisters: Difference and the National Body Politic,” *Social Scientist* 37, no. 1/2 (2009): 33.

[131] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, প্রথম খণ্ড, ৩-৪।

[132] মতিলাল রায়, ঐ, ৩৯-৪০, ৪২।

যেহেতু তাঁর ধর্মসাধনার সূচনা, তাই তাঁর অস্তিত্বকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকারও করতে পারেননি। ফলত বারে বারে এদের সংস্কারের প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করেছেন।

তবে জনপরিসর, বিশেষ করে রাজনীতি এবং অন্যান্য জীবিকায় মেয়েদের প্রবেশ তাঁর মধ্যে সবচেয়ে অসুবিধার উদ্রেক করেছে, যা তিনি নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন। দুইয়ের দশক থেকে পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে মেয়েরা যেভাবে রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করেন এবং স্বাধীন জীবিকায় অনুপ্রবেশ করেন তা প্রচলিত নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী গার্হস্থ্যের ধারণায় যে আঘাত তৈরি করে সেখান থেকে তাঁর আলোচনায় প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রকট হয়। তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী সেখানে প্রতিভাত হন 'আদর্শ হিন্দু নারী' হিসেবে যাঁর বিপরীতে তিনি দাঁড়া করিয়েছেন সমকালীন মেয়েদের। স্ত্রীর স্মৃতিচারণা করে তিনি লিখছেন, "জীবনের সে পুণ্যস্মৃতি আজও হৃদয়ে আমার শক্তি ও সাহস দেয়; কিন্তু অন্তর আমার জাগ্রৎ ও জীবন্ত থাক, আমি যে আজ বড় নিঃসহায়! সমগ্রা পৃথিবী তাঁর তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গে বিগতযৌবনা হতশ্রী হইয়াছে বলিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ... আজ এই নারী-প্রগতির যুগে সতীশক্তি পতির উন্নতি-ভিত্তি বলিয়া কেহ কি স্বীকার করিবে? পুরুষের বীর্য্য-মূলে যে নারীর সতীত্ব, এ কথা কেহ মানিয়া লইবে?"[১৩৩] মেয়েদের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করে তিনি *নারী মঙ্গল* গ্রন্থে লিখছেন—

> যাঁহারা বর্তমান সমাজে বিদুষী, তাঁদের মত যদি অসংখ্য নারী চরিত্র গড়ে ওঠে, জাতির অভাব যা, তা যে পুরণ হবে, সে তো দেখ্‌তে পাই না। নারীকে যে আজ পর্য্যন্ত তপস্বিনী মূর্ত্তিতে দেখ্‌তে পেলুম না, পুরুষের মত, নারী তো "ঘরেতো আর থাক্‌বো না শ্যাম, সার করেছি তোমারই নাম" বলে মুক্ত আকাশতলে এসে দাঁড়াতে পার্‌লে না! যারা এসেছেন, তাদের মধ্যে চৈতন্য, শঙ্কর, বুদ্ধর সেই বিদ্যুৎ, সে তেজ নাই, কাজেই খোলস অঙ্গে জড়িয়া হুঙ্কার দিলে কি হবে, নারী জাতির গুপ্ত কুণ্ডলিনী তো ইহাতে জাগ্‌বে না! ঠিক কোন মন্ত্রে নারী শিক্ষার মহাযজ্ঞ আরম্ভ কর্‌তে হবে, তার বিচারের দিন এসেছে, আজ কেবল এই পর্য্যন্ত বলে শেষ কর্‌তে চাই, পুরুষের শিক্ষা সাধনার সঙ্গে নারীর কেবল একটি স্থানে মিল আছে, তদ্ব্যাতীত অবশিষ্ট অনন্ত সাধনার সবখানিই নারীকে স্বতন্ত্র ভাবেই আয়ত্ত করতে হবে, পুরুষের শিক্ষাধারা ধরে চল্‌লে, তাদের স্বভাব স্বধর্ম্ম নষ্ট হবে, নারীর জীবনের সার্থকতা ফুটিয়ে তুল্‌তে পারবে না, জাতির অধঃপতন আরও চরম সীমায় গিয়ে ক্রমশঃ পৌছবে, মরণ ভিন্ন তখন আর গতি থাক্‌বে না।[১৩৪]

---

[১৩৩] ঐ, ৩০৫।

[১৩৪] মতিলাল রায়, *নারীমঙ্গল*, ১৩৩২, ৫-৬।

ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়ে পুরুষ শরীরকে নিয়মানুবর্তিতা এবং অনুশাসনে আনার প্রকল্পে মেয়েদের গুরুত্বকে অতএব মতিলাল বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। এখানে মেয়েদের ভূমিকা মূলত সহায়িকার। ফলত মেয়েদের এই ভূমিকায় যোগ্য করে তোলার জন্য তিনি তাদের পৃথক প্রশিক্ষণের প্রতি জোর দিয়েছেন। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাতে পৌঁছনোর পদ্ধতি যে পুরুষদের আধ্যাত্মিক যাত্রার থেকে পৃথক এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি হিন্দু নারীর পৃথক জীবন প্রণালী চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে তিনি পুরুষের পাশাপাশি নারীর পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন *নারী মন্দির* প্রতিষ্ঠা করে। উদ্ধৃত অংশে মেয়েদের যে স্বতন্ত্র শিক্ষার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যেই এই *নারী মন্দির*-এর নির্মাণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর স্ত্রীর পরে যাঁদের নিয়ে তিনি সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে *জীবনসঙ্গিনী*-তে লিখেছেন তাঁরা হলেন এই আশ্রমিক মেয়েরা। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ একটি ব্রহ্মচর্য আশ্রম হিসেবে গড়ে ওঠায় মতিলাল আশ্রমিক পুরুষ সদস্যদের সন্ন্যাসী হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে কিছু আশ্রমিক পুরুষ আশ্রমের মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হলে তিনি বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করেন।[১৩৫] নতুন নিয়ম অনুযায়ী কিছু আশ্রমিকদের মধ্যে বিবাহের বিধান স্বীকৃত হয়। কিন্তু সেই বিবাহের শর্ত চির ব্রহ্মচর্য ব্রতধারণ যাকে তাঁরা 'আধ্যাত্মিক বিবাহ' বলে চিহ্নিত করেন।[১৩৬] আশ্রমের মেয়েদের এখানে এক আদর্শ হিন্দু নারী হিসেবে গড়ার পাঠ দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। মতিলাল এখানে কিন্তু হিন্দু মেয়েদের নিরক্ষর, পর্দানশিন রাখার চরম বিরোধী ছিলেন।[১৩৭] আশ্রমের মেয়েদের কঠিন অধ্যবসায়ের মধ্যে রেখে শিক্ষিত, ব্যক্তিত্ববান করে তোলার কর্মসূচী নেন তিনি। পাশাপাশি এটিও উল্লেখ্য, ধর্মশিক্ষা ছিল এইক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষার প্রধান ভিত্তি। এই ধরনের পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁদের স্বামীর আদর্শ ধর্মসঙ্গিনী করার প্রয়াস নেওয়া হয় যা তাঁদের স্বামীর ব্রহ্মচর্যচর্চার সহায়ক হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তুলবে। ফলত এই প্রশিক্ষণ হয়ে দাঁড়ায় স্বামীর আধ্যাত্মিক সাধনার সহায়ক ব্রহ্মচর্য ব্রতটি যাতে সাফল্য পায় তার জন্য আদর্শ সহধর্মিণী গড়ার প্রকল্প। যেমনভাবে জীবৎকালে রাধারাণী দেবী মতিলালের ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। *নারী মঙ্গল* গ্রন্থে তিনি লিখছেন, "পুরুষের সাধ্যে যতদূর কুলিয়েছে তারা করেছে, নারী তুমি তাদের পার্শ্বে এসে দাঁড়ালে না! পুরুষ অবজ্ঞা করেছে, তোমরা তা মেনে নিলে কেন, তোমাদের দিব্য অধিকার পুরুষের উপেক্ষায় নাকচ হতে দিবে কেন? নারীবিহীন পুরুষের

---

[১৩৫] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৫।

[১৩৬] মতিলাল রায়, "প্রবর্ত্তক আশ্রমে পরিণয়," *প্রবর্ত্তক*, আষাঢ়, ১৩৩২, ১৪২-১৪৫।

[১৩৭] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৪, ১৮৮।

সাধনা কঠোর উৎকট হলেও, সব যে ব্যর্থ হয়েছে - তোমাদের সহায়তা না পেয়ে। কেবলই কি তোমরা সংসারের সঙ্গিনী? সাধনার উত্তর সাধিকা মহিমাময়ী নারী, তোমার স্নেহস্পর্শ না পেয়ে পুরুষের এতখানি ত্যাগ যে ব্যর্থ হয়।"[১৩৮] তাই মেয়েদের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা। এই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মতিলাল *জীবনসঙ্গিনী*-তে লিখছেন,

> সঙ্ঘে একদল ছেলেদের চরিত্র গড়ার আয়োজনের সঙ্গে নারী-চরিত্র গড়ার স্বপ্নও রূপ লইতেছিল। আমার ধারণা – দেশ ও জাতি যদি কোন দিন বড় হয়, মেয়েদেরই তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে বড় করিতে হইবে। তাহারা উত্তম মাতা হইবে, যে মাতার পীযূষস্তন্যপানে সন্তান পাইবে সুকঠোর চরিত্রবল। সন্তান কি রাষ্ট্র, কি সমাজ-জীবন, কি বাণিজ্যক্ষেত্র – ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিক্ষায় সর্ব্বত্র জয়ী হইবে মাতৃপ্রসাদে। ... আমাদের দেশের মেয়েরা বীর্য্যশালিনী হইবে, রাষ্ট্রবিদ্য-বিশারদা হইবে, অর্থবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিবে। মানুষের সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণানুশীলনের যদি তাহাদের সুযোগ দেওয়া না হয়, সন্তানের রক্তধারায় এই দুর্জ্জয় স্বভাব স্থান পাইতে পারে না। এই জন্য আমি মেয়েদের লইয়া সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি আলোচনা করিতাম। ... মেয়েদের শরীরচর্চার দিকেও আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদের যথারীতি ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।[১৩৯]

উল্লেখ্য, মতিলাল তাঁর ব্রহ্মচর্যেকে আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক, নিজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী এবং নিজের সাথে সত্যর সম্বন্ধ তৈরিতে সক্ষম পৌরুষ অর্জনের উপায় হিসেবে দেখেছেন। তিনি লিখছেন, "আমার লক্ষ্য ও আদর্শ বিরাট্। সে পথে পৌরুষ ছিল। ব্রহ্মচর্য্যসাধনে মনে জোর পাইতাম, কর্ম্মে অসাধারণ উৎসাহ পাইতাম। নিঃসঙ্গ সাধনের প্রয়োজনটা বেশ বড় হইয়াই আমাকে অস্বাভাবিক জীবনপথে সাহস দিত, উৎসাহ দিত। আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িলে, কর্মের আসক্তি ভাঙ্গা মন যুড়িয়া দিত।"[১৪০] কিন্তু এই পৌরুষের কোনো একটি নির্দিষ্ট যাত্রাপথ তিনি নির্ধারণ করেননি। ভারতীয় পরম্পরায় ব্রহ্মচর্যের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে তিনি *ব্রহ্মচর্য্য* নামক গ্রন্থে লিখছেন, "ব্রহ্মচারীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হইত। যাহাদিগকে আচার্য্য সাংসারিক কল্যাণ ও উন্নতি-কামনায় অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদিগিকে অধ্যায়ন শেষ করাইয়া গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া দেওয়া হইত; এবং যাহারা নিবৃত্তি-মার্গের অধিকারী বিবেচিত হইত, তাহাদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত দীক্ষা দেওয়া হইত। ভোগ ও ত্যাগের সংঘর্ষ ছিল না। ভাগবৎ-কাম-সিদ্ধ জীবন-যন্ত্রগুলি সামঞ্জস্যের সুরে ভারতকে মুখরিত করিয়া তুলিত। কি গৃহী, কি মোক্ষপ্রার্থী, সকলের চরত্রেই একটা মৌলিক

---

[১৩৮] মতিলাল রায়, *নারীমঙ্গল*, ৩০।

[১৩৯] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ১০৬।

[১৪০] মতিলাল রায়, *জীবনসঙ্গিনী*, প্রথম খণ্ড, ২৯৬।

শিক্ষাপ্রথায় গড়িয়া উঠার সুযোগ পাইত। মানুষ হিংসা-বিরহিত হইত, সত্যাশ্রয়ী ও নির্লোভ হইত, ইন্দ্রিয়জয়ী হইত, পর-দ্রব্যে লোভ রাখিত না।"[১৪১] ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য এখানে ভিন্ন, কিন্তু তার মধ্যে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি চিহ্নিত করেছেন, তা হল আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা। কিন্তু এটুকু উল্লেখ করলে মতিলালের ব্রহ্মচর্যের আদর্শের সার কথা বলা হয় না। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পাবনায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার পর *প্রবর্তক* পত্রিকায় মতিলাল একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য পূর্ববঙ্গের মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলিতে 'ক্রমহ্রাসমান' হিন্দুদের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগুরু জেলাগুলিতে জনমত তৈরি করা। জাতিভেদ প্রথার প্রতি কড়া সমালোচনার মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দু যুবকদের মধ্যে নতুন শক্তি ও উদ্যম তৈরি করতে লেখেন, "ব্রহ্মচারী, নবদীক্ষিত, নব উপবীতধারী, তরুণ তনয় সম কনকবর্ণ নব বিপ্র – যাঁর কণ্ঠে নূতন উদ্গান উঠিবে, যিনি আচণ্ডালে দীক্ষা দিতে অবতীর্ণ হইবেন, যাঁর পাঞ্চজন্যে অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইবে, বাংলার এই নতুন শক্তির আবির্ভাব কালে তোমরা প্রস্তুত হও – আশ্বস্ত হও, সংস্কার-মুক্ত হইয়া জীবকে শিবের আসনে উঠাইয়া লওয়ার মহাযজ্ঞে হোতার আসন পরিগ্রহ কর, হিন্দুত্বের বিজয়-প্রভাব ধরায় স্বর্গ-রাজ্যের সূচনা করিবে!"[১৪২]

উপসংহার

জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ এবং তার চর্চার যে ধারার কথা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করলাম সেখানে আমরা যেমন পুরুষদের প্রতি সাংগঠনিক অনুশাসন এবং পিতৃতান্ত্রিক বিধিগুলিকে বিপ্লবীদের আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে দেখলাম; পাশাপাশি পুরুষদের কখনোই অনুভূতিহীন বা তা প্রকাশে অক্ষম হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়নি। বরং অনুভূতি এখানে পুরুষদের মধ্যে এবং নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ফলত বিশ শতকের সূচনায় উদীয়মান বিপ্লবী রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনুশাসন, অন্তরঙ্গতা ও অনুভূতির আন্তঃসম্পর্কটিকে উদ্ঘাটনের দ্বারা পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে কীভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে সেই বিষয়টিই সমগ্র অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে উঠে এসেছিল।

---

[১৪১] মতিলাল রায়, *ব্রহ্মচর্য*, ১৯৩৪, ২০।

[১৪২] ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় "পাবনা" শিরোনামে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। কলকাতা বড়বাজার হিন্দু সভা "হিন্দুর জাগরণ" শিরোনামে এই প্রবন্ধটি ইস্তেহার আকারে পুনরায় প্রকাশ করে। এই অংশটি "হিন্দুর জাগরণ" ইস্তেহার থেকে উদ্ধৃত। মতিলাল রায়, *হিন্দুর জাগরণ*, ৬।

এখানে আমরা যেমন আমাদের সন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটি বিপ্লবী পরিসরে কী প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল থাকে তা বোঝার চেষ্টা করেছি এবং একটি অনুশাসনমূলক নীতি হিসেবে ব্রহ্মচর্য পৌরুষের কী ধরনের পরিভাষা তৈরি করে তাকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেখেছি যে এক্ষেত্রে তা পৌরুষের একটি আদিকল্প তৈরির ভূমিকায় থেকেছে। এটি এইক্ষেত্রে পৌরুষের একটি ক্রোমোচ্চ আধিপত্যবাদী অবধারণা তৈরি করে। যদিও এই পৌরুষ হিন্দু সাম্প্রদায়িক পরিসরের মতো বর্জনমূলক (exclusionary) চরিত্র নেয়নি। পাশাপাশি আমরা সামগ্রিকভাবে এই পরিসরে অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতির প্রশ্নটিকে উত্থাপন করে দেখেছি সেটি যেমন এই ধরনের অনুশাসনমূলক পৌরুষের আদিকল্পটিকে নির্মাণের ক্ষেত্রে মাধ্যমের ভূমিকায় থেকেছে, পাশাপাশি তেমনি বৃহত্তর অর্থে পুরুষদের মধ্যে অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে নানা ধরনের অনুভূতি ব্যক্ত হওয়ার পরিসর তৈরি হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে এখানে পুনরায় অগ্রভাগে আনা যায় পৌরুষের সাথে অনুভূতি এবং ক্ষমতার সহাবস্থানের প্রসঙ্গটি, যা বিপ্লবী এবং তাঁদের চারপাশের পরিসর নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করলাম। অনুভূতি এবং আবেগ সম্পর্কে সারা আহমেদের পূর্বে উল্লিখিত আলোচনাটি এখানে আর একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আহমেদ দেখিয়েছেন সার্বিকভাবে মানবীয় অনুভুতিকে কোনোভাবে ভালো বা খারাপ বলা যায় না। ডেকার্তের আলোচনা থেকে উদাহরণ নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কোনো বস্তুকে মানুষ খারাপ বা ভালো বলে ঘৃণা করে না বা ভালোবাসে না। বরং ঘৃণা অথবা ভালোবাসা নির্ভর করে বস্তুটি তার কাছে ক্ষতিকর অথবা উপকারী হিসেবে গণ্য হচ্ছে কিনা তার উপর। এখান থেকেই সারা আহমেদ সিদ্ধান্তে এসেছেন, এই ক্ষতিকারক বা উপকারিতার বোধটি তৈরি হয় একাধারে সেই বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বের সামাজিক মূল্যায়ন এবং শরীর তাকে কীভাবে অনুভব করছে তার উপর।[১৪৩] ফলত আহমেদ শারীরিক অনুভূতির পাশাপাশি যে বিষয়টিকে একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন তা হল কোনো বিষয় সম্পর্কে তৈরি হওয়া সামাজিক ধারণা বা বোধ যেটি অবশ্যই সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত ও ইতিহাসনির্দিষ্ট।

ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট এই পরিসরে নির্মিত জীবনাদর্শ এবং চর্চিত জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা পৌরুষের যে অবয়বটিকে নির্মিত ও বিবর্তিত হতে দেখলাম তা কতটা আধিপত্যবাদী সেই প্রশ্নটা খুব শুরু থেকেই আমাদের আলোচনায় কেন্দ্রীয়ভাবে আলোচিত হয়েছে। আমরা পুরো অধ্যায় জুড়ে এই প্রক্রিয়াটিই অনুধাবন করেছি যে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অভ্যন্তরে এক বিশেষ ধরনের সামাজিকতার বোধ বা ধারণার চর্চা হয়েছে যা

---

[১৪৩] Ahamed, *Cultural Politics of Emotion*, 6-7.

সহজাতভাবে লিঙ্গায়িত। ফলত এই নিরিখেই আমাদের অনুধাবন করতে হবে কীভাবে আলোচ্য পরিসরে এক বিশেষ ধরনের সম-সামাজিকতার বিকাশ হয়েছে যা একাধারে পুরুষালি বন্ধন ও পৌরুষচর্চার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। আমরা দেখেছি যেমন একদিকে পুরুষরা একে অপরের সাথে থাকাকালীন নানা ধরনের আবেগ আদানপ্রদান করেছেন। তেমনই আবার তার মধ্য দিয়ে পুরুষালি বন্ধনও বিকশিত হয়েছে। একদিকে যেমন সেখানে বিশেষ এক ধরনের সম-রোমান্টিক আবেগ প্রকাশ পাওয়ার অবকাশ হয়েছে যা সেই অর্থে কোনো উচ্চতর ক্রমনির্ভর এবং আধিপত্যবাদী প্রাতিষ্ঠানিক ঘেরাটোপের বাইরের বিষয়। কিন্তু তার পাশাপাশি গভীর বিসমনিয়মাত্বক পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকেও তৈরি করা হয়েছে, ফলে সামাজিকতায় পুরুষদের মধ্যে প্রজন্মগত উচ্চতর ক্রমকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা বজায় থেকেছে। এর পাশাপাশি দ্বিতীয় বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষপ্রধান সম-সামাজিক পরিবেশে সম্পর্কে নৈকট্য ও অনুভূতির ধরন এবং বিসমকামী দাম্পত্যের মধ্যেকার নৈকট্যের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যকেও এখানে চিহ্নিত করা যায়। এখানে আমরা মতিলাল রায় এবং তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবীর প্রসঙ্গ এনে এই দিকটি আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছি যে পৌরুষের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি আবেগ প্রকাশের আবকাশ থাকলেও ভিন্ন স্তরে স্ত্রী তথা গার্হস্থ্য সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার উচ্চতম ক্রমকে বজায় রাখার প্রক্রিয়াও পাশাপাশি কাজ করেছে। এইক্ষেত্রে যে বিষয়টির ইঙ্গিত আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ করতে পারি তা হল দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা হিন্দু আত্মপরিচয় নির্মাণের সাথে আধিপত্যকামী পৌরুষের যে সংযোগটি লক্ষ করেছিলাম মতিলাল রায়ের মধ্যেও আমরা তার ছায়া দেখে থাকি। যদিও সামগ্রিকভাবে আধিপত্যকামী পৌরুষ, ব্রহ্মচর্যের মতো অনুশাসন এবং পুরুষদের মধ্যেকার নৈকট্য এবং আবেগ এইক্ষেত্রে পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে অনেকটা জটিল আঙ্গিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে যার আভাস আমরা এই একই সময়পর্বে নির্মীয়মান হিন্দু সাম্প্রদায়িক পৌরুষের বয়ানে একেবারেই লক্ষ করি না। সর্বপরি গার্হস্থ্য এবং তার বাইরে পৌরুষের এই বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়টিও বোধগম্য হয়েছে যে জাতীয়তাবাদ এবং লিঙ্গের প্রসঙ্গটি প্রেক্ষিত নির্ভর বিষয়, যার অর্থ পরিসর অনুযায়ী বদলাতে থেকেছে। ফলত অন্তত বিপ্লবী পৌরুষের পরিসরে এই দ্বৈতের মধ্যদিয়ে লিঙ্গায়িত সম্পর্ককে অনুধাবণ করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

ধাতুদৌর্বল্য থেকে ব্রহ্মচর্য :

শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষ ও যৌনতা প্রসঙ্গে, ১৮৮০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

সূচনা

> (যখন) পঞ্চবিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে যখন স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা ছিলনা, তখন বাঙ্গালী জাতি যে এত রোগপ্রবণ হইত না, -- তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন বাল্য বিবাহ -- বাঙ্গালী সমাজে প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু যথাযোগ্য কাল উপস্থিত না হইলে স্ত্রী পুরুষের মিলিত হইবার উপায় ছিল না। বিবাহের উদ্দেশ্য কাম -- প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সম্পাদন নহে। স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভই যৌন সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া তখনকার দিনে সকলে জানিত। এখন সে প্রথা যে দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, দেশের দুর্গতির তাহাই আমরা সর্ব্ব প্রধান কারণ বলিয়া মনে করি।
>
> ব্রহ্মচর্য্য বলিলে থান কাপড় পড়িতে হইবে, আতপ চাউল খাইতে হইবে, মাছ মাংস ত্যাগ করিতে হইবে-- এমন অর্থ করিলে চলিবে না। বীর্য্যরক্ষাই ব্রহ্মচর্য্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু আমরা এ অর্থ ভুলিয়াছি।...আগে পাঠদ্দশায় গুরুগৃহে অবস্থিতির যেরূপ প্রথা ছিল, সেইরূপ শিক্ষণীর বিষয় গুলিও ছিল ধর্ম্মমূলক। এখন সে গুরু গৃহও নাই সে ধর্ম্মমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা নাই। ফলে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই সঙ্গদোষে অনেক বালকই অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্র ব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী বালকের স্বাস্থ্য এমনই করিয়া যে নষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহার জন্য দেশের মনীষীরা চিন্তা করিতেছেন কি?
>
> "মরণং বিন্দু পাতেন
> জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"
>
> বিন্দু অর্থাৎ শুক্রের ব্যয়ই মরণের কারণ এবং শুক্র সংরক্ষণই দীর্ঘায়ু লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। বাঙ্গালী বালককে এ কথা শিখাইবে কে? যতদিন লজ্জা ছাড়িয়া দেশের কোমলমতি বালকদিগকে এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে -- ততদিন যে আমাদের সমাজের মঙ্গল নাই -- ইহা অবিসংবাদিত সত্য।
>
> বহুকালাবধি চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিয়া যতদূর বুঝিয়াছি -- তাহাতে বাল্যের এইরূপ অযথা অত্যাচারের ফলেই বহু সংখ্যক বাঙ্গালীকে জীবন্মৃত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার পরিণতি বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু। কলিকাতায় যক্ষ্মা বা থাইসিসে যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহার মূলে বাল্য জীবনে অস্বাভাবিক শুক্র ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর ম্যালেরিয়া -- কালাজ্বরের মূলেও এই পাপ নিহিত। বাঙ্গালীর শিশু মৃত্যুর কারণও আমরা এই শ্রেণীর অযথা শুক্রব্যয়ী পুরুষদিগকে দায়ী করিতে পারি।[১]

ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম পর্বে বাঙ্গলায় দেশীয় স্বাস্থ্য বিশারদরা জনস্বাস্থ্য নিয়ে যে আলোচনার পরিসরকে বিস্তৃত করেন সেখানে প্রজননগত স্বাস্থ্যর প্রসঙ্গটি বেশ স্পষ্ট ভাবে উত্থাপিত হতে দেখা যায়। উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে এই আলোচনাগুলির মধ্যে স্থায়ী ভাবে যে তিনটি বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ করাযায় তা হল মূলত মহামারী এবং অন্যান্য রোগে বাঙালির মৃত্যুর প্রসঙ্গ, বাঙালি

[১] সত্যচরণ সেনগুপ্ত, "ব্রহ্মচর্য্য," *আয়ুর্বেদ,* বৈশাখ, ১৩৩০, ২১৪-১৫।

পুরুষের শারীরিক দুর্বলতার অবধারণা ও তার কারণ নির্ধারণের প্রচেষ্টা এবং সুস্থ-সবল হিন্দু সন্তান, বিশেষ করে পুত্রসন্তান প্রজননকে সুনিশ্চিত করার প্রশ্ন। উপরে উদ্ধৃত অংশটি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে *আয়ুর্বেদ* পত্রিকায় কবিরাজ সত্যচরণ সেনগুপ্ত রচিত "ব্রহ্মচর্য্য" শিরোনামের প্রবন্ধের কিয়দংশ, যেখানে এই তিনটি বিষয়ই উঠে এসেছে। সর্বোপরি প্রবন্ধে সত্যচরণ বাঙালি পুরুষের প্রজনন ক্ষমতাকে নানাভাবে প্রশ্ন করেছেন, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন বাঙালির সুস্থ-সবল সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাকে। আলোচ্য সময়পর্বে কবিরাজ সত্যচরণ সেনগুপ্তের মতো অসংখ্য স্বাস্থ্যজ্ঞরা এই বিষয়ে প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনা করেন বা বহু বিতর্কে অংশ নেন যার কেন্দ্রীয় বিষয় বাঙালির মৃত্যু, পুরুষের শারীরিক দুর্বলতা এবং তাদের প্রজননগত স্বাস্থ্য। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হল এই যে জনস্বাস্থ্য নিয়ে এই ধরনের আলোচনায় মতামতগত নানা বৈচিত্র্য থাকলেও কেবলমাত্র প্রজননকেন্দ্রিক যৌনাচারকেই যৌনতার একমাত্র প্রকাশ হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি স্বাস্থ্যজ্ঞরা যে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান হয়নি।[২] আমরা বর্তমান অধ্যায়ে চিকিৎসকদের বয়ানে উঠে আসা উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের পারস্পারিক সম্পর্ক উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন করব কীভাবে ঔপনিবেশিক কালপর্বে চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চার মধ্য দিয়ে প্রজননই যৌনতার যথার্থ ও একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে মান্য হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙালি পুরুষশরীরের যে চিকিৎসাকরণ ঘটে তা কীভাবে একটি প্রজননশীল পৌরুষের ধারণার নির্মাণ করে সেই প্রশ্নটিকেও আমরা এই অধ্যায়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করব। এই দুটি প্রশ্নকে সামনে রেখে আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে চিকিৎসামূলক বয়ানে, যথা সমকালীন চিকিৎসক মহলে ব্রহ্মচর্যর ধারণাটি কী অর্থে উত্থাপিত হয় তা দেখব। মূলত প্রজননশীল পৌরুষ এবং পুরুষ-যৌনতার ধারণাটি উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে কীভাবে বাঙালি চিকিৎসক মহলে উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠায় ব্রহ্মচর্যর ধারণাটি সেখানে কীভাবে বাঙালি পৌরুষকে 'উজ্জীবিত' করে তোলার সহায়ক হয়ে ওঠে, এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রীয় বয়ানে ব্রহ্মচর্য একটি বিশেষ অর্থ নিয়ে হাজির হয় তাই আমরা এখানে আলোচনা করব। এ-প্রশ্নগুলিকে উত্থাপনের সময় আমরা আমাদের সন্দর্ভের বৃহত্তর প্রশ্নটির সাথে কথোপকথনে থাকব যে আলোচ্য সময়পর্বে ব্রহ্মচর্য কীভাবে পৌরুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষ্য তৈরি করেছে।

---

[২] এই ক্ষেত্রে সুজাতা মুখার্জীর সাম্প্রতিক গবেষণা ব্যতিক্রমী যেখানে তিনি ঔপনিবেশিক বাংলায় মেয়েদের প্রজননগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন কীভাবে চিকিৎসকদের বয়ানে প্রজননই মেয়েদের যৌনাচারের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে মান্যতা পায়। Sujata Mukherjee, *Gender, Medicine, and Society in Colonial India: Women's Health Care in Nineteenth and Early Twentieth-Century Bengal* (Delhi: Oxford University Press, 2017).

এই বিষয়ে আলোচনাটিকে উপস্থাপন করতে গিয়ে আমরা পাঁচটি পর্বে মূল আলোচনাকে বিভাজিত করেছি। প্রথম পর্যায়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব উনিশ শতকের অন্তিমপর্ব থেকে জনসংখ্যা এবং মৃত্যুর প্রসঙ্গটি বাঙালি স্বাস্থ্যবিদদের আলোচনায় যেভাবে উত্থাপিত হতে থাকে তার সাথে সমকালীন জনস্বাস্থ্যের সম্পর্ক কীরূপ। এর মধ্য দিয়ে আমরা মূলত জনস্বাস্থ্য এবং মহামারী সম্পর্কে বাঙালি স্বাস্থ্যজ্ঞরা উনিশ শতকের আটের দশক থেকে নানা পত্রিকায় লেখালিখি শুরু করেন তার প্রেক্ষিতটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। বোঝার চেষ্টা করব প্রজননগত স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা সম্প্রসারিত হওয়ার পিছনে কী ধরনের তাগিদ কাজ করছিল।

দ্বিতীয় অংশে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যজ্ঞদের আলোচনায় বাঙালি পুরুষের শরীরের দুর্বলতার ধারণা কীভাবে উত্থাপিত হয় সেই প্রক্রিয়াটি নিয়ে আলোচনা করব। দেখার চেষ্টা করব এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে বাঙালি হিন্দু পুরুষের শরীরের অবধারণা তৈরি হয়েছে। তৃতীয় অংশে আমরা আলোকপাত করব কীভাবে বাঙালির শারীরিক দুর্বলতার ধারণা পুরুষের প্রজননক্ষমতা এবং পৌরুষের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়। সমকালীন চিকিৎসার জগতে ধাতুদৌর্বল্যের যে রেটোরিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে তা বাঙালি পুরুষদের প্রজননের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন তৈরি করে। চতুর্থ পর্বে আমরা আলোকপাত করব বাঙালি ছাত্র-কিশোর-যুব সম্প্রদায় সম্পর্কে উঠে আসা নানা সামাজিক মূল্যায়নের উপর। এখানে উত্থাপিত হবে কীভাবে সেই প্রজন্মের মানুষদের যৌনাচারকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যৌনতার এক নির্দিষ্ট সংজ্ঞাকে সমকালীল স্বাস্থ্যবিদরা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ছেলেদের বিবাহের বয়সের নিম্নসীমা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাগুলি কীভাবে সামনে আসতে থাকে সেই বিষয়ে আলোচনা সম্প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে আমরা পঞ্চম পর্বে প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষের প্রতি ঝোঁকের প্রক্রিয়াটিকে সামনে আনব।

বাংলায় জনসংখ্যা এবং জনস্বাস্থ্য – রোগ, মহামারী এবং স্বাস্থ্যের অবধারণা

ঔপনিবেশিক শাসনের স্বাস্থ্যনীতি এবং তার বাস্তবায়ন নিয়ে,[৩] অথবা উপনিবেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভারতীয় দেহের ঔপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিগত কিছু দশকে

---

৩ Kabita Ray, *History of Public Health : Colonial Bengal, 1921-1947,* (Calcutta: K.P. Bagchi & Co., 1998); Sandeep Sinha, *Public Health Policy and the Indian Public: Bengal, 1850-1920* (Calcutta: Vision Publications, 1998).

বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৪] তুলনায় ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যনীতির প্রতি ভারতীয় জনতার প্রতিক্রিয়া নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বিরল।[৫] যদিও উনিশ শতকের আটের দশক থেকে জাতীয়তাবাদী প্রতর্কে স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটি যেভাবে উত্থাপিত হয়েছে তা কিছু ঐতিহাসিকের নজরে এসেছে।[৬] কিন্তু এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী বয়ানে দেশীয় জনতার স্বাস্থ্য নিয়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগের যে প্রকাশ চোখে পড়ে তার সঙ্গে দেশীয় জনতার স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থার সম্পর্কটি কোথাও আলোচিত হয়নি। ফলত কোন প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমপর্বে জাতীয়তাবাদী প্রতর্কে স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত হল সেই বিষয়টি আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। বর্তমান অংশে আমরা ঔপনিবেশিক শাসনের শেষপর্বে বাংলার জনসংখ্যা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। দেখার চেষ্টা করব এই বিষয়ে আলোচনার পরিসর বিস্তৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে বাংলার মানুষের প্রজননগত স্বাস্থ্য ও সর্বোপরি সার্বিক স্বাস্থ্য নিয়ে স্বাস্থ্যজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেন।

ব্রিটিশ ভারতে ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের অবনতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা সবচেয়ে বেশি আলোকপাত করেছেন আঞ্চলিক রোগ, মহামারী ও অতিমারীর ওপর। এর মধ্যে ইরা ক্লেইনের আকর্ষণীয় গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্লেইন এক্ষেত্রে মৃত্যুর হারের (mortality rate) নিখুঁত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ১৮৯১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে ভারতীয়দের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি থাকে, যার সূচনা তার দুই দশক আগে থেকেই লক্ষ করা যায়।[৭] এক্ষেত্রে তিনি ম্যালেরিয়া, ইনফুয়েঞ্জা, প্লেগ, ডায়ারিয়া, কলেরা, টিউবার কিউলোসিসের মতো রোগের মাহামারীকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি দেখান ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতীয় জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কীভাবে এই রোগগুলি দ্রুত বিস্তার

---

৪ David Arnold, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India* (Delhi: Oxford University Press, 1994).

৫ মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা হলেও বাংলার প্রেক্ষিতে তেমন আলোচনা লক্ষ করা যায় না। যদিও অরবিন্দ সামন্ত ঔপনিবেশিক বাংলায় বিবর্ধমান ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন কীভাবে ভারতীয় জনগণ ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে মহামরীর বিস্তারকে সংযুক্ত করে দেখেছে। Arabinda Samanta, *Living with Epidemics in Colonial Bengal 1818–1945* (London: Routledge, 2018); এছাড়া চিত্তব্রত পালিতও এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। Chittabrata Palit, "Popular Response to Epidemics in Colonial Bengal," *Indian Journal of History of Science* 43, no. 2 (2008): 277–83.

৬ Satadru Sen, "Health, Race and Family in Colonial Bengal," in *Children, Childhood and Youth in the British World*, ed. Shirleene Robinson, Simon Sleight (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016), 144–60.

৭ Ira Klein, "Population Growth and Mortality Part I: The Climacteric of Death," *Indian Economic and Social History Review* 26, no. 4 (1989), 389.

লাভ করে এবং দারিদ্র্যপীড়িত ভারতীয় জনতার জীবনহরণ করে।[৮] ক্লেইন উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে ভারতীয়দের মৃত্যুর যে বিস্তৃত পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন তা থেকে এই কালপর্বের দারিদ্র্য, রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার সাধারণ সম্পর্কটি অনুধাবন করা সম্ভব হয়। ব্রিটিশ উন্নয়ণমূলক নীতি, যেমন রেলপথ এবং সড়কপথ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদীবাঁধ তৈরি ইত্যাদির ফলে কীভাবে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই বাংলায় ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করে এবং বাংলার পশ্চিম অংশ জনশূন্য হতে শুরু করে সেই প্রসঙ্গটি অরবিন্দ সামন্ত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।[৯] ইরা ক্লেইন এবং অববিন্দ সামন্ত এই দুজনের আলোচনা থেকে প্রতীয়মন হয় আলোচ্য সময়ে ম্যালেরিয়ার মহামারীতে সর্বাধিক মানুষের মৃত্যু হয়।[১০] এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষয় হয় কলেরায়।[১১] যে সকল ঐতিহাসিকরা ব্রিটিশ রাজের জনস্বাস্থ্যনীতি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন তাঁরা দেখিয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র শুধুই সৈন্যদলের এবং ভারতে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।[১২] ভারতীয় জনতার মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার ঘটনার পর থেকে তাঁরা এই বিষয়গুলির

---

৮ ইরা ক্লেইন জলবায়ুগত পরিবর্তনের সাথে রোগের বিস্তারের সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের প্রবন্ধে। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী উনিশ শতকে জলবায়ুর পরিবর্তন, যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রসারের ফলে রোগ দ্রুত ছড়াতে থাকে। এই রোগগুলির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধক্ষমতা না থাকায় উনিশ শতকে মানুষের মৃত্যু ব্যাপক হারে হতে থাকে। কিন্তু বিশ শতকে, মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থাকে জনসংখ্যায় হ্রাস রোধ হয়, কারণ এই সময়ের মধ্যে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। Ira Klein, "Population Growth and Mortality in British India Part II: The Demographic Revolution," *Indian Economic and Social History Review* 27, no. 1 (1990)

৯ Arabinda Samanta, *Malarial Fever in Colonial Bengal, 1820-1939: Social History of an Epidemic* (Kolkata: Farma KLM Private Limited, 2002), 33-58, 72-73. ইরা ক্লেইনও রেল ও সড়কের বিস্তার ও নদীবাঁধের বিষয়টি বাংলায় ম্যালেরিয়ার বিস্তারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও তিনি এর বৃহত্তর কারণ হিসেবে জলবায়ুগত পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন। Ira Klein, "Malaria And Mortality in Bengal, 1840-1921," *The Indian Economic & Social History Review* 9, no. 2 (1972).

১০ Ira Klein, "Population Growth and Mortality Part I: The Climacteric of Death," 399; Samanta, *Malarial Fever in Colonial Bengal, 1820-1939: Social History of an Epidemic*, 33–58, 72–73.

১১ Ira Klein, "Imperialism, Ecology and Disease: Cholera in India, 1850-1950," *The Indian Economic and Social History Review* 31, no. 4 (1994): 492.

১২ রাধিকা রামসুব্বান দেখান ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক চিকিৎসাব্যবস্থা 'enclavist' চরিত্রের ছিল। মূলত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সৈনিকদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হতো, ভারতীয়রা সেখানে গুরুত্ব পেতেন না। Radhika Ramasubban, "Imperial Health in British India, 1857–1900," in *Disease, Medicine and Empire: Perspectives on Western Medicine and the Experience of European Expansion* (London: Routledge, 1988), 38–60. ডেভিড আর্নল্ড এবং মার্ক হ্যারিসন এই আলোচনাটিকে আরও বিস্তৃত করেন। David Arnold, *Colonizing the Body,* 94. মার্ক হ্যারিসন দেখান ব্রিটিশ শাসনের এই নীতি অন্তত ১৮৮০ পর্যন্ত বহাল ছিল, তারপর এখানে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভারতীয় প্রজার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সরকার তারপর কিছুটা গুরুত্ব দেয়। তাঁর মতে এই গুরুত্ববৃদ্ধির পিছনেও ব্রিটিশ স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং ডাক্তারদের মধ্যে ভারতীয় প্রজাদের জন্য কল্যাণকর উপযোগবাদী (Utilitarian) তাগিদ বিশেষভাবে কাজ করেছিল। মার্ক হ্যারিসনের এই আলোচনার জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, Mark Harrison, "Towards a Sanitary Utopia? Professional Visions and Public Health in India, 1880-1914," *South Asia Research* 10, no. 1 (1990): 67 and passim. লেখকের ব্রিটিশ

কারণ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। যদিও সেক্ষেত্রে অনেক সময়েই তাঁরা ভারতীয়দের জীবনযাত্রা, রোগ প্রতিরোধের প্রতি অনীহাকে রোগ প্রসারের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৩] এমনকী বহু ব্রিটিশ ডাক্তার এবং স্যানিটারি কমিশনররা ভারত বিষয়ক গবেষণা এবং প্রতিবেদনে ভারতীয় জলবায়ু এবং তার বাসিন্দাদের ইউরোপের সাথে তুলনা করার মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের বিশেষভাবে চিত্রিত করেন। যেমন মার্ক হ্যারিসন দেখিয়েছেন যে ভারতে শরীর ব্যবচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে ভারতে আগত ব্রিটিশ ডাক্তাররা ভারতীয় শরীরের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে শুরু করেন। ইউরোপীয় দেহের থেকে এশীয় দেহের এই ভিন্নতার কারণকে তাঁরা অনেক সময় ভারতীয় ক্রান্তীয় (tropical) জলবায়ু বলে ঠাওরাতে থাকেন। ফলত ভারতীয় ক্রান্তীয় জলবায়ু থেকে তাঁদের দৈহিক গঠন-- এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে অপরের (other) ধারণা তৈরি হয়। যদিও তিনি এটিও দেখান, এই বর্ণবাদ (race) নির্ভর ধারণাগুলি সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক কালপর্ব জুড়ে যে একইরকম ছিল তা নয়, জ্ঞানচর্চায় পরিবর্তন এবং উপনিবেশের পরিস্থিতিতে রদবদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতেও নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।[১৪]

ব্রিটিশ জ্ঞানচর্চায় বর্ণবাদী (racist) চেতনার সাথে ভারতীয় স্বাস্থ্য এবং শরীরের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ডেভিড আর্নল্ডের একটি পর্যবেক্ষণ আমাদের আলোচনার এই অংশকে অনেকটা অধিক্রম (overlap) করে। ফলত আর্নল্ডের অনুসন্ধানটি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। তিনি বাংলায় ম্যালেরিয়ার বিস্তার প্রসঙ্গে উনিশ শতকের শেষপর্যায় থেকে বিশ শতকের শুরুর দিকের ব্রিটিশ গবেষণা এবং স্বাস্থ্য প্রতিবেদনগুলির পাঠগত বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে আলোচ্য পর্বে বাঙালির শারীরিক দুর্বলতা সম্পর্কে ব্রিটিশ বয়ানে যে গতে বাঁধা ধারণাগুলি তৈরি হচ্ছিল তার উপস্থিতি এই ধরনের প্রতিবেদনেও লক্ষ করা যায়। আর্নল্ডের মতে ম্যালেরিয়া বাঙালি জাতির শরীরিক দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে, এই ধরনের ঔপনিবেশিক

ভারতের স্বাস্থ্যনীতির বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Mark Harrison, *Public Health in British India: Anglo-Indian Preventive Medicine 1859–1914* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

[১৩] অরবিন্দ সামন্ত দেখিয়েছেন, বাংলার অভ্যন্তরে ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্রিটিশ আধিকারিকরা এই দিকগুলির উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। তুলনায় প্রথমদিকে ব্রিটিশ উন্নয়নমূলক নীতিগুলিকে ম্যালেরিয়া প্রসারের কারণ হিসেবে স্বীকার করতে গররাজি ছিলেন। Samanta, *Malarial Fever in Colonial Bengal, 1820-1939: Social History of an Epidemic*. 34.

[১৪] মার্ক হ্যারিসন এই বিষয়টি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে খুব সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। এডওয়ার্ড সায়িদের তত্ত্বায়নকে তিনি সমালোচনা করে দেখান যে ঔপনিবেশীক চিকিৎসাশাস্ত্রের বয়ানে ভারতীয়দের অপর হিসেবে দেখার প্রক্রিয়া সর্বদা নঞর্থক এবং স্থায়ী থাকেনি। পরিস্থিতি ও পরিবেশভেদে তাতেও নানা রদবদল এসেছে। Mark Harrison, “Differences of Degree: Representations of India in British Medical Topography, 1820-c. 1870,” *Medical History* 44, no. S22 (2000): 68.

ধারণা এবং জ্ঞান বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সরাসরি প্রভাবিত করে। এই ধারণার প্রতিফলন আমরা বাঙালি চিকিৎসক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও দেখতে পাই, যেখান থেকে বঙ্গদেশে 'ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতি'র মতো সাম্প্রদায়িক উদ্বেগটি প্রকট হতে থাকে।[১৫] এই অধ্যায়ের আলোচনায় আর্নল্ডের এই বিশ্লেষণকে কিছুটা সম্প্রসারিত করতে চাইব। যদিও এক্ষেত্রে আমরা দেখব বাঙালির স্বাস্থ্যের ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক জ্ঞান-ক্ষমতা (power-knowledge) সর্বদা সরাসরি দেশীয় বাঙালি স্বাস্থ্যজ্ঞদের স্বাস্থ্যের অবধারণাকে সূচিত করেনি। বহু বিদগ্ধ স্বাস্থ্যবিদ ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যনীতিকে সমালোচনা করেছেন, ক্রান্তীয় রোগের প্রতি সর্বদা ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যজ্ঞদের মতো গতে বাঁধা মতামত রাখেননি। ফলত তুলনায় অনেকটা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদী স্বাস্থ্যচেতনার নির্মাণ হতে দেখা গেছে।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শুধু ম্যালেরিয়া নয় এর পাশাপাশি কলেরা, কালা জ্বর এবং কিছু ক্ষেত্রে গুটিবসন্ত এবং আমাশার মতো রোগগুলিও বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই প্রকট হয়ে ওঠে এবং এই শতকে বিভিন্ন পৃথক পৃথক পর্বে তা মহামারীর আকার নেয়।[১৬] যদিও উনিশ শতকের প্রথম পর্বে এই ধরনের মহামারীগুলি বাংলার সাধারণ জনজীবনকে কতটা ব্যাহত করেছিল সেই বিষয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের তৈরি করা পরিসংখ্যান তুলনায় অনেক কম মাত্রায় তৈরি হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এসে স্যানিটারি কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করে যেখানে স্বাস্থ্য নিয়ে বিস্তৃত তথ্য জনপরিসরে উন্মুক্ত হয়। প্রথম স্যানিটারি কমিশনের প্রতিবেদনে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় মহামারীর বিস্তারিত যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় তার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী প্রতিবেদনগুলিতে তথ্য সংযোজিত হতে দেখা যায়।[১৭] জেলাস্তরে অঞ্চলভেদে জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে তথ্য, মৃত্যুর কারণ নিয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান, জেলা এবং এলাকা ভেদে রোগ, বিশেষত মহামারীর তারতম্যের বিস্তারিত হিসেব যে তথ্য হাজির করে তা থেকে দেশের স্বাস্থ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ বাড়ে। অন্যদিকে ১৮৯১ সাল থেকে দশ বছর অন্তর জনগণনার

---

[১৫] David Arnold, "'An Ancient Race Outworn': Malaria and Race in Colonial India, 1860–1930," in *Race, Science and Medicine, 1700–1960*, ed. Waltraud Ernst and Bernard Harris (London: Routledge, 1999), 123–43.

[১৬] অরবিন্দ সামন্ত, পুনম বালা প্রমুখ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। Samanta, *Malarial Fever in Colonial Bengal, 1820-1939: Social History of an Epidemic;* Poonam Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective* (New Delhi: Sage Publications, 1991).

[১৭] দ্রষ্টব্য, First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal, for 1864-65, Calcutta: 1866; First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal, for 1870-71 (Calcutta: 1872).

একটি সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণের পর থেকে সার্বিকভাবে বাংলার লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির একটি নিয়মানুগ পরিসংখ্যান উপলব্ধ হয়। প্রথম আদমসুমারীর প্রতিবেদনেই বাংলার প্রতিটি জেলা ধরে মহামারীর বিস্তার এবং তাতে মানুষের মৃত্যু ও ভয়াবহতার বিস্তারিত বর্ণনা স্থান পেয়েছে এবং পরের দশকের প্রতিবেদনগুলিতে সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে।[১৮] ফলত উনিশ শতকের অন্তিমপর্বে এসে জনসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যু এবং রোগগ্রস্ততা সম্পর্কে দেশীয় বিদ্বৎসমাজের কাছে স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্যের বৃহৎ পরিসর উন্মুক্ত হয়। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে দেশীয় জনতার একাংশের মধ্যে আলোচনার পরিসর বিস্তৃত হয়।

যদিও পার্থ দত্ত মনে করেন ঔপনিবেশিক শাসনে জনস্বাস্থ্য পরিষেবার গণ্ডি খুব সীমিত ছিল এবং এর গুরুত্ব অন্যত্র নিহিত। যেমন ব্রিটিশ শাসনের যাথার্থ্য প্রমাণ করা, তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, শাসনের পশ্চাতের দর্শন তৈরি এবং তার প্রতি প্রজার ঐক্যমত বানানোর প্রক্রিয়ায় তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর মতে জনস্বাস্থ্য এবং জনকল্যাণের এই প্রতীতি (notion) ভারতীয় এলিটদের আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁরা এই নিয়ম-নীতিগুলিকে আত্মস্থ করেন, যা থেকে উনিশ শতকে প্রায় অধরা ধারণার উৎপত্তি হয়, যাকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা বলে চিহ্নিত করা হয়।[১৯] পার্থ দত্ত জনস্বাস্থ্য এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মধ্যের এই সম্পর্কটি যেভাবে দেখেছেন তার গুরুত্ব অস্বীকার না করলেও পাশাপাশি এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এর মধ্য দিয়ে জনস্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্যের মতো বিষয়টি জনপরিসরের প্রতর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলত এই বিষয়টি সর্বদা ভারতীয়দের কাছে অধরা থেকেছে তা নয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে বিশেষত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের পর থেকে তা ভারতীয়দের নাগালে এসেছে। আর তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই পর্বে সভাসমিতির রাজনীতির উত্থানের পর থেকে এই বিষয়গুলিতে সীমিত হলেও কিছু সংখ্যক ভারতীয়দের জনমতও তৈরি হতে শুরু করে। এই জনমত এবং জ্ঞানগুলি সর্বদা ঔপনিবেশিক শাসনের যথার্থতার যুক্তিক্রমের সাথে সহমত জ্ঞাপন করেছে তা নয়। বরং ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মধ্য দিয়ে বাহিত জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমন অনেক ক্ষেত্র উন্মুক্ত হতে দেখা যায় যেখানে দেশীয় স্বাস্থ্যজ্ঞরা কখনো ঔপনিবেশিক শাসনের গতে বাঁধা ধারণাগুলিকে

---

[১৮] C.J. O'Donnell, *Census of India, 1891, Volume III: The Lower Provinces of Bengal: The Report*, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1893, 2, 35, 64, 88, 92; O'Malley, *Census of India, 1911*, vol. 1, part I, 69.

[১৯] Partho Datta, "Ranald Martin's Medical Topography (1837): The Emergence of Public Health in Calcutta," in *The Social History of Health and Medicine in Colonial India*, ed. Biswamoy Pati and Mark Harrison (New Year: Routledge, 2009), 16-17.

নানাভাবে প্রশ্ন করেন, কখনো বা ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় জনতার স্বাস্থ্যের অবনতিকে চিহ্নিত করেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় ক্রান্তীয় জলবায়ু এবং মহামারী সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতিবেদন এবং নানাবিধ জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করা যায়, যেগুলি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে যে শুধু ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্য নীতিই বিবর্ধমান জাতীয়তাবাদী বিদ্বৎসমাজের কাছে সমালোচিত হয়েছে তা নয়, প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে ঔপনিবেশিক জ্ঞানজাত সিদ্ধান্তগুলিও।

যেমন মহামারীর প্রসঙ্গে তৈরি হওয়া বিতর্কগুলির দিকে নজর দিই তাহলে দেখতে পাব এই বিষয়টি সম্পর্কে ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এমন অনেক বিষয় উঠে এসেছে যা পূর্বোক্ত ব্রিটিশ চিকিৎসক ও আমলাদের সিদ্ধান্তকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এই প্রসঙ্গে ম্যালেরিয়া জাত মহামারীর কথা উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকের ছয়ের দশকে নিম্নবঙ্গের বৃহৎ অংশে এই মহামারীর ব্যাপক বিস্তারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে কমিশন তৈরি করা হয় তার একমাত্র ভারতীয় সদস্য হিসেবে মনোনিত হন দিগম্বর মিত্র।[20] এই অনুসন্ধানে দ্বিগম্বর মিত্র ম্যালেরিয়ার বিস্তারে যে কারণটিকে আলাদাভাবে উত্থাপন করেন, তা হল মূলত নিম্নবঙ্গের বিস্তৃত অংশে সড়ক এবং রেলপথের বিস্তারের প্রক্রিয়া। তিনি দেখান এই সড়ক এবং রেলপথের জন্য যে বিস্তৃত উঁচু বাঁধ তৈরি করা হয়, তার ফলে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক জলপ্রবাহের পথ ব্যাহত হয়। ফলত ম্যালেরিয়ার প্রসার ত্বরান্বিত হয়। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অন্যতম বাহক এই সড়ক এবং রেলপথের নির্দ্বিধায় বিস্তারকে যেখানে দিগম্বর মিত্র গ্রামবাংলায় ম্যালেরিয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উত্থাপন করেন, সেখানে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার এবং আমলারা ক্রমাগত দায়ী করতে থাকেন এই অঞ্চলের খালবিলের অস্তিত্ব এবং গ্রামাঞ্চলে বসতি অঞ্চলের চারপাশে উদ্ভিদের ব্যাপক উপস্থিতিকে। ফলত এই সরকারি প্রতিবেদনে দিগম্বর মিত্র যে কারণটিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিলেন সেই রেল ও সড়কপথের সংস্কার তথা বহু *কালভার্ট* তৈরি করে জল সরবরাহের স্বাভাবিক গতিকে পুনরায় বহাল করার পরামার্শ গৃহীত না হয়ে খালবিল বোজানো এবং বিশেষ করে বনস্পতির ব্যাপক উচ্ছেদের প্রতি কমিশন গুরুত্ব দেয়। এই ধরনের জনস্বাস্থ্যনীতির প্রতি হতাশ হয়ে দ্বিগম্বর মিত্র *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চোদ্দোটির মতো প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলি ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে দেশীয় বিদ্বৎসমাজের অসন্তোষের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন শুধু নয়, ঔপনিবেশিক বয়ানে ক্রান্তীয় অঞ্চল সম্পর্কে তৈরি হওয়া গতে বাঁধা জ্ঞানের সমালোচনাত্মক

---

২০ *Report of the Epidemic Commission*, 1864.

দলিলও বটে।[২১] এখানে লেখক প্রথমত বাংলার ভূপ্রকৃতি সর্বত্র জলাকীর্ণ এই ধারণাটি নস্যাৎ করছেন। সেই সঙ্গে তিনি যে বিষয়টা বিশেষ করে উল্লেখ করছেন সেটা হল এই যে বাংলার যে অংশ জলাকীর্ণ হয়েছে তার কারণ গ্রামের চরিত্রে খুঁজলে চলবে না, বরং খুঁজতে হবে গ্রামগুলি এমন চরিত্রের হয়েছে কেন সেই বিষয়টিতে।[২২]

ম্যালেরিয়া সম্পর্কে দিগম্বর মিত্রের মতামত ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এবং দেশীয় বিদ্বৎসমাজের মধ্যেকার বিবর্ধমান বিতর্ক ও সমালোচনার একটি উদাহরণ মাত্র, যেখান থেকে অনুধাবন করা সম্ভব যে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনার পরিসর ভারতীয়দের মধ্যে উন্মুক্ত হতে শুরু করে যেখানে ভারতীয়রা শুধুই ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যনীতিকে নির্বিবাদে গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসনের সম্পর্কে প্রজার ঐক্যমত বানানোর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন না। একই সাথে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে নিজেদের ধারণাকেও সম্প্রসারিত করেন, এই বিষয়ে জনপরিসরে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই ছাপা বইপত্র এবং পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বহু পত্রিকা প্রকাশ হতে দেখি যেখানে দেশীয় জনতার স্বাস্থ্যের নানা দিক নিয়ে অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের স্বাস্থ্যনীতি, মহামারীর বিস্তার, এই বিষয়ে জনসাধারণকে সূচিত করার প্রয়াস ইত্যাদি যেমন এই পত্রিকাগুলির আলোচ্য তালিকায় স্থান পায়, তেমন নানা ধরনের রোগ, তার নিরাময়ের পন্থা, দেশীয় নানা স্বাস্থ্যবিধি, তার গ্রহণযোগ্যতা অথবা সীমাবদ্ধতা নিয়েও আলোচনা সম্প্রসারিত হয়। পাশাপাশি গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক-ধর্মীয় প্রথার সাথে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সম্পর্ক, স্বাস্থ্যবিধি পালনে মেয়েদের ভূমিকা থেকে শুরু করে ধাত্রীবিদ্যার সংস্কার, শিশুপালন, বালক-বালিকার স্বাস্থ্যবিধি, বিবাহ, বিবাহের বয়স, যৌনাচারের মতো অগুনতি বিষয়ে এই পত্রিকাগুলি প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, পত্র ইত্যাদি প্রকাশ করে যার মূল লেখক ছিলেন চিকিৎসা পেশার

---

[২১] দিগম্বর মিত্র বাংলার জলবায়ু সম্পর্কে ঔপনিবেশিক গৎবাঁধা ধারণাকে সমালোচনা করে লিখছেন, "The whole of the Gangetic delta may not inaptly be described as one swampy expanse, interspersed, at varying intervals, with villages several feet higher than the surrounding country. The surrounding country is inundated more or less during the rains; but not so the majority of the villages, the sites for which, were practicable, have been so selected as to be beyond the reach of ordinary annual inundation. As a matter, of course, therefore, the periodical rains, unless obstructed in their course, run off from the surface of the villages in the direction of their slope to the adjoining low country." Digambar Mitter, *Epidemic Fever in Bengal: Reprinted from Hindoo Patriot*, (Calcutta: 1876), 8.

[২২] তিনি লিখছেন, "This abnormal condition is not to be looked for in the marshy character of the surrounding country, which is very present, but in that of the villages themselves, the drainage of which, has been interfered with" Digambar Mitter, 9.

সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা। পাশাপাশি বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, শিক্ষক এবং অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও এই বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। এর মধ্যে উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যথাক্রমে *চিকিৎসা সম্মিলনী* (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশনা শুরু), *স্বাস্থ্য* (১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশনা শুরু), ভিষক্-দর্পণ(১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশনা শুরু), *স্বাস্থ্য সমাচার* (১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশনা শুরু), *আয়ুর্বেদ* (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশনা শুরু)-এর মতো দীর্ঘস্থায়ী, প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বাংলা পত্রিকাগুলির কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রচুর রচনা প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া এই প্রেক্ষিতে চিকিৎসক(আনুমানিক ১৮৯০ খ্রি. থেকে প্রকাশিত হয়), , চিকিৎসক ও সমালোচক(আনুমানিক ১৮৯৫ খ্রি. থেকে প্রকাশিত হয়), ধন্বন্তরী(১৯১৯ খ্রীঃ থেকে প্রকাশনা শুরু হয়) মতো বহু ক্ষণস্থায়ী পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যায়। আমরা পরবর্তী পর্বগুলিতে দেখব এই ধরনের অসংখ্য পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থের মধ্য দিয়ে কীভাবে বাঙালির শারীরিক দুর্বলতা এবং প্রজননগত স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জনপরিসরের আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্থানে চলে আসে।

জাতীয়তাবাদী স্বাস্থ্যচেতনা, দুর্বল স্বাস্থ্যের ধারণা, বর্ণবিজ্ঞান এবং বাঙালি শরীর

ইতিপূর্বে আমরা দেখলাম ঔপনিবেশিক আমলে স্বাস্থ্য নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি চিন্তাবিদ এবং স্বাস্থ্যজ্ঞদের মধ্যে তৈরি হওয়া মতামত, অনুযোগ ও অভিযোগ যেভাবে নথিভুক্ত হতে থাকে তা বিবিধভাবে স্বাস্থ্য নিয়ে দেশীয় জনগণের মধ্যে আলোচনার পরিসরকে বিস্তৃত করে। ফলত ঐতিহাসিকরা উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বিদ্বৎসমাজের মধ্যে বাঙালির স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনার পরিসর উন্মুক্ত হতে দেখেছেন যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক আমলের জনস্বাস্থ্যের চেহারা অথবা ঔপনিবেশিক শাসনের জনস্বাস্থ্যনীতি নিয়ে তৈরি হওয়া বিবিধ বিতর্ক ও আলোচনার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। এই প্রবণতাগুলি একভাবে যেমন জনপরিসরে স্বাস্থ্য নিয়ে তৈরি হতে থাকা আলোচনার প্রক্রিয়াকে দর্শায়, পাশাপাশি তেমনি আর একটি দিক এই আলোচনায় প্রকট হয়ে ওঠে। তা হল এই জাতীয়তাবাদী স্বাস্থ্যভাবনার মধ্যে বাঙালির শরীরের একটি বিশেষ লিঙ্গায়িত অবধারণার নির্মাণ।

বাঙালির স্বাস্থ্যচেতনার সাথে শারীরিকভাবে দুর্বল বাঙালির তত্ত্ব কীভাবে সংযুক্ত ছিল তার বিচিত্র প্রকাশ আমরা আলোচ্য পর্বে লক্ষ করতে পারি। প্রাথমিকভাবে সেই আলোচনাটি শুরু করা যায় আলোচ্য সময়ের রোগ ও

মহামারীগুলির আলোকে যে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ *চিকিৎসা সম্মিলনী* পত্রিকার তিনজন সম্পাদক বাঙালির দৈহিক দুর্বলতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখছেন, "এইরূপ অপকৃষ্টতার সমুদয় কারণ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে যথা (১) নৈসর্গিক বা স্থানীয় ও (২) ক্রম-লব্ধ দূষিত প্রথা বা প্রকৃতিমূলক। যে সকল কারণ স্বানীয়, তাহার নিবারণ করা কঠিন, কেননা কোনও দেশে বাস করিতে গেলে সেই দেশের জল বায়ু উত্তাপ বা শীতলতার অধীন হইয়া থাকিতে হয় বলিয়া ক্রমে সেই দেশোপযোগী পরিবর্তন শরীরে ঘটে। যেমন ম্যালেরিয়া, গোদ, গলগণ্ড প্রভৃতি রোগপ্রধান দেশে বাস করিতে গেলে সেই সকল রোগাত্মক বীজ ক্রমে রক্ত ও মজ্জাগত হয়তঃ শরীরকে যথোচিত মতে সবল ও বীর্য্যশালী হইতে দেয় না।"[২৩] *চিকিৎসা সম্মিলনী*-র ডাক্তার সম্পাদক ত্রয়ী ক্রান্তীয় রোগের সঙ্গে বাঙালির শারীরিক দুর্বলতার ধারণাকে যেভাবে যুক্ত করছেন তা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী বয়ানের একটি *ট্রোপ*, যা পরবর্তী দশকগুলিতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা ইতিপূর্বেই দিগম্বর মিত্রের বয়ান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখেছি যে তিনি ম্যালেরিয়াকে ক্রান্তীয় অঞ্চলের চিরাচরিত রোগ হিসেবে দেখতে অস্বীকার করেছিলেন। বাঙালির শারীরিক দুর্বলতা এবং মহামারীর সম্পর্ক অনুধাবন করতে গিয়ে এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় *স্বাস্থ্য* পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্তর প্রতিবেদনে। দুর্গাদাস উত্তর ভারত এবং ব্রিটেনের জলবায়ুর সাথে বাংলার তুলনা করে দেখান বাঙালিদের তুলনায় উত্তর ভারতীয় অথবা ব্রিটেনের বাসিন্দা অথবা সেখানে কিছু প্রজন্ম ধরে প্রবাসী বাঙালিরা অনেক বলশালী। কারণ সেই এলাকাগুলি ম্যালেরিয়াপ্রবণ নয়। কিন্তু বঙ্গের বাঙালি দুর্বল কারণ তাঁর ভাষায়, "...আমরা যে ম্যালেরিয়া বিষে জর জর। জননীজঠরে অবস্থানকাল হইতে আমাদের দেহে ঐ বিষের সংস্রব আইসে, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র জলবায়ু ও মৃত্তিকা সাহায্যে তাহা বৃদ্ধি পায়। আমরা তাহার কোনও প্রতিকার না করিয়া মানসিক শ্রমে সময় কাটাই, এইজন্য যৌবনেই জরা উপস্থিত হয়। দুই ক্রোশ পথ হাঁটিতে হাঁপাইয়া উঠি, দুই সের জিনিষের ভার বহিতে গলদ্ঘর্ম্ম হই, শারীরিক দৌর্ব্বল্যের আর অধিক পরিচয় কি দিব।"[২৪] কিন্তু পাশাপাশি একই সাথে লেখক উল্লেখ করেন, "বাংলাদেশে চিরদিনই ম্যালেরিয়া আছে, তবে ৩০/৩৫ বৎসর বেশি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এদেশের লোকের শারীরিক বল যে অনেকেরই ছিল, একথা প্রাচীনের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এ দেশের বাগদী ও গড়ো গোয়ালারা সৈনিকের কাজ করিত ইহারও প্রমান আছে। কেবল ম্যালেরিয়াই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছে।

[২৩] "জাতীয় দৈহিক পুনরুজ্জীবন," *চিকিৎসা সম্মিলনী*, বৈশাখ, ১২৯২, ৩৯।

[২৪] "ম্যালেরিয়ার প্রাধান্য," *স্বাস্থ্য*, বৈশাখ, ১৩০৬, ৫।

ম্যালেরিয়া না ঘুচিলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই।”[২৫] ফলত ঔপনিবেশিক বয়ানে বাঙালির রোগগ্রস্ততা এবং দুর্বলতাকে যেরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, তার হুবহু প্রতিলিপি দেশীয় বিদ্বৎমহলের বয়ানে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় তা নয়। কিন্তু এই বয়ানগুলি থেকে একটি বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই চিহ্নিত করা যায়। উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে বাঙালি চিকিৎসাবিদ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লেখক মহলে সংক্রামক মহামারীকে বাঙালি দুর্বলতার একটি অন্যতম কারণ হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়। ঔপনিবেশিক বয়ানে বাঙালিরা দুর্বল এই গতে বাঁধা ধারণাটি যেভাবে স্থান করে নিয়েছিল, মহামারী অনেক ক্ষেত্রেই সেই অপবাদের একটি বিরুদ্ধ যুক্তি হিসেবে সামনে আসতে থাকে। একে অনেকেই উনিশ শতকে ছড়িয়ে পড়া রোগগুলির ফলাফল হিসেবে দেখার চেষ্টা করেন যার জন্য দায়ী করা হয় ঔপনিদেশিক শাসন এবং তার উন্নয়নকারী পরিকল্পনাগুলিকে।

আলোচ্য সময়ে বাঙালিদের দুর্বলতার কারণ অনুধাবন করতে গিয়ে যদিও শুধুই মহামারীজনিত স্বাস্থ্যগত দুর্বলতাকে একমাত্র বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছে তা নয়। অনেক সময় মহামারীর সাথে অন্যান্য বিষয়কেও সংযুক্ত করে দেখার চেষ্টা করেছেন অনেকে। *স্বাস্থ্য* পত্রিকার সম্পাদক দুর্গাদাস গুপ্ত “জাতীয় উন্নতি” নামক একটি প্রবন্ধে লেখেন, “সহস্র সহস্র শিশু পিতা মাতার অজ্ঞতা দোষে অকালে মরিতেছে। ম্যালেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে কত শত পল্লী ও সহর একবারে জনশূন্য হইতেছে, কত শত আধুনিক শিক্ষিত যুবক পবিত্র স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থ্যা উল্লঙ্ঘন করিয়া হীনবল হইতেছেন, ও অতি অল্প দিনের মধ্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছেন, এবং কত শত নারী অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত হইতেছেন, এমনকি মহামূল্য জীবন পর্যন্ত হারাইতেছেন। এই সকল বালক বালিকা ও যুবক যুবতীরাই ভবিষ্যতের আশা; ইহাদিগকে লইয়াই জাতীয়ত্ব”।[২৬] ইতিপূর্বে চিকিৎসা *সম্মিলনী* পত্রিকায় “জাতীয় দৈহিক পুনরুজ্জীবন” শিরোনামে যে প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল সেখানে দৈহিক পুনরুজ্জীবনের প্রতিবন্ধক হিসেবে মহামারী ব্যতীত যে দ্বিতীয় কারণের উল্লেখ করা হয়েছিল তা হল ‘ক্রম-লব্ধ দূষিত প্রথা’। লেখক এখানে ক্রমলব্দ প্রথা হিসেবে সেই সকল অভ্যাসকে উল্লেখ করেছেন যা তাঁর মতে প্রজননগত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যেমন– বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ব্যায়ামের অভাব, নেশাগ্রস্ততা, ‘অভিগমন দোষ’ এবং হস্তমৈথুনের অভ্যাস। এই সময়ে

[২৫] “ম্যালেরিয়ার প্রাধান্য,” ৫-৬।

[২৬] “স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ : জাতীয় উন্নতি,” *স্বাস্থ্য*, ১৩০৫, আশ্বিন, ১২৪-২৫।

রচিত বেশিরভাগ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ অথবা পুস্তকেই মহামারী এবং রোগগ্রস্ততার সাথে উপরিউক্ত বিষয়গুলি, বিশেষত বাল্যবিবাহ এবং হস্তমৈথুনের অভ্যাসকে সংযুক্ত করে দেখা হয়েছে। অনেকের মতেই এই ধরনের বিবাহ প্রথা এবং যৌন অভ্যাসের সাথে স্বাস্থ্য যেহেতু সরাসরি সংযুক্ত তাই তার প্রভাবেই শরীর মহামারীর কবলে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আবার ম্যালেরিয়ার মতো মহামারীর প্রকোপে পড়লে তার প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানবশরীর বয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই কারণে পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানের শরীর জন্মাবধি রুগ্ন এবং দুর্বল হতে থাকে। কাজেই অনেক সময়েই সংক্রামক রোগ এবং প্রজননগত স্বাস্থ্যকে চক্রাকার এক আবর্ত রূপে কল্পনা করতে দেখা যায়, যার পরিণতি হিসেবে ভাবা হয় জাতি হিসেবে বাঙালির শারীরিক দুর্বলতা এবং মেয়েলিত্বকে। প্রজননগত স্বাস্থ্যের দিকটি নিয়ে আমরা পরের দু'টি অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। কিন্তু প্রথমে আমাদের উল্লিখিত এই চিকিৎসাশাস্ত্রীয় আলোচনাগুলি থেকে যে প্রবণতাটি বিশেষভাবে লক্ষ করা প্রয়োজন তা হল বাঙালির শরীরকে এক নির্দিষ্ট দেহতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ে চিহ্নিত করার প্রবণতা যা বেশিরভাগ লেখকদের কাছে ঔপনিবেশিক শাসনকালে অবক্ষয়ের পথে এগোচ্ছে বলে মনে করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক কারণেই বাঙালির এই পরিচিতির সাথে শারীরিক অবক্ষয়ের ধারণার সংযোগটি স্বাস্থ্যকে ঘিরে তৈরি হতে থাকা প্রতর্কে যেভাবে স্থান করে নেয় তার চরিত্রটি এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রজিতবিহারী মুখার্জী একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন উনিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে বিদ্যালয়ের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মেটাতে কীভাবে বাংলা ভাষায় মানবদেহতত্ত্ব (physiology) বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। এই পাঠ্যপুস্তকগুলির পাঠগত বিশ্লেষণ করে মুখার্জী শুধুমাত্র এই বিষয়ে আলোকপাত করেন যে মানবদেহ সম্পর্কে পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঔপনিবেশিক ক্ষমতার দোসর হিসেবে কীভাবে দেশীয় জনতার কাছে এসে পৌঁছায়। পাশাপাশি তিনি এই বিষয়টির ওপরও আলোকপাত করেন যে বাংলার মতো দেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পশ্চিমী মানবদেহতত্ত্ব এবং বর্ণ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ধারণার কীভাবে একটি পর্যায় পর্যন্ত দেশীয়করণ ঘটে।[27] প্রজিতবিহারী মুখার্জীর আলোচনাটি আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মূলত দুটি দিক থেকে। তার আলোচনা থেকে এই বিষয়টি অনুধাবন করা যায় যে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে মানবদেহতত্ত্ব ও বর্ণ বিজ্ঞান (Race Science) সম্পর্কিত পশ্চিমী জ্ঞানের ভাষান্তর বাঙালি শিক্ষার্থীদের

---

[২৭] Projit Bihari Mukharji, "Vernacularizing the Body: Informational Egalitarianism, Hindu Divine Design, and Race in Physiology Schoolbooks, Bengal 1859-1877," *Bulletin of the History of Medicine* 91, no. 3 (2017): 554.

মধ্যে বর্ণচেতনা তৈরিতে ভূমিকা নেয়। তিনি দেখান এই ধরনের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-জ্ঞানের প্রকল্পগুলি যে সর্বদা সরাসরি দেশীয় জনতার মধ্যে প্রবেশ করে তা নয়। দেশীয় ভাষায় ভাষান্তরের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এমন অনেক বিষয় সেখানে নতুন অর্থ নিয়ে হাজির হয় যেখান থেকে বোঝা যায় দেশীয় অনুবাদকের মধ্যস্থতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যেমন মুখার্জী দেখান *ককেশিয়ান* জাতিগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বাসস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পাঠ্যপুস্তকের লেখক তাদের বাসস্থান হিসেবে যে এলাকাকে চিহ্নিত করেছেন তা হল স্কটল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষ। লেখক এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের অন্যান্য পূর্ব এশীয় জনগোষ্ঠীর থেকে পৃথক রেখে ভারতীয়দের সাথে ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর বর্ণগত সংযোগের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২৮] এর মধ্য দিয়ে দেশীয় ভাষায় বর্ণের এক স্বতন্ত্র ধারণা তৈরি হয় যা তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের বর্ণবাদী ধারণার থেকে পৃথক। মুখার্জী দেখিয়েছেন এর মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক জ্ঞান-ক্ষমতার প্রকল্পকে উপনিবেশিতরা সম্পূর্ণ উলটে দিতে না পারলেও জ্ঞান নির্মাণে তাদের নিজস্ব কিছু *এজেন্সি* তৈরি হয়।

শারীরিকভাবে নিজেদের দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই বাঙালিদের নানান ধরনের রচনায় লক্ষিত হয়। কিন্তু সেই সকল রচনাগুলিতে বাঙালিকে কোনো স্পষ্ট জাতিগোষ্ঠী বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত হিসেবে চিহ্নিত করে দেখার প্রবণতা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে না।[২৯] এর বিপরীতে আমরা যে চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা করছি যদি তার দিকে নজর ফেরাই তাহলে দেখতে পাব সেখানে বাঙালিদের অস্পষ্টভাবে হলেও কোনো না কোনো জাতিগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে হাজির করার প্রবণতা অহরহই চোখে পড়ে।[৩০] এর মধ্যে সবচাইতে বেশি নজরে আসে বাঙালিকে আর্য

---

[২৮] Ibid., 582.

[২৯] এমন কিছু রচনার উদাহরণ—"বঙ্গ দেশের বর্তমান অবস্থা," শ্রাবণ, ১৭৭৮ শক, ১৫৬ সংখ্যা, বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজচিত্র*, চতুর্থ খণ্ড: *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১*, (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৬৩), ১৮২-৯২; "বাঙ্গালিদিগের শক্তি ও সাহসার্থে মাংস ভক্ষণের প্রয়োজন," জুন, ১৮৪২ খ্রীঃ, ৩ সংখ্যা, বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজচিত্র*, ষষ্ঠ খণ্ড: বেঙ্গল স্পেক্টেটর, (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৬৪), ১৪২-৪৪; "মাংসাহারের বিষয়," জুলাই ১৮৪২ খ্রীঃ, ৫ সংখ্যা, বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজচিত্র*, ষষ্ঠ খণ্ড: বেঙ্গল স্পেক্টেটর, (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৬৪), ১৫১-৫৪; "মল্লযুদ্ধ এবং বাঙ্গালিদিগের দুর্ব্বলতা ও অসাহসিকতার বিষয়," অক্টোবর, ১৮৪২ খ্রীঃ, ১০ সংখ্যা, বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজচিত্র*, ষষ্ঠ খণ্ড: বেঙ্গল স্পেক্টেটর, (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৬৪), ১৫৮-৬১।

[৩০] আমরা এই অধ্যায়ে যে প্রবন্ধ অথবা পুস্তক গুলি উল্লেখ করেছি তার প্রায় প্রত্যেকটিই পর্যায় ভুক্ত। উদাহরণ স্বরুপ কএকটি রচনা - প্রসন্নচন্দ্র মৈত্র, "আর্য্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান," *চিকিৎসক ও সমালোচক*, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০২, ১৬৭-১৭২, ১৯৯-২০৩; শৌরিন্দ্রমোহন গুপ্ত, "প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান," *চিকিৎসক ও সমালোচক*, ভাদ্র-আশ্বিন, ২০৩-২১০, কার্তিক, ২৩১-২৪০, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ২৫৫-২৫৬,; সুরেন্দ্রমোহন ভর্টাচার্য, *ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৬; স্বামী রঘুনন্দন, *ছাত্রজীবন*, ১৩১৮।

হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা।[৩১] উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রাচ্যবাদী পণ্ডিতদের উদ্যোগ এবং পরের পর্বে বর্ণ বিজ্ঞানের (Race Science) বর্ণবাদী নানান তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বর্ণ সম্পর্কে এই গোটা শতক ধরে জটিল এবং অনেক সময়েই একে অপরের বিরোধী জ্ঞানের উৎপাদন হতে থাকে-- সেই দিকটি বহু ঐতিহাসিক সামনে এনেছেন। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর বর্ণগত অতীত সম্পর্কে ইংরেজ তথা ইউরোপীয় চিন্তাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, প্রাণীবিদ, নৃতাত্ত্বিকদের সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করে থমাস আর ট্রটম্যানের দেখিয়েছেন যে আর্যগোষ্ঠী সম্পর্কে এই সকল পণ্ডিতদের গবেষণা কীভাবে বর্ণ সম্পর্কে জটিল জ্ঞান নির্মাণের বিচিত্র যাত্রাপথ তৈরি করে।[৩২] অপরদিকে ঈশিতা পাণ্ডে তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন, এই প্রাচ্যবাদী এবং পরবর্তী বর্ণ বিজ্ঞানের সমর্থক নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণাগত সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্তর থাকলেও তা আদতে ঔপনিবেশিক উদারনৈতিক বর্ণবাদী শাসনের যুক্তিকেই নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য থেকেছে বাঙালির দেহতাত্ত্বিক *প্রফাইলিং*।[৩৩] কিন্তু আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বর্ণ সম্পর্কিত এই সকল ঔপনিবেশিক জ্ঞান নির্মাণের প্রকল্পগুলি সমকালীন বাঙালি চিকিৎসাবিদ-লেখক-চিন্তাবিদদের ধারণাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল? আলোচ্য পর্বে বাঙালি যেভাবে নিজের পৌরুষের নির্মাণ করে, সেই চিন্তায় বর্ণ এবং শারীরিক দুর্বলতা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যজনিত উদ্বেগগুলি কীভাবে কাজ করে সেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

বাঙালির শারীরিক দুর্বলতার অবধারণার সঙ্গে বর্ণচেতনার সম্পর্কটি উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে ইন্দিরা চৌধুরীর একটি পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেখিয়েছে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রতর্কে আর্য শুধু দেহতাত্ত্বিক ভিন্নতাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়নি। তার সাথে আর্য একটি সাংস্কৃতিক ভিন্নতার পরিচয়কে বোঝাতেও ব্যবহৃত

[৩১] জন লিওপোল্ড দেখিয়েছেন উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে আর্য শব্দটি ভারতীয় লেখক, প্রচারণাকারীদের (publicist) রচনায় ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে যার মধ্য দিয়ে তাঁরা হিন্দুদের জাতিগত মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। Joan Leopold, “The Aryan Theory of Race,” *The Indian Economic and Social History Review* 7, no. 2 (1970): 273–74. তপতী গুহঠাকুরতা দেখান বাংলায় আর্য পূর্বসূরীর পরিচয় বাঙালিদের নতুন জাতীয় ঐতিহ্যের চেতনায় কেন্দ্রীয় স্থানে চলে আসে। Tapati Guha-Thakurta, “Recovering the Nation’s Art,” in *Texts of Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal*, ed. Partha Chatterjee (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995), 69.

[৩২] Thomas R Trautmann, *Aryans and British India*, University Press Scholarship Online (Berkeley, Calif, London: University of California Press, 1997).

[৩৩] Ishita Pande, *Medicine, Race and Liberalism in British Bengal: Symptoms of Empire* (New York: Routledge, 2010), 21–43.

হতে শুরু করে।[৩৪] ডেভিড আর্নল্ড এই প্রবণতাটিকে আরও নির্দিষ্ট করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে আলোচ্য সময়ে ভারতে বর্ণের ইউরোপীয় মানবদেহতাত্ত্বিক ধারণাটি নাকচ না হলেও ভারতীয়দের মধ্যে তার সাংস্কৃতিক এবং জলবায়ুগত চিহ্নকগুলিই সবচেয়ে বেশি প্রচার ও প্রসার পায়।[35] আমরা নিজেদের আলোচনার ক্ষেত্রে বাঙালি জাতির আর্য আত্মপরিচয় দাবি করার মধ্যে এই দেহতাত্ত্বিক-সংস্কৃতি-জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যগুলির সহাবস্থান লক্ষ করতে পারি যা আলোচ্য পর্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক রচনায় পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। ফলত বর্ণের মাধ্যমে ইউরোপীয় ক্ষমতা-জ্ঞান বাঙালি শরীরকে যে পদ্ধতিতে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছে, বাঙালি স্বাস্থ্যবিদদের ব্যাখ্যা তার থেকে কিছু কিছু অর্থে অভিনব ও পৃথক। এখানে যে বিষয়টি সবচাইতে গুরুত্বের সাথে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি তা হল আর্য হিসেবে বাঙালি শরীরের ভিন্ন সাংস্কৃতিক (cultural difference) পরিচয় দাবি করার প্রসঙ্গটি। *চিকিৎসক ও সমালোচক* পত্রিকায় আনুমানিক ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জনৈক কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্র *আর্য্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান* শিরোনামের একটি প্রবন্ধে লিখছেন--

> যদি মল পরিস্কারের অন্য কোন বন্দোবস্ত বা সময় অবধারণ হইত তাহা হইলে বোধ হয় কোনও সহরে এতদূর রোগের আক্রমণ দেখা যাইত না। পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া সুস্থ শরীরে, সুখ স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ কাল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিলে, বোধ হয় কাহারও অকাল মৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইতে পারিত না। বিজাতীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে যতই বিলাতী সভ্যতার বিস্তার হইতেছে, হতভাগ্য ভারতবাসীগণ দিন দিন আত্মহারা হইয়া যতই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ম্লেচ্ছের অনুকরণ প্রিয় হইতেছে, মানবপালন (Municipality) আত্মশাসন (Self-Government) ইত্যাদি সভা সমিতির যতই ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে, ততই দেশ মধ্যে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, আত্মদ্রোহ, সমাজভঙ্গ, ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা প্রভৃতির আধিক্য লক্ষিত হইতেছে। ওলাওঠা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নিবারণের জন্য বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যতই উপায় উদ্ভাবন করা যায়, ততই উহাদের আক্রমণ আরও প্রবল হইতে থাকে। এই সমস্ত অত্যহিতের প্রকৃত কারণ কেহ কি অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? হতভাগ্য ভারতবাসীর জীবিতকাল ক্রমেই যে, নিতান্তই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা কি কেহ মনে করিয়া থাকেন? ধর্ম্ম-কর্ম্ম, স্বাস্থ্য, শান্তি-একতা এই সকলের মধ্যে পরস্পর অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে

---

৩৪ Indira Chowdhury-Sengupta, "The Effeminate and the Masculine: Nationalism and the Concept of Race in Colonial Bengal," in *The Concept of Race in South Asia*, ed. Peter Robb (Delhi: Oxford University Press, 1997), 291.

৩৫ ডেভিড আর্নল্ডের একটি পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডেভিড আর্নল্ডের মতে বর্ণকে পশ্চিমের বস্তুগত লোভ এবং সামাজিক উদ্বেগ দ্বারা চালিত ধারণা যা বিশ্বজুড়ে শ্বেতাঙ্গদের সামাজিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়, এমন একটি সমমাত্রিক বিষয় হিসেবে দেখা অনুচিত। তিনি দেখিয়েছেন বর্ণ তুলনায় অনেক অস্পষ্ট এবং প্রায়শই স্ববিরোধী একটি ধারণা। শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ কর্তৃত্বের কণ্ঠস্বর হওয়ার পরিবর্তে, এটি অনেক আদানপ্রদানমূলক বিষয়, যার মাধ্যমে ইউরোপের বর্ণবাদী ধারাণাগুলি অইউরোপীয় গোষ্ঠীও আত্মস্থ করতে থাকে, এবং এর মধ্য দিয়ে এরাও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। Arnold, "'An Ancient Race Outworn': Malaria and Race in Colonial India, 1860–1930," 123, 131.

> একটীতে গোলযোগ উপস্থিত হইলে, সকল গুলিই ক্রমশঃ পণ্ড হইয়া যায়। সুতরাং এতৎসম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইলে উচ্চবংশীয়, শিক্ষিত ও বহুদর্শী লোকের হস্তেই তাহার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সমুদয় গুরুতর কার্য্য, কখনও নিম্নশ্রেণীর লোক দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না।[৩৬]

প্রসন্নচন্দ্র মৈত্র 'আর্য্য স্বাস্থের' উন্নতির জন্য যে ভিন্ন সাংস্কৃতিক *কোডকে* চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তা তাঁর এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে আর্যশরীর একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় পরিচয় বহন করে। তাই আর্যশরীরের অবক্ষয়ের কারণ বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখছেন, "বর্ত্তমান আর্য্য সন্তানগণ ম্লেচ্ছ-জ্ঞানাভিমানে উন্মত্ত হইয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, গৌতম প্রভৃতি জ্ঞানীগণকে, ব্যাস, বাল্মীকী প্রভৃতি কবিদিগকে এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি নীতি প্রচারকবর্গকে একবারে উপহাসে উড়াইয়া দিয়া থাকে। ... বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজাধিকৃত বিদ্যালয় সমূহে যে প্রকার ম্লেচ্ছ-জ্ঞানানুমোদিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা হইতেছে, এইরূপ না হইয়া যদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপনা হইত তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবাসীগণ বাল্যকাল হইতেই বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে।"[৩৭] এই একই ধরনের যুক্তিক্রম আমরা *স্বাস্থ্য* পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্তর বয়ানেও পেতে পারি। তিনি লিখছেন, "রোগীর জাতীয়ভাব অবগত না হইলে কখনই সুচিকিৎসা সম্ভব না"। তাঁর কাছে এই জাতীয় ভাবের অর্থ, "রোগীর জাতিগত আচার পদ্ধতি, আহার বিহার প্রণালী, মানসিক বৃত্তি ও ধর্ম্মভাব"। ধর্মভাবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখছেন, "সর্ব্বোপরি রোগীর ধর্ম্মভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রোগীর ধর্ম্মভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিলে যেরূপ আশু রোগোপশমিত হয়, সেইরূপ ঐ বিষয়ে উদাসীন বা বীতশ্রদ্ধ থাকিলে হিতে বিপরীত ঘটইয়া থাকে; রোগ শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। কারণ, জাতিগত ধর্ম্মভাব ঐ জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিতে অল্প বিস্তর রূপে বিদ্যমান থাকিবেই থাকিবে"।[৩৮]

এই প্রসঙ্গে ঠিক চিকিৎসক মহলকে প্রতিনিধিত্ব করছেন না এমন একজন ব্যক্তি, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের রচিত এবং সমকালে বহুল জনপ্রিয় একটি পুস্তক *ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা* থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে আলোচ্য বিষয়টি আরও বৃহৎ প্রেক্ষাপটে দেখা সম্ভব হবে। ছাত্রদের উপযোগী করার জন্য গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ধাঁচে বইটি লেখা হয়েছে। সূচনার কথোপকথনগুলি এইরূপ--

---

[৩৬] প্রসন্নচন্দ্র মৈত্র, "আর্য্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান," *চিকিৎসক ও সমালোচক*, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০২, ১৯৯-২০০।

[৩৭] ঐ, ২০৩।

[৩৮] দুর্গাদাস গুপ্ত, "জাতীয় স্বাস্থ্য," *স্বাস্থ্য*, অগ্রহায়ণ, ১৩০৬, ২৪৭।

শিষ্য। আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, - আমাকে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে হইবে।

গুরু। ব্রহ্মচর্য্য কথাটি মাত্র এখনও এদেশে বর্ত্তমান আছে; কিন্তু ব্রহ্মচারীর দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। যে জাতির যখন অধঃপতন কাল সমাগত হয়, তখন তাহার মূল লইয়াই টানাটানি পড়ে। প্রাসাদ ভিত্তিহীন হইলেই পড়িয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যের মহামহিম ভিত্তির উপরেই আর্য্যজাতির গৌরব-প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল; - কিন্তু কালবশে সে ভিত্তি বিধ্বংস হইয়াছে, - এই দিক দিয়াই আর্য্যের আর্য্যত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন এদেশের শিশু-শিক্ষা, তাহার দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্য মাত্র। ... সে শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান নহে, চরিত্র লাভ নহে, শারীরিক বলবিধান নহে; কেবল ছেলে বড় হইয়া সাহেবের বড় গোলামী করিবে – বড় বেতন পাইবে বড় লোক হইবে!

আর যুবকগণের দিকে চাহিতে হইলে চক্ষুর জল সম্বরণ করা যায় না। যৌবনে বৃদ্ধ, শক্তিহীন, উদ্যম-অধ্যবসায় হীন – জীর্ণ দীর্ণ শক্তিহারা – উদর, প্লীহা-যকৃত-অম্ল-ক্লেদে পরিপূর্ণ।

প্রৌঢ় জরা-জীর্ণ – স্থবির ও অকর্ম্মণ্য। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত আর বড় কেহ জীবিতই থাকে না।

এ সকলের কারণ, গৌণভাবে আর কিছু থাকিলেও যে, এক মাত্র মুখ্য কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।[৩৯]

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে *আর্যত্বর* সাথে *হিন্দু* অথবা *হিন্দুত্ব* -- এই পরিচয়গুলিকেও আলোচ্য সময়ে একে অপরের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার হতে দেখা যায়। হিন্দু অথবা আর্য এখানে ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দ্যোতনা নিয়ে হাজির হয়। সেই প্রেক্ষিতে মূলত বাঙালি পুরুষের শরীর এবং তার দুর্বলতার ধারণার সাথে আর্যজাতির এই সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা বাংলায় বর্ণপরিচিতি সম্পর্কে একটি ভিন্ন সংজ্ঞার নির্মাণ হতে দেখি, যাকে ডেভিড আর্নল্ড বলতে চেয়েছেন ইউরোপীয়-ব্রিটিশ বর্ণবাদী ধারণার নির্মাতাদের সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির।[৪০]

ঔপনিবেশিক যে বর্ণবাদ উনিশ শতকের বাংলায় ক্রিয়াশীল ছিল তা ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত বিতর্কের মাধ্যমে কীভাবে অগ্রভাগে চলে আসে সেই বিষয়ে আমাদের মৃণালিনী সিন্‌হা অবগত করেছেন। বিশেষত ঔপনিবেশিক প্রতর্কে মেয়েলি বাঙালি পুরুষের ধারণাটি যেভাবে উত্থাপিত হয় সেই প্রক্রিয়াটি উদ্ঘাটন করার মধ্য দিয়ে তিনি

---

[৩৯] সুরেন্দ্রমোহন ভর্টাচার্য, *ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা,* দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৬, ১-২।

[৪০] ভারতীয় প্রেক্ষিতে বর্ণকে ডেভিড আর্নল্ড একটি সংস্কৃতিকেন্দ্রিক, জলবায়ু নির্ধারিত সংজ্ঞা হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। Arnold, "'An Ancient Race Outworn': Malaria and Race in Colonial India, 1860–1930," 123, 131, 140.

দেখিয়েছেন বর্ণ এবং লিঙ্গনির্মাণের প্রক্রিয়াটি কীভাবে একে অপরকে ছেদ করে (intersect)।[৪১] এই বর্ণ এবং লিঙ্গনির্মাণের যৌথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপনিবেশবাদ যেভাবে বাঙালি পুরুষকে মেয়েলি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে তার প্রতিক্রিয়া আমরা বাঙালিদের বয়ানে আর্যত্বের ধারণা নির্মাণের মধ্যে খুঁজে পেতে পারি (উল্লেখ্য আর্যজাতির ধারণা এই একই দশকে ভারতে জনপ্রিয় হতে শুরু করে)। উল্লেখ্য যাঁরাই বাঙালি পরিচয়ের সাথে আর্য পরিচয়কে সংযুক্ত করে দেখেছেন প্রায় সকলেই বাঙালি স্বাস্থ্যের অবনতির সময় হিসেবে গণ্য করেন ঔপনিবেশিক আমলকেই। ফলত ঔপনিবেশিক বর্ণবাদী চেতনায় যখন বাঙালির মেয়েলিত্বের অপবাদটি জুড়তে থাকে তার প্রতিক্রিয়া আমরা জাতীয়তাবাদী স্বাস্থ্যচেতনায় মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে দেখি। এখানেই আমরা বাঙালি পুরুষের দেহ এবং সর্বোপরি বাঙালির দেহের এক সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নির্মাণ হতে দেখছি যা ভারতীয়দের কাছে পশ্চিমের শরীরের অবধারণার থেকে পৃথক। অবশ্যই এই সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরিতে পরিপূরকের ভূমিকায় থাকে দেহতাত্ত্বিক এবং পরিবেশগত নির্ণায়কগুলিও। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন হল আর্যত্বের (এবং পরবর্তী সময় হিন্দু) সাংস্কৃতিক দ্যোতনাটি (signifier) বাঙালি পুরুষের দেহকে কীভাবে পরিচিত করে? আমরা পরের পর্বে দেখব চিকিৎসাশাস্ত্রীয় প্রতর্কে ব্রহ্মচর্যের ধারণা এবং তার সাংস্কৃতিক অনন্যতাকে কীভাবে আর্য তথা বাঙালি পুরুষের জীবনচর্যার সাথে সম্পৃক্ত করে দেখা হয়েছে যা বাঙালি পুরুষদেহের এই সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ধারিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

আলোচ্য পর্বের অন্তিমে যে প্রসঙ্গটি অবশ্যই উত্থাপন করা প্রয়োজন সেটি হল এই যে এই বাঙালি পুরুষের দেহের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার ধারণাটির সাথে আমরা বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক উদ্বেগকে সংযুক্ত হতে দেখি। রোগগ্রস্ততা, মহামারী ও মৃত্যু নিয়ে উদ্বিগ্নতা সেই সময়ের বাঙালি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বয়ানেও অব্যাহত থাকে যা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় লক্ষ করেছি। এই বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করা যায়। যেমন মূলত ছাত্রদের উদ্দেশে **১৯১১** সালে জনৈক স্বামী রঘুনন্দনের রচিত একটি গ্রন্থে লেখক বিলাপের স্বরে লিখছেন, “অহো! লীলাময় প্রভূর লীলা নিকেতন, আর্য্যনন্দনগণের আবাসভূমি, অমর নিকেতন আমার দেশ,...আর্য্যকুল কলঙ্ক আমাদের কর্ম্মদোষে ধ্বংসমুখে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে; ... বঙ্গদেশের অনেক পল্লী জনশূন্য হইতেছে। তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইব যে, চিন্তাক্লিষ্ট দুর্ব্বলদেহে

---

[৪১] Mrinalini Sinha, *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century* (New Delhi: Kali for Women, 1995). Chapter 1 Reconfiguring hierarchies: the Ilbart Bill controversy, 1883-84, 33-68.

ব্যাধি দানবের প্রবল আক্রমণ প্রতিকারে অসমর্থতা প্রযুক্ত, অসংখ্য নরনারী অকালে ধ্বংসন্মুখে পতিত হইয়া, অনেক পল্লীকে জনশূন্য করিতেছে। সুতরাং ইহা বলিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হইবেনা যে, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি আমাদের নিত্য সহচর ব্যাধি দানবগণের প্রবল আক্রমণে, অত্যধিক পরিমাণে লোকক্ষয়, এবং হতাবশিষ্টের ব্যাধি ক্লিষ্টতা ও শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত জাত সংখ্যার অল্পতাবশতঃ, অনধিক শতাব্দিকাল মধ্যে বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলি জনশূন্য হইবে"।[৪২] এখানে উল্লেখ্য বাঙালি হিন্দুর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান হওয়ার কারণ যে মহামারী তা রঘুনন্দনের উক্ত উপদেশমূলক পুস্তকটিতে প্রথম উত্থাপিত হয়নি। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু ক্রমহ্রাসমানতার তত্ত্ব প্রকাশের পর থেকে এই সম্পর্কে অগণিত রচনা প্রকাশ পেতে শুরু করে তাতে ম্যালেরিয়ার বিষয়টি বিশদে উত্থাপিত হয়েছে।[৪৩] কিন্তু এখানে রঘুনন্দনের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য ভিন্ন। রঘুনন্দনের মতে ম্যালেরিয়া, কলেরার মতো মহামারীতে বাঙালি 'আর্য্যনন্দনদের' সংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পেলেও এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অন্য কোথাও খোঁজা প্রয়োজন। তিনি লিখছেন—

> আমাদের প্রাচ্য আয়ুর্বিজ্ঞান প্রণেতা মহামনস্বী আর্য্যঋষিগণের গভীর গবেষণার ফল, যাবতীয় রোগের কারণ স্বরূপ জ্বররোগের নিদানতত্ত্ব, এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে যে, --
>
> "মিথ্যাহার বিহারশ্চ দোষাহ্যামশয়া শ্রয়া"
>
> "জ্বরোহষ্টধা পৃথগদন্দ সংবাতাগন্তুজ স্মৃতঃ।"
>
> অমিত আহার ও বিহারদ্বারা কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ আমাশয় গত হইয়া, তত্রস্থ পিত্তরাশিকে অধিকতর দূষিত করিয়া ফেলে, এবং সেই পিত্ত সর্ব্বাঙ্গীন চর্ম্ম গত পিত্ত প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া পৃথক এবং দন্দ ভেদে অষ্টপ্রকার জ্বর উৎপন্ন করে। এই প্রকার দুষ্টকার্য্য বা অত্যাচারোৎপন্ন জ্বর, প্রায় রোগেরই মূল কারণ।[৪৪]

এর পরের অনুচ্ছেদের শুরুতেই লেখক 'মিথ্যাহার বিহারশ্চ' এই শব্দের বাংলা তর্জমা 'মিথ্যা আহার ও বিহার' লিখে স্মরণ করিয়ে দেন, "সরকারী medical reportএ লিখিত Insufficient food unfit of dwelling যে

---

[৪২] স্বামী রঘুনন্দন, *ছাত্রজীবন,* ১৩১৮, ১৮-১৯।

[৪৩] কিশোরিলাল সরকার তাঁর গ্রন্থের বড় অংশ জুড়ে জনসংখ্যা হ্রাসের সাথে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। যদিও তাঁর মতে এই হ্রাস শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না, মুসলমানদের সংখ্যাও ম্যালেরিয়ার ফলে হ্রাস পাচ্ছে। Kishori Lal Sarkar, *A Dying Race, How Dying?* (Calcutta: 1911), 8-38; এছাড়া সেই সময় উক্ত বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়, "Are the Bengali Hindus a Dying Race?" *Modern Review,* January,1911, 39-40. সখারাম গণেশ দেউস্কর, *বঙ্গীয় হিন্দু কি ধ্বংসোন্মুখ?,* আশ্বিন, ১৩১৭, ৫৯-৬২; রাধারমণ মুখোপাধ্যায়, "বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ ও তাহার প্রতিকার," *বঙ্গদর্শন,* শ্রাবণ, ১৩১৭।

[৪৪] স্বামী রঘুনন্দন, *ছাত্রজীবন,* ৩৭।

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত মিথ্যা আহার ও বিহার সেই অর্থের বিকাশ নহে"।[৪৫] এই মিথ্যা আহার ও বিহারের সংজ্ঞা বিবৃত করতে গিয়ে লেখক বিস্তারিতভাবে বৈদিক ঋষিদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দূরদর্শিতার বিস্তৃত বয়ান দিয়ে তার সাথে ধর্মের সম্পর্ককে উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন, "ধৃ+মন = করিয়া ধর্ম্ম শব্দ সাধিত হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা বা পোষণ করা, যে শক্তি বলে মানুষ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, উহাকেই মানুষের ধর্ম্ম বলে, মানুষ ধর্ম্মহীন হইয়া মুহূর্ত্তমাত্রও বাঁচিতে পারে না। যে যত পরিমাণ আত্মধর্ম্মের স্বত্তা সংরক্ষণে সমর্থ হয়, সে তত পরিমাণে শান্তি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি আত্মসুখ ও আত্মন্নোতিকর বিষয় সমূহের অধিকারী হইতে সক্ষম হয়। ... মনস্বী আর্য্য ঋষিগণ, সংরক্ষিণী শক্তিবিশিষ্ট পোষণ প্রকরণকে "ধর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়া, তাহার পরিচালন জন্য কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ধ্যান-ধারণা জপ-তপ প্রভৃতি উপায়গুলি তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আবার ধ্যানাদি উপায় সমূহকে পরিচালনার জন্য, কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যাবধারণ, তাহার মধ্যে মানব জীবনের অসীম উন্নতিকর সুখ-শান্তি, আয়ু-আরোগ্য সৌর্য্য, বীর্য্য বিধায়ক অনন্ত ফলরাশির অক্ষয় ভাণ্ডার।"[৪৬] রঘুনন্দন সংজ্ঞাটি শেষ করেন এইভাবে, "পাশ্চাত্য মতে জ্বরাদি রোগের সূক্ষ্ম নিদানতত্ত্ব, বিষদুষ্ট (poisonous) পানীয় প্রভৃতি দ্বারা, রক্তমধ্যস্থিত অসুস্থ জাতীয় টিসুসমুহ শক্তি সম্পন্ন হইয়া, যে জ্বরাদি রোগের আবির্ভাব করে; তাহা বীর্য্যহীন শরীরে যেমন গুরুতর এবং প্রবলবেগে ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে, বীর্য্যবন্ত দেহ তেমন পারেনা। এমন কি বাল্যাবধি সংরক্ষিত, সম্পূর্ণ বীর্য্যবন্ত জনের পরিত্র দেহ, ব্যাধি দানব স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় না। প্রাচ্য মনীষীগণের মতে জ্বর রোগের সূক্ষ্মনিদান তত্ত্ব "মিথ্যা আহার বা বিহার" নানাকারণে সংগঠিত হইয়া, যে জ্বরাদি রোগের উদ্ভাবন করে, সেখানে বোঝা যায় যে, যে প্রকারেই হউক না কেন বীর্য্যহীনতাই নানা প্রকার রোগের সমুদ্ভাবক।"[৪৭] উল্লেখ্য এই 'মিথ্যা আহার ও বিহার' এর মধ্য দিয়েই রঘুনন্দন বাঙালি হিন্দুর একটি পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয়কে চিহ্নিত করতে চাইছেন, যার বিকল্প তাঁর কাছে পুরুষের বীর্য সংরক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যসাধন।

সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে সাম্প্রদায়িক হিন্দু উদ্বেগের একেবারে গোড়ার সময়েই স্বামী রঘুনন্দনের লেখায় দুটি বিষয় সংযুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। তা হল আর্য্য অর্থাৎ হিন্দু পুরুষদেহের ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং তার দুর্বলতার ধারণার সঙ্গে সংখ্যার নিরিখে হিন্দুর ক্রমহ্রাসমানতা জনিত সাম্প্রদায়িক উদ্বেগটির সংযোজন। বিশ শতকের

[৪৫] ঐ, ৪০।

[৪৬] স্বামী রঘুনন্দন, ৪০-৪১।

[৪৭] ঐ, ৪১।

একের দশকের পূর্বে স্বাস্থ্য নিয়ে এই ধরনের হিন্দু সাম্প্রদায়িক উদ্বেগের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। ফলত এই বিষয়ে ডেভিড আর্নল্ডের আলোচনাটি সমালোচনার দাবি রাখে যেখানে তিনি মনে করেছেন জাতি হিসেবে ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বয়ানগুলিতে যেভাবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙালির দুর্বল শরীরের ছকে বাঁধা চিত্রণগুলি ফুটে ওঠে তেমনি আদমসুমারিতে বাংলায় মৃত্যুর পরিসংখ্যান আসার ফলেই বাঙালি হিন্দুর ক্রমহ্রাসমানতার মতো সাম্প্রদায়িক তত্ত্বটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের আলোচনা থেকে এটা অনেকটাই স্পষ্ট হয় যে রোগগ্রস্ত দেহের ধারণা এবং তার সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রক্রিয়াটি শুধুই প্রাতর্কিকভাবে নির্মিত হয়নি। আমরা দেখেছি উনিশ শতকের শেষ তিন দশক এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালির দুর্বল দেহ এবং মহামারী নিয়ে বহু ধরনের চিকিৎসক এবং বুদ্ধিজীবী তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এখানে বাঙালি দেহের একটি বিশেষ ধরনের নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু ১৯০৯ সালের পূর্বে এই বিষয়টা সাম্প্রদায়িক যুক্তিক্রমের চেহারা নেয়নি। যেমন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *A Dying Race* গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার পরই এই গ্রন্থের কিছু অংশকে সমালোচনা করে, কিন্তু বাঙালি হিন্দুর হ্রাসমানতার তত্ত্বটিকে সমর্থন করে সখারাম গণেশ দেউস্কর পৃথক একটি পুস্তক রচনা করেন যা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল, সখারাম জাতীয়তাবাদী মহলে যে বইটি রচনার জন্য সবচেয়ে বেশি সমাদ্রিত হয়েছিলেন সেই *দেশের কথা* পুস্তকে তিনি পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থা এবং লোকমৃত্যু নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন।[৪৮] কিন্তু এই বিষয়টিকে তিনি হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির মতো সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তখন দেখেননি। এখানে সুমিত সরকারের পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করে বলতে হয় স্বদেশি আন্দোলন-উত্তর সময়ে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয় তার মধ্য থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে এই হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি ঝোঁক প্রকট হতে শুরু করে।[৪৯] ফলত স্বদেশি আন্দোলন-উওর কালপর্বে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রভাব আমরা রঘুনন্দন এবং সমকালীন অনেকের রচনাতেও লক্ষ করতে পারব যা হিন্দু পৌরুষের উদ্বিগ্নতা

---

[৪৮] সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বাঙালির স্বাস্থ্যের দুরবস্থা, মহামারী এবং মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক সংখ্যাতত্ত্বের প্রসঙ্গটি একবারও উল্লেখ করেননি। সখারাম গণেশ দেউস্কর, *দেশের কথা,* ১৩১২ (তৃতীয় সংস্করণ)।

[৪৯] Sumit Sarkar, *Beyond Nationalist Frame: Relocating Postmodernism, Hindutva, History* (Delhi: Permanent Black, 2002). Chapter 3 Intimation of Hindutva: Ideologies, Caste, and Class in Post-Swadeshi Bengal, 81-95.

প্রসারে পৃথক ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলত এই সময় থেকে স্বাস্থ্য, প্রজননশীল শরীর এবং চিকিৎসার দুনিয়াও হিন্দু সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।

'ধাতুদৌর্বল্য' ও প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষ

মিশেল ফুকো একটি প্রভাবশালী বক্তৃতায় মন্তব্য করেছেন যে ইউরোপে অষ্টাদশ শতক থেকে চিকিৎসার প্রসঙ্গটি এক বিশেষ ধরনের সামাজিক চরিত্র পেতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতকে চিকিৎসার সামাজিক (social medicine) এই মোড় সম্পর্কে তাঁর মত হল, এই সময় থেকে চিকিৎসা সেই সকল সামাজিক বিষয়ে নাক গলাতে শুরু করে যা ইতিপূর্বে তার এক্তিয়ারভুক্ত হিসেবে গণ্য হতো না, যেমন রুগী আর রোগের বাইরে জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান, নগর, জেলার প্রশাসনিক বিষয় অথবা নির্মাণকার্য, পয়ঃপ্রনালীর মতো অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ।[৫০] ফুকো একই সাথে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে তেমন কিছু ক্ষেত্রকেও চিহ্নিত করেন যার সেই অর্থে এমন ধরনের চিকিৎসাকরণ ঘটেনি যেমন-- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, যৌন নৈতিকতা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি পরবর্তীকালে চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫১] আধুনিক ইউরোপের প্রেক্ষিতে ফুকোর এই পর্যবেক্ষণের বেশকিছু দিক ঔপনিবেশিক ভারতীয় আধুনিকতার মধ্যে আমরা নানা তারতম্য সমেত লক্ষ করতে পারি। ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিগত দশকগুলিতে ঐতিহাসিকরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু খুব সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকরা সেই বিষয়গুলির ওপরও নজর দিতে শুরু করেছেন যেখানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি দেশীয় জনতাও চিকিৎসার বিবিধ পদ্ধতির সাথে সমকালীন সামাজিক চিন্তাচেতনাগুলিকে সংযুক্ত করার পক্ষপাতী হতে শুরু করেন।[৫২]

---

[৫০] মিশেল ফুকো চিকিৎসার এই সামাজিক মোড়কে চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। ১, চিকিৎসাশাস্ত্র কেবলমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানে নিজের কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেনি। সামাজিক কর্তৃপক্ষ হিসেবেও শহর, জেলা বা প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্থানে চলে যায়। ২, জল, বাতাস, নির্মাণকার্য বা পয়ঃপ্রণালীর মতো বিষয়গুলিও তার অন্তর্গত বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট হতে থাকে। ৩, মানব সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের ওপর তার প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় হাসপাতালের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। ৪, প্রশাসনিক বিষয়েও তার অগ্রহ সম্প্রসারিত হয়, যেমন জন্ম, মৃত্যুর পরিসংখ্যান নথিভুক্ত করা। Michel Foucault, "'The Crisis of Medicine or the Crisis of Antimedicine?' Translated by Edgar C. Knowlton, Jr, William J. King and Clare O'Farrell" (Foucault Studies, no. 1, 2014), https://pdfs.semanticscholar.org/c355/1944141bc2940a5f557e157de 4ca38af013c .pdf (accessed 11 January, 2021), 13.

[৫১] Ibid., 14.

[৫২] এমন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা - Charu Gupta, "Procreation and Pleasure: Writings of a Woman Ayurvedic Practitioner in Colonial North India," *Studies in History* 21, no. 1 (2005): 17–44. Projit Bihari Mukharji, *Nationalizing the Body: The Medical Market Print and Daktari Medicine* (New York: Anthem Press, 2009).

ঔপনিবেশিত ভারতীয় সমাজ চিকিৎসাকে অনেকক্ষেত্রেই যে শুধু রোগ এবং রুগীর নিরিখে বুঝতে চাইছিল না, এবং এক্ষেত্রে চিকিৎসার সাথে সাম্প্রতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা যে অনেক সময়েই সংযুক্ত হতে থাকে তা এই বিষয়ে সমকালীন বিপুল বাংলা প্রকাশনা থেকেই অনুধাবন করা যায়।[৫৩] কারণ সেখানে শুধু বিবিধ রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে চিকিৎসকদের অভিমতই প্রকাশ পায়নি - একই সাথে জাতীয়তাবাদী বিবিধ সিদ্ধান্ত, লিঙ্গভিত্তিক অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক অগুনতি মতামত স্থান পায়। আমরা আগের পর্বে সমকালীন চিকিৎসা অথবা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত রচনাগুলিতে বাঙালি শরীরের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার যে ধারণার কথা উল্লেখ করেছি, বলা বাহুল্য সেখানেও বাঙালির শারীরিক দুর্বলতাকে কেবলি রোগ এবং রুগীর নিরিখে দেখা হয়নি। দেহের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার ধারণাটিই এমন একটি যুক্তিক্রম যার মাধ্যমে চিকিৎসকরা এমন অনেক বিষয়ে আলোচনা সম্প্রসারিত করেছেন যা সংকীর্ণ অর্থে চিকিৎসার পরিধির অতিরিক্ত বিষয় হিসেবেই বিবেচিত ছিল, এবং আলোচ্য পর্বে তা বাংলা চিকিৎসাকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে স্থান পেতে শুরু করে।

উল্লিখিত প্রবণতাগুলি স্মরণে রেখে আমরা যদি পুরুষদের যৌনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে প্রজননকেন্দ্রিক যৌনস্বাস্থ্যের বিষয়ে মনোনিবেশ করি তাহলে সমকালীন চিকিৎসক মহলে এই বিষয়ে কিছু বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষণ লক্ষ করতে পারব। ১৮৯৬ সালে *ভিষক্-দর্পণ* পত্রিকায় ডাক্তার ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় *ধাতু- দৌর্বল্য* নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের সূচনা পর্বে এই বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজনীয়তার কথা পাড়তে গিয়ে সমকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি যুব সমাজের সম্পর্কে লেখেন—

> আজন্ম সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া যে ভাগ্যধর বিলাসিতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, হয়তো আজ কর্ত্তব্যজ্ঞান আসিয়া আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনুতাপানলে তাহাকে দগ্ধ করিতেছে, আজ বুঝি

---

[৫৩] আমরা বর্তমান অধ্যায়ে যে বই এবং পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলিকে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছি সেই সকল রচনাকেই এই ধরণের প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গন্য করাযায়। একটি রচনার শিরোনাম থেকেই এর চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যেমন, কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "হিন্দু ডুবিল! বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতেছে," ভাদ্র, *স্বাস্থ্য সমাচার*, ১৩২৭, ৯৭-১০৩; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়", কার্তিক, ১৩২৭, ১৪৮-৫৭; "জাতির মৃত্যু হয় কিসে?," পৌষ, ১৩২৭, ১৯৮-২০১; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," ভাদ্র, ১৩২৮, ১১৩-২৩; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," কার্তিক, ১৩২৮, ১৬৯-৭৮; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, অগ্রহায়ণ, ২১৩-১৬; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," পৌষ, ১৩২৮, ২২৫-৩৬; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," শ্রাবণ, ১৩২৯, ৯৪-৯৯; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," আশ্বিন, ১৩২৯, ১৪৬-৫৩; "বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার," পৌষ, ১৩২৯, ২২৫-৩৩১; "বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার," ফাল্গুন, ১৩২৯, ২৮৬-৮৯।

> বোধ করিতেছে শ্রমবিমুখ বাবু হওয়া অপেক্ষা, অলস অকর্ম্মণ্য প্রভু হওয়া অপেক্ষা শ্রমশীল ভৃত্য হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। বাহ্য চাক্‌চিক্যশালী চোগা চাপকান পরিধান করিয়া শিবিকারোহী বাবু হয়তো আজ বাহকদিগকে তাঁহা অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। পর্য্যুষিত অন্নভোগী ছিন্ন বস্ত্রধারী দরিদ্র কৃষক তৃণসমাচ্ছাদিত কুটীরাভ্যন্তরে ভূমিশয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে; আর হয়তো সৌধহর্ম্মোপরি কুসুম শয্যায় শায়িত নিত্য ঘৃত মাংসভোগী আমোদপ্রিয় বিলাসী বাবু অনিদ্রার ক্রোড়ে আত্ম মমর্পণ করিয়া ছট্ ফট্ করিতেছেন। কে যেন তাঁহার শুষ্ক নীরস শ্রীভ্রষ্ট নিষ্প্রভ শরীরচ্ছবির উপর নিরাশার কালিমা মাখাইয়া দিয়াছে, তাঁহার যশে আকাঙ্ক্ষা নাই, উন্নতিতে দৃক্‌পাত নাই, অধ্যবসায়ে সাহস নাই, কার্য্যতৎপরতা নাই, সংসারে শান্তি নাই, অর্থাগমনের আবশ্যকতা আছে প্রবৃত্তি নাই সুখের অভিলাষ আছে, চরিতার্থতা নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, শরীরে বল নাই। কিন্তু কেন? ইহার কি কোন নিগূঢ় কারণ নাই? আছে বৈকি, আছে বলিয়াই আমরা আদ্য ভীষক্ দর্পণের ৬ষ্ঠ বর্ষের প্রথম হইতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি। যদিও মাদৃশ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র লেখক দ্বারা এ হেন প্রয়োজনীয় বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা অসম্ভব তথাপি সূক্ষ্মদর্শী প্রবীণ চিকিৎসকদিগের মধ্যে যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সাধারণের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে,...[৫৪]

ডাক্তার ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই প্রবন্ধে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পর্কে যে অভিমতের মধ্য দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন তা এই সময় বাঙালি কিশোর, যুবকদের যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসক মহলে তৈরি হওয়া একটি সাধারণ মতামত। এখানে লক্ষ করার মতো বিষয়টি হল ললিতমোহন যেভাবে উক্ত বিষয়ে বৃহত্তর চিকিৎসক মহলের মতামত চেয়ে আবেদন করেছেন, সেই বিষয়ে ততদিনে চিকিৎসক মহল প্রায় একমত হতে শুরু করেছেন যে শিক্ষিত বাঙালি পুরুষদের এক বৃহৎ অংশের শারীরিক দুর্বলতার হেতু তাদের লাগাম ছাড়া যৌনচর্যা। চিকিৎসকরা এই বিষয়টির সাথে একাধিক সামজিক রীতিনীতি এবং অভ্যাসকে নানাভাবে সংযুক্ত করে বোঝার চেষ্টা করেছেন। যেমন ললিতমোহনের কাছে এই সমস্যার কেন্দ্রীয় কারণ মধ্যবিত্ত সমাজের ভোগবাদের প্রতি আকর্ষণ।

এই একই বছর *চিকিৎসক ও সমালোচক* পত্রিকায় কবিরাজ বঙ্কুবিহারী রায় "বীর্য্য" নামক প্রবন্ধের সূচনা করছেন এক উদ্বেগজনক প্রশ্ন নিয়ে -- "কেন আজ বাঙ্গালিজাতি এত ঘৃণিত, এত অবসন্ন, এত অধঃপতিত? একবার বাঙ্গলা ছাড়িয়া, একবার বাঙ্গালিত্ব ভুলিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিরপেক্ষ দর্শকের চক্ষে চাহিয়া দেখ, বাঙ্গালী আজ কিরূপ অবনত, দুর্দ্দশাগ্রস্থ, ঘৃণিত, পদদলিত! যেন বিস্তৃত কর্দ্দম পরিপূর্ণ দুর্গন্ধ জলাভূমে লক্ষ লক্ষ কৃমিকীট নিবিড় পঙ্কমধ্যে বুকে হাঁটিয়া চলিয়াছে।...বাঙ্গালী ভীরু কাপুরুষ কেন হইল? কেন বাঙ্গালী মনুষ্যত্ব

---

[৫৪] ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, "ধাতু-দৌর্বল্য," *ভিষক দর্পণ*, জুলাই, ১৮৯৬, ২১।

হারাইল?"[৫৫] সমগ্র প্রবন্ধ জুড়ে তিনি 'আর্য রীতিনীতি' থেকে সামাজিক বিচ্যুতির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর ঠাওর করতে চেষ্টা করেছেন। অন্তিম অংশে তিনি লিখছেন, "আমরা যতদূর বুঝি, তাহাতে মনে হয়, বীর্য্যলাভ ও বীর্য্যরক্ষা করিতে না পারাই বাঙ্গালীর ভীরুতার, বাঙ্গালীর কাপুরুষতার প্রকৃত কারণ। দেখিতে চাও, ত একবার বাঙ্গলা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে চাহিয়া দেখ। বিজ্ঞাপন স্তম্ভের চারিভাগের একভাগ ধাতুদৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্বহানির মহৌষধের বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ। কোন বিজ্ঞ কবিরাজের মুখে শুনিয়াছি, শতকরা ৯৪ জন বাঙ্গালী ধাতু দৌর্ব্বল্য রোগাক্রান্ত?...বিদ্যা বুদ্ধি, বল, মেধা, স্মৃতিশক্তি সমস্তই বীর্য্যের উপর নির্ভর করে, তাই প্রাচীন আর্য্যেরা বীর্য্য রক্ষা ও বীর্য্য বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাই তাঁহারা আহারে, বিহারে, আমোদে-প্রমোদে সর্ব্বদা সংযম অভ্যাস করিতেন। সেই অপূর্ব্ব অমূল্য সংযম আমরা স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি।"[৫৬]

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আমরা এমন অজস্র চিকিৎসামূলক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের সন্ধান পাব যেখানে বাঙালি কিশোর, যুবকদের বিবাহ বহির্ভূত এবং প্রজননের উদ্দেশ্যরহিত যৌনাচার নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতিতে পুরুষদের বীর্যপাতকে ঘিরে এমন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ হতে দেখেছেন বহু মনোবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদরা। বীর্যপাতকে নিয়ে এই ধরনের সামাজিক দুশ্চিন্তাকে তাঁরা ধাতু সিনড্রোম অথবা ধাতু বা বীর্য ক্ষয় জনিত উদ্বেগ বলে চিহ্নিত করেছেন যা তাঁদের মতে দক্ষিণ এশীয় সমাজের এক বিশেষ অনন্যতা।[৫৭] আমরা আমাদের আলোচ্য সময়ে পুরুষের যৌনজীবন নিয়ে যে ধরনের প্রকাশনাগুলি পাচ্ছি তার সঙ্গে এই ধরনের ধাতু *সিনড্রোমের* সাযুজ্য লক্ষ করতে পারি। কিন্তু এই বিষয়টি শুধুই সংস্কৃতিনির্দিষ্ট একটি উদ্বেগ, নাকি তা নির্মাণের কোনো ঐতিহাসিক

---

[৫৫] বঙ্কুবিহারী রায়, "*বীর্য্য,*" *চিকিৎসক ও সমালোচক,* পৌষ, ১৩০৩, ৩০৭-০৮, ৩১০-১১।

[৫৬] ঐ, ৩১১।

[৫৭] G Morris Carstairs, *The Twice-Born: A Study of a Community of High-Caste Hindus* (London: Hogarth Press, 1958) ; Gananath Obeyesekere, "The Impact of Ayurvedic Ideas on the Culture and the Individual in Sri Lanka," in *Asian Medical Systems,* ed. Charles Leslie (Berkeley: University of California Press, 1976), 201-26; Sudhir Kakar, *The Inner World: A Psycho-Analytic Study of Childhood and Society in India* (Delhi; New York: Oxford University Press, 1981) ; James W Edwards, "Semen Anxiety in South Asian Cultures: Cultural and Transcultural Significance," *Medical Anthropology* 7, no. 3 (1983): 51–67; A. Sumathipala, S. H. Siribaddana, and Dinesh Bhugra, "Culture-Bound Syndromes: The Story of Dhat Syndrome," *British Journal of Psychiatry* 184, no. 3 (2004): 200–09.

পটভূমি আছে সেই প্রশ্নটি জোসেফ অল্টার এবং প্রজিতবিহারী মুখার্জী সঠিকভাবেই উত্থাপন করেছেন। এর উত্তর এঁরা আংশিকভাবে খুঁজে পেয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার মধ্যে। তাঁরা নিজেদের গবেষণায় দেখিয়েছেন উপনিবেশবাদ ভারতীয় তথা বাঙালি পুরুষদের সম্পর্কে দৌর্বল্য এবং মেয়েলিত্বর অপবাদ দেওয়ায় তা দেশীয় জনতার মানসে নিজেদের সম্পর্কে দুর্বলতার ধারণাকে প্রথিত করেছে। এই দুর্বলতার ধারণা থেকে উদ্ভূত পৌরুষের সঙ্কটকেই উনিশ শতকে বীর্যপাতজনিত উদ্বেগের পটভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আলোচ্য গবেষকরা।[৫৮] প্রসঙ্গত প্রজিতবিহারী মুখার্জীর আর একটি পর্যবেক্ষণ এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি দেখিয়েছেন যে আলোচ্য সময়ে পুরুষের যৌনজীবন নিয়ে বহুবিধ উদ্বেগ নানা যৌন সমস্যার উপসর্গ হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করে যার মধ্যে পড়ে-- শুক্রমেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, *নামরদগি* বা পৌরুষত্বহীনতা, দুর্বলতা, শুক্রতারল্য ইত্যাদি। উনিশ শতকের ডাক্তারি, আয়ুর্বেদিক রচনা এবং ওষুধের বিজ্ঞাপনে উক্ত উপসর্গগুলিকে একটি সাধারণ নাম *ধাতুদৌবল্য* বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ করেছেন প্রজিতবিহারী মুখার্জী।[৫৯] এখানে উল্লেখ্য যে ধাতুদৌর্বল্যের মধ্য দিয়ে বাঙালি পুরুষের দেহকে বিকারগ্রস্ত প্রতিপন্ন করার প্রয়াস (pathologize) একটি বৃহৎ প্রক্রিয়ার অংশ যার মধ্য দিয়ে বাঙালি পুরুষের দেহ এবং তার প্রজননক্ষমতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ফলত শুধু ধাতুদৌর্বল্যকেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যে নয়, এর বাইরেও আমরা অসংখ্য চিকিৎসামূলক রচনার কথা উল্লেখ করতে পারি যেখানে প্রজনন এবং পৌরুষকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া উদ্বেগগুলি আত্মপ্রকাশ করে।

---

[৫৮] জোসেফ অল্টার এই সম্পর্কটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও উক্ত সংযোগটি স্থাপন করেন। তারপর প্রজিতবিহারী মুখার্জী উনিশ শতকের বাংলার প্রেক্ষিতে এই বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। Joseph S. Alter, "Ayurveda and Sexuality: Sex Therapy and the 'Paradox of Virility,'" in *Modern and Global Ayurveda : Pluralism and Paradigms*, ed. Dagmar Wujastyk and Frederick M Smith (New York: State University of New York Press, 2008), 188. Mukharji, *Nationalizing the Body: The Medical Market Print and Daktari Medicine*, 241- 47.

[৫৯] প্রজিতবিহারী মুখার্জী এখানে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন তা হল উক্ত উপসর্গগুলি যে সবকটিই ধাতুদৌর্বল্যের বন্ধনীর মধ্যে সবসময় এক সাথে উল্লিখিত হয়েছে তা নয়। বরং চিকিৎসাশাস্ত্রে ধাতুদৌর্বল্য হল আলোচ্য সময়ে অনবরত পরিবর্তনশীল একটি প্যাথলজিকাল পরিস্থিতির মতো যেখানে উক্ত উপসর্গগুলি কখনো এই ধাতুদৌর্বল্য নামক 'রোগের' অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েহে, কখনো বা তা এক একটি পৃথক রোগ হিসেবে চিকিৎসাশাস্ত্রে অথবা ওষুধের বিজ্ঞাপনে উপস্থিত থেকেছে। Mukharji, *Nationalizing the Body: The Medical Market Print and Daktari Medicine*, 228-41.

পাবনার জনৈক ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্মা *জীবনরক্ষক* নামের একটি বই লেখেন যে বইটির ইংরেজি শিরোনাম করা হয় *LIFE PRESERVER IN BENGALEE*।[৬০] *জীবনরক্ষক* প্রজিতবিহারী মুখার্জী উল্লিখিত ধাতুদৌর্বল্যকেন্দ্রিক ডাক্তারি বইগুলির মতোই একটি রচনা। *আর্য্যদর্শন* পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা অংশে এই বইটির সারসংক্ষেপ উল্লেখ করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লেখেন, "হস্তমৈথুন বা অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাতে মনুষ্যের যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সেই সকলের বর্ণন দ্বারা বালক ও যুবকবৃন্দেকে সর্ব্বসংহারকারি হস্তমৈথুনের হস্ত হইতে মুক্ত করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য।...বালক ও যুবকবৃন্দ যখন প্রথমে এই ভীষণ অভ্যাসের দাস হয়, তখন তাহারা মনে করে ইহা একটী নির্দ্দোষ আমোদমাত্র। এই সময় যদি তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া যায় যে এই আমোদ হইতে তাহাদিগের ভাবি সুখের আশা সমূলে উন্মূলিত হইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই কুঅভ্যাসের অনুসরণ হইতে বিরত হইবে। পিতা মাতা বা অবিভাবকগণ যদি নিজ মুখে এই সকল কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অধীন বালক ও যুবক বৃন্দের হস্তে ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার জীবনরক্ষক অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে ঘোরতর ভাবি দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবেন।"[৬১] হস্তমৈথুনের অভ্যাস অবধারিতভাবে ভবিষ্যতের জীবনকে সর্বনাশের দোরগোড়ায় নিয়ে হাজির করে এই ধারণাটি যে শুধুই বীর্যপাতজনিত পৌরুষের উদ্বেগকে প্রকাশ করে তা নয়। পাশাপাশি আজকের কিশোর ভবিষ্যতে যখন সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে তখন সে হবু পিতা হওয়ার সুবাদে এই দায়িত্ব পালনে কতটা সক্ষম থাকতে পারবে সেই প্রসঙ্গটাও উক্ত আলোচনাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থিত থেকেছে। কিশোর বয়সে হস্তমৈথুন অভ্যাস করলে বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সাথে যৌনসম্ভোগ প্রক্রিয়ায় সেই পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্র শর্মা এক জায়গায় লিখছেন, "কামের চৈতন্য ও শিশ্নের শক্তি ক্রমে কমিয়া যায়। কখন কখন অন্ডকোষ শিশ্ন ঠান্ডা বোধ হয়। এবং শিশ্ন খর্ব্ব, দুর্ব্বল এবং নেকড়া (বস্ত্রখন্ড) মত শিথিল হইয়া যায়। যুবা পুরুষ ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শিশ্ন বালকের শিশ্নের মত দেখায়। এ অবস্থাতে পুরুষ প্রায়ই স্ত্রী সংসর্গে অক্ষম হইয়া পড়ে। যোনি মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে। মনের ইচ্ছা থাকে এজন্য স্ত্রী সংসর্গের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া ব্যগ্রভাবে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে কিন্তু মনের চাঞ্চল্যহেতু কাপড়েই শুক্র নির্গত

---

[৬০] হরিশ্চন্দ্র শর্মা, *জীবনরক্ষক*, ১২৮২।

[৬১] 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা,' জীবনরক্ষক, *আর্য্যদর্শন*, ফাল্গুন, ১২৮১, ৫৪২।

হইয়া যায়। তখন লজ্জা, বিষাদ, ক্ষোভে একেবারে মনকে আচ্ছন্ন করে”।[৬২] এমন পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আর একস্থানে লিখছেন, “শুক্র ক্রমে পাত্‌লা হইয়া পড়ে।...পাত্‌লা শুক্র কাপড়ে পড়িয়া শুকাইলে কোন প্রকার দাগই থাকে না। যাহার শুক্র এত পাতলা হয়, তাহার সন্তান উৎপাদিকা শক্তিও নষ্ট হয়।... হস্তমৈথুনে ধারণ-শক্তি একেবারে কমিয়া যায়। ... এ প্রকার রোগীও অনেক দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের স্ত্রীলোকের নিকট গেলে সংসর্গ হওয়ার পূর্ব্বেই স্পর্শমাত্র জলবৎ শুক্র নির্গত হইয়াছে। অনেক বৎসর যাবৎ তাহাদিগের সন্তানাদি হয় নাই। কিন্তু চিকিৎসার পর অল্পকাল মধ্যেই (স্ত্রী) অন্তঃস্বত্বা হইয়া উপযুক্ত সময়ে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন সুশ্রী সন্তান প্রসব করিয়াছে।”[৬৩]

আমরা আলোচ্য সময়ের পঞ্জিকায় ধাতুদৌর্বল্যের ওষুধের যে বিজ্ঞাপনগুলি দেখতে পাই সেখানেও শুক্রতারল্যকে যৌন অক্ষমতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা প্রজননের প্রসঙ্গটিকেই ইঙ্গিত করে।[৬৪] যদিও ঔপনিবেশিক পর্বে পুরুষদের বীর্যপাতজনিত উদ্বেগটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা তেমন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেননি।[65] আর এই সম্পর্কে আলোচনাগুলি মূলত পৌরুষের নানা উদ্বেগের প্রেক্ষিতেই আবর্তিত হয়েছে। এই পৌরুষের উদ্বেগের সাথে প্রজননের প্রসঙ্গ কীভাবে সম্পর্কিত তা আলোচনায় স্থান পায়নি। কিন্তু আলোচ্য সময়ে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিসরে সন্তান প্রজননের প্রসঙ্গটি যে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে ওঠে তা চিকিৎসকদের আলোচনা এবং ওষুধের বিজ্ঞাপনগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে অনুমান করা সম্ভব। এর পাশাপাশি যদি আমরা জাতীয়তাবাদী বা সংস্কারপন্থী লেখকদের রচনাগুলি পাঠ করি তাহলে বীর্যপাতজনিত উদ্বেগের সাথে সন্তান প্রজননকে ঘিরে তৈরি হতে থাকা উদ্বেগের সম্বন্ধটি অনুধাবন করতে পারব।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তার তারকনাথ রায় *ভীষক্‌-দর্পণ* পত্রিকায় “জীবনীশক্তি” (VITAL FORCE) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যার সূচনা হয় পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান দ্বারা পাঠকদের কাছে জীবনীশক্তির উৎস ব্যাখ্যা করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। তারকনাথ রায় এখানে শুরুতে পশ্চিমী বিজ্ঞানের ভাষায় জীবনের প্রধান

---

[৬২] হরিশ্চন্দ্র শর্মা, *জীবনরক্ষক,* ৪০-৪১।

[৬৩] ঐ, ১৯-২০।

[৬৪] *নূতন পঞ্জিকা,* ১৩১১, কিউরেল, ইলেকট্রিক্ সলিউসন্, অমৃত বিন্দু সালসা, যৌবন সঞ্চার - এই ঔষধগুলির বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

[৬৫] এই বিষয়ে একটি ব্যতিক্রমী আলোচনা করেছেন শ্রীকান্ত বোট্রে এবং ডগলাস হ্যায়েনস। একটি মারাঠি যৌন স্বাস্থ্য পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠকদের সাথে সম্পাদকের চিঠিপত্রের ভিত্তিতে তাঁরা দেখান কীভাবে বিশ শতকের প্রথমপর্বে অল্পবয়সি পুরুষদের মধ্যে বীর্যপাতকে কেন্দ্র করে উদ্বেগগুলি আত্মপ্রকাশ করে। Srikant Botre and Douglas E. Haynes, “Sexual Knowledge, Sexual Anxieties: Middle-Class Males in Western India and the Correspondence in Samaj Swasthya, 1927–53,” *Modern Asian Studies* 51, no. 4 (2017): 991–1034.

উৎস হিসেবে মানবকোষের অর্থ পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন। তার সাথে উল্লেখ করেছেন মানবজীবনের ক্ষেত্রে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর সমগুরুত্বের কথা। কিন্তু বাকি প্রবন্ধে নারীদেহ, ডিম্বাণু ও জীবনের সম্পর্ক আর উন্মোচিত হয়নি, সম্পূর্ণ আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় সন্তান উৎপাদনে পুরুষদেহ এবং শুক্রাণুর গুরুত্বের ওপর যা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম অনুযায়ী মানব-জীবনীশক্তির কেন্দ্র। এই বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তারকনাথ লেখেন,

> "কেহ কেহ শুক্রধাতু দেহের রসের সারভাগ হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া মনোযোগ করেন না ও তাঁহারা শুক্রক্ষয়ে যে বলক্ষয় হয় তাহাও বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ইহা ভুল, কারণ কে না জানেন যে, শুক্রক্ষয় হইলে স্বরভেদ, ঘর্ম্ম, রোমহর্ষ, দৌর্ব্বল্য, শ্রান্তি, প্রভৃতি ক্রিয়ার অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে।...এ সকল লক্ষণ সমূহই অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের ফল ইহা অবশ্যই সকলেই বলিবেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শুক্রে অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা জীবনীশক্তিই বেশীর ভাগ বর্ত্তমান থাকে। একারণে শুক্রক্ষয় হইলে সমস্ত ধাতুক্ষয়ের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। অতিশয় শুক্রক্ষয়ে শরীরের সমস্ত ক্রিয়ারই বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অবশেষে ক্ষয়রোগে বা বাতব্যাধিতে শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহার সন্দেহ নাই।...একটী পুংবীজ কীটাণুতেই সন্তান হইতে পারে যথার্থ, কিন্তু পিতার শরীরের উপর সন্তানোৎপাদিকাশক্তি কতক পরিমাণে নির্ভর করে। যদি পিতামাতার মনের অবস্থা আনন্দময় এবং এক থাকে, সন্তানও সুসন্তান হয় এবং যদ্যপি উভয়ের মনের বিকৃতাবস্থা ঘটে তাহা হইলে সন্তান রুগ্ন বা দুষ্ট প্রকৃতির হয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহা বোধহয় সকলেই অবগত আছেন যে দুর্ব্বল বা অতি মৈথুনাশক্ত পুরুষের বীর্য্যে সন্তান রুগ্ন বা স্বল্পায়ু হয়।"[৬৬]

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ডাক্তার তারকনাথ রায় তাঁর প্রবন্ধের সূচনায় পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান এবং ভাষায় প্রজননবিজ্ঞান পাঠকদের বোধগম্য করে তুলতে চাইলেও বীর্য এবং তার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আয়ুর্বেদিক তত্ত্ব ব্যবহার করেন এবং সেই সূত্রেই ধাতু এবং ধাতুক্ষয়ের মতো *রেটরিক* দিয়ে তিনি বীর্যপাতজনিত উদ্বেগটি ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে পশ্চিমী চিকিৎসাশাস্ত্রের পাশাপাশি আয়ুর্বেদকে একই সাথে মান্যতা দেওয়ার পিছনে তিনি যুক্তি দেখান প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান হওয়ার সুবাদে এই চিকিৎসার ধারার মধ্যে সুসন্তান প্রজননের এমন অনেক জ্ঞান নিহিত আছে যা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সবেমাত্র গবেষণার মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছে। একই আয়ুর্বেদ জ্ঞানের উল্লেখ করে সবশেষে তিনি স্ত্রীর রজস্বলাবস্থার হিসেব অনুযায়ী সম্ভোগের সঠিক দিন নির্ধারণ করে দেন, অন্যথা বীর্যধারণের পরামর্শ দেন যা পালন করতে পারলে সুস্থ, সবল

---

[৬৬] তারকনাথ রায়, "জীবনীশক্তি," *ভীষক্-দর্পণ*, ডিসেম্বর, ১৯০৪, ৪৪৪।

পুরুষ সন্তান প্রজনন সম্ভব।[৬৭] এই রচনাগুলির মধ্যে দুটি বিষয় পৃথকভাবে লক্ষ করার মতো। প্রথমত বীর্যধারণ করার ধারণাটির সাথে শুধু বাঙালি পৌরুষের পুনরুদ্ধার সুনিশ্চিত করা নয়, একই সাথে পুরুষের শরীরকে সুস্থ সন্তান প্রজননের জন্যেও সুশৃঙ্খল, নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তোলার পাঠ দেওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত এই ধরনের *হেটেরোনরম্যাটিভ* প্রজননকেন্দ্রিক যৌনাচারের ধারণাকে যৌনতার একমাত্র সংজ্ঞা হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য একাধারে পশ্চিমী চিকিৎসাশাস্ত্র এবং দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতি জাত জ্ঞানকে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা।

অনেকটা একই ধরনের অভিমুখ নিয়ে প্রায় তেরো বছর পর কুমিল্লাস্থিত কবিরাজ যোগেশচন্দ্র সেন এবং হেমচন্দ্র সেন লিখিত *ব্রহ্মচর্য সাধন* শিরোনামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়।[৬৮] বলা বাহুল্য ব্রহ্মচর্যের গুরুত্ব তুলে ধরাই এই গ্রন্থের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কিন্তু সমকালীন প্রকাশনার মধ্যে এই বইটি কিছু দিক থেকে অনন্য। কারণ এখানে হিন্দু সমাজকে ব্রহ্মচর্যের অনিবার্যতা বোঝাতে গিয়ে লেখকদ্বয় মানবদেহের গঠন যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে দেশীয় আয়ুর্বেদিক তত্ত্বকে কেন্দ্রে রাখলেও পশ্চিমী শরীরবিজ্ঞানের সাথেও এক ধরনের মিথষ্ক্রিয়া (interaction) লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে এখানে প্রজনন প্রক্রিয়াকে বোধগম্য করে তোলার জন্য যেভাবে পশ্চিমী বিজ্ঞানের শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষায় প্রজনন এবং যৌনাচারকে বোঝার জন্য যে আধুনিক প্রচেষ্টাগুলি নেওয়া হচ্ছিল তার প্রতিনিধিত্ব করে। উল্লেখ্য, লেখকরা এখানে ব্রহ্মচর্যের যে পরিচিত সংজ্ঞা অর্থাৎ 'বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্' তার থেকে একেবারেই বিচ্যুত হননি।[৬৯] একইভাবে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য প্রায় সকল উপদেশমূলক গ্রন্থগুলি যেভাবে আধ্যাত্মিকতা, যোগ, শুচিতা, মানসিক শুদ্ধতা পালনের নিয়মাবলী বাতলে দিয়েছে, এখানেও সেই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এর সাথে যে বিষয়টি সংযুক্ত হয়েছে তা হল প্রজননবিদ্যা।

'ধাতুদৌর্বল্য' সংক্রান্ত উপসর্গের বিস্তৃত উল্লেখ যোগেশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র তাঁদের বইতে না করলেও বাল্যজীবনে 'অস্বাভাবিক' উপায়ে এবং 'অপরিমিত' বীর্যপাত করলে যে তা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে

---

[৬৭] লেখক এক্ষেত্রে লিখছেন "যিনি পুত্র কামনা করেন, তিনি তাঁহার ঋতুমতী স্ত্রীর প্রথম চারি দিবসের পর যুগ্ম দিবসে, বিশেষতঃ সিতপক্ষে দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বায়ু বহনকালে পবিত্র ও প্রসন্নচিত্তে স্ত্রী সহবাস করিলে সুসন্তান লাভ করিতে পারেন।...তন্মধ্যে রজোদর্শনাবধি অষ্ট রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রির মধ্যে গর্ভাধান হইলে সেই গর্ভজাত সন্তান পুষ্ট, বলিষ্ঠ, সুস্থ ও দীর্ঘ জীবী হয় তাহার সন্দেহ নাই"। তারকনাথ রায়, "জীবনীশক্তি," ৪৪৬।

[৬৮] যোগেশচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র সেন, ব্রহ্মচর্য্য-সাধন, ১৩২৪।

[৬৯] যোগেশচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র সেন, ক।

অচিরেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা তাঁরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।[৭০] এখানে উল্লেখ্য যে তাঁরা ইতিপূর্বে আলোচিত রচনাগুলির মতো প্রাথমিকভাবে যৌন 'সমস্যাগুলিকে' চিহ্নিত করার জন্য কলম ধরেননি। বরং তাঁরা এই গ্রন্থটি লিখেছেন এই সমস্যাগুলি যাতে উদ্ভূত না হয় তার জন্য পাঠকদের প্রজননতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্যের যথার্থতা বাতলে দিতে। এক্ষেত্রে তারকনাথ রায়ের "জীবনরক্ষক" প্রবন্ধটির সাথে এই গ্রন্থটির প্রাথমিক মিলের জায়গাটি হল দুটি রচনাতেই বীর্যকে জীবনরক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার সাথে এক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র যে নতুন বিশেষ্যটি যুক্ত করছেন তা হল 'শক্তি'। এর ব্যাখ্যায় তাঁরা লিখছেন, "আমাদের শাস্ত্রকারগণ শুক্রকে সাক্ষাৎ চৈতন্যরূপী বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, উদ্ভিদ্ জীবনের স্থানুভাব পরিবর্তিত করিয়া, চিন্তা, বিচার এবং জ্ঞানগরিমামণ্ডিত জীবভাবে পরিণত করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, শুক্র সেই শক্তি"। এই সঙ্গে তিনি পরের পংক্তিতেই এই মন্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য লিখছেন, "শাস্ত্রকারগণের এই মত পাশ্চাত্যমতের সহিত ঠিক এক না হইলেও একার্থবাচক তাহাতে কোনও সন্দেহ নেই।"[৭১] পরবর্তী পর্যায়ে বীর্যের এই গুরুত্বটি বোঝাতে গিয়ে তিনি তাকে সকল ধরনের 'শক্তি'র প্রাথমিক উৎস হিসেবেই শুধু তুলে ধরছেন না, সেই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভারতীয় এবং পশ্চিমী পণ্ডিতদের দ্বারা যে এই তত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত তাও তাঁরা বিবৃত করছেন বেশ কিছু আধুনিক বৈজ্ঞানিক মেটাফোরেরও ব্যবহার করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কলকাতা তথা বাংলার নগরজীবন তিন দশক হল তড়িৎ সংযুক্ত হয়েছে। ফলত নাগরিক সমাজে তা এক অনন্য গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয়।[৭২] বীর্য শুধুই একটি জনন উপযোগী পদার্থ নয়, তার একটি অনন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে যা প্রজনন ছাড়াও শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নিজের চরিত্রেরও যে রূপান্তর ঘটায় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখকদ্বয় লিখছেন, "যে পদার্থ শক্তিতে এবং উপাদানে উভয়তঃ এমন মূল্যবান্ তাহা বৃথা ব্যয়িত হইবে ইহা কি কখনও প্রকৃতির অভিপ্রায় হইতে পারে? জগতে এমন কোন্ শক্তি আছে যাহা মানুষের বুদ্ধিবলে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য প্রকার শক্তিতে পরিণত না হইতেছে? এক প্রকার শক্তি (Energy) পরিবর্তিত হইয়া অন্য প্রকার শক্তিতে পরিণত হইতে পারে বলিয়াই আজি

---

[৭০] ঐ, ৯-১০।

[৭১] ঐ, ৬।

[৭২] ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতায় বাণিজ্যিকভাবে বৈদ্যুতিকরণ শুরু হয়। এই বৈদ্যুতিকরণ এবং বাঙালি কল্পনায় তার প্রতিফলন নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Suvobrata Sarkar, *Let There Be Light : Engineering, Entrepreneurship and Electricity in Colonial Bengal, 1880-1945* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 154, 212–24.

বিজ্ঞানের এই অসাধারণ উন্নতি! তড়িৎ, জল ও বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় সকলেই মানুষের মঙ্গলসাধনে অহরহঃ নিয়োজিত হইতেছে, আর সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠ এই যে জীবনদায়িনী শক্তি ইহাই কেবল অপব্যয়ের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে?”[৭৩] বিবিধ ভারতীয় এবং পশ্চিমী শরীরবিদ্যাগত জ্ঞানকে সংযুক্ত করে তাঁরা দেখান সন্তান উৎপাদন ব্যতীত বীর্যের ব্যয় আদতে অপচয়ের সামিল। বরং এই বীর্যের মধ্যেই নিহিত আছে মানবজীবনের বেঁচে থাকার মৌলিক শক্তি। ফলত বীর্যের অপব্যয় না করে সেই শক্তি বা এনার্জির রূপান্তর ঘটিয়ে যদি তাকে রক্তে প্রত্যাবর্তনের সাধনা করা যায় তাহলে মানুষ নবযৌবন ফিরে পায়। তার জীবন দীর্ঘায়িত করা সম্ভবপর হয়।

জোসেফ অল্টার আধুনিক ভারতীয় আয়ুর্বেদের যুক্তিক্রমের মধ্যে একটি কূটাভাষ (paradox) লক্ষ করেছেন। কারণ এখানে বলবর্ধক ওষুধগুলি পুরুষোচিত তেজবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যৌনক্ষমতা বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে চাইলেও বীর্যধারণকে বিশেষ প্রাধান্য দেয় এবং তার জন্য ব্রহ্মচর্যপালনের পরামর্শ দেয়।[৭৪] কিন্তু আমরা ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিমপর্বের যে ধরনের আধুনিক আয়ুর্বেদিক প্রকাশনাগুলি, এমনকি এই সময়ের ডাক্তারি যে রচনাগুলিরও সন্ধান পেয়েছি সেখানে বীর্যধারণের জন্য ব্রহ্মচর্যকে অন্যতম উপায় হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষের অযৌন (asexual) জীবন যে অভিপ্রেত মনে করা হয়েছে তা নয়। বরং ব্রহ্মচর্য সংক্রান্ত যে ব্যাপক রচনা উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশক পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করা যায় সেখানে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ব্রহ্মচর্যকে একটি আদর্শ যৌনজীবনের নমুনা মনে করা হয়েছে। যেখানে বিবাহের পূর্বে পুরুষ বীর্যধারণের পদ্ধতি এতটাই সুচারুরূপে অভ্যাস করবে যে বিবাহিত জীবনে সে সন্তান উৎপাদনের জন্য তেজস্বী পৌরুষের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। যদিও সন্তান উৎপাদন ব্যতীত অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে যৌনাচার এইধরনের সকল লেখনীতেই অবশ্য বর্জনীয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। এই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র লিখছেন, “জননক্রিয়া ব্যতীত অন্যত্র শুক্রব্যয় প্রকৃতির অভিপ্রেত হতে পারে না একথা বলা হইয়াছে। প্রত্যুত জননক্রিয়াও যে যথেচ্ছ পরিচালিত হইবে এরূপ বিশ্বাস করাও ভুল। সন্তান যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট হওয়াও আবশ্যক; কতকগুলি অপদার্থ অকর্ম্মণ্য জীব সৃষ্টি করিয়া সমাজকে ভারাক্রান্ত করা কাহারও লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। শক্তিতে যে শ্রেষ্ঠ এ জগতে তাহারই স্থান।

[৭৩] যোগেশচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র সেন, ৭।

[৭৪] Alter, “Ayurveda and Sexuality: Sex Therapy and the ‘Paradox of Virility,’” 178.

যে দুর্ব্বল তাহার পক্ষে ধরাপৃষ্ঠে স্থান রক্ষা করা একান্ত কঠিন।...ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা সংরক্ষিত শুক্র, একদিকে যেমন পিতামাতার অন্তর্নিহিত শক্তিরাশিকে উন্নত করিয়া তুলে, অন্যদিকে সেইরূপ সন্তানেরও সর্ব্বপ্রকার ভবিষ্যৎ মূলীভূত অতি সূক্ষ্ম শক্তিরূপে তাহাতে সংক্রামিত হয়।"[৭৫] লেখকরা এর পাশাপাশি সুসন্তান প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় যৌনসম্ভোগের ক্ষেত্রে যৌন অভিজ্ঞতা যাতে সুখকর হয় তাকেও পক্ষান্তরে সুনিশ্চিত করার কথা বলছেন যার জন্যও তাঁদের মতে ব্রহ্মচর্য অভ্যাস জরুরি। কারণ বীর্যধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে যে দীর্ঘস্থায়ী লিঙ্গ-যোনি কেন্দ্রিক যৌনসম্ভোগ সম্ভব, তার মধ্যে দিয়ে যে যৌন সুখানুভূতি আসে তা সন্তান উৎপাদন কেন্দ্রিক যৌনাচারকে পরিণতি দেয়। এই যুক্তিটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা লিখছেন, "সঙ্গমের শেষ অবস্থায় শুক্রবাহিকা-প্রান্ত যেন ক্লান্তিবশে হঠাৎ সঙ্কোচন পরিত্যাগ করিয়া প্রসারণ অবলম্বন করে; এবং তৎক্ষণাৎ শুক্রাশয় ও তৎসংলগ্ন শুক্রবাহিকা যুগপৎ সবলে সঙ্কুচিত হইয়া অন্তঃস্থিত শুক্রকে সবেগে নির্গত করিয়া দিতে আরম্ভ করে। অতঃপর সঙ্গম ক্রিয়ার শেষ হয়। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তির সঙ্গমকাল অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষণস্থায়ী এবং তাহার সুঅনুভূতিও অসম্পূর্ণ। ... যে শক্তি হইতে সঙ্গমের পূর্ণতা লাভ হয় ঠিক সেই শক্তি হইতেই শুক্রধারণ ক্ষমতাও লাভ হইয়া থাকে। যদি কোনও কারণে ঐ সকল যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শুক্র শুক্রাশয়ে সঞ্চিত হইয়া উহাকে কথঞ্চিৎ বিস্তৃত করিতে না করিতেই উহা উত্তেজিত হইয়া অন্তঃস্থ যৎকিঞ্চিৎ শুক্র নির্গত করিয়া দিতে চেষ্টা করে। ... অবস্থা এরূপ হইলে যেমন শুক্রধারণশক্তি নষ্ট হয় তেমনই সঙ্গমশক্তিও ক্ষুন্ন হইয়া পড়ে।"[৭৬]

ফলত ব্রহ্মচর্য অর্থ এখানে কখনোই যৌনজীবনকে সম্পূর্ণ পরিহার নয়। এমনকী এখানে পুরুষ যৌনশক্তিকে শুধুই সঞ্চয়ের নিদানও দেওয়া হচ্ছে না, এই যৌনাচারে সীমিত অর্থে সুখানুভূতিরও স্থান স্বীকৃত হয়েছে। খুব উল্লেখযোগ্যভাবে উক্ত যৌনাচার ব্যতীত যে অতিরিক্ত শক্তি তাকে সঞ্চয়ের কথা অবশ্যই বলা হচ্ছে। তা কেবল উক্ত দম্পতির জীবনকেই রক্ষা করবে না, পরবর্তী প্রজন্মেও তা সঞ্চিত সম্পদের মতো হস্তান্তরিত হবে। এর পাশাপাশি শেষ উদ্ধৃত অংশের মধ্যে আর একটি বিষয়ও খুব স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। এখানে লিঙ্গ- যোনি কেন্দ্রিক যে যৌনাচারের কথা বলা হচ্ছে তার পরিণতি পুরুষের বীর্যপাত, সুখানুভূতি এবং সেখান থেকে সম্ভাব্য সন্তানের প্রজননের মধ্যে আবর্তিত হয়। কোথাও দম্পতির মধ্যে স্ত্রীর সুখানুভূতি এমনকী অস্তিত্বকেই গণ্য করা হয় না। এই সম্পূর্ণ যৌনসম্ভোগ প্রক্রিয়ায় নারীর যৌনতা প্রায় নীরব। নারীর যৌনতা একমাত্র সে ক্ষেত্রেই

---

[৭৫] যোগেশচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র সেন, *ব্রহ্মচর্য্য-সাধন*, ১৩২৪, ১০-১১।
[৭৬] ঐ, ১৬-১৭।

উল্লিখিত হয় যখন লেখকদ্বয় সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে নারীশরীরের গুরুত্ব বোঝাতে চান। যদিও সেখানেও ডিম্বাণু এবং ঋতুস্রাব ব্যতীত পৃথকভাবে মেয়েদের যৌন অঙ্গের কোনো বর্ননা বর্তমান নয়। এমনকী সেক্ষেত্রেও শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা লেখেন, "ডিম্বাণু মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়। শুক্রজীবাণুগুলি মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া এই ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়, এবং এই মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে সন্তানের জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতৃগর্ভস্থ ডিম্বাণু হইতেই জীবশরীরের উৎপত্তি; শুক্র উহার জীবনদাতা। ... একটি ডিম্বাণুতে জীবন সঞ্চার করিতে বহু পারিমাণে শুক্রজীবাণু উহাতে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। এইরূপ শুক্রজীবাণুর সহিত সম্মিলিত হওয়ার পর, ডিম্বাণু উদ্ভিদের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া জীব-প্রকৃতি অবলম্বন করে। এইরূপ শুক্র সন্তানের জীবন সঞ্চার করিয়া দেয়।" সবশেষে তাঁরা লেখেন "পণ্ডিতগণের মতে (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী) জীবশরীরের সমস্ত অংশই ডিম্বাণু হইতে উৎপন্ন হয়; -- শুক্রজীবাণুগুলি উহাতে মাত্র এমন একটি শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা ডিম্বাণুর স্বাভাবিক উদ্ভিদ্-জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবজীবনে পরিণত হয়।"[৭৭] ফলত শক্তির একমাত্র সূত্র বীর্য, লিঙ্গ-যোনি কেন্দ্রিক যৌনাচার এবং তার থেকে সুস্থ সন্তানের প্রজননের যে তত্ত্ব আলোচ্য রচনাগুলিতে পেশ করা হয় তা কেবল ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা নয়। যৌনতা সম্পর্কে হেটেরোনরম্যাটিভ একটি বয়ানকে বিজ্ঞানের বিবিধ ধারার মধ্য দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াসও এখানে লক্ষ করা যায় যার কেন্দ্রে আছে প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষের প্রসঙ্গ।

উনিশ শতকের অন্তিমপর্ব থেকে চিকিৎসামূলক রচনাগুলিতে যৌনাচারের সাথে বাধ্যতামূলক সন্তান প্রজননের প্রসঙ্গটি প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হতে থাকলেও এই বিষয়টি সাম্প্রদায়িক উদ্বেগের অংশ হয়ে ওঠেনি। সার্বিকভাবেই স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটির সাথে হিন্দু আত্মপরিচয়ের সংযোগ তৈরি হলেও বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে তার যে সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়নি তা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। অপরদিকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটি কীভাবে সাম্প্রদায়িক চিন্তার সাথে সরাসরি সংযুক্ত হতে শুরু করে। অবশ্যই সেখানে হিন্দু সাম্প্রদায়িক উদ্বেগের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় হিন্দুর প্রজননগত স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে। আমরা চিকিৎসামূলক প্রকাশনাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে তার মধ্যেও স্পষ্টভাবে এর প্রতিফলন লক্ষ করতে পারব। আমাদের সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি উপেন্দ্রনাথ মুখার্জীর 'ধ্বংসোন্মুখ জাতির' তত্ত্বকে সমালোচনা করতে গিয়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর অভিযোগ করেন একজন ডাক্তার হওয়া

[৭৭] ঐ, ৪।

সত্ত্বেও উপেন্দ্রনাথ কেন তাঁর গ্রন্থে বাঙালি হিন্দুর ক্রমহ্রাসমানতার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে স্বাস্থ্যগত অবনতির বিষয়টিকে প্রাপ্য গুরুত্ব দেননি। এর উল্টোদিকে আমরা যদি বিশ শতকের এক এবং দুয়ের দশকের চিকিৎসামূলক প্রকাশনা, বিশেষ করে পত্রিকাগুলির দিকে নজর ফেরাই তাহলে লক্ষ করব বাঙালির দুর্বল শরীরের ধারণার সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িক উদ্বেগগুলি ব্যাপকভাবে সংযুক্ত হতে থাকে। এবং আবশ্যিকভাবেই এখানে হিন্দু সন্তানের প্রজনন এবং সন্তানপালন,[৭৮] দম্পতির প্রজননগত স্বাস্থ্য ও সন্তানসম্ভাব্য নারীর স্বাস্থ্য,[৭৯] ধাত্রীবিদ্যার সংস্কার, বাল্যবিবাহের সাথে মেয়েদের প্রজননগত স্বাস্থ্যের বিরূপ প্রভাবের প্রসঙ্গ[৮০] এবং আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় পুরুষের বীর্যপাতের প্রসঙ্গগুলি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে থাকে। এছাড়া এই পত্রিকাগুলিতে আদমসুমারি থেকে হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ এবং শিশুদের জন্ম ও মৃত্যুর নির্বাচিত পরিসংখ্যান ও জেলাভিত্তিক স্বাস্থ্যের পরিসংখ্যান ছাপা হতে থাকে,[৮১] যা একই ধরনের সাম্প্রদায়িক দুশ্চিন্তারই প্রতিফলন।

চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এই পত্রিকাগুলিতে বিশ শতকের একের দশক থেকে বাঙালি হিন্দুর স্বাস্থ্য নিয়ে যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় তার প্রতিনিধিস্থানীয় একটি রচনা "হিন্দু ডুবিল", যা *স্বাস্থ্য সমাচার* পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত টানা তিন বছর এগারোটি কিস্তিতে ছাপা হয়। প্রবন্ধমালাটির প্রথম কিস্তির শিরোনাম ছিল "হিন্দু ডুবিল! বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতেছে"।[৮২] এই প্রবন্ধমালার লেখক ডাক্তার কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যেখানে

[৭৮] সতীশচন্দ্র রায়, "বংশরক্ষার কর্তব্য অবধারণ," *আয়ুর্ব্বেদ*, কার্তিক, ১৩২৫, ৬১-৬৪; সতীশচন্দ্র রায়, "বালক রক্ষা," *আয়ুর্ব্বেদ*, আশ্বিন, ১৩২৬, ৩০-৪০; "স্তন্য দুগ্ধ ও শিশুর আহার," *স্বাস্থ্য সমাচার*, বৈশাখ, ১৩২০, ৩৪-৪০; "সন্তান পালন," *স্বাস্থ্য সমাচার*, বৈশাখ-আষাঢ়-আশ্বিন-অগ্রহায়ণ, ১৩২২, ৩৩-৩৭, ৬৫-৬৮, ১৮৫-৮৯, ২২৫-৩০।

[৭৯] কালীপ্রসন্ন রায়, "মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সপ্তাহ," *স্বাস্থ্য সমাচার*, মাঘ, ১৩৩২, ৩১৫-১৬।

[৮০] "বাঙ্গালীর মরণের যৎকিঞ্চিৎ," *আয়ুর্ব্বেদ*, আশ্বিন, ১৩২৭, ২-৫; "বাঙ্গালার স্বাস্থ্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩২৬, ২২৩-২৫, ২৫২-৫৪; "বিবাহ-রজোদর্শন-গর্ভাধান," পৌষ, *আয়ুর্ব্বেদ*, ১৩২৩, ১৫৩-৫৮।

[৮১] "বাংলার লোকক্ষয়," *আয়ুর্ব্বেদ*, শ্রাবণ, ১৩২৬, ৪৩৮-৩৯; "বঙ্গে লোক সংখ্যা - জন্ম ও মৃত্যু," *আয়ুর্ব্বেদ*, আষাঢ়, ১৩৩০, ৩০১-০৩; "বঙ্গে লোকক্ষয়," *আয়ুর্ব্বেদ*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০, ২৮১।

[৮২] কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "হিন্দু ডুবিল! বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতেছে," ভাদ্র, *স্বাস্থ্য সমাচার*, ১৩২৭, ৯৭-১০৩; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়," কার্তিক, ১৩২৭, ১৪৮-৫৭; "জাতির মৃত্যু হয় কিসে?," পৌষ, ১৩২৭, ১৯৮-২০১; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," ভাদ্র, ১৩২৮, ১১৩-২৩; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," কার্তিক, ১৩২৮, ১৬৯-৭৮; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, অগ্রহায়ণ, ২১৩-১৬; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," পৌষ, ১৩২৮, ২২৫-৩৬; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," শ্রাবণ, ১৩২৯, ৯৪-৯৯; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়," আশ্বিন, ১৩২৯, ১৪৬-৫৩; "বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার," পৌষ, ১৩২৯, ২২৫-৩৩১; "বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার," ফাল্গুন, ১৩২৯, ২৮৬-৮৯।

আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল ‘শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়’। শিশুমৃত্যুর আলোকে হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের কারণগুলিকে তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন এবং বিবিধ স্বাস্থ্যভিত্তিক প্রতিবেদন এবং আদমসুমারি থেকে তিনি এই বিষয়ে বিস্তৃত পরিসংখ্যান হাজির করে এই বিষয়টির গুরুত্ব পাঠকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে তিনি উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, কিশোরীলাল সরকার প্রমূখ যাঁরা হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের ধারণাটি নির্মাণে প্রাথমিকভাবে অংশ নেন তাঁদের রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে এই তত্ত্বটির গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন তিনি পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়াজনিত মহামারীর বিষয়টি উত্থাপন করেন, তেমন দারিদ্র্য, সরকারি নীতির ভ্রান্তি ইত্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। সর্বোপরি মুসলমান সমাজের স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস আর অন্যদিকে হিন্দু সমাজের বহু সামাজিক কুপ্রথা এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অসংযমী জীবনযাত্রা এবং সম্ভোগমুখী যৌনজীবনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে দুই সম্প্রদায়ের সংখ্যা হ্রাস- বৃদ্ধির কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। যেমন ম্যালেরিয়ার প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, “পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রধান স্থান। সেই পশ্চিমবঙ্গে অতি ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রতি বছর অসংখ্য হিন্দু ম্যালেরিয়ায় অকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ভীষণ ম্যালেরিয়া বিষের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু নরনারী, বালকবালিকা জীর্ণ, শীর্ণ, রক্তহীন ও জড় হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ জড় লোকের দ্বারা কখনও বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না”।[৮৩] দ্বিতীয় কিস্তিতে শিশুমৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একস্থানে তিনি আবার লেখেন, “বর্ত্তমান সময়ে নবীন রমণীগণ যদি প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে সংযমী বা ব্রহ্মচারিণী ব্রত অবলম্বন না করেন তবে হিন্দু জাতির উন্নতির আর কোনই ভরসা নাই। বর্ত্তমানে এই ভীষণ স্বাস্থ্যহানি ও অকালমৃত্যুর মূলে সংযমের অভাব বা অমিতাচারই সর্ব্ব প্রধান কারণ দেখিতে পাইতেছি। ... প্রাচীন কালেও এদেশে বাল্য-বিবাহ (বালিকাদের ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ) প্রথা সর্ব্বত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু প্রাচীনা হিন্দু রমণীগণের সংযমের বা ব্রহ্মচারিণী ব্রতের ফলে হিন্দু সমাজের কোন অনিষ্টই হইতে পারিত নয়া।”[৮৪] ফলত একটি কিস্তিতে তিনি বিস্তৃতভাবে ব্রহ্মচর্যের সাথে জীবনীশক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্ণনা করে সন্তান প্রজননের জন্য ব্রহ্মচর্য পালনের নিয়মাবলীর এক দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে দেন।[৮৫] *স্বাস্থ্য সমাচার* পত্রিকাতেই বিশ

[৮৩] কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “হিন্দু ডুবিল! বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতেছে,” ভাদ্র, *স্বাস্থ্য সমাচার,* ১৩২৭, ১০০।

[৮৪] কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক, ১৩২৭, ১৫১।

[৮৫] কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাবণ, ১৩২৯, ৯৪-৯৯।

শতকের দুইয়ের দশকে এমন অনেক প্রবন্ধ ছাপা হয় যেখানে হিন্দুর হ্রাসমানতার বিষয়টি উত্থাপন করে একই ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করা হয়।[৮৬]

এর পাশাপাশি আর একটি প্রবণতাও আলোচ্য সময় থেকে প্রকট হয়ে ওঠে, তা হল স্বাস্থ্যের পাশাপাশি চিকিৎসাগত জ্ঞানেরও সাম্প্রদায়িকীকরণ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মতাদর্শের প্রভাবে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ধারার সাথে হিন্দু আত্মপরিচয়কে সংযুক্ত করার প্রবণতা আমরা বেশকিছু পত্রিকায় লক্ষ করতে পারি।[৮৭] বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এই প্রবণতার মধ্যে কিছু সম্প্রদায়িক লক্ষণ প্রকাশ পায়।[৮৮] আয়ুর্বেদকে শুধুই হিন্দু প্রতীক, জীবনযাত্রা, প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থজাত জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখা হয় না। পাশাপাশি মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের বিপরীতে হিন্দু স্বাস্থ্যের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ করার চেষ্টা এই রচনাগুলিতে প্রকট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাপদ্ধতিকে বিশেষ কার্যকারী জ্ঞান হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও উল্লিখিত সময়ে প্রত্যক্ষ করা যায়।[৮৯] আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল, অনেক ক্ষেত্রেই আয়ুর্বেদ হয়ে ওঠে হিন্দু জনতার জন্য সেই যথার্থ চিকিৎসাগত জ্ঞান যা চর্চার মধ্য দিয়ে 'ধাতুদৌর্বল্যে'র মতো রোগ থেকে হিন্দু বাঙালি প্রতিকার পেতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই রচনাগুলি ব্রহ্মচর্যকে প্রাচীন আদর্শ হিন্দু জীবনচর্যার উপায় হিসেবে তুলে ধরে যা অভ্যাসের মাধ্যমে শুধুই বাঙালি পুরুষ তার মেয়েলিত্বের অপবাদ থেকে নিস্তার পেয়ে বলশালী হয়ে উঠবে না বরং একাধারে আয়ুর্বেদশাস্ত্র নির্ধারিত যৌনাচার যথা ব্রহ্মচর্য

---

[৮৬] নগেন্দ্রচন্দ্র দাস, "বাঙালী হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?," *স্বাস্থ্য সমাচার,* অগ্রহারণ, ১৩৩০, ২২৮-৩০; নৃপেন্দ্রকুমার বসু, "জাতীয় স্বাস্থ্য সুমার," *স্বাস্থ্য সমাচার,* ভাদ্র, ১৩৩০, ১৪৩-৪৭।

[৮৭] উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে *চিকিৎসক ও সমালোচক* পত্রিকাটির কথা এইক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই পত্রিকাটি ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং দু-বছর মাসিক পত্রিকা হিসেবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। "আর্য্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান," "প্রাচীন আর্য চিকিৎসা বিজ্ঞান"-এর মতো বেশ কিছু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যার মধ্যে উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকাটির বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, স্বপন বসু, *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র,* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১৮ খ্রি.), ৬৮০।

[৮৮] সম্প্রতি বিশ শতকের সূচনায় উত্তর ভারতে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসামূলক প্রকাশনাগুলিতে আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে কীভাবে হিন্দু আত্মপরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা শুরু হয় সেই বিষয়ে সৌরভকুমার রাই আলোচনা করেছেন। তিনি এই রচনাগুলির পাঠগত বিশ্লেষণ করে দেখান কীভাবে এর মধ্য দিয়ে চিকিৎসামূলক জ্ঞানচর্চার সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটে। Saurav Kumar Rai, "Invoking 'Hindu' Ayurveda: Communalisation of the Late Colonial Ayurvedic Discourse," *The Indian Economic and Social History Review* 56, no. 4 (2019): 411–26.

[৮৯] বিশ শতকের দুইয়ের দশকে আয়ুর্ব্বেদ, আর্য চিকিৎসাবিজ্ঞান, ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচনা পত্রিকায় আলোচ্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে কিছু উল্লিখিত হল - রাখালদাস সেন, "আর্য্য স্বাস্থ্য নীতি", *আয়ুর্ব্বেদ,* ফাল্গুন, ১৩২৭, ২০৪-০৮; সতীশচন্দ্র রায়, "হিন্দু হই কেমন করিয়া?," *আয়ুর্ব্বেদ,* অগ্রহায়ণ, ১৩২৭, ১০২-৩৭; সতীশচন্দ্র রায়, "আর্য চিকিৎসা," *আয়ুর্ব্বেদ,* বৈশাখ, ২৩২-৫৭।

পালনের মধ্য দিয়ে হিন্দু সুস্থ থাকবে এবং সুস্থ হিন্দু সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে।[90] ফলত এখানে প্রাক্ বৈবাহিক জীবন এবং দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্যের অভ্যাসকে একটি আদর্শ জীবনচর্চার পদ্ধতি হিসেবে দেখা হয় যা কৈশোরকাল থেকেই অভ্যাস করলে একাধারে পৌরুষ এবং প্রজনন সুনিশ্চিত করা সম্ভব। এই সামগ্রিক আলোচনায় যে বিষয়টিকে কেন্দ্রীয়ভাবে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় তা হল ব্রহ্মচর্যচর্চাকে সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়াটি। এই প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষের নির্মাণ প্রথম পর্বে হিন্দু আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং পরবর্তী পর্বে হিন্দু শরীরের সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা নেয়। আর ব্রহ্মচর্যের সাথে হিন্দু পুরুষের জীবনচর্যাকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমেই বাঙালি পুরুষের দেহ একটি ভিন্ন সংস্কৃতির দ্যোতক হয়ে ওঠে।

'ছাত্রজীবন' -- শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ব্রহ্মচর্য

উনিশ শতক থেকেই ধাতুদৌর্বল্য বা তার নানান প্রকারভেদ অথবা নানা সংক্রামক যৌনব্যাধি নিরাময়ের জন্য একটি ওষুধের বাজার তৈরি হতে দেখা যায়।[91] প্রাথমিকভাবে পঞ্জিকাগুলিতে এই সকল ওষুধের বিজ্ঞাপন চোখে পড়লেও বিশ শতকের দোরগোড়ায় এসে ধীরে ধীরে নানা পত্র-পত্রিকায় এর বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতে থেকে। যদিও পত্র-পত্রিকা এবং পঞ্জিকায় প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনগুলির প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগও বিশ শতকে জোরালো হয়ে ওঠে। কিন্তু এসকল বিতর্কের মধ্যেই ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত *ছাত্র* নামক একটি পত্রিকায় এই ধরনের ওষুধের নানা বিজ্ঞাপন ছাপা হতে দেখা যায়। এমনই একটি বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনদাতা দেবেন্দ্রলাল নাথ তাঁর কলকাতাস্থ শ্যামবাজারের ঠিকানা থেকে লিখছেন—

> বিনামুল্য ছাত্রগণের অত্যন্ত সুযোগ।
>
> আজকাল ছাত্রগণকে প্রায়ই বলিতে শুনি যে তাঁহারা ভাল পড়া করিতে পারিতেছেন না। তাহাদের স্মরণ শক্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে, কার্যে উৎসাহের পরিবর্তে আলস্য জন্মিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা কেবল এইভাবে আপশোষই করিয়া থাকেন। ইহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন না।

---

৯০ আয়ুর্ব্বেদ, আর্য চিকিৎসাবিজ্ঞান, ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে কিছু রচনা উল্লেখ করা হল – সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঙ্গালীর ভগ্ন স্বাস্থ্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, ফাল্গুন, ১৩২৫, ২১৬-২১; ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত, "বাঙ্গালির বাঁচিবার উপায়," *আয়ুর্ব্বেদ*, আষাঢ়, ১৩২৮, ৩৭১-৭৫; সতীশচন্দ্র রায়, "বংশরক্ষার কর্তব্য অবধারণ," *আয়ুর্ব্বেদ*, কার্তিক, ১৩২৫, ৬১-৬৪; রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী, "আমরা হীন বীর্য্য কেন?," *আয়ুর্ব্বেদ*, মাঘ, ১৩৩০, ১২০-২১।

91 এই বিষয়ে রত্নবীর গুহ সম্প্রতি চমৎকার আলোচনা করেছেন। Ratnabir Guha, "Native Bodies, Medical Market and 'Conflicting' Medical 'Systems': Venereal Diseases and the 'Vernacularisation' of Western Medical Knowledge in Colonial Bengal," *Presidency Historical Review* 1, no. 1 (2015): 1–62.

বলিতে বাধ্য হইতেছি যে ইহাদের প্রতিকারের উপায় তাহাদেরই হাতে। তবে যদি ইহা তাহাদের দোষ না হইয়া স্বপ্নদোষ হয় তাহা হইলে আমার নিকট আবেদন করিলে আমি বিনামূল্যে ওষুধ দিব। আর যদি এই স্বাস্থ্যহানি স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও নিরুৎসাহ তাহাদের নিজ দোষ বা স্বপ্নদোষ না হয় তাহা হইলে আমার সেই চিরবিখ্যাত শক্তি যাহা নামেও শক্তি, কাজেও শক্তি যাহা আমি এত দিন অতি সম্মানের সহিত ৪৲ টাকায় বিক্রয় করিতেছিলাম আর আজ যাহা কেবল ছাত্রগণের সুবিধার জন্য ২৲ টাকা মুল্যে দিতে ইচ্ছাকরিয়াছি তাহা পান করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। উহা পান করিলে মনে নূতন উৎসাহ আসিবে স্মৃতিশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে ও রক্ত পরিষ্কৃত হইবে।[৯২]

শারীরিক দুর্বলতা, ধাতুদৌর্বল্য ইত্যাদির মতো বীর্যপাতজনিত উদ্বেগ যে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছিল তা এই বিজ্ঞাপনে দুর্বলতা সম্পর্কে জনপ্রিয় *রেটরিকগুলি* ব্যবহার করার প্রবণতাটি থেকে খানিকটা অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু একই সাথে আমাদের উনিশ শতকে তৈরি হওয়া ছাত্রসমাজ সম্পর্কেও এই বিজ্ঞাপনটি অবগত করে,[৯৩] কিশোর-যুব গোষ্ঠীও যে বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত। ফলত আলোচ্য সময়ে ছাত্র, কিশোর, যুব এই পরিচয়গুলি একে অপরের পরিপূরক হিসেবেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যদিও এখানে বয়সের প্রসঙ্গটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধন্ধর ক্ষেত্র হিসেবে রয়ে যায় যে বিষয়টি আমরা পরের পর্বে উত্থাপন করব। এই ছাত্রদের সাথে যে দুটি ক্রিয়াকে আমরা সংযুক্ত হতে দেখি তার মধ্যে প্রথমটি হল শিক্ষা এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হল সেই শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে জীবিকা অর্জনের দিকে পা বাড়ানো। আমরা আলোচ্য সময়পর্বে জনপরিসরে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনায় এই দুটি বিষয়কে ঘিরে ছাত্রদের জীবন কীভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক সেই বিষয়টি সামনের সারিতে উঠে আসতে দেখি। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রধানত চিকিৎসা পেশার সাথে জড়িত এই ব্যক্তিদের উক্ত বিষয়ে মতামত প্রবলরকম নৈতিক।

উল্লেখ্য বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জুড়তে থাকে শিক্ষার প্রসঙ্গটি। এই বিষয়ে আমাদের তিথি ভট্টাচার্য অবগত করেছেন যে কীভাবে উনিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্তের পরিচয়ের

---

[৯২] *ছাত্র*, ফাল্গুন, ১৩২০,৭০।

[৯৩] ঔপনিবেশিক বাঙ্গলায় ছাত্রসমাজের উত্থান এবং তার পরিচিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন জন বারউইক। এই বিষয়ে তাঁর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, John Barewick, "Chatra Samaj: The Significance of Student Community in Bengal. c 1880-1920," in *Mind Body and Society : Life and Mentality in Colonial Bengal*, ed. Rajat Kanta Ray (Calcutta: Oxford University Press, 1995), 232–59. এছাড়া এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য তাঁর অপ্রকাশিত ডক্টরাল গবেষণপত্র, John Barewick, "Chatrasamaj : The Social and Political Significance of the Student Community in Bengal c. 1870-1920." Unpublished PhD dissertation, (University of Sydney: 1986).

সাথে ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে।[৯৪] মূলত মেকলে প্রদর্শিত নীতি অনুযায়ী আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা উনিশ শতকের অন্তিম পর্যায়ে এসে শিক্ষাগ্রহণের মূল ধারা হিসেবে গণ্য হতে থাকলেও একই সঙ্গে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উষ্মাপ্রকাশের প্রবণতাও এই সময়েই প্রবল হয়ে ওঠে। উষ্মাপ্রকাশের ধরন যে একই ধাঁচের ছিল তা বলা যায় না। অনেক চিন্তাবিদই চাকরিকেন্দ্রিক শিক্ষানীতির প্রতি সৃজনশীল সমালোচনা সামনে রেখেছেন এবং একটি বিকল্প শিক্ষানীতির অবধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন। বিশেষত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এই সৃজনশীল প্রচেষ্টার বেশ কিছু নিদর্শন চোখে পড়ে।[৯৫] কিন্তু প্রচলিত পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিক্রিয়ায় আমরা লক্ষ করতে পারি এক লিঙ্গায়িত এবং রক্ষণশীল ঢং। উনিশ শতকের আটের দশক থেকে আমরা ছাত্রদের জন্য লিখিত যে উপদেশমূলক পুস্তকগুলি প্রকাশ পেতে দেখি সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে হিন্দু পরম্পরার বিনাশের কারণ হিসেবে গণ্য করার পাশাপাশি এই পাঠাভ্যাসের প্রবল চাপকে বাঙালি ছাত্রের দৈহিক দুর্বলতার হেতু হিসেবেও গণ্য করা হয়। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত ধাতুদৌর্বল্যের ওষুধের বিজ্ঞাপনে সেই *ট্রোপটির* ব্যবহারের উল্লেখ করা যায় যেখানে স্কুল-কলেজের লেখাপড়াজনিত শারীরিক ও মানসিক খাটুনি এবং শারীরিক দুর্বলতা ও অবসাদের প্রসঙ্গটিকে কার্যকারণ সম্পর্কের মতো দেখা হয়।

পাশাত্য শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্কে এই উষ্মার পাশাপাশি সেই শিক্ষার সাথে সংযুক্ত জীবিকা তথা চাকরির প্রতি বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের হতাশাগ্রস্ততার চরিত্রটি সুমিত সরকার চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।[৯৬] ঔপনিবেশিক কালপর্বকে কলিযুগের সাথে তুলনা করার মধ্য দিয়ে সমকাল সম্পর্কে যে অবধারণা এই কল্পনায় স্থান পায় সেখানে জাতনির্ভর এবং লিঙ্গায়িত সামাজিক স্থিতাবস্থাটি উল্টে যাওয়ার আতঙ্কের যে ইঙ্গিত সুমিত সরকার তৎকালীন মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তের মানসিকতায় লক্ষ করেছেন সেই আতঙ্কের উপস্থিতি আমরা ছাত্রদের নিয়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগের মধ্যেও লক্ষ করতে পারি। একাধারে ছাত্রজীবনের লেখাপড়ার চাপ, চাকরির অনিশ্চয়তা, সীমিত আয় ও চাকরি জীবনের খাটুনি, নৈরাশ্য, হতাশা বাঙালি যুবকের দৈনন্দিন

---

[৯৪] Tithi Bhattacharya, *The Sentinels of Culture: Class, Education and the Colonial Intellectual in Bengal 1848-1885* (New Delhi: Oxford University Press, 2005).

[৯৫] Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908* (New Delhi: People's Publishing House, 1973). Chapter 4 National Education, 149-81.

[৯৬] Sumit Sarkar, *Writing Social History* (Delhi: Oxford University Press, 1997). Chapter 8 Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramkrishna and His Times, 282-357.

জীবনকে যে নাজেহাল করে তুলেছে এই বোধ সমকালীন স্বাস্থ্যমূলক রচনাগুলিতে প্রতিফলিত হতে থাকে। বর্তমান বা ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্যজীবনে সম্ভাব্য আর্থিক অনটনের আশঙ্কাগুলি বাঙালি যুবকের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে ব্যাহত করছে এই ভাবনাটি বৃহত্তর মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজকে যেমন দুশ্চিন্তায় ফেলে, তার প্রতিফলন আমরা সমকালীন চিকিৎসক মহলেও দেখতে পাই। মূল প্রসঙ্গে প্রবেশের পূর্বে তাই ১৩০৮ বঙ্গাব্দে(১৯০১ খ্রি.) *স্বাস্থ্য* পত্রিকার সম্পাদকের কলমে "সংযম" শিরোনামে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায় যেখানে এই ধরনের দুরাশার অভিনব আত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। বীর্যধারণের আবশ্যকতা বোঝাতে গিয়ে লেখক এখানে আর্থিক সঞ্চয় সংক্রান্ত বিষয়টির উত্থাপন করেছেন।

> খাটিলেই ক্ষয়। খাটিতে খাটিতে প্রত্যেক যন্ত্র -- যে যেরূপ খাটে, সে সেই পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যেমন ব্যয় হইলেই সঞ্চয় আবশ্যক, সেইরূপ ক্ষয় হইলেই পূরণ আবশ্যক। যেমন প্রত্যেক বুদ্ধিমান গৃহস্থের সঞ্চিত ধন সিন্ধুকে বা ব্যঙ্কে থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক যন্ত্রেরই একটা সঞ্চিত বল বা রিসার্ভ ফোর্স থাকে। শরীর যন্ত্রের প্র্যাত্যহিক ক্ষয় বাদে আহারাদি হইতে যাহা যাহা অতিরিক্ত সঞ্চয় হয় তাহাই তাহার সঞ্চিত বল। যাহাতে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় সেজন্য সকলেরই যত্নপর থাকা উচিত। দেহে সঞ্চিত বল না থাকিলে কোন কাযই আমরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি না। যাঁহাকে প্রত্যহ ৫ ঘন্টা করিয়া শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, যাঁহাকে ৬/৭ ঘন্টা করিয়া মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, এমত সময় আইসে যখন তাঁহাদের দ্বিগুণ সময় শ্রম না করিলে সংকল্পিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। সঞ্চিত বল না থাকিলে কিরূপ আমরা এই অতিরিক্ত সময় খাটিতে সমর্থ হইব? এতদ্ভিন্ন রোগের সময় আমাদের সঞ্চয় ত হয়ই না অপিতু সঞ্চিত বলের অত্যধিক ক্ষয় হইয়া যায়; সে সময় পূর্ব্ব সঞ্চিত বল না থাকিলে জীবনরক্ষা হওয়া, পিতৃ মাতৃ দায়ের অপেক্ষাও গুরুতর এই রোগের দায়ে মুক্তি পাওয়া, সম্ভবে কি? ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকা না থাকিলে লোক যেমন দেউলিয়া হয়, দেহে সঞ্চিত বল না থাকিলে সেইরূপ লোক অল্প অত্যাচারে, সামান্য রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের আর্থিক সঞ্চয়ের ন্যায় দৈহিক বল সঞ্চয়ের জন্যও সর্ব্বদা মনোযোগী থাকা উচিত।[৯৭]

আর্থিক সঞ্চয়ের *মেটাফোরটি* বীর্য সংরক্ষণ তথা ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ব্যবহার করার এই পদ্ধতিটি আলোচ্য সময়ের একটি সাধারণ প্রবণতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষত ছাত্রসমাজ এবং তাদের অবিভাবকদের উদ্দেশ করে রচিত এমন অসংখ্য রচনা তার অন্তর্ভুক্ত যেখানে ছাত্রদের ভোগবাদের শিকার হিসেবে তুলে ধরা হয়। নভেল পড়ার অভ্যাস, থিয়েটারের নেশা, অলস জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়া, মদের নেশা, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে মেস-হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করা ইত্যাদি সেখানে কিছু সাধারণ

[৯৭] "সংযম," *স্বাস্থ্য,* অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩০৮, ২২৭।

চিহ্নকে পরিণত হয়, যার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলামি এবং ভোগবাদের প্রতি তাদের আকর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝানো হয়। বীর্য সংরক্ষণের সাথে আর্থিক সঞ্চয়ের *মেটাফোরটিকে* সমান্তরাল করে দেখার মধ্যে দিয়ে বীর্যপাতের অভ্যাসের সাথে ভোগবাদকে সংযুক্ত করা হয়। আর এর মাধ্যমে আমরা মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তর আর্থিক দুরবস্থা এবং নৈতিক উদ্বেগের প্রসঙ্গটিকে মূর্ত হতে দেখি।

আলোচ্য প্রেক্ষিতে আমরা যদি ছাত্র-কিশোর-যুব সমাজের জীবনযাত্রা সম্পর্কে চিকিৎসাবিদদের নানা ধরনের অভিমতগুলি উত্থাপন করি তাহলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসকদের উদ্বেগের চরিত্রটি অনুধাবন করতে পারব। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কলকাতার মতো বৃহৎ শহরে মফঃস্বল অথবা গ্রাম্য পরিবেশ থেকে আগত ছাত্রদের শারীরিক সুস্থতার বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মধ্যস্তরীয় ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি নীতিতে পরিবর্তন আসার ফলে বেশ কিছু বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় যার বেশির ভাগটাই কলকাতায় নির্মিত হয়। প্রেসিডেন্সি অথবা সেন্ট জেভিয়ার্স-এর মতো এলিট প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়াশোনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে খরচ কম ছিল। এছাড়া তুলনায় দেশীয় পরিবেশ মফঃস্বলের ছাত্রদের পঠনপাঠন এবং সামাজিক যোগাযোগ তৈরির পক্ষে অনুকূল ছিল।[৯৮] কলকাতা বা মফঃস্বল শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠরত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রই ছিল অভিবাসিত।[৯৯] এই ছাত্রদের বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে একদিকে কলেজগুলির, অন্যদিকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে হস্টেল এবং কিছু ব্যক্তি ও সমষ্টির উদ্যোগে নির্মিত মেস কলকাতায় দ্রুত গজিয়ে উঠতে থাকে। পরের দিকে মফঃস্বলেও ইস্কুল এবং কলেজগুলিকে ঘিরে হস্টেল ও মেস গজিয়ে ওঠে।[১০০] কলকাতা শহরের হস্টেল এবং মেসগুলি মূলত উত্তরের দেশীয় বসতি অঞ্চলেই ছড়িয়ে ছিল। আর শহর কলকাতা, বিশেষ করে তার উত্তরাংশের এই দেশীয় জনতার বসতি অঞ্চলগুলি তৎকালীন দক্ষিণের ইংরেজ লোকালয়ের তুলনায় অনেক ঘনবসতিপূর্ণ ছিল।[১০১] এই অঞ্চলের

---

[৯৮] Barewick, “Chatra Samaj: The Significance of Student Community in Bengal. c 1880-1920.” 235.

[৯৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় কলকাতার বাইশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫,৭৫৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২,৩৬৫ জন মফঃস্বল থেকে এসেছেন। ১৯১৭-১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ একান্নটি কলেজে মাত্র ৩২.৭ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়ত যারা সেই কলেজ যে শহরে অবস্থিত সেখানকার বা সেই জেলার বাসিন্দা। বাকিরা অন্য জেলা থেকে সেখানে লেখাপড়া করতে এসেছিল। এই প্রতিবেদন পুরো বাংলা প্রেসিডেন্সি জুড়ে ফলত শিক্ষার্থীর ব্যাপক অভিবাসন লক্ষ করেছে। Calcutta University Commission Report, 1919, Chapter XIX Conditions of Student Life, 313.

[১০০] Barewick, “Chatra Samaj: The Significance of Student Community in Bengal. c 1880-1920.” 232.

[১০১] অনিন্দিতা ঘোষ দেখিয়েছেন উত্তর কলকাতায় দেশীয় মানুষদের বসতি এলাকাগুলি ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ার সেখানকার বায়ু চলাচলের মান ইংরেজ বসতি এলাকার তুলনায় অনেক নিম্নমানের ছিল। Anindita Ghosh, *Claiming the City : Protest, Crime, and Scandals in Colonial Calcutta 1860-1920* (New Delhi: Oxford University Press, 2016), 23.

ছাত্রাবাস ও মেসের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও পরিবেশ নিয়ে বহু চিকিৎসক দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন।[১০২] শুধু তাই নয় মেসে ছাত্রদের জীবনযাত্রা নিয়েও নৈতিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে *Indian Mirror* পত্রিকায় "Student's Hostels and Messes" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এখানে লেখা হয়—

> The dangers to which young men coming from the mufassil to study in the colleges in Calcutta are exposed are numerous and well known. … All of us are familiar with instances of well-behaved, sober young man, the hopefuls of their parents and families who on their arrival in this great city to prosecute their studies after matriculation, have put up in messes, lost their character and return home wrecks of their former selves. Parents and guardians living in the mufassil are fully sensible of the risk they run by sending their sons and wards for education in Calcutta; they are aware of the utter absence of discipline that characterises these messes, and naturally long for some decent establishments where not only the material comforts but the moral welfare as well of the inmates might be looked after and take care of.[১০৩]

প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস নিজের পেশায় সফল হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং কলকাতা-সহ অন্যান্য জনপদে পরিশুদ্ধ জলসরবরাহ ব্যবস্থা ও নাগরিক স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার বিষয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা নেন।[১০৪] জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, ধাত্রীবিদ্যার সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অসংখ্য পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কর্মজীবনের অন্তিম পর্যায়ে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরীমোহনের *বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা* নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটি তিনি লেখেন এক ধাত্রীর নিজস্ব বয়ানে। দীর্ঘজীবন চিকিৎসামূলক পেশার সাথে জড়িত থাকার কারণে এই ধাত্রী বাংলার জনসমাজ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে হাতেকলমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা কাহিনীর আকারে পাঠকদের সামনে তুলে ধরছেন -- এমন একটি ধাঁচে এই গ্রন্থটি রচিত। আদতে এই গল্প-সংকলনটি সুন্দরীমোহন দাসের অভিজ্ঞতারই গল্পরূপ। গ্রন্থের সূচনায় বইটির প্রকাশক লিখছেন, "এক সময় ছিল যখন জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভোজন না করাই স্বর্গে বাস করিবার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। যুবক যুবতীরা

---

[১০২] সত্যচরণ সেনগুপ্ত, "বাঙ্গালি ছেলেদের স্বাস্থ্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, শ্রাবণ, ১৩৩০, ৩২৪-২৮; মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, "ছাত্রাবাসে স্বাস্থ্যরক্ষা," *স্বাস্থ্য সমাচার*, চৈত্র, ১৩৩০, ৩৫৩-৫৫।

[১০৩] Note of Reform of Students Messes and Hostels, 1905 File no 3-L/2-6, West Bengal State Archive (Home Political).

[১০৪] Is Calcutta's Filtered Water Supply Contaminated? Dr. Sundari Mohan Das's Allegations Refuted By The Executive Engineer, Water Works, *The Calcutta Municipal Gazette*, Volume 18, 1933, 868-875.

যতদিন যৌনধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, ততদিন তাহাদের পতনের সম্ভাবনা নাই, পিতামাতা এবং শিক্ষকেরা এই শিক্ষাই অনুসরণ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের চল্লিশবৎসরব্যাপিনী অভিজ্ঞতা এই শিক্ষারই ভ্রম প্রদর্শন করিতেছে।”[১০৫] এই গল্প-সংকলনে বেশির ভাগ গল্পই পুরুষ এবং নারীর কৈশোর বা প্রথম যৌবনে নানাবিধ যৌন অভিজ্ঞতার কাহিনী যা তাদের জীবনকে বিনাশের পথে নিয়ে গিয়েছে। এমনই একটি গল্প “বংশরক্ষা”র একটি অংশ এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা যায়।

ধাত্রী পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক অবস্থাপন্ন জমিদার চ্যাটার্জী পরিবারে পেশাগত কারণে যান। জমিদারের সন্তানসম্ভবা অনধিক কুড়ি বছরের কন্যার প্রসবের কাজে তিনি এসেছেন। কন্যার ইতিপূর্বে ছয়বার গর্ভাবস্থায় সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। তাই এইবার ধাত্রীকে আনা। কন্যার স্বামী কলকাতা নিবাসী এক এমএ পাশ যুবক যে কলকাতাতেই বাস করে এবং নাগরিকজীবনে সুখী। কিন্তু জমিদারকন্যা পুত্রসন্তান প্রসব করার দু-সপ্তাহ পরেই ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেন সে উপদংশ রোগের শিকার। তার স্বামী সত্যপ্রিয় প্রথমে নিজের স্ত্রীর দিকে সন্দেহের আঙুল তুলে তাকে ত্যাগ করার হুমকি দেয়। কিন্তু শীঘ্রই ডাক্তার তাকে চেপে ধরায় সত্যপ্রিয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে সে নিজেও নানা যৌনরোগে আক্রান্ত। এই রোগের হেতু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দীর্ঘ নীতিগর্ভ স্বগতোক্তিতে ডাক্তার এক জায়গায় বলেন, “এই যে চতুষ্পাঠীর বা গুরুগৃহবাসের অনুকরণে সব হোটেল বা হোস্টেল-বাসের প্রণালী হয়েছে, এতেই ছেলেদের পরকাল ঝর্ঝরে হয়ে যায়। এই সকল গুরুগৃহে গুরুর স্থানে থাকেন এক সুপারিঠন্‌ঠন্‌, আর অনুগত শিষ্যের স্থান থাকে গুরুমারার দল, যাদের ভয়ে নকল গুরু শশব্যস্ত! সমস্ত রাত বাহিরে থেকে এসে দারোয়ানকে ঘুষ দিলেই হল। নব্যশিক্ষা ও নব্যসভ্যতার প্রধান লক্ষণ যেন বাহিরে চাকচিক্য-মাথার উপরে কৃত্রিম কুঞ্চিত কেশদাম, মাথার ভিতরে কুৎসিত রোগের বীজ।”[১০৬] গল্পের অন্তিমে ডাক্তারের প্রদর্শিত নৈতিক পথে সত্যপ্রিয় নৈতিক জীবনে ফিরে আসে এবং চিকিৎসার মধ্য দিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সুস্থ সন্তানের জন্ম দেয়।

---

[১০৫] সুন্দরীমোহন দাস, বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা, ১৩৩০, প্রকাশকের নিবেদন। এর সমালোচনাতে বলা হচ্ছে, এই পুস্তকে কইয়েকটি মনোহারী গল্প-গাথার মধ্য দিয়া লেখক স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি আমাদের দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তৃতি করিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের জাতীয়-জীবন শক্তি কিরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহার উজ্জ্বল চিত্র ডঃ দাস কয়েকটি গল্পে হৃদয়গ্রাহীভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। “প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা,” স্বাস্থ্য সমাচার, ভাদ্র, ১৩৩৪, ১৬৫।

[১০৬] ঐ, ১০।

শুধু জাতীয়তাবাদী মহল থেকেই নয়, ঔপনিবেশিক প্রশাসনও মেস হস্টেলে ছাত্রদের জীবন নিয়ে একই সুরে নানা নৈতিক প্রশ্ন তোলে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের সি. রাসেলের করা এই মেস ও হস্টেল বিষয়ক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়

> Apart from the feebleness of character, slavishness and incompetence which shows itself in their college work and is the natural outcome of a slipshod and wholly undisciplined mode of life, there are positive moral evils of a more serious nature. Some of the messes are almost next door to brothels; and I have told by a trustworthy person of instances where students for the sake of economy have actually lived in brothels. The servant employed in the messes, I am told, are commonly women of loose character[১০৭]

উল্লেখ্য মেস-হস্টেল জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে এই ধরনের নৈতিক প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি মেসের খাদ্যদ্রব্য নিয়েও এক্ষেত্রে অভিযোগ নথিভুক্ত হয়, যার ফলে ছাত্রদের মানসিক বিকাশ এবং শারীরিক বৃদ্ধি ও সুস্থতা নিয়ে অনেকে চিন্তা প্রকাশ করেন।[১০৮] পাশাপাশি কবিরাজ সত্যচরণ সেনগুপ্ত কলকাতার রেস্তোরাঁগুলির নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য নিয়েও অভিযোগ তোলেন যেখানে নাকি ছাত্রদের ভিড় বেশি ।[১০৯] কিন্তু এই বিষয়গুলির সাথে যে প্রশ্নটি সর্বদা সংযুক্ত থাকে তা হল ছাত্রদের জীবনে নৈতিকতার প্রশ্নটি।

আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এ "ছাত্রগণের স্বাস্থ্য" এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে ছাপা হয় যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর করা একটি স্বাস্থ্য সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে রচিত। সেখানে বলা হয়,

> "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাইয়াছে, শতকরা ৭১ জন ছাত্র কোনো না কোনো রোগে ভুগিতেছে। তাঁহারা স্কটিশচার্চ্চ, ইউনিভার্সিটি, সিটি, প্রেসিডেন্সি, বিদ্যাসাগর, সি, এম, এস এবং বঙ্গবাসী কলেজের ছয় হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পাঠকগণ ইহা হইতেই দেশের অবস্থা অনুমান করিয়া লউন।"[১১০] এই একই বছর এই

---

[১০৭] Note of Reform of Students Messes and Hostels , (West Bengal State Archives, HP).

[১০৮] ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, "ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতা ও তাহার প্রতিকারের উপায়," *ভারতবর্ষ*, পৌষ, ১৩২৫, ৫।

[১০৯] সত্যচরণ সেনগুপ্ত, "বাঙ্গালি ছেলেদের স্বাস্থ্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, শ্রাবণ, ১৩৩০, ৩২৪-২৮।

[১১০] "ছাত্রগণের স্বাস্থ্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, বৈশাখ, ১৩৩০, ২৬০; এই সমীক্ষার ভিত্তিতে *প্রবাসী* পত্রিকাতেও একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে অনুমান করা হয় এইধরনের সমীক্ষা জেলাগুলিতে চালালেও দেখা যাবে সেখানেও ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভালো না। তাই *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রত্যেক জেলার ছাত্রদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রস্তাব দেওয়া হয় ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং পৌরসভাগুলিকে এই উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। "ছাত্রদের স্বাস্থ্য", *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩৩২, ৭৪০-৪১। এই একই অভিযোগ তোলেন ভূপেন্দ্রনাথ সরকার। ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, "ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতা ও তাহার প্রতিকারের উপায়", ৬৭।

> পত্রিকায় কবিরাজ সত্যচরণ সেনগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত সমীক্ষার প্রসঙ্গে লেখেন এই ৭১ শতাংশ ছাত্রের মধ্যে বহু সংখ্যক ছাত্র অসুস্থ হলেও তাদের অসুস্থতার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সত্যচরণ সেনগুপ্ত লেখেন, "তাহাদের কি রোগ-- তাহা আমরা বলিয়া দিতে পারি। সে রোগের মূল কারণ বাঙ্গালী ছাত্রের ব্রহ্মচর্য্য হানি। আগে পঠদ্দশায় আমাদের দেশের ছাত্রগণকে যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত, আধুনিক শিক্ষা-সমিতির নিয়মে তাহা আর করিতে হয় না।...কলেজ, মেস্ এবং হস্টেলে রাখিয়া ছাত্রদিগকে যে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, তাহা হইতেই যে সকল ছাত্রের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির অনুমিত অজ্ঞাত রোগের কারণ তদ্দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতিও কতকগুলি ছাত্রকে অজীর্ণ রোগগ্রস্থ বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন এবং ইহাও অবিসম্বাদিত সত্য যে, তাঁহাদের পরীক্ষিত ছাত্র ভিন্নও দেশের বহু সংখ্যক ছাত্রই এখন অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছে। ইহার মুখ্য কারণ – বাঙ্গালী ছাত্রের একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।"[১১১]

সত্যচরণ সেনগুপ্ত উদ্ধৃত অংশে বাঙালি ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানির জন্য যে দুটি বিষয়কে মূলত কার্যকারণ সম্পর্কের নিরিখে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তা হল পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং লাগামছাড়া অনৈতিক জীবনযাত্রা। যদিও একমাত্র চিকিৎসক মহলে নয়, ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিমপর্বে, বিশেষ করে উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশক পর্যন্ত ছাত্রদের নিয়ে রচিত সব ধরনের নীতিমালার রচয়িতারাই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভারতীয় সমাজের জন্য বিপজ্জনক বলে বর্ণনা করেছেন। ফলত আলোচ্য সময়ের চিকিৎসক মহলের এই ধরনের মতামত তৈরিতে ভূমিকা যে ভাগীদারিত্বের তা সহজেই অনুমেয়। লর্ড কার্জনের নিযুক্ত Indian Universities Commission-এর প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে এবং Indian Universities Act প্রবর্তনের ঠিক প্রাক্কালে এই কমিশন এবং আইনের বিষয়ে কিছু আশঙ্কা করে *স্বাস্থ্য* পত্রিকার সম্পাদক দুর্গাদাস বসু কিছু নির্দিষ্ট অভিযোগ করেছেন।[১১২] সরাসরি কার্জনকে সমালোচনা করে তিনি লেখেন ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষা যদি শুধুই মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো ফল করা হয় তাহলে সেই শিক্ষানীতিতে বড়রকম পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভয়ঙ্করভাবে বিগড়ে চলেছে। ছাত্রদের অসুস্থতার মূল উপসর্গ হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন দুর্বলতা, মাথায় পীড়া, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ইত্যাদি যার সাথে ধাতুদৌর্বল্যের উপসর্গগুলির অনেক মিল আছে। ফলত তিনি শিক্ষানীতিতে নৈতিক শিক্ষার প্রবর্তনের উপর সবচাইতে জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে ছাত্রদের 'বদ অভ্যাস'গুলি দূরীভূত হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এখানে তিনি শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "একটী জীবন হইতে জীবনান্তরে

---

[১১১] সত্যচরণ সেনগুপ্ত, "বাঙ্গালি ছেলেদের স্বাস্থ্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, শ্রাবণ, ১৩৩০, ৩২৫।

[১১২] "শিক্ষা ও স্বাস্থ্য," *স্বাস্থ্য*, কার্তিক, ১৩০৮, ১৯৫-২০৩।

জীবনীশক্তির সংক্রমণের নাম শিক্ষা। এ শিক্ষা ভারতে নাই। শিক্ষক হইতে ছাত্রবৃন্দ জীবনীশক্তি পায় না।”[১১৩] আমরা এই অধ্যায়ের তৃতীয় পর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি আলোচ্য সময়ে জীবনীশক্তির উৎস হিসেবে মূলত চিকিৎসকরা বীর্যকে বুঝিয়েছেন। ফলত এর সংরক্ষণের সাথে ছাত্রদের নৈতিক জীবনের উন্নতিকে সম্পর্কিত মনে করা হয়। লেখক কার্জনের সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে তাই নৈতিক শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকেই ছাত্রদের জন্য অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হতে শুরু করে।[১১৪] এমন অনেক পুস্তকে ছাত্রজীবনে কীভাবে সঠিক উপায়ে ব্রহ্মচর্য চর্চা করা যায় তার নিয়মাবলী প্রকাশ করা হয়। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর থেকে রাত্রে শুতে যাওয়া পর্যন্ত দিনের প্রতিটি পর্বে কীভাবে পৃথক পৃথক নিয়ম বিধি অনুযায়ী দিন অতিবাহিত করা উচিত তার বিস্তারিত নির্দেশের একটি তালিকা সেখানে ছাপা হয়।[১১৫] নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন পারিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের নির্দেশে তাঁদের শৈশবে কীভাবে দিনের প্রতিটি কাজকে তালিকাবদ্ধ করতে হতো এবং তার জন্য একটা খাতা থাকত। সেখানে নির্দেশিত নিয়মের বাইরে তাঁদের যদি কোনো পদস্খলন হতো (যেমন দিনের বেলা ঘুম, মেয়েদের প্রতি আসক্তি) তাহলে তা নিজেদের খাতায় তালিকাভুক্ত করতে হতো একটি বক্সের মতো ঘর তৈরি করে। আশা করা হতো এই পরিসংখ্যানটির নিরিখে তাঁরা নিজেদের ‘পদস্খলন’-এর মাত্রা সম্পর্কে অবগত

[১১৩] ঐ, *স্বাস্থ্য*, ১৯৮।

[১১৪] কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী, *ব্রহ্মচর্য্য* (ময়মনসিংহ: ১৩২৯) (আঃ); গিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য, *ব্রহ্মচর্য্য* (ঢাকা: ১৩২৬); আদীশ্বর ভট্টাচার্য, *ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তার প্রতিকার* (কলকাতা: ১৩২২); ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা* (কলকাতা, ১৩১৫); যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, *ব্রহ্মচর্য্য: বালক ও যুবক গণের নৈতিক বিধানার্থ* (কলকাতা: ১৩১৬) দ্বিতীয় সংস্করণ; শরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা, *ব্রহ্মচর্য্য*, ১৩২০; শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত, *ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষাজীবন* (চট্টোগ্রাম: ১৩২৩); শ্রীকুমার চিদানন্দ (প্রকাশক), *ব্রহ্মচর্য্য সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়মাবলী* (ঢাকা: ১৩১৫); সরোজিনী দেবী, *ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা* (কলকাতা: ১৩৩২); স্বামী রঘুনন্দন, *ছাত্রজীবন* (কলকাতা: ১৩১৮); সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *ছাত্রগণের চির-আচরণ ও পরিব্রাজকের উপদেশাবলী*, (জলপাইগুড়ি: ১৩২৯) দ্বিতীয় সংস্করণ; রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, *ব্রহ্মচর্য* (ফরিদপুর: ১৩০৫) দ্বিতীয় সংস্করণ; সুখময় দাশগুপ্ত, *গান্ধীর ছাত্র জীবন*, ১৩৩৮; প্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত, *যুবক-বন্ধু*, (কলকাতা: ১৮৯৭ খ্রি.); যামিনীরঞ্জন মজুমদার, *ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবন*, ১৩৩৫ (অষ্টম সংস্করণ); মাখন ব্রহ্মচারী, *ব্রহ্মচর্য্য*, ১৯২৬ খ্রি.; মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধূরী, *ব্রহ্মচর্য্য*, ১৯২৬ খ্রি.; নিগমানন্দ স্বামী, *ব্রহ্মচর্য্য*, ১৯২০ খ্রি.; গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, *ব্রহ্মচর্য্য* (তমলুক: ১৯১৭ খ্রি.); জগচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত, *ব্রহ্মচারী* (ঢাকা : ১৩২৬ খ্রি.); অন্নদাসুন্দরী দেবী, *ব্রহ্মচর্য্য* (বরিশাল: ১৩২৯); বিজয়কান্ত চৌধূরী, *ব্রহ্মচর্য্য* (নদীয়া : ১৩৩৩); ললিতমোহন জ্যোতির্ভূষণ, *ব্রহ্মচর্য্য বিজ্ঞান* (রংপুর : ১৩৩১); সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, *ব্রহ্মচর্য্য সাধন বিধি* (পাবনা : ১৯২৭ খ্রি.); ব্রজনাথ বিশ্বাস, *ছাত্রজীবন* (কলকাতা : ১৮৯২ খ্রি.); যামিনীরঞ্জন মজুমদার, *ব্রহ্মচর্য্য ও ছাত্রজীবন* (কলকাতা : ১৯২১ খ্রি.); যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, *ব্রহ্মচর্য্য*, ১৯২২ খ্রি.; যোগেশচন্দ্র সেন, *ব্রহ্মচর্য্য সাধন*, ১৯১৭ খ্রি. ।

[১১৫] এমন একটি পুস্তকের উদাহরণ যোগেন্দ্রমোহন ঘোষের লেখা *ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও যুবক গণের নৈতিক বিধানার্থ* বইটি যেখানে প্রতিটি দিন কী কী করা উচিত এবং কী করা নিষিদ্ধ তার বিস্তারিত তালিকা প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, *ব্রহ্মচর্য্য*, ১২-২২।

হবেন এবং নিজেদের সংশোধন করতে পারবেন।[১১৬] অনেক বিদ্যালয়ে এই ধরনের পুস্তিকা ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এমন একটি পুস্তকের লেখক চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থের সূচনায় লিখছেন, "সমাজে স্বাস্থ্যহানি ও অকালমৃত্যু যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমন মানসিক দুর্ব্বলতা ও আধ্যাত্মিক উদাসীনতা প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে।"[১১৭] এর জন্য শ্যামাচরণ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সমালোচনা করে লিখছেন, "শিক্ষা যদি সর্বাঙ্গসুন্দর না হইয়া অসম্পূর্ণ হয়, তবে সেই শিক্ষার ফলে সমাজে যেই মানবজীবন গঠিত হইয়া ওঠে তাহাও বিকলাঙ্গ ও অনুপযোগী হইয়া পড়ে। শরীর, মন ও আত্মার যুগপৎ সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের উপরই মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ নিহিত রইয়াছে। সুতরাং যেই শিক্ষাপদ্ধতি এই তিনটী উপাদানের সম্যক্ পরিস্ফুরণ করিয়া পুর্ণ মানবত্বের আদর্শে মানবকে গঠন করার সহায়তা করে, তাহাই একমাত্র অভীপ্সিত শিক্ষাপদ্ধতি।"[১১৮]

আলোচ্য পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে ছাত্রদের জীবনযাত্রা নিয়ে যে আশঙ্কাটি সবচেয়ে গভীরভাবে সামনে আসে তা হল তাদের ওপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের বাঁধন শিথিল হতে থাকার আশঙ্কা। এখানে হস্টেল বা মেসে তাদের লাগামছাড়া জীবনযাত্রার আশঙ্কাটি তো বটেই, পাশাপাশি বাড়ির ভৃত্য, সহপাঠী এবং ইস্কুল ও গৃহ শিক্ষকদের সম্পর্কেও নানা আশঙ্কা করা হয়। অনেকে অভিযোগ আনেন গৃহশিক্ষক অথবা বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের সঙ্গদোষে অনেক ছাত্র সমকামী যৌনাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।[১১৯] ফলত ছাত্রদের গতিবিধির উপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে সবচাইতে জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে *স্বাস্থ্য* পত্রিকায় "ব্রহ্মচর্য্য" শিরোনামে একটি ক্ষুদ্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে একটি অংশে লেখা হয়—

> আমাদের দেশে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে বালকগণ একরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে বলিলে বোধ হয় অসত্য কথা বলা হইল না। গুরু জনের প্রতি, বয়োবৃদ্ধের প্রতি, পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান দেখান একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। যাঁহারা সন্তানদিগকে এইরূপে প্রশ্রয় দিয়া উচ্ছৃঙ্খল করেন, তাঁহারা পিতার কর্ত্তব্য ত অবহেলন করেনই, পরন্তু তাঁহারা নিজ নিজ সন্তানগণের, প্রতিবেশীগণের ও স্বদেশের পরমশত্রু। প্রত্যেক পিতা বা অবিভাবকের উচিত, সন্তানগণকে বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া; কিসে সন্তানগণ স্বাবলম্বন শিক্ষা করে, কিসে তাহারা গুরুজনের অনুরক্ত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, কিসে তাহাদের কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল

---

[১১৬] Nirad C. Chaudhuri, *The Autobiography of an Unknown Indian* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968), 212.

[১১৭] শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত, *ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষাজীবন*, ১৩২৩, নিবেদন।

[১১৮] ঐ, নিবেদন।

[১১৯] আদীশর ভট্টাচার্য, *ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার*, ১৩২২, ১৫-১৬।

হয়, কিসে তাহাদের মনে বাল্যকাল হইতে বিলাসিতার বীজ সঙ্কুরিত না হইতে পারে, কিসে তাহারা কষ্টসহিষ্ণু হয়, কি উপায়ে ক্রোধাদি দমন করিতে শিক্ষা করিতে পারে, কিরূপে তাহারা মিতাচারী ও মিতব্যয়ী হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সৎপিতা মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা বাল্যকালে এই সকল শিক্ষা করে, তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আরোগী হইয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, পরমসুখে কাল কাটাইতে পারে। এইরূপে যাহারা ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে নিরন্তর রোগের যাতনা ভুগিতে বা আজীবন ডাক্তার কবিরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। রোগ ব্রহ্মচারীর ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না।[১২০]

বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে উদ্ধৃত অংশে যে দিকটির প্রতি পৃথকভাবে দৃষ্টি দেওয়া যায় তা হল কিশোর এবং নবযৌবনে পদার্পণ করা পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যের ওপর পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসার আশঙ্কা এবং সেই উদ্বেগ থেকে কিশোর-যুব সম্প্রদায়ের প্রতি নিয়ন্ত্রণ কায়েমের চেষ্টা। ইংরেজ উপনিবেশবাদ কর্তৃক ভারতীয় প্রজাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে দেখার যে প্রবণতার প্রতি আশিষ নন্দী ইঙ্গিত করেছেন,[১২১] তার কিছু লক্ষণ জাতীয়তাবাদী চিকিৎসকদের চিন্তার মধ্যেও লক্ষ করা যায়। যদিও আমাদের আলোচনা থেকে এটিও প্রতীয়মান হয় যে এক্ষেত্রে প্রেক্ষিত এবং ক্ষমতার অভিমুখগুলি ভিন্ন। ঔপনিবেশিক পর্বে বাল্যজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার এই প্রবণতা যে নানা ধরনের ক্ষমতার সমীকরণ থেকে উৎপন্ন হয় সেই বিষয়টি কিছু পণ্ডিত নজরে এনেছেন।[১২২] কিন্তু এখানে একাধারে প্রজন্মগত উচ্চতম ক্রম এবং *হেটেরোনরম্যাটিভ* পিতৃতান্ত্রিকতা কীভাবে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার সাথে ক্রিয়াশীল থেকেছে সেই প্রক্রিয়াটি আলাদাভাবে লক্ষ করার মতো।

আলোচ্য পর্বে ছাত্র-কিশোর-যুবকদের জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত পরিবার অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার বাসনার দিকটি সামনে আনলে সম্ভবত বিষয়টি অনুধাবন করতে কিছুটা সুবিধে হবে। সত্যচরণ সেনগুপ্ত ছাত্রদের পিতার উদ্দেশে লিখছেন, “মেস এবং হোস্টেলে যে সকল ছাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে,

---

[১২০] "স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ – ব্রহ্মচর্য্য," *স্বাস্থ্য,* মাঘ, ১৩০৬, ২৯০।

[১২১] Ashis Nandy, *Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self Under Colonialism* (New Delhi: Oxford University Press, 1983), 7,10, 14-16, 37-38.

[১২২] জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে সন্তানপালনের নতুন আদর্শ নিয়ে প্রদীপ বোস আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি অনেকটাই অস্পষ্ট এবং আলোচনাটি যান্ত্রিক। Pradip Kumar Bose, “Sones of the Nation: Child Rearing in the New Family,” in *Texts of Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal,* ed. Partha Chatterjee (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995), 118–44. কিন্তু তুলনায় শিশুশিক্ষা এবং তার সাথে উপনিবেশবাদের সম্পর্ক নিয়ে খুবই মনোজ্ঞ এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় যা বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশু সাহিত্য* (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯১ খ্রি.)।

তাহাদের অভিভাবকগণ প্রতিমাসে নিয়মিত অর্থ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন মাত্র, ছাত্র কলকাতায় কি ভাবে কাটাইতেছে, তাহার চিন্তা করিবার অনেকেরই অবসর নাই। কলেজ মেসে এবং হোস্টেলে রাখিয়া ছাত্রদিগকে যে যথেচ্ছা চারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, তাহা হইতেই যে সকল ছাত্রের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির অনুমিত অজ্ঞাত রোগের কারণ তদ্দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে।"[123] সুতরাং সন্তানদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি পিতাকে পরামর্শ দিচ্ছেন, "বাঙ্গালী বালককে বাঁচাইতে হইলে বাঙ্গালী অবিভাবককে শুধু অর্থ পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, যে পর্য্যন্ত কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ না রাখিয়া ছাত্রের কার্য্য কলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা না হইবে সে পর্য্যন্ত যে সুফলের আশা করা যাইবে না -- তাহা সুনিশ্চিত।"[১২৪] আদীশ্বর ভট্টাচার্য লিখছেন, "ভৃত্যদিগের সঙ্গে কখনও একাকী রেখো না (পুত্রকে)। এই সব ভৃত্যদের কাছে হাজার হাজার ছেলে হস্তমৈথুন শিখেছে। পাড়ার বড় ছেলেদের সঙ্গে একেবারেই মিশিতে দিও না। যাদের সঙ্গে মিশতে দিবে তাদের চরিত্র ভাল করে পরীক্ষা করবে।...বাড়ীতে যে গৃহশিক্ষক রাখবে তার আচরণের দিকে গোপনে নজর রাখবে। তোমরা মনে করিতে পার, যে বিবাহিত ও প্রবীণ শিক্ষক রাখিলে তার সংসর্গে ছেলে খারাপ হবে না।...Boy hunter বা ছেলে শিকারী মাস্টারের কীর্ত্তি চাপা থাকে না।"[১২৫]

পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে হস্টেল ও মেসগুলিতে থাকা ছাত্রদের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য মেস ও হস্টেল-ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়েও শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিরাও নানা পরামর্শ দেন। গুরুদাস ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হয় কলকাতা শহরের মেস এবং হস্টেলগুলির উন্নতির জন্য পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে। ১৯০৫ সালে এই কমিটির প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয় প্রতিটি কলেজকে নিজস্ব মেস ভাড়া নেওয়ার এবং এই বিষয়ে সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখে চলার। সেই সঙ্গে এই প্রতিবেদনে বলা হয়, "The principal which has led the committee to make this recommendation is that students should live either with their parents or recognized guardians or in a college mess or in a recognized hostel."[১২৬] ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তেইশ জন সদস্য নিয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা

---

[১২৩] সত্যচরণ সেনগুপ্ত, "বাঙ্গালি ছেলেদের স্বাস্থ্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, শ্রাবণ, ১৩৩০, ৩২৫।

[১২৪] সত্যচরণ সেনগুপ্ত, ৩২৭।

[১২৫] আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, *ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার*, ১৩২২, ১৫-১৬।

[১২৬] Note of reform of Students Messes and Hostels, 1905, (West Bengal State Archives, Home Political).

হয়।[১২৭] আলোচনার বিষয় ছিল কলকাতা, ঢাকা, পাটনা এবং অন্যান্য মফঃস্বল শহরের ইস্কুল ও কলেজের মেস ও হস্টেলগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনার কৌশল ঠিক করা। মেস ও হস্টেলগুলিতে মহিলাকর্মী বাতিল করা, প্রতিটি কলেজের অধীনে মেসগুলিকে নিয়ে আসা, সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত মেসগুলিতেই ছাত্রদের থাকা বাধ্যতামূলক করা, প্রতিটি মেসে একজন সুপারকে নিয়োগ করার মতো বহু পরামর্শ এই আলোচনা থেকে উঠে আসে।[১২৮] উল্লেখ্য ছাত্রদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি হওয়া এই সকল কমিটিগুলির উপর তাদের রাজনৈতিক কাজকর্মের প্রতি নজর রাখারও চাপ তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন এবং নীতিগ্রহণের জন্যও লর্ড কার্জনের প্রশাসন বদ্ধপরিকর ছিল যে সম্পর্কে *স্বাস্থ্য* পত্রিকায় কড়া সমালোচনা করা হয় তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর কয়েক বছর পরেই বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে এই সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।[১২৯] এখানে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরি করে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করতে চাইলে এবং ছাত্রদের জীবনযাত্রায় সংস্কারের পরিকল্পনা করলে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র তার বিরোধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল ভারতীয় ছাত্রদের জীবনের উন্নয়নের জন্য কী করা প্রয়োজন তা তাদের অবিভাবকরাই ঠিক করবেন। পঠনপাঠনের মান উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো নির্মাণই একমাত্র সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।[১৩০]

অন্যদিকে দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে বেসরকারি কলেজ পত্তনের উদ্যোগ শুধু কলকাতায় নয়, মফঃস্বল শহরগুলিতেও বৃদ্ধি পায়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের মতো করে ছাত্রদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে উদ্যোগী হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ জানান যে, কলেজে ২০৬ জন ছাত্র মেস ও হস্টেলে বসবাস করে। তাদের গতিবিধি নজর রাখা এবং এই বিষয়ে তাদের পরিবারকে সচেতন রাখার জন্য তাঁরা অনবরত তাঁদের পিতার সাথে যোগাযোগ বজায় রাখেন।[১৩১] এমনকী ঢাকার দৌলতপুরে হিন্দু অ্যাকাডেমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী পাঠদান করলেও, ছাত্রদের আলাদাভাবে

[১২৭] Ibid.

[১২৮] Ibid.

[১২৯] Ibid.

[১৩০] Ibid.

[১৩১] Ibid.

ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রমকে কলেজের পাঠদানের প্রাথমিক শিক্ষাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৩২] ফলত এখানে ছাত্রদের জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণ ঔপনিবেশিক সরকার এবং ভারতীয় উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদ উভয়ের প্রকল্পের অংশ হলেও এই বিষয়ে তাদের অভিমুখেও প্রভেদ স্পষ্ট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জাতীয়তাবাদী *হেটেরোনরম্যাটিভ* পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে সমকালীন ছাত্রদের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা শুধুই কিশোর-যুবকদের প্রতি পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ার আশঙ্কা নয়। তাই *স্বাস্থ্য* পত্রিকার পূর্ব উদ্ধৃত "ব্রহ্মচর্য্য" প্রবন্ধটির লেখকের কাছে এই সন্তানদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণে অপারগ পিতামাতারা শুধু তাঁদের সন্তানদের জন্য নয়, পরন্তু প্রতিবেশী এবং দেশের জন্যও পরম শত্রু। সুতরাং তাঁদের কাছে ছাত্রদের সঠিক শিক্ষা ফলত বৃহত্তর সামাজের উন্নয়ন প্রকল্পেরই অঙ্গ। তাই কবিরাজ সত্যচরণ সেনগুপ্ত সন্তানদের পিতামাতাদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে লিখছেন, "বালক রক্ষা করিতে হইলে, — সমাজ রক্ষা করিতে হইলে—দেশ রক্ষা করিতে হইলে—আমাদিগকে এসকল বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিতে হইবে।"[১৩৩] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বিপ্লবী সমিতিগুলির মধ্যে কনিষ্ঠ সদস্যদের উপর সমিতির উচ্চপর্যায়ের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করেছি। সেইখানে পরিবারের বাইরের একটি রাজনৈতিক গুপ্ত সংগঠগন হিসেবে তাদের কর্মপদ্ধতির সাথে পরিবারের মত একটি হেটেরো-পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ক্ষেত্রে আমরা ক্ষমতা প্রয়োগের চরিত্রে খুব একটা তফাত দেখতে পাইনা। ঘর এবং বাহির – দুই পরিসরেই আমরা কনিষ্ট সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণের একই ধরনের প্রয়াস কার্যকরি থাকতে দেখি।

'বালক রক্ষা' – সম্ভোগের বয়স, সন্তান প্রজনন ও পিতৃত্ব

পুরুষদের ছাত্রজীবন এবং গার্হস্থ্যজীবনের মধ্যে যে ব্যবধান থাকা জরুরি এমন উপলব্ধি বাংলায় উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষামূলক আলোচনায় বিস্তারিতভাবে উত্থাপিত হতে শুরু করে। সহবাসে সম্মতির বয়সের নিম্নসীমা নির্ধারণ নিয়ে নয়ের দশকের শুরুতে জনপরিসরে যে দীর্ঘ বিতর্কের সূচনা হয়, সেখানে পুরুষের সহবাসের বয়সের নিম্নসীমা নির্ধারণের জন্য কোনো আইনি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু বিশ শতকের সূচনা থেকেই চিকিৎসকদের রচনায় পুরুষ এবং নারী নির্বিশেষে যৌনসম্ভোগের ন্যূনতম বয়স

---

[১৩২] Ibid.

[১৩৩] সত্যচরণ সেনগুপ্ত, "কাজের কথা," *আয়ুর্ব্বেদ*, শ্রাবণ, ১৩২৫।

নির্ধারণের তাগিদ অনুভূত হতে দেখা যায়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার ছেলেদের বিয়ের বয়সের নিম্নসীমা নির্ধারণের জন্য বাংলার প্রাদেশিক আইন সভায় বিল উত্থাপিত হয়।[১৩৪] পরিশেষে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন সভায় *চাইল্ড ম্যারেজ প্রোটেকশন অ্যাক্ট* পাশ হয়, যা ছেলে এবং মেয়ে নির্বিশেষে উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য ঘোষিত হয়।[১৩৫]

উনিশ শতকের আটের দশক থেকেই যৌনসম্ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য চিকিৎসা এবং শিক্ষার পরিসরে ছাত্রদের মধ্যে যৌন নৈতিকতা তৈরির যে প্রক্রিয়াগুলি কার্যকরী ছিল তা আগের পর্বে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এরই সঙ্গে সঙ্গে বিশ শতকের সূচনা থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলিতে মেয়েদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্ক এবং 'বালক'দের মধ্যে সীমারেখা নির্মাণ করতে চেয়ে যৌনসম্ভোগের বয়স নির্ধারণের প্রসঙ্গটি কীভাবে উত্থাপিত হয় এবং তা কীভাবে ভবিষ্যতের জন্য প্রজননে সক্ষম যথার্থ পিতার শরীরের অবধারণাটি নির্মাণ করে সেই বিষয়েও আলোচ্য বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মেয়েদের সহবাসে সম্মতির বয়স নির্ধারণের জন্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদী মহল যে উদ্যোগগুলি নিচ্ছিলেন তার চরিত্র নিয়ে নারীবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতামতগত ভিন্নতা আছে। তনিকা সরকার যেখানে এই উদ্যোগগুলির ভিতর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অধিকারভিত্তিক জনমত তৈরির প্রাক্-ইতিহাস খুঁজে পেয়েছেন,[১৩৬] ঈশিতা পাণ্ডে সেখানে বালিকা চিহ্নিত করার এই পদ্ধতিকে ঔপনিবেশিক উদারনৈতিক রাজনীতির প্রকাশ বলে শনাক্ত করেছেন যা তাঁর মতে বয়সের এক পশ্চিমী রৈখিক (linear) অবধারণা থেকে জাত।[১৩৭] ঈশিতা পাণ্ডের এই সমালোচনাটি তিনি ছেলেদের বিয়ের বয়স নির্ধারণ করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করেছেন। আমাদের আলোচনাটি বিবাহ এবং সহবাস সম্মতির বয়স নির্ধারণের জন্য আইনি উদ্যোগগুলির উপর

---

[১৩৪] এই বিষয়ে সম্প্রতি দুজন ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। Ritu Birla, *Stages of Capital: Law, Culture and Market Governance in Late Colonial India* (Durham, NC: Duke University Press, 2010). Ishita Pande, "Sorting Boys and Men : Unlawful Intercourse, Boy-Protection, and the Child Marriage Restraint Act in Colonial India," *The Journal of the History of Childhood and Youth* 6, no. 2 (2013): 332–58.

[১৩৫] Ishita Pande, *Sex, Law, and the Politics of Age: Child Marriage in India, 1891–1937* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 162.

[১৩৬] Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism* (New Delhi: Parmanent Black, 2001). বিশেষভাবে এই আলোচনাটির জন্য দ্রষ্টব্য, Chapter 7 A Pre-History of Right? The Age of Consent Debate in Colonial Bengal, 226-49.

[১৩৭] Pande, *Sex, Law, and the Politics of Age: Child Marriage in India, 1891–1937*. এই আলোচনাটির জন্য দ্রষ্টব্য, Chapter 3 The Sex/Age System: Boy-Grooms, Young Rapists, and Child Protection in Hindu Liberalism, 123-65.

কেন্দ্রীভূত নয়। জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে প্রজননগত স্বাস্থ্যকে ঘিরে আলোচ্য সময়ে যে আলোচনাগুলি আত্মপ্রকাশ করছিল তার পর্যালোচনা করার মধ্য দিয়ে উক্ত বিষয়ে মতামত কীভাবে গড়ে উঠছিল তা আলোচনা করাই এখানে প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করব উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলে বিবিধ মতামত উঠে এসেছে এবং দশক এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও সম্প্রসারণ ঘটেছে। ফলত ঈশিতা পাণ্ডের আলোচনার নিরিখে শুধু উল্লেখ করা যায় যে ছেলেদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করতে চাওয়ার প্রয়াস এবং প্রক্রিয়াটি তুলনায় জটিল।

উনিশ শতকের নয়ের দশকে মেয়েদের বিবাহ এবং যৌনসম্ভোগের বয়সের নিম্নসীমা বেঁধে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে বাঙালি সমাজের বৃহৎ অংশই সমালোচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে চিকিৎসকদের মতামতও শামিল ছিল, যেখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল বাংলার গরম আবহাওয়ায় মেয়েরা বারো বছরের আগেই বয়ঃসন্ধিতে এসে পৌঁছায়। যেহেতু হিন্দু সমাজে গর্ভাধান প্রথা প্রচলিত আছে তাই বয়ঃসন্ধির আগে মেয়েদের বিবাহ হলেও সে তার বরের সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হতে পারে না। সেটি সম্ভব হয় বয়ঃসন্ধি পেরোনোর পরেই। ফলত এই নিয়মে বিবাহ সম্পাদিত হলে যেহেতু বয়ঃসন্ধির পরেই মেয়েরা যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হন, তাই সেখানে হিন্দু ধর্মীয় কর্তব্যও পালন হয় এবং সুস্থ সন্তান প্রজননের জন্য মেয়েদের শরীরও পরিপক্ক হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। অতএব উনিশ শতকের অন্তিম দুই দশকে চিকিৎসকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলোচনায় এই ব্যাখ্যাটি সমর্থিত হয়।[১৩৮] অন্যদিকে এই সময় থেকেই পাশাপাশি আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে জাতির জন্য সুস্থ এবং দীর্ঘজীবী সন্তান প্রজননকে কীভাবে সুনিশ্চিত করা যায়। কিন্তু এই সময়ের রচনাগুলিতে হিন্দু বংশধর প্রজননের প্রসঙ্গটি সরাসরি সামনে এলেও গর্ভাধান প্রথার যুক্তি দিয়ে বাল্যবিবাহের সমস্যাকে তেমনভাবে সম্বোধন করা হয় না। পরের শতকের শুরুতে পরিস্থিতিতে একটা বড় ধরনের বদল লক্ষ করা যায়। **১৯১৭** খ্রিস্টাব্দে *আয়ুর্ব্বেদ*-এর মতো চিকিৎসকদের একটি গোঁড়া পত্রিকায় গর্ভাধান প্রথা নিয়ে লেখকের অস্বস্তি স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। "ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ" প্রবন্ধের জনৈক লেখক এখানে মনু প্রদত্ত গর্ভাধান প্রথা পালন এবং বিবাহবিধিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে না পারলেও তার বাস্তবিক প্রয়োগের দিকটি নিয়ে সংশয়

[১৩৮] এমন কিছু রচনা, "বিবাহ-বিচার, হিন্দু শাস্ত্রমতে," *চিকিৎসা সম্মিলনী,* ১৮৮৫, ১১-১৩, ৪০-৪২, ১৩৮-৪১; "বালিকার সন্তান," *স্বাস্থ্য,* আশ্বিন, ১৩০৬, ১৬১-৬২।

প্রকাশ করেন। তাই বস্তুত সুস্থ সন্তান প্রজননের স্বার্থেই বাল্যবিবাহ প্রথার পরিবর্তন চেয়ে মেয়েদের জন্য ন্যূনতম ষোলো এবং পুরুষের জন্য পঁচিশ বছর বয়সকে বিয়ের সঠিক সময় হিসেবে তিনি গণ্য করেছেন।[১৩৯]

এই নিরিখেই বিশ শতকের বিশেষ করে দুইয়ের দশক থেকে ছেলেদের বিয়ে তথা সম্ভোগের বয়সবৃদ্ধির সপক্ষে চিকিৎসক মহলে মতামত জোরালো হতে থাকে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়নবিদ চুনীলাল বসু ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে *প্রবাসী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে "শারীর স্বাস্থ্য-বিধান" শিরোনামে একটি প্রবন্ধমালা লিখতে শুরু করেন যা পরের বছর বই আকারে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি বাঙালির স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এখানে সংযম অধ্যায়ের শুরুতে তিনি লিখছেন, "সমাজ-রক্ষার জন্য বিবাহের সৃষ্টি। প্রজাবৃদ্ধি ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ইহা যে ইন্দ্রিয়-সংযমের পক্ষে প্রধান সহায় তাহা সকল সমাজে ও সকল ধর্ম্মে একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে।...আমাদিগের হিন্দু-সমাজে বিবাহ অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে স্বার্থ ও আত্মসুখের বশবর্ত্তী হইয়া এই পরম মঙ্গলকর প্রথার অপব্যাবহার দ্বারা কি বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকি।...যে পুত্রোৎপাদন বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রী-পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন না করিয়া, কুলপাবন পুত্র কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না।"[১৪০] বিবাহিত জীবনে প্রজনন উদ্দেশ্য ব্যতীত যৌনাচারের বিরোধিতা করার পাশাপাশি চুনীলাল বসু এক্ষেত্রে বাল্যবিবাহকে অনেক জোরালোভাবে সমালোচনা করেছেন। এই বিষয়ে তিনি লিখছেন, "যে বয়সে, যে অবস্থায় এবং যে ভাবে আমাদিগের দেশে পুত্র কন্যা জন্মিতেছে, তাহাতে তাহারা যে ক্ষীণশক্তি, চিররুগ্ন ও অল্পজীবী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? পিতা মাতার দেহ পূর্ণতালাভ করিবার বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাদিগের দেহে ইন্দ্রিয়-চালনা-জনিত ক্ষয়ের আরম্ভ হইয়া থাকে।...প্রথমতঃ, ২৫ বৎসরের ন্যূনে পুরুষের দেহ পূর্ণতালাভ করে না; ইহার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইলে অপূর্ণ দেহ হইতে সবল সন্তান লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র।"[১৪১] পাশাপাশি তিনি বালিকা বিবাহেরও একই যুক্তিতে ঘোর সমালোচনা করে বলেছেন "এই সকল দুগ্ধপোষ্য বালিকাদিগের গর্ভ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা যে কখন জীবনে শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা বাতুলের কার্য্য মাত্র।"[১৪২]

---

[১৩৯] "ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ," *আয়ুর্ব্বেদ*, পৌষ, ১৩২৪, ১৫০-৫৮; মাঘ, ১৩২৪, ২১৮-২৩।

[১৪০] চুনীলাল বসু, *শারীর স্বাস্থ্য-বিধান*, ১৯১৩, ৩১৫-১৭।

[১৪১] ঐ, ৩১৭।

[১৪২] ঐ, ৩১৭।

এই একই সময় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কবিরাজ শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত *ব্রহ্মচর্য্য ও বাল্যবিবাহ* নামে একটি বই লেখেন। এখানেও তিনি ব্রহ্মচর্য এবং বীর্যধারণের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে চুনীলালের মতন একই যুক্তি উত্থাপন করে লেখেন, "পুরুষের পক্ষে ২১ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিতে হইবে। তবে স্থলবিশেষে তৎপূর্ব্বে বা পরেও বিবাহ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিদ্যাধ্যয়ন শেষ না করিয়া বিবাহ করা শাস্ত্রের বিধান নহে। সাম্যক্ জ্ঞানলাভের পরই ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।"[১৪৩] আগের প্রজন্মের থেকে শ্যামাচরণের যুক্তিক্রমে এক্ষেত্রে একটি সরণ লক্ষ করা যায়। তিনি গর্ভাধানের নিয়মকে গ্রহণযোগ্য মনে করলেও তার বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলে লিখছেন, "বালকের কিংবা বালিকার বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু বালকের স্ত্রীসঙ্গ ও বালিকার স্বামীসঙ্গ সম্বন্ধে শাস্ত্রে তীব্র নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান উভয়েই কঠোর শাসনবাক্য দ্বারা গর্ভাধানের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যদি সমাজে ইন্দ্রিয়সংযম ও প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে বাল্যবিবাহে সমাজের অমঙ্গল না হইতে পারে, কিন্তু সমাজের এই অধঃপতনের দিনে, এই ইন্দ্রিয়লালসার অবাধপ্রসারের দিনে, বাল্যবিবাহ সমাজের মঙ্গলকর হইতে পারে না।"[১৪৪] দুইয়ের দশকের শুরু থেকে *আয়ুর্ব্বেদ*-এর মতো রক্ষণশীল পত্রিকাতেও এমন অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যেখানে ছেলেদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধির সপক্ষে সওয়াল করা হয়।[১৪৫] ছেলেদের বিয়ের বয়স বৃদ্ধির সপক্ষে সেখানে বারে বারে তিনটি কারণকে সামনে আনা হয়। এক, শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি না করে ছেলেদের বিবাহ করা অযৌক্তিক, কারণ তাতে শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। দুই, পরিণতবয়স্ক না হয়ে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হয়ে গার্হস্থ্যজীবনে পদার্পণ করলে পুরুষের সাংসারিক বোঝা মাথায় নেওয়া সম্ভবপর হয় না। ফলত পিতা হিসেবে সে সন্তান পালনের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হয়। তিন, পঁচিশ বছর না পেরোলে ছেলেদের বীর্য পরিণত হয় না। ফলত তার পূর্বে সন্তান জন্মালে সেই সন্তান সমাজ ও দেশের জন্য উপযুক্ত বলশালী হয়ে উঠতে পারে না।

উল্লেখযোগ্য, দ্বিতীয় কারণটি এখানে অনেক চিকিৎসকের কাছেই চূড়ান্ত সমস্যা হিসেবে ধরা দেয়। চুনীলাল বসু এক্ষেত্রে লেখেন, "আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে খাওয়াদাওয়ার সঙ্গতি নাই, শীততাপ হইতে শরীর

---

[১৪৩] শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত, *ব্রহ্মচর্য্য ও বাল্যবিবাহ*, ১৩২৩, ১৪-১৫।

[১৪৪] ঐ, ১৬।

[১৪৫] মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, "ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, কার্তিক, ১৩২৩, ৭২-৭৪; সতীশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "ব্রহ্মচর্য্যে বালক সমাজ", *আয়ুর্ব্বেদ*, চৈত্র, ১৩২৫, ২৭০-৭৩; সত্যচরণ সেনগুপ্ত, "ব্রহ্মচর্য্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, বৈশাখ, ১৩৩০, ২১৪-১৮; শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, "ছাত্রদের স্বাস্থ্য: মানিকগঞ্জ যুব সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণ," বৈশাখ, *আয়ুর্ব্বেদ*, ১৩৩৩, ১৪-১৮।

রক্ষার জন্য উপযুক্ত বস্ত্রসংস্থানের উপায় নাই, রোগ হইতে উপযুক্ত চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা নাই, পুত্রকন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই, অথচ ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহে এরূপ অবস্থায় গৃহস্থকে প্রতি বৎসর সন্তানের মুখ দেখিবার আশায় নিরাশ হইতে হয় না! এই সংযমের অভাবে আমাদিগের গৃহস্থগণ (Middle class man) দিন দিন ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছে।"[১৪৬] এই একই যুক্তিতে পঁচিশ বছরের পূর্বে পুরুষ বিয়ে করলে আর্থিকভাবে সে দুর্বিপাকে পড়তে পারে এই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর্থিক সঞ্চয় এবং বীর্য সঞ্চয়ের সমান্তরালতার মেটাফোরটি ব্যবহার করে লেখেন, "সঞ্চয়বিমুখ গৃহস্থ ব্যয়বাহুল্য দ্বারা যেরূপ ঋণী হইয়া পড়ে, সেই রূপ ব্রহ্মচর্যাদি-হীন মানব, অকালে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া, অসংযত চিত্তে রিপুর তাড়নায়, অত্যধিক ক্ষয়জনিত-পাপে ব্যাধিরূপ ঋণ যাতনায় রাত্রি দিবা দুঃখ ভোগ করে।"[১৪৭] ফলত দুইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে চিকিৎসক মহলের অনেকের বয়ানে আয়ের পথ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণের সময় বৃদ্ধি করার পরামর্শ এবং গৃহস্থের আর্থিক অনিশ্চয়তার প্রতি বারে বারে নজর টানার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এখানে বহু চিকিৎসক পুষ্টিকর খাদ্য এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের অপ্রতুলতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। একই সাথে ম্যালেরিয়া, যক্ষার মতো মহামারী এবং অপুষ্টিজনিত রোগগুলির প্রতি তাদের দুশ্চিন্তা ব্যক্ত হয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য খাদ্য, পুষ্টি, বাসস্থান, সংযমী জীবনশৈলী নিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকাগুলিতে অজস্র প্রবন্ধের প্রকাশ আমাদের সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে চিকিৎসকদের মধ্যে তৈরি হতে থাকা চিন্তাগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে। ফলত সন্তানসম্ভবা নারী, সন্তান এবং সার্বিকভাবে গৃহস্থের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্ধারণ করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত, নিম্ন- মধ্যবিত্তের আর্থিক দুরবস্থার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার প্রবণতা অথবা নানা সংক্রমক রোগ আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে এই বিষয়গুলি তুলে ধরার চেষ্টা মধ্যবিত্তের সমকালীল বাস্তবতার প্রতি চিকিৎসকদের দুশ্চিন্তাকে একভাবে দর্শায়। ফলত উক্ত প্রেক্ষিতে ছেলেদের বিবাহের বয়স নির্ধারণ এবং তার পিতৃত্বের প্রতি সুবিচার করার জন্য এই আবেদনগুলি আলোচ্য সময়ে জোরালোভাবে সামনে আসতে থাকে। সম্ভবত এই প্রেক্ষিতেই জাতির জন্য সুস্থ সন্তান প্রজননের অপারগতা নিয়ে তাঁরা বারে বারে নিজেদের দুশ্চিন্তা

---

[১৪৬] চুনীলাল বসু, *শারীর স্বাস্থ্য-বিধান*, ৩১৮-১৯।

[১৪৭] মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, "ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য," *আয়ুর্ব্বেদ*, কার্তিক, ১৩২৩, ৭৩।

প্রকাশ করেন। এখানে উল্লেখ্য এই আলোচনাগুলির মধ্যেই আবার অনেক চিকিৎসক হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের বিষয়টিও সামনে আনেন,[১৪৮] যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

আমরা আগের পর্বে কিশোর এবং যুবকদের ওপর পিতামাতা এবং পরিবারিক পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার যে প্রবণতাগুলি লক্ষ করেছি, তা ছেলেদের বিয়ের বয়স বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টার মধ্যেও আবশ্যিকভাবেই লক্ষণীয়। বিশেষত বিয়ের বয়স নির্ধারণের জন্য বালক এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সীমারেখা রচনার প্রয়াস থেকে শুরু করে তাদের শিক্ষা-জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, তাদের দৈনন্দিন রোজনামচার প্রতি নজর রাখার বাসনা, বিবাহ পরবর্তী জীবনে তাদের যৌনাচারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার এই তাগিদগুলি থেকে তা প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করা যায়। এই প্রজন্মগত পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণগুলি কার্যকরী করতে চাওয়ার প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়ভাবে ব্রহ্মচর্যকে জীবনচর্চার আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে তুলে ধরতে দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার মারোয়াড়ি ব্যবসায়িক পরিবারের সন্তান এবং বিশিষ্ট আইনবিদ ও রাজনীতিবিদ দেবীপ্রসাদ খৈতান Bengal Child Marriage Prevention Bill উত্থাপন করেন। এই বিলটি বাংলায় হিন্দু বাল্যবিবাহ রোধের উদ্দেশ্যে গৃহীত হলেও নির্দিষ্টভাবে এটি ছিল বালকদের বিবাহ রোধের জন্য প্রস্তাবিত আইন।[১৪৯] এখানে ছেলেদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম আঠেরো রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই বিলেও লেখা হয়—

> The causes of public health and education have greatly suffered by the unfortunate practice of child-marriage. . . . The Shastras prescribe that Brahmacharya [celibate studenthood, the classical Hindu conception of the stage of life preceding marriage] should be practiced at the age of 20 years and more. This injunction was closely observed by Hindus for several

---

[১৪৮] এমন কিছু রচনা - শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত, *ব্রহ্মচর্য্য ও বাল্যবিবাহ,* ১৩২৩। স্বাস্থ্য সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ যেমন - কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "হিন্দু ডুবিল! বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতেছে," ভাদ্র, *স্বাস্থ্য সমাচার,* ১৩২৭, ৯৭-১০৩; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়," কার্তিক, ১৩২৭, ১৪৮-৫৭; "জাতির মৃত্যু হয় কিসে?," পৌষ, ১৩২৭, ১৯৮-২০১; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়," ভাদ্র, ১৩২৮, ১১৩-২৩; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়," কার্তিক, ১৩২৮, ১৬৯-৭৮; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়," অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ২১৩-১৬; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়," পৌষ, ১৩২৮, ২২৫-৩৬; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়," শ্রাবণ, ১৩২৯, ৯৪-৯৯; "শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার নিবারণের উপায়," আশ্বিন, ১৩২৯, ১৪৬-৫৩; "বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার," পৌষ, ১৩২৯, ২২৫-৩৩১; "বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার," ফাল্গুন, ১৩২৯, ২৮৬-৮৯। *আয়ুর্ব্বেদ* পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ যেমন - সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঙ্গালীর ভগ্ন স্বাস্থ্য," *আয়ুর্ব্বেদ,* ফাল্গুন, ১৩২৫, ২১৬-২১; ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত, "বাঙ্গালির বাঁচিবার উপায়," *আয়ুর্ব্বেদ,* আষাঢ়, ১৩২৮, ৩৭১-৭৫; সতীশচন্দ্র রায়, "বংশরক্ষার কর্তব্য অবধারণ," কার্তিক, ১৩২৫, ৬১-৬৪; রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী, "আমরা হীন বীর্য্য কেন?," মাঘ, ১৩৩০, ১২০-২১।

[১৪৯] Birla, *Stages of Capital: Law, Culture and Market Governance in Late Colonial India*, 220–21.

> centuries, when they were recognised to be on a high level in every way. Their downfall synchronised with the adoption of evil customs, of which child-marriage is one.
>
> As the first stage [of reform] I propose that the minimum age for the marriage of boys may be fixed at 18. Some . . . feel that the age had better been fixed at 16 to start with. The All-India Marwari Agarwal Mahasabha fixed the minimum age at 16. The general feeling seems to be in favor of 18.[১৫০]

ফলত ব্রহ্মচর্যের ধারণাটি দুইয়ের দশকে যে ছেলেদের বিবাহের বয়স নির্ধারণের জন্য প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হতে থাকে তার পরিধিটি আমরা এই আইনি প্রস্তাবনার মধ্য থেকে আংশিকভাবে অনুমান করতে পারি। একই সাথে এখানে একটি প্রাপ্তবয়স্কতার অনুষঙ্গও বর্তমান যেখানে সন্তানের পিতা হয়ে ওঠার জন্য এই সময় থেকে একটি বিশেষ বয়সসীমা, শারীরিক পরিণতি এবং আর্থিক সংস্থানের প্রসঙ্গ যুক্ত হয়। বিশেষ করে আলোচ্য সময় থেকে সুস্থ সন্তান প্রজনন এবং তাকে পালন করার জন্য নির্ধাতিত বয়সের পর পিতৃত্ব গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত - এই যুক্তিটি জোরালো হয়ে ওঠে।

এই একই সময়পর্বে যৌনতা সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন ধরনের রচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই প্রবন্ধ এবং পুস্তকগুলির বিষয় পূর্ব-আলোচিত রচনার থেকে আমূলভাবে ভিন্ন নয়। কিন্তু এখানে যৌনবিজ্ঞান (sexology) হল আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে উনিশ শতকের শেষ দু-এক দশকে থেকে যে রচনাগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে সেখানে লেখকরা যৌনতা সম্পর্কে আলোচনাগুলি উপস্থাপন করার সময় প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে যৌনতার বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি পরিসর তৈরির প্রয়োজনীতা অনুভব করেছেন এবং এই বিষয়ে সন্তানের পিতামাতাকে উপদেশ দিয়েছেন শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার সংকীর্ণ ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে সন্তানদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষায় সহায়কের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হতে।[১৫১] ফলত জনপরিসরে যৌনতা বিষয়ক আলোচনাগুলির সূত্রপাতের তাগিদ আমরা উনিশ শতকের শেষপর্ব থেকেই লক্ষ বালককরতে পারি।[১৫২] কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে যৌনবিজ্ঞানের আলোচনার একটি বৃহৎ পরিসর তৈরি হতে দেখা যায়, যা ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত চিকিৎসকদের

---

[১৫০] উদ্ধৃত, Birla, 221.

[১৫১] এমন কিছু গ্রন্থের উদাহরণ, আদীশ্বর ভট্টাচার্য, *ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তার প্রতিকার* (কলকাতা: ১৩২২); যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, *ব্রহ্মচর্য্য: বালক ও যুবকের নৈতিক বিধানার্থে* (কলকাতা: ১৩১৬) দ্বিতীয় সংস্করণ।

[১৫২] অবশ্যই তার পাশাপাশি একদম ক্লিনিকাল উদ্দেশ্যে ডাক্তারদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুস্তক গুলির কথাও সেখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু তার বাইরে মূলত সাধারণ পাঠকদের জন্য রচনা এবং আলোচনা এখানে কতটা স্থান পেয়েছে বা উদ্দেশ্য ছিল তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আলোচনার থেকে চরিত্রগতভাবে কিছুটা আলাদা। সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঐতিহাসিক এই কালপর্বে যৌনবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, বিশ্বব্যাপী জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্যোগগ্রহণ অথবা যৌন-মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে একটি ট্রান্সন্যাশনাল পরিসর তৈরি হতে দেখেছেন,[১৫৩] এই রচনাগুলি অনেকক্ষেত্রে তারই অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। এক্ষেত্রে ছাত্র-কিশোর-যুবক অথবা নবদম্পতির জন্য নানাধরনের যৌনজ্ঞান উপস্থিত করা এই ধরনের রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ছাত্র-কিশোর-যুবকদের উদ্দেশ করে রচিত এমন বেশ কিছু রচনার কথা এখানে উল্লেখ করতে পারা যায়। *স্বাস্থ্য সমাচার* পত্রিকায় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জনৈক লেখকের লেখা "কৈশোরে যৌন সমস্যা" যেখানে কিশোরদের সঠিক জ্ঞানের অভাবকেই তাদের 'পদস্খলনের' প্রাথমিক কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৫৪] তার জন্য সঠিক যৌনজ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে লেখক পিতা-মাতাকে সম্বোধন করে লিখছেন, "জননেন্দ্রিয় কিছু অপবিত্র পদার্থ নহে। যাঁহারা পবিত্র তাঁহাদের নিকট সমস্তই পবিত্র, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জননেন্দ্রিয়ও আমাদের একটী ইন্দ্রিয় এবং জীব জগতে বর্দ্ধনের জন্যই ইহার আবশ্যকতা।...আমাদের দেশে হিন্দুমতে শিবলিঙ্গকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা হয় এবং হিন্দু শাস্ত্রের মতে প্রথম পুত্রের জন্ম দেওয়া ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। পবিত্র জ্ঞানে এই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যে শিক্ষায় শরীরতত্ত্বের কোন স্থান নাই, সেরূপ শিক্ষাই অসম্পূর্ণ;..."[১৫৫] একই সাথে এই প্রবন্ধটিতে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য সেটি হল এই যে সন্তান যাতে সঠিক যৌনজ্ঞান আহরণ করতে পারে সেই পন্থাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করে কীভাবে সন্তান যৌনাচার সম্পর্কে ভুল তথ্য পেয়ে থাকে সেই বিষয়ে লেখক অনেক বিস্তারিতভাবে পুত্রসন্তানের পিতামাতাকে অবগত করতে চেয়েছেন। এখানে কিশোরদের 'বিপথে' যাওয়ার জন্য সেই পারিবারিক ভৃত্য, এলাকার বিপথগামী ছেলে অথবা উপন্যাস-বায়স্কোপকেই তিনি দায়ী করছেন যা ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত রচনাগুলির

---

[১৫৩] Sanjam Ahluwalia, *Reproductive Restraints: Birth Control in India, 1877-1947* (Urbana: University of Illinois Press, 2008); Sarah Hodges, *Contraception, Colonialism and Commerce: Birth Control in South India, 1920-1940* (Aldershot: Ashgate, 2008); Sutanuka Banerjee, *Unbinding Bodies and Desires: Re-searching the Home, the World and the In between in Nara-Naree, the Only Bengali Journal on Health, Hygiene, Sex (1939-1950),* Unpublished PhD Thesis, (Aalborg University: 2014); Srikant Botre and Douglas E. Haynes, "Sexual Knowledge, Sexual Anxieties: Middle-Class Males in Western India and the Correspondence in Samaj Swasthya, 1927–53."; Douglas E. Haynes, "Gandhi, Brahmacharya and Global Sexual Science, 1919–38," *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 2020.

[১৫৪] "কৈশোরে যৌন সমস্যা," *স্বাস্থ্য সমাচার,* আষাঢ়, ১৩২০, ১০৭-১৭।

[১৫৫] ঐ, ১১২।

একটি সাধারণ ট্রোপ। অন্তিমে তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন, "কিশোরকালে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনই শ্রেয়; কার্য্যে ও চিন্তায় পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।"[১৫৬]

এই একই পত্রিকায় নয় বছরের মাথায় এমনই একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার নাম "গুপ্ত প্রকাশ বা চরিত্রগঠনের পন্থা: কিশোর ও যুবকদিগের পাঠ্য"।[১৫৭] এই প্রবন্ধটিতে তুলনার অনেকটা বিস্তারিতভাবে পুরুষ এবং নারীর প্রজননতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন লেখক রমেশচন্দ্র রায়। পাশাপাশি এই প্রবন্ধের তিনটি বিষয়কে আলাদাভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক, আমরা ধাতুদৌর্বল্য সম্পর্কিত রচনায় পুরুষদের বীর্যক্ষয় নিয়ে যে ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ হতে দেখি তার উপস্থিতি। সেই সঙ্গে গনোরিয়া, সিফিলিসের মতো সংক্রামক যৌন ব্যাধি নিয়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগ। দুই, যৌনাচারকে সম্পূর্ণ একটি পবিত্র ক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা, যা সম্ভব ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়ে। তিন, পুরুষ ও নারীর বিবাহ অথবা সম্ভোগের বয়স যথাক্রমে ন্যূনতম পঁচিশ এবং ষোলো নির্ধারিত করার পরামর্শ এবং যৌনাচারকে একেবারেই সন্তান উৎপাদনের উপায় হিসেবে গণ্য করার নীতিগ্রহণ। যেমন তিনি এক স্থানে লিখছেন, "গোড়া হইতে স্পষ্ট করিয়া বলি, জননেন্দ্রিয় আমাদের আলোচ্য বিষয় বিধেয়, জনন-তন্ত্র (generative system) সম্পর্কীয় কয়েকটি কথা এখানে বলিব। প্রথমতঃ এই কথা স্মরণ কর — জীবনের জন্ম দিবারই জন্য জীব জন্মিয়াছে — আর্থাৎ বংশ-রক্ষা করাই সৃষ্টির মূল কারণ। যে ব্যক্তি সমাজকে সর্ব্ববিধায় উপযুক্ত সন্তান দান করিয়া যাইতে পারে, তাহারই জন্ম সার্থক; তাহা যে না পারে, তাহার জন্ম বিড়ম্বনা এই বড় কথাটি খুব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং খুব যত্ন করিয়া মনে রাখিতে হইবে।"[১৫৮] ফলত *স্বাস্থ্য সমাচার*-এর উল্লিখিত দুটি প্রবন্ধে আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় যৌনবিজ্ঞান হলেও সেটি যৌননৈতিকতার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে বহন করে যা ব্রহ্মচর্যকেন্দ্রিক রচনাগুলিতেও বর্তমান, তা হল যৌনাচারকে হিন্দু জীবনচক্রের অতি আবশ্যক অংশ হিসেবে দেখার প্রবণতা, প্রজননের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উপায়ে বীর্যপাত করা ক্ষতিকর এই ধারণাটি এবং বিবাহের জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বয়সবৃদ্ধির পরামর্শ। কিন্তু এই একই পত্রিকায় কিছু বছর পর সেক্সলজিস্ট নৃপেন্দ্রকুমার বসুর বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত

---

[১৫৬] ঐ , ১১৩।

[১৫৭] রমেশচন্দ্র রায়, "গুপ্ত প্রকাশ বা চরিত্রগঠনের পন্থা : কিশোর ও যুবকদিগের পাঠ্য," *স্বাস্থ্য সমাচার*, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩২৯, ১২১-৪৬।

[১৫৮] ঐ, ১২৪।

হতে শুরু করে যেখানে যৌনাচার সম্পর্কে প্রচলিত হিন্দু বর্ণাশ্রম জীবনচক্রের ধারণার থেকে সরণ দেখতে পাওয়া যায়।

নৃপেন্দ্রকুমার বসুর এমন একটি প্রবন্ধ "পুত্রের যৌন প্রশ্নের উত্তর কি?"[১৫৯] যেখানে তিনি মূলত শিশু এবং কিশোর বয়সে পুত্রসন্তানরা যৌনতা সম্পর্কে পিতা-মাতার কাছে যে কৌতুহলী প্রশ্নগুলি করে থাকে তার উত্তর তাঁরা কীভাবে দেবেন এবং এই বিষয়টি পুত্রের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর প্রয়াস নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "অধিকাংশ পিতাই বুঝিতে পারেন যে, পারিবারিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া, পরবর্তী জীবনে বিকৃত-লব্ধ শিক্ষার ফলে পুত্রের কতখানি অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুকে এ প্রশ্নের উত্তর যে করিয়া হউক্ শুনাইতেই হইবে; পিতামাতা নিজেরা যদি অপারগ হন্, তাহা হইলে ইহার ভার অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা উচিত।"[১৬০] এই যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তিনি কখনো বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা পারিবারিক ডাক্তারদের কথা উল্লেখ করেন, যাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুত্রের মাতা-পিতা এই জ্ঞানগুলি সন্তানের কাছে সহজভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন। সমকালীন এক পশ্চিমী সেক্সলজিস্ট জর্জ এ. ডর্সের রচনার অনেকটা অংশ তিনি এই প্রবন্ধে অনূদিত করে লেখেন যে এই বৈজ্ঞানিক যৌনজ্ঞানের প্রসারে সামাজিক সংকীর্ণতা বোধ মূল প্রতিবন্ধকতা। তাঁর মতে "কিন্তু একা সমাজকেই কেবল দোষ দেওয়া যায় না। যৌন বিষয়টিকে এইরূপ জুজু-বুড়ী করিয়া রাখার জঘন্য ব্যাপারটি একদল মানুষের তৈয়ারী কুসংস্কারজনিত আইনের ফলে পুরুষানুক্রমে আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার সম্বন্ধীয় কোনো জ্ঞানলাভ বা প্রচার পাপ বলিয়া ধারণা করা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানকে এই জন্ম-জন্মার্জিত কুসংস্কারের সহিত লড়িতে হইতেছে।"[১৬১] আর এই প্রয়াস যদি পিতা-মাতা গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে, "বালকগণ এইগুলি (যৌন যন্ত্র) পরিপক্ক ও সুপরিপুষ্ট হইবার পূর্বে, দূষিত অন্তরের প্রেরণায় হউক বা কুসংসর্গের প্রতিপত্তিতে হউক, তাহাদের অপব্যবহার শিক্ষা করে। ইহার ফলে বন্ধ্যাতা আসে, নানা বিপজ্জনক শরীর-ক্ষয়কর ব্যাধি আসে, জীবন্মৃত্যু, নহেতো অকাল মৃত্যু!"[১৬২] আর যদি তাদের যৌনশিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে, "যুবা-বয়সে যদি কখনও থিয়েটারে, বায়স্কোপে বা কোনো নগ্ন নারীমূর্ত্তি প্রতিভাত হয়,

---

[১৫৯] নৃপেন্দ্রকুমার বসু, "পুত্রের যৌন প্রশ্নের উত্তর কি?," *স্বাস্থ্য সমাচার*, কার্তিক, ১৩৩৪, ২২৮-৩২, অগ্রহায়ণ, ২৪১-৪৮।

[১৬০] নৃপেন্দ্রকুমার বসু, "পুত্রের যৌন প্রশ্নের উত্তর কি?," ২২৯।

[১৬১] ঐ, ২৩১।

[১৬২] ঐ, ২৩২।

তাহা হইলে সে বিস্মিত আগ্রহে চঞ্চল হইয়া উঠিবে না। ইহাতে সত্যই তাহার কোনো যৌন-লিপ্সা জাগ্রত হইইয়া উঠিবে না; তখন তাহার বারবনিতার সন্ধানে গুপ্ত অভিসার কিংবা অভাবপক্ষে নিজের যৌন বৃত্তিকে অন্য বিকৃত উপায়ে চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা একেবারে কমিয়া যাইবে।”[১৬৩] বিশ শতকের দুইয়ের দশকে এমন বেশ কিছু প্রবন্ধ *স্বাস্থ্য সমাচার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যেখানে তিনি ছাত্র-কিশোর-যুবকদের যৌনবিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা ছাড়াও পুরুষ-নারী নির্বিশেষে কম বয়সে বিবাহর সমস্যার দিকটি তুলে ধরেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে সওয়াল করেন এবং এই বিষয়ে নানাধরনের জন্মনিরোধক প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সওয়াল করেন।[১৬৪] ফলত ব্রহ্মচর্যকেন্দ্রিক যৌননৈতিকতা থেকে তাঁর রচনায় সরণ স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

এর পরের দশকগুলিতে এই বিষয়ে আলোচনার পরিধি যে আরও সম্প্রসারিত হয় এবং বিশেষ করে ইউরোপ-আমেরিকার যৌনবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের সাথে অনেক ভারতীয় সংস্কারকের যে সরাসরি যোগাযোগ এবং কথোপকথন বাড়তে থাকে তা সম্প্রতি সনজাম আলুওয়ালিয়া, ডগলাস ই হায়েন্স, সুতনুকা ভট্টাচার্য প্রমুখের গবেষণা আমাদের অবগত করে।[১৬৫] যদিও যৌনবিজ্ঞানের প্রসার আমাদের সন্দর্ভের মূল পরিধির অন্তর্গত নয় এবং বিশেষ করে বিশ শতকের চার এবং পাঁচের দশকে যখন এই বিষয় নিয়ে আলোচনার পরিধি অনেকটা সম্প্রসারিত হয় সেই সময়পর্ব আমাদের গবেষণার পরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু দুই-তিনের দশকে যখন ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত আলোচনাগুলি যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল তখন তার পাশাপাশি যৌনবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনাগুলিরও সূত্রপাত লক্ষ করা গিয়েছে। তাই যৌনতা সম্পর্কে আলোচনা এবং জ্ঞানের পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী সময় সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা প্রাসঙ্গিক। এখানে যৌনতা বিষয়ক দুই ধরনের আলোচনার মধ্যে যে দিকটিতে আমরা পরিবর্তন লক্ষ করি তা হল যৌননৈতিকতা সম্পর্কে উনিশ শতকে যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় সিদ্ধান্তগুলি বলশালী হয়েছিল দ্বিতীয় সারির রচনায় তার প্রভাব অনেকটাই ক্ষীণ হতে শুরু

---

[১৬৩] ঐ, ২৪৩।

[১৬৪] নৃপেন্দ্রকুমার বসু, “জন্ম সংরোধের বিপক্ষবাদের বিরুদ্ধে,” *স্বাস্থ্য সমাচার*, বৈশাখ-আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩৩৩, ৬-১৩, ৮৫-৯৩, ১৫৬-২২০।

[১৬৫] Ahluwalia, *Reproductive Restraints : Birth Control in India, 1877-1947*; Srikant Botre and Douglas E. Haynes, “Sexual Knowledge, Sexual Anxieties: Middle-Class Males in Western India and the Correspondence in Samaj Swasthya, 1927–53”; Sutanuka Banerjee, “Unbinding Bodies and Desires: Re-searching the Home, the World and the In between in Nara-Naree, the Only Bengali Journal on Health, Hygiene, Sex (1939-1950)” Unpublished PhD Thesis, (Aalborg University: 2014).

করেছে। যদিও আমরা এই পর্বের আলোচনায় এই বিষয়টিও লক্ষ করলাম যে ছাত্র-কিশোর-যুবকদের জীবনযাপন, তাদের যৌনাচার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই দু-ধরনের রচনা একইরকম উদ্যোগী থেকেছে। অন্যদিকে বিশেষ করে আমরা ছেলেদের বিবাহের বয়স নির্ধারণের প্রচেষ্টাটি বিশ শতকের দুইয়ের দশক থেকেই দু-ধরনের রচনাতেই লক্ষ করতে পারি। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে এখানে ডগলাস ই হায়ান্সের একটি নিখুঁত পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশ শতকের তিনের দশক থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী আলোচনাগুলি যখন ভারতেও জনপ্রিয় হতে শুরু করে তখন তার প্রতিক্রিয়ায় গান্ধিও ধীরে ধীরে ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকে দৃঢ় করতে শুরু করেন। গান্ধির কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য পশ্চিমী পদ্ধতিগুলির বিপরীতে ব্রহ্মচর্য হয়ে ওঠে আদর্শ ভোগবাদবিরোধী জন্মনিয়ন্ত্রণের ভারতীয় পন্থা।[১৬৬] ফলত সদ্য সম্প্রসারিত যৌনজ্ঞান এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যে একাধিক ক্ষেত্রে বিরোধ এবং মিলের স্থানগুলি পাশাপাশি অবস্থান করছিল সেই বিষয়টি এখানে অনুধাবন করা যায়।

কিন্তু আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে এখানে যে প্রবণতাগুলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল এই সকল ধরনের আলোচনাতেই ছাত্র-কিশোর-যুবকদের বিবাহের বয়সের নিম্নসীমা বাড়ানোর তাগিদ, বিবাহের পূর্বে যেকোনো ধরনের যৌনাচারকে শারীরিকভাবে ক্ষতিকর হিসেবে দেখার প্রবণতা এবং বিবাহের পর কেবলমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যেই যৌনাচারকে মান্যতা দেওয়ার প্রচেষ্টাটি পরিলক্ষিত হয়। একই সাথে আর একটি বিষয়ও অনেকসময়ই সংযুক্ত থাকতে দেখা যায় — এই ধরনের প্রজননজাত সন্তানের সাথে ভবিষ্যৎ সমাজ, জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে সম্পৃক্ত করে দেখার প্রবণতা। নৃপেন্দ্রকুমার বসু জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সেখানে সমকালীন সংস্কারবিমুখ হিন্দু সমাজকে গভীরভাবে সমালোচনা করলেও ধ্বংসোন্মুখ জাতির তত্ত্বটিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখছেন, সমকালীন অনেকেই তাঁকে এই কারণে সমালোচনা করেছেন যে জন্মনিয়ন্ত্রণের পশ্চিমী ধারণা বাংলায় প্রসারিত হলে 'ধ্বংসোন্মুখ' হিন্দুসংখ্যা আরও হ্রাস পাবে। তার উত্তরে তিনি পরিসংখ্যান এবং যুক্তি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন জন্মনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করলে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের সম্ভাবনা তো থাকেই না, বরং কম বয়সে বিবাহ এবং অসংখ্য সন্তান প্রজননের ফলেই বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার বেশি। তুলনায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে যে সুস্থ সবল

[১৬৬] Haynes, "Gandhi, Brahmacharya and Global Sexual Science, 1919–38."

হিন্দু সন্তানের প্রজনন হবে তার ফলে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে রোধ করা সম্ভব।[১৬৭] ফলত ব্রহ্মচর্যের তত্ত্ব তো বটেই, নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও যে এক্ষেত্রে হেটেরোনরম্যাটিভ প্রজননকেন্দ্রিক হিন্দু সংখ্যাতত্ত্বের যুক্তিকে শক্ত করে সেই বিষয়টিও এখান থেকে অনুধাবন করা যায়।

উপসংহার

জনস্বাস্থ্যের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আমরা প্রজননের প্রসঙ্গে যে আলোচনাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি সেখানে লক্ষ করা যায় যে উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে একাধিক উপাদান এই আলোচনার সাথে সংযোজিত ও বিয়োজিত হয়েছে। ফলত প্রজননগত স্বাস্থের প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয়ে বিবর্তনের একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এর পাশাপাশি দীর্ঘ ছয় দশক জুড়ে যৌনাচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্থায়ী ধারণা জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে নির্মাণ ও সামাজিক চেতনায় প্রোথিত হতে দেখা গেছে। তা হল প্রজননকে যৌনাচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করার এবং বাঙ্গালি পুরুষদেহ ও তার প্রজননশীলতা সম্পর্কে একটি লিঙ্গায়িত উদ্বেগ তৈরি হওয়ার প্রবনতা। এই অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনায় আমরা সেই বিষয়টিকে অনুধাবন করলাম যে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিমপর্বে কীভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র যৌনতা সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক *হেটেরোনরম্যাটিভ* বিধি তৈরী করে, আর চিকিৎসাকরণের মাধ্যমে পুরুষদেহের লিঙ্গায়িত অবধারণা নির্মাণ করে। আর এই প্রক্রিয়ায় বর্ণবাদী চেতনা, উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। লক্ষ করার বিষয় হল ঔপনিবেশিক শাসন বাঙ্গালি পুরুষদের যেভাবে দুর্বল ও মেয়েলি হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, দেশীয় স্বাস্থ্যজ্ঞদের আলোচনার মধ্যদিয়ে ঔপনিবেসিক সমাজে তা চিকিৎসাগত মান্যতা লাভ করে। পাশাপাশি আমরা আর একটি প্রবণতা প্রত্যক্ষ করি যে বাঙালির স্বাস্থ্যের দুর্বলতার জন্য দেশীয় স্বাস্থ্যজ্ঞরা কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসন এবং তার জনস্বাস্থ্য নীতিকে সমালোচনার মধ্যদিয়ে নিয়ে গিয়ে এই বিষয়ে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী পরিসর তৈরি করেন। ফলত এখানে লক্ষ করা যায় কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক প্রতর্কের মাধ্যমে দেশীয় শিক্ষিত জনগণের মধ্যে যৌনতা ও পৌরুষের একটি বিধিবদ্ধ ধারণা প্রবেশ করেছে তা নয়। এখানে এটিও প্রতিভাত হয় যে দেশীয় জনগণও এই প্রক্রিয়ায় নানাভাবে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং নানাভাবে এই নির্মাণ প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করেছে, বাঙালি পুরুষদেহের নির্মাণ প্রক্রিয়াতে

[১৬৭] নৃপেন্দ্রকুমার বসু, "জন্ম-সংরোধের বিপক্ষবাদের বিরুদ্ধে," *স্বাস্থ্য সমাচার*, আষাঢ়, ১৩৩৩, ৮৫-৯৩।

ক্রিয়াশীল ঔপনিবেশিক মতাদর্শকে সমালোচনার মাধ্যমে বাঙ্গালি পৌরুষের একটি ভিন্ন অবধারণাকে নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছে।

দেশীয় স্বাস্থবিদদের চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চায় ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে দেখার মাধ্যমে আমরা বাঙ্গালি পৌরুষের উক্ত ভিন্ন অবধারণাটি গঠনের প্রক্রিয়াটিকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাঙালি দুর্বল পুরুষের ধারণার নির্মাণ হওয়া এবং সমকালীন জনস্বাস্থ্যের নিরিখে রোগগ্রস্ত বাঙ্গালি দেহের বাস্তব চিত্রের মুখোমুখি হওয়া দেশীয় স্বাস্থবিদদের বয়ানে বাঙালির দেহ সম্পর্কে উদ্বেগ দানা বাঁধতে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ায় দীর্ঘ ষাট দশক জুড়ে দেশীয় স্বাস্থ্যজ্ঞদের মধ্যে বাঙ্গালি পৌরুষের যে সঙ্কট অনুভূত হয়েছে তা নানা পর্যায়ে বাঙালির প্রজননগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগগুলিকে বাড়িয়ে তোলে। এখানে ব্রহ্মচর্য হয়ে উঠেছে প্রজননশীল পৌরুষকে সুনিশ্চিত করার উপায় যা হিন্দু বাঙালির ‘হৃত পৌরুষ’ পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে মান্যতা পায়। এই প্রসঙ্গেই আধিপত্যবাদী পৌরুষ এবং ব্রহ্মচর্যের সম্পর্কের প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

আমরা বর্তমান অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য এবং প্রজননের গভীর সংযোগের মধ্য দিয়ে পৌরুষের যে প্রজননশীলতার ভাষ্য তৈরি হতে দেখি তা নানাভাবে পৌরুষ সম্পর্কে আধিপত্যবাদী প্রতর্ককে সামনে আনে। এখানে প্রজননশীল দেহ গড়ার তাগিদ এবং পৌরুষের উদ্বেগ একে অপরকে পুষ্ট করতে দেখাযায়। কিন্তু এই প্রবনতাটির মধ্যেও বেশ কিছু স্তর লক্ষ্য করি আমরা। যেমন উনিশ শতকের অন্তিম দশকগুলিতে দেশীয় সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার মিশন কার্যকরী হয় ঔপনিবেশিক বয়ানে চিহ্নিত ‘দুর্বল বাঙালি’ ভদ্রলোকের দেহকে ‘পুনরুদ্ধার’ করার তাগিদ থেকে। কিন্তু বিশ শতকের একের দশক থেকে হিন্দু হ্রাসমানতার তত্ত্ব জনপ্রিয় হতে থাকায় সেই প্রবনতাটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানের অন্তভুক্ত হয়ে যায়। আর এই পুরো সময়কাল জুড়ে হিন্দু সন্তান, বিশেষ করে পুরুষ সন্তান প্রজননের তাগিদ যৌনতা সম্পর্কে *হেটেরোনরম্যাটিভ* বিধিকে পুষ্ট করে। ফলত ঔপনিবেশিক বাঙলায় আধিপত্যবাদী পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়া এবং যৌনতা সম্পর্কে *হেটেরোনরম্যাটিভ* বিধি তৈরীর প্রক্রিয়া দু’টি একে অপরের ক্ষেত্রে পরিপূরক হয়ে ওঠে। এখানে পৌরুষের উক্ত ভাষ্য নির্মাণে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা, নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণের কৌশল কার্যকারী হতে দেখি। এই প্রক্রিয়ার উপাদান আমরা বহু পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসন কতৃক আনিত সংস্কৃতির পাশাপাশি দেশীয় সামাজিক কাঠামোর মধ্যেও নানাভাবে নিহিত থাকতে দেখেছি। বিশেষ করে ছাত্র-কিশোর-যুবকদের যৌনাচার নিয়ন্ত্রণের পশ্চাতে বাঙালি

মধ্যবিত্তের প্রজন্মগত নিয়ন্ত্রণের বাসনা যেভাবে কার্যকরী থাকে তা আলোচ্য সময়ে ক্ষমতা, নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছার এক আধিপত্যবাদী প্রয়াসকে সামনে আনে যা প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষের ভাষ্যকে চরিতার্থ করার জন্য আবশ্যিক হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য এই আধিপত্যবাদী ভাষ্যটি মূলগতভাবে যে বর্জনমূলক থেকেছে তা নয়, কিন্তু যখন সে হিন্দু হ্রাসমানতার তত্ত্বের মতো সাম্প্রদায়িক দুশ্চিন্তার অংশ হয়ে যায় তখন সেটি এমন এক পুরুষ দেহের 'উদ্ধার' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় যা প্রাথমিক ভাবে একটি হিন্দুর দেহ। এইক্ষেত্রে লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, তিনের দশকের পর থেকে যখন চিকিৎসাশাস্ত্রীয় বয়ান থেকে ব্রহ্মচর্যের ধারণাটি মুছে যেতে থাকে তখনও এই ধরনের প্রজননকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণকামী যৌনবিধি এবং পৌরুষের ধারণাগুলি ক্রিয়াশীল থেকে যায়।

উপসংহার

১৯০১ সালের এপ্রিল-মে মাসে *ভারতী* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চিরকুমার সভা* ধারাবাহিক উপন্যাস হিসাবে ছাপা শুরু হয়। উপন্যাস, গল্প, নাটক বহু খাত বয়ে এই রচনাটির যাত্রা শেষ হয় ১৯২৬ সালের ২১শে এপ্রিলে এর নাট্যরূপ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। *চিরকুমার সভা*-র দীর্ঘ পঁচিশ বছরের প্রকাশ-ইতিহাসের রকমফের, এই রচনাটি নিয়ে লেখকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন মজাদার তেমনি মধ্যবিত্ত বাঙালির বিপরীত লিঙ্গের অন্তরঙ্গতার পরিবর্তনশীল সামাজচিত্রকে প্রকট করে,[১] তেমনই আকর্ষণীয় এর বিষয় ও প্রকাশকালের সম্পর্কটিও। এটি যখন প্রথম প্রকাশ পায় তার প্রায় দু-দশক অগে থেকেই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী প্রতর্কে ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গটি পৌরুষের একটি আদর্শ রূপের ছবি তৈরি করে। আর খুব আকর্ষণীয়ভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে *চিরকুমার সভা* নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে যে রচনাটির মূল প্রতিপাদ্য ব্রহ্মচর্যেরই রসবোধপূর্ণ কিন্তু কড়া সমালোচনা।[২] মতিলাল রায়ের প্রবর্ত্তক সংঘে আমন্ত্রণ পেয়ে চন্দননগর থেকে ঘুরে আসার পর একটি সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> একটা কথা আমি তখন জানতুমও না, জানলে আমি খুব ঝগড়া করতাম। ওরা নাকি celibacy preach করে। আমাকে বললেন – আমি সময়ের সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে যাচ্ছি। প্রথমে একরকম ঠিক করেছিলাম, তার পর তাদের মনের গতি দেখে ব্যবস্থাটা একটু বদলে দিলাম। এটা খুব wise ব্যবস্থা বটে, কিন্তু বিবাহ দিয়া celibacyতে থাকা preach করাটা আমি মস্ত ভুল মনে করি। সাধারণ জীবনের মধ্যে spiritual ক'রে তোলবার শিক্ষা দাও – ভাল; কিন্তু physical বাদ দিয়ে spiritualটা হতে পারে না, এটা annihilation, এটা সৃষ্টি নয়। জগতের ব্যবস্থাটাকে অমান্য ক'রে যাওয়া এটা একটা অধর্ম্ম আমি মনে করি"।[৩]

শুধু রবীন্দ্রনাথ একা নন, বিশেষ করে বিশ শতকের দুইয়ের দশক থেকে বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে সমালোচনা করতে শুরু করেছেন।[৪] এমনকী এই সময় থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের

---

[১] শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, "চিরকুমার সভা রহস্য," *আরেক রকম,* দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ যুগ্ম সংখ্যা, অক্টোবর,২০১৪, ৯১-৯৮।

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রজাপতির নির্বন্ধ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড (সুলভ সংস্করণ), (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১০), ৫১৯-৬১৩।

[৩] হরিহর শেঠ, "রবীন্দ্র-সমীপে", *মাসিক বসুমতি,* আষাঢ়, ১৩৩৪, ৪৩৬।

[৪] বেশ কিছু সাহিত্যিক তাঁদের গল্প উপন্যাসে ব্রহ্মচর্যচর্চাকারীদের নিয়ে ঠাট্টা করেছেন, ব্রহ্মচর্য যারা প্রচার করতে চায় তাদের সমালোচনা করেছেন। যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শহরতলি উপন্যাসটিতে এক নীতিবাগিস ডাক্তারের প্রসঙ্গ এসেছে যিনি তার ডিসপেন্ডারিতে নিদ্রাহীনতা জনিত সমস্যা নিয়ে আসা এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের চাকরি হীন যুবককে তার মানসির-শারিরীক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রহ্মচর্যর পরামর্শ দেন। ডাক্তার সেই যুবকের ব্যক্তিগত জীবনের নানা মানসিক টানাপোড়েন এবং আর্থিক দুরবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেযান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, "শহরতলি", *রচনাসমগ্র,* তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা

পৌরুষের ভাষ্যটিতেও পরিবর্তন আসতে শুরু করে।[৫] আমরা তিনের দশকের পর থেকে ব্রহ্মচর্য নিয়ে উপদেশমূলক রচনাতেও ব্যাপক ভাঁটা পড়তে দেখি। ফলত ব্রহ্মচর্যের মতো আধিপত্যবাদী পৌরুষের ভাষ্যগুলিকে আমরা যেভাবে চারটি অধ্যায়ে নির্মাণ হতে দেখি, সেই নির্মাণ পর্বের মধ্যেই যে এর সম্পর্কে নানা পরিসর থেকে সমালোচনা উঠে আসতে থাকে তা বোধগম্য হয়। যদিও এইক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত পৌরুষের আধিপত্যবাদী যে বয়ানগুলির নির্মাণ হয়, তা কীভাবে সমালোচিত হয় তার সামগ্রিক রূপটিকে উত্থাপন করা এই সন্দর্ভের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না। এবং আমরা সূচনাতেই উল্লেখ করেছিলাম পৌরুষের আধিপত্যবাদী চরিত্রটি কখনোই সামগ্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, সেই বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল থেকেছি। এমনকী বাঙালি মধ্যবিত্তের এই ধরনের আধিপত্যবাদী প্রকল্পের বিরোধী ভাষ্য যে তৈরি হয়েছে তা দলিত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আমরা উত্থাপন করেছি। কিন্তু এই ধরনের প্রতিরোধের বৃহত্তর চিত্রটি উত্থাপন করাও প্রয়োজন আছে যে বিষয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণা জরুরি।

আমরা বিগত চারটি অধ্যায় জুড়ে যে অনুসুন্ধানমূলক অধ্যয়নটি চালিয়েছি তার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল দেশীয় সমাজে বাঙালি ভদ্রলোকের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায় সেই বৃহৎ প্রক্রিয়ার সাথে পৌরুষের প্রসঙ্গটি কীভাবে সংযুক্ত তা বোঝার প্রয়াস। বা অন্যভাবে বলতে গেলে বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষিতে বাঙালি ভদ্রলোকের আধিপত্যবাদী প্রবণতাকে বুঝতে হলে পৌরুষের প্রসঙ্গে আলোচনা কতটা প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা। এইক্ষেত্রে আমরা বাংলায় উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে পৌরুষের আদর্শ রূপ হিসেবে ব্রহ্মচর্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাগুলিকে আলোচনার কেন্দ্রে এনে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম যে কেন আলোচ্য সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে এই প্রবণতাটি প্রকট হয় এবং তার মধ্য দিয়ে বাঙালি ভদ্রলোকের কী ধরনের আধিপত্যের বয়ান সামনে আসে।

একাডেমি, ১৯৯৮) ১২১-২৭১; বনফুলের *ঐরাবত* নামকএকটি ছোট গল্পে এক গ্রামের নীতিবাগিশ পন্ডিতের গল্প লেখেন যিনি ছাত্রদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য প্রচারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং পুরো এলাকায় হাসির পাত্র হন। বনফুল, "ঐরাবত," *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প* (কলকাতা: বাণীশিল্প, ১৩৫৫), ৪৩-৪৭।

[৫] এই বিষয়ে অনুরাধা রায়ের আলোচনা খুব প্রাসঙ্গিক যেখানে তিনি দেখান বিশ শতকের তিনের দশক থেকে বাঙালি শিক্ষিত যুবকদের বড় অংশের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের মতো অনুশাসনমূলক বিধির বিরুদ্ধে সমালোচনা তৈরি হয়। নতুন প্রজন্মের লেখক সাহিত্যিকরা যৌবনকে উদ্- যাপন করার আদর্শ চর্চা করেন যাকে তিনি 'যৌবনবাদ' বলে চিহ্নিত করছেন। Anuradha Roy, "Riding the Wave of Youth Power : Bengal during the 1920's," *Journal of History* 25, (2007-2008): 50–78. অন্যদিকে সুদেষ্ণা ব্যানার্জি দেখিয়েছেন বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক পটপরিবর্তন জাতীয়তাবাদী পৌরুষের ভাষ্যে বদল আনে। সেখানে ব্রহ্মচর্যর ধারণাটি অনেক পরিসরে তার জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। Sudeshna Banerjee, "Spirituality and Nationalist Domesticity : Rereading the Relationship," *The Calcutta Historical Journal* 19 & 20, (1997-1998): 173–204.

আমরা আমাদের দীর্ঘ আলোচনায় যেমন ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণের প্রয়াসগুলির পিছনে দীর্ঘ এবং বিবিধ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করেছি, পাশাপাশি এই বিষয়টাও লক্ষ করেছি যে বাঙালি সাবর্ণ হিন্দু মধ্যবিত্তের বয়ানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে যে আলোচনাগুলি উঠে আসে সেখানে পৌরুষের যে আদর্শ রূপটি তৈরি হয় তা আধিপত্যবাদের বিবিধ ভাষ্য তৈরি করে।

উল্লিখিত ভাষ্যগুলি সম্পর্কে পুনরায় কিছু পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বলশালী হওয়া যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি তা জনপরিসরে পৌরুষ এবং পুরুষের যৌন নৈতিকতা সম্পর্কে তৈরি হতে থাকা সন্দর্ভকে অনুধাবন করার ব্যাপারে আমাদের কাছে কিছু সূত্র হাজির করেছে। এই পৌরুষের ভাবমূর্তি এমন একটি বিশ্বদর্শনের উপর ভর করে বিকশিত হয়, যেখানে আমরা জাতিচেতনার কেন্দ্র হয়ে উঠতে দেখি এক আদর্শ গার্হস্থ্যের কল্পনা। আমরা এই বিষয়টিও লক্ষ করেছি যে এক নির্দিষ্ট ধাঁচের আধ্যাত্মিকতা বোধ, যা হিন্দু পুনরুত্থানবাদ থেকে তার আদর্শগত অনুপ্রেরণা পেয়েছিল, তা এই গার্হস্থ্যের কল্পনাকে আকার দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এহেন বিশ্বচেতনা পারিবারিক-সামাজিক-জাতীয় জীবনের মধ্যে এমন এক সূত্রধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যেখানে জীবনকে এক বিশেষ ধরনের নৈতিকতা বোধের আওতায় দেখার প্রবণতা আমরা প্রত্যক্ষ করি। ফলত আমরা এই ধরনের সন্দর্ভে সেই সব নীতিমালার অনুপ্রবেশ হতে দেখি যা একাধারে যৌনসম্ভোগকে যেমন কেবল সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস নেয়, তেমনি এর পাশাপাশি ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করে যা সন্তান উৎপাদন ব্যতীত আর অন্য কোনো ধরনের উদ্দেশ্য থেকে তাড়িত যৌনাচারকে নিয়ন্ত্রণের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সামনে আসে আদর্শ বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক কল্পিত আদর্শ পৌরুষের ভাষ্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডল যেভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষদের কোণঠাসা করে দেয়, মেয়েলি হওয়ার অপবাদ যেভাবে বাঙালি পৌরুষের স্বাভিমানে আঘাত করে তা বিবর্ধমান সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করে বাঙালি পৌরুষের একটি বিকল্প ভাষ্যনির্মাণে। এখানেই আমরা ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করি। এখানে যে বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা হল 'পৌরুষদৃপ্ত ইংরেজ' এই নির্মাণের বিপরীতে এক ধরনের বিকল্প পৌরুষের নির্মাণ, বিকল্প হওয়ার পাশাপাশি যা প্রতি-আধিপত্যবাদী। ব্রহ্মচর্যের এই ভাষ্য যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের আধিপত্যবাদী চেতনাকে সামনে আনে

এবং এই আধিপত্যবাদী পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বাভিমান যে ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তা আমাদের সামনে পিতৃতন্ত্রের একটি বিশেষ ধরনকে প্রকট করে। ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে আদর্শায়িত করার এই প্রবণতা লিঙ্গ, প্রজন্ম এবং জাতপাতগত ভিন্নতার নিরিখে কার্যকরী হয় যা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ, পিতৃতন্ত্র এবং পৌরুষের পারস্পারিক সম্পর্ককে বোঝার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্রহ্মচর্য এইক্ষেত্রে আধিপত্যবাদী পৌরুষের যে সংস্করণকে সামনে আনে তা মূলত আত্ম-নিয়ন্ত্রণমূলক। এই ধরনের নৈতিকতাবোধ হিন্দু গার্হস্থ্যে পুরুষের অবস্থানকে চিহ্নিত করার বিধি হিসেবে তার মান্যতা দাবি করে। আর এর মধ্য দিয়েই প্রতি-আধিপত্যবাদী পৌরুষের ভাষ্যটিকে আমরা প্রকট হতে দেখি যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণকেই তার পুরুষোচিত গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষকে যেমন পৌরুষদৃপ্ত ইংরেজের ধারণার মুখোমুখি হওয়ার আত্মবিশ্বাস দেয়, আবার এর মধ্য দিয়েই আত্মনিয়ন্ত্রণ হয়ে ওঠে আত্ম-অনুশাসনের মতো একটি আধিপত্যবাদী প্রকল্পের ভাষ্য। যদিও পৌরুষের এই ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্মাণ যে পরিবর্তনশীল এবং চলমান একটি প্রক্রিয়া এবং আধিপত্যের ভাষ্যও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলাতে থাকে তা আমরা অনুধাবন করতে পারি পরের অধ্যায়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী বয়ানে পৌরুষ এবং ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গটি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে।

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনার দোসর হিসেবে বংশবৃদ্ধিকেন্দ্রিক আলোচনাগুলি যখন আত্মপ্রকাশ করল— সেখানে লিঙ্গ, জাতপাত আর সাম্প্রদায়িক চেতনাগুলি যেভাবে উত্থাপিত হয় তার চরিত্র ভিন্ন এবং তারা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত থেকেছে। ফলত এই সংযোগের বৃহত্তর সূত্রগুলি থেকে আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যকামী পৌরুষ নির্মাণের প্রক্রিয়াটির প্রসঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। আমরা এখানে দেখেছি হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানে ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষের অস্তিত্ব দুদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তা একাধারে হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে চায় এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে দিশা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের নৈতিক তথা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে ওঠে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতর্কে পিতৃসুলভ হয়ে ওঠার এই তাগিদের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষের উদ্বেগমোচনের উপায়গুলি মূর্ত হতে দেখি। একদিকে হিন্দুর দুর্বলতা এবং হ্রাসমানতার কারণকে নিম্ন জাতির জনতার দেহে প্রোথিত করা এবং তার থেকে উদ্ধারের জন্য জাতিব্যবস্থায় সংস্কারের

উদ্যোগ নেওয়ার মধ্যে সেই নৈতিক পৌরুষের প্রকাশকে আমরা লক্ষ করতে পারি যা এক আধিপত্যকামী চেহারা নিতে থাকে।

এখানে আমরা হিন্দু সাবর্ণ মধ্যবিত্ত বাঙালির সাম্প্রদায়িক বয়ানে একাধিক পুরুষালি 'অপরকে' চিহ্নিত হতে দেখি যে প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। যেমন একাধারে মুসলমান পৌরুষকে 'অপর' হিসেবে কখনো সদর্থক চরিত্রে চিত্রিত করা, কখনো নঞর্থক ভূমিকায় কল্পনা করার প্রবণতা। অপরদিকে শ্রমশীল দলিত দেহকে দুর্বল, নৈতিক এবং সুস্থ সন্তান প্রজননে অক্ষম হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস। এখানে সর্বোপরি যে প্রবণতাটি সবচেয়ে বেশী নজরে আসে তা হল দলিত পুরুষ এবং হিন্দু মেয়েদের যৌনতা, তথা দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ বহাল করার বাসনা। এই নিয়ন্ত্রণের পশ্চাতে আমরা সাবর্ণ হিন্দু নেতৃত্বের নৈতিক ভিত্তিকে প্রতিভাত হতে দেখি একটি বর্জনমূলক (exclutionary) পৌরুষের অবধারণার মধ্য দিয়ে। এখানে ব্রহ্মচর্য হয়ে ওঠে সেই বর্জনমূলক সাবর্ণ পৌরুষের ভিত্তি যা চর্চার মধ্য দিয়ে উচ্চবর্ণ হিন্দু পুরুষ নেতৃত্ব দলিত পুরুষ এবং হিন্দু মেয়েদের নিয়ন্ত্রণের জন্য তার নৈতিক আধিপত্যটি দাবি করতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রতীকী নৈতিক জোরটি আহৃত হয় ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে পুনর্নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু একাধারে আমরা এই বিষয়টিও লক্ষ করলাম যে এই আধিপত্যকামী ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষ নির্মাণের প্রক্রিয়া অপর অধস্তন পুরুষ গোষ্ঠী এবং নারীদের উপর কতটা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় সেই বিষয়ে সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ আমরা খেয়াল করেছি যে সাবর্ণ হিন্দু বয়ান, যেখানে দলিত দেহকে দুর্বল, কর্মবিমুখ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, সেই একই সময়পর্বে দলিতদের বয়ানে কিন্তু পৌরুষের একটি আত্মবিশ্বাসী, আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছবি আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষত রাজবংশী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষ নির্বিঘ্নে সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু এই পৌরুষ নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আধিপত্যকামনা যে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়, বলার অপেক্ষা রাখে না যে সেই আধিপত্য দাঁড়িয়ে আছে একটি বর্জনমূলক নীতির উপর। ফলত বিশ শতকের প্রথম পর্বে বিকশিত হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানে আধিপত্যবাদী পৌরুষের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে পারি আমরা।

উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ধারা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে আমরা পৌরুষ নির্মাণের আর একটি প্রবণতার প্রতি আলোকপাত করেছি। মূলত প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির অভ্যন্তরীণ দুনিয়ায় পৌরুষের অবধারণাটিকে উন্মোচন করতে গিয়ে আমরা অনুশাসন, অন্তরঙ্গতা এবং

অনুভূতি— এই তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছি। এখানে আমরা যেমন আমাদের সন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটি বিপ্লবী পরিসরে কী পদ্ধতিতে ক্রিয়াশীল থাকে তা বোঝার চেষ্টা করেছি এবং একটি অনুশাসনমূলক নীতি হিসেবে ব্রহ্মচর্য পৌরুষের কী ধরনের পরিভাষা তৈরি করে তাকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেখেছি যে এক্ষেত্রে তা পৌরুষের একটি আদিকল্প তৈরির ভূমিকায় থেকেছে। বিশেষ করে এইক্ষেত্রে পৌরুষের একটি ক্রোমোচ্চ আধিপত্যবাদী বয়ান তৈরি হতে দেখা যায় । যদিও এই পৌরুষ হিন্দু সাম্প্রদায়িক পরিসরের মতো বর্জনমূলক চরিত্র নেয়নি। পাশাপাশি আমরা সামগ্রিকভাবে এই পরিসরে অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতির প্রশ্নটিকে উত্থাপন করে দেখেছি সেটি যেমন এই ধরনের অনুশাসনমূলক পৌরুষের আদিকল্পটিকে নির্মাণের ক্ষেত্রে মাধ্যমের ভূমিকায় থেকেছে, পাশাপাশি তেমনি বৃহত্তর অর্থে পুরুষদের মধ্যে অন্তরঙ্গতার ভিতর দিয়ে নানা ধরনের অনুভূতি ব্যক্ত হওয়ার পরিসর তৈরি হয়েছে। ফলত বিপ্লবী সমিতিগুলিতে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল সেই ধারার জাতীয়তাবাদী পরিমণ্ডলকে নিয়ে আলোচনাকালে আমরা দেখি সেখানে পুরুষদের কখনোই অনুভূতিহীন মনে হয়নি বা তা ব্যক্ত করতে তাঁরা অক্ষম তা প্রকাশ পায়নি। বরং অনুভূতি এখানে পুরুষদের মধ্যে এবং নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সামনে এসেছে।

ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট এই পরিসরে নির্মিত জীবনাদর্শ এবং চর্চিত জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা পৌরুষের যে অবয়বটিকে নির্মিত ও বিবর্তিত হতে দেখি তা কী অর্থে আধিপত্যবাদী সেই প্রশ্নটা আমাদের সন্দর্ভের বৃহত্তর অনুসন্ধানের সাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আমরা পুরো অধ্যায় জুড়ে এই প্রক্রিয়াটিই অনুধাবন করেছি যে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অভ্যন্তরে এক বিশেষ ধরনের সামাজিকতার বোধ বা ধারণার চর্চা হয়েছে যা সহজাতভাবে লিঙ্গায়িত| ফলত এই নিরিখেই আমাদের অনুধাবন করতে হবে কীভাবে আলোচ্য পরিসরে এক বিশেষ ধরনের সম-সামাজিকতার বিকাশ হয়েছে যা একাধারে পুরুষালি বন্ধন ও পৌরুষচর্চার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে| আমরা দেখেছি যেমন একদিকে পুরুষরা একে অপরের সাথে থাকাকালীন নানা ধরনের আবেগ আদানপ্রদান করেছেন, তেমনই আবার তার মধ্য দিয়ে পুরুষালি বন্ধনও বিকশিত হয়েছে। একদিকে যেমন সেখানে বিশেষ এক ধরনের হোমো-রোম্যান্টিক আবেগ প্রকাশ পাওয়ার অবকাশ তৈরি হয়েছে যা সেই অর্থে কোনো উচ্চতর ক্রমনির্ভর এবং আধিপত্যবাদী প্রাতিষ্ঠানিক ঘেরাটোপের বাইরের বিষয়| কিন্তু তার পাশাপাশি গভীর হেটেরোনরম্যাটিভ পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণও এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রচেষ্টা করেছে, ফলে এই ধরনের সামাজিকতায় পুরুষদের মধ্যে প্রজন্মগত উচ্চতর ক্রমকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা বজায় থেকেছে| এর পাশাপাশি দ্বিতীয় বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ| সম-সামাজিক পরিবেশে সম্পর্কের নৈকট্য ও অনুভূতির ধরন এবং

বিসমকামী দাম্পত্যের মধ্যেকার নৈকট্যের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যকেও এখানে চিহ্নিত করা যায়। এখানে আমরা মতিলাল রায় এবং তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবীর প্রসঙ্গ এনে এই দিকটি আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছি যে পৌরুষের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি আবেগ প্রকাশের অবকাশ থাকলেও ভিন্ন স্তরে স্ত্রী তথা গার্হস্থ্য সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার উচ্চতম ক্রমকে বজায় রাখার প্রক্রিয়াও পাশাপাশি কাজ করেছে। এইক্ষেত্রে যে বিষয়টির ইঙ্গিত আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ করতে পারি তা হল দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা হিন্দু আত্মপরিচয় নির্মাণের সাথে আধিপত্যকামী পৌরুষের যে সংযোগটি লক্ষ করেছিলাম মতিলাল রায়ের মধ্যেও আমরা তার ছায়া দেখে থাকি। যদিও সামগ্রিকভাবে আধিপত্যকামী পৌরুষ, ব্রহ্মচর্যের মতো অনুশাসন এবং পুরুষদের মধ্যেকার নৈকট্য এবং আবেগ এইক্ষেত্রে পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়ার তুলনায় জটিল একটি আঙ্গিক আমাদের সামনে উপস্থিত করে যার আভাস আমরা এই একই সময়পর্বে নির্মীয়মান হিন্দু সাম্প্রদায়িক পৌরুষের বয়ানে একেবারেই লক্ষ করি না।

যৌন স্বাস্থ্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং দেহ সম্পর্কে আলোচনা কেন্দ্রিভূত রেখে আমরা চতুর্থ অধ্যায়টিতে দীর্ঘ ছয় দশক জুড়ে(১৮৮০-১৯৩৯ খ্রি.) যৌনাচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্থায়ী ধারণা জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে নির্মাণ ও সামাজিক চেতনায় প্রথিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে লক্ষ করেছি। এই ধারণাটি হল প্রজননকে যৌনাচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করার প্রবণতা এবং তার মাধ্যমে বাঙালি পুরুষ দেহ ও তার প্রজননশীলতা সম্পর্কে একটি লিঙ্গায়িত উদ্বেগের নির্মাণ। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আমরা ফলত সেই বিষয়টিকে অনুধাবন করেছি যে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম পর্বে কীভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র যৌনতা সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক *হেটেরোনর্ম্যেটিভ* বিধি তৈরি করে, আর চিকিৎসাকরণের মাধ্যমে পুরুষ দেহের লিঙ্গায়িত অবধারণা নির্মাণ করে। আর এই প্রক্রিয়ায় বর্ণবাদী চেতনা, উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, ঔপনিবেশিক শাসন বাঙালি পুরুষদের যেভাবে দুর্বল ও মেয়েলি হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, তা দেশীয় স্বাস্থ্যজ্ঞদের আলোচনার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজে চিকিৎসাগত মান্যতা পায়। পাশাপাশি আমরা আর একটি প্রবণতা প্রত্যক্ষ করি যে বাঙালির স্বাস্থ্যের দুর্বলতার জন্য দেশীয় স্বাস্থ্যজ্ঞরা কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন এবং তার জনস্বাস্থ্য নীতিকে সমালোচনার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী সমালোচনার পরিসর তৈরি করেন। ফলত এখানে লক্ষ করা যায় কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক

প্রতর্কের মাধ্যমে দেশীয় শিক্ষিত জনগণের মধ্যে যৌনতা ও পৌরুষের একটি বিধিবদ্ধ ধারণা প্রবেশ করেছে তা নয়। এখানে এটিও প্রতিভাত হয় যে দেশীয় জনগণও এই প্রক্রিয়ায় নানাভাবে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং নানাভাবে এই নির্মাণ প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করেছে, বাঙালি পুরুষদেহের নির্মাণ প্রক্রিয়াতে ক্রিয়াশীল ঔপনিবেশিক মতাদর্শকে সমালচনার মাধ্যমে বাঙালি পৌরুষের একটি ভিন্ন অবধারণাকে নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছে।

দেশীয় স্বাস্থ্যবিদদের চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চায় ব্রহ্মচর্যের ধারণাকে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে দেখার মাধ্যমে আমরা বাঙালি পৌরুষের উক্ত ভিন্ন অবধারণাটি গঠনের প্রক্রিয়াটিকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। এইক্ষেত্রে আমরা দেখি ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাঙালি দুর্বল পুরুষের ধারণা নির্মাণ হওয়া এবং সমকালীন জনস্বাস্থ্যের নিরিখে রোগগ্রস্ত বাঙালি দেহের বাস্তব চিত্রের মুখোমুখি হওয়া দেশীয় স্বাস্থ্যবিদদের বয়ানে বাঙালির দেহ সম্পর্কে উদ্বেগ দানা বাঁধতে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ায় দীর্ঘ ষাট দশক জুড়ে দেশীয় স্বাস্থ্যজ্ঞদের মধ্যে বাঙালি পৌরুষের যে সংকট অনুভূত হয়েছে তা নানা পর্যায়ে বাঙালির প্রজননগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগগুলিকে বাড়িয়ে তোলে। এখানে ব্রহ্মচর্য হয়ে উঠেছে প্রজননশীল পৌরুষকে সুনিশ্চিত করার উপায় যা হিন্দু বাঙালির ‘হৃত পৌরুষ’ পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে মান্যতা পায়। আর এই প্রসঙ্গেই আধিপত্যবাদী পৌরুষ এবং ব্রহ্মচর্যের সম্পর্কের প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আমরা এই অংশে ব্রহ্মচর্য এবং প্রজননের গভীর সংযোগের মধ্য দিয়ে পৌরুষের যে প্রজননশীলতার ভাষ্য তৈরি হতে দেখি তা নানাভাবে পৌরুষ সম্পর্কে আধিপত্যবাদী প্রতর্ককে সামনে আনে। এখানে প্রজননশীল দেহ গড়ার তাগিদ এবং পৌরুষের উদ্বেগ— একে অপরকে পুষ্ট করতে দেখা যায়। কিন্তু এই প্রবণতাটির মধ্যেও বেশ কিছু স্তরকে লক্ষ করি আমরা। যেমন উনিশ শতকের অন্তিম দশকগুলিতে দেশীয় সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার মিশন কার্যকরী হয় ঔপনিবেশিক বয়ানে চিহ্নিত ‘দুর্বল বাঙালি’ ভদ্রলোকের দেহকে ‘পুনরুদ্ধার’ করার তাগিদ থেকে। কিন্তু বিশ শতকের একের দশক থেকে হিন্দু হ্রাসমানতার তত্ত্ব জনপ্রিয় হতে থাকায় সেই প্রবণতাটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক বয়ানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এই পুরো সময়কাল জুড়ে হিন্দু সন্তান, বিশেষ করে পুরুষ সন্তান প্রজননের তাগিদ যৌনতা সম্পর্কে *হেটেরোনরম্যাটিভ* বিধিকে পুষ্ট করে। ফলত ঔপনিবেশিক বাংলায় আধিপত্যবাদী পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়া এবং যৌনতা সম্পর্কে *হেটেরোনরম্যাটিভ* বিধি তৈরির প্রক্রিয়া দুটি একে অপরের এক্ষেত্রে পরিপূরক হয়ে ওঠে। এখানে পৌরুষের উক্ত ভাষ্য নির্মাণে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা, নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে কার্যকারী হতে দেখি। এই

প্রক্রিয়ার উপাদান আমরা বহু পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসন দ্বারা আনীত সংস্কৃতির পাশাপাশি দেশীয় সামাজিক কাঠামোর মধ্যেও নানাভাবে নিহিত থাকতে দেখেছি। বিশেষ করে ছাত্র-কিশোর-যুবকদের যৌনাচার নিয়ন্ত্রণের পশ্চাতে বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রজন্মগত নিয়ন্ত্রণের বাসনা যেভাবে কার্যকরী থাকে তা আলোচ্য সময়ে ক্ষমতা, নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছার এক আধিপত্যবাদী প্রয়াসকে সামনে আনে যা প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষের ভাষ্যকে চরিতার্থ করার জন্য আবশ্যিক হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য হল এই আধিপত্যবাদী ভাষ্যটি মূলগতভাবে যে বর্জনমূলক থেকেছে তা নয়, কিন্তু যখন সে হিন্দু হ্রাসমানতার তত্ত্বের মতো সাম্প্রদায়িক দুশ্চিন্তার অংশ হয়ে যায় তখন সেটি এমন এক পুরুষদেহের 'উদ্ধার' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় যা প্রাথমিকভাবে একটি হিন্দুর দেহ।

আমাদের সন্দর্ভটি মূলত ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম পর্বে বাঙালি হিন্দু সাবর্ণ মধ্যবিত্তের লিঙ্গচেতনা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তার আধিপত্যবাদী ভাবধারার আন্তঃসম্পর্কটিকে বুঝতে চেয়েছিল। আরও স্পষ্টভাবে বলতে হলে দেশীয় সমাজে বাঙালি ভদ্রলোকের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায় সেই বৃহৎ প্রক্রিয়ার সাথে পৌরুষের প্রসঙ্গটি কীভাবে সংযুক্ত সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করে আমরা দেখতে পাই এইক্ষেত্রে বৃহত্তর আধিপত্যবাদী প্রবণতা এবং পৌরুষ নির্মাণের প্রক্রিয়াটি একে অপরের গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় থাকে। কিন্তু এই আধিপত্যকামী উদ্যোগগুলি লিঙ্গায়িত জাতীয়তাবাদের চরিত্রকে একটি জটিল রূপ দেয়। আমরা এই সন্দর্ভটিতে পৌরুষ নির্মাণের দীর্ঘ গতিপথটি অধ্যয়নকালে চিহ্নিত করেছি যে এটি এমন একটি গতিশীল (dynamic) প্রক্রিয়া যাকে ক্ষমতার অন্যান্য অক্ষগুলি বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করেছে। ফলত আমাদের সন্দর্ভটি থেকে এমন একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ক্ষমতার এই প্রতিচ্ছেদবিন্দু (intersection)-গুলিকে আমরা যদি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করি এবং তাদের কার্যপদ্ধতির স্তরগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করি তাহলে পৌরুষ তথা সামগ্রিক আধিপত্যবাদী চিন্তার মধ্যেকার বৈচিত্র্যকে আমরা চিহ্নিত করতে পারব। আমরা অনুধাবন করতে পাবব আধিপত্যবাদী ক্ষমতার ভাষ্য একশৈলিক হতে পাবে না। লিঙ্গকেন্দ্রিক আধিপত্যের বয়ানটি আকার নেয় লিঙ্গের পাশাপাশি ক্ষমতার অন্যান্য অক্ষগুলির সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। ফলত এই গতিময় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আধিপত্যের একাধিক ভাষ্য তৈরি হয়। বিশেষ করে আধিপত্য এবং তার প্রতিরোধের আন্তঃসম্পর্ককে অধ্যয়ন করতে হলে আধিপত্যবাদী ক্ষমতার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষ্যটিকে চিহ্নিত করা জরুরি হয়ে পড়ে। যদিও পাশাপাশি ব্রহ্মচর্যের মতো আধিপত্যবাদী পৌরুষের ভাষ্যগুলির কার্যকারিতা অনুধাবন করতে হলে এই ধরনের লিঙ্গবাদী মতাদর্শের প্রতিরোধ, বিকল্প ভাষ্যনির্মাণের প্রক্রিয়াটিকেও

পুঙ্খানুপুঙ্খ পদ্ধতির সাথে অনুধাবন করা জরুরি, যে প্রকল্পটি আমাদের ভবিষ্যৎ গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় হতে পারে। বিশেষত দলিত, মুসলমান অথবা শ্রমজীবীদের বয়ানে পৌরুষের ভাষ্যগুলি জানা এইক্ষেত্রে একান্ত জরুরি যা আমাদের সন্দর্ভের পরিসরের বাইরে থেকে গেছে।

পরিশিষ্ট

বাংলা প্রেসিডেন্সিতে প্রকাশিত এবং নিবন্ধিত

ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত উপদেশমূলক বাংলা বইএর তালিকা (১৮৯৮-১৯৩৯ খ্রি.)

প্রকাশ সাল	লেখক	বই	স্থান	সংখ্যা
১৮৯৮	Ramesh Chandra Chakravarty	ব্রহ্মচর্য্য, (প্রথম সংস্করণ)	Faridpur	
১৯০০-১৯০৭	-	-	-	
১৯০৮	Yaminiranjan Majumdar	ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবন	Krishipracharini Samiti, Jessore.	2000
১৯০৯	Surendra Mohan Bhattacharyya	ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা	Calcutta.	1000
	Ramesh Chandra Chakravarty	ব্রহ্মচর্য্য	Calcutta.	1000
১৯১০	Surendra Mohan Bhattacharya	ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	-	1000
১৯১১	-	-	-	-
১৯১২	Jagat Chandra Sen Gupta	ব্রহ্মচারী	Calcutta.	150
	Satis Chandra Chakravartti	সন্তানের চরিত্র গঠন	Calcutta.	1,000
	Jyotish Chandra Sen	ব্রহ্মচারী	Cooch Bihar.	1000
১৯১৩	-	-	-	-
১৯১৪	Rames Chandra Chakravarti	ব্রহ্মচর্য্য ও ছাত্রজীবন	Calcutta.	1000
১৯১৫	-	-	-	-
১৯১৬	Adisvar Bhattacharyya	ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তার প্রতিকার	Calcutta.	1000
	Rajesvar Gupta	ব্রহ্মচারী	Cittagong	1000
	Adisvar Bhattacharyya	ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তার প্রতিকার, (দ্বিতীয় সংস্করণ)	-	1000
	Sasi Kumar Guha	সরল ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা	Umacharan Asrum, Purba Nailrnti, Dacca.	1000

১৯১৭	Syamscharan Sen Gupta (Kaviratna)	ব্রহ্মচর্য্য ও বাল্যবিবাহ	Chittagoug.	500
	Syamscharan Sen Gupta (Kaviratna)	ব্ররক্ষচর্য্য বা শিক্ষাজীবন	Chittagoug.	1000
	Nigamananda	ব্রহ্মচর্য্য-সাধন, (তৃতীয় দ্বিতীয় সংস্করণ) আগের সংস্করণ ১৯১৫	Jorhat, Assam.	2500
	Rasbiharl Sen Gup	ব্রহ্মচারী	Faridpur.	1000
১৯১৮	Jogeschandra Ray	ব্রহ্মচর্য্য	Calcutta.	1000
	Rames Chandra Chakravarti	ব্রহ্মচর্য্য, (৮ম সংস্করণ) আগের সংস্করণ ১৯১১	Calcutta.	1100
১৯১৯	Girajabhushan Bhattacharya	সমাজ ব্যাধি	Dacca.	1000
১৯২০	Harinath Ghosh	দাম্পত্য লীলা	Calcutta.	500
	Nigarnananda Paramhansa, Swami	ব্রহ্মচর্য্য সাধন, (৪র্থ সংস্করণ)	Assam-Bengal Sarasvat Math, Assam.	2250
১৯২১	Rames Chandra Chakrabarti	ব্রহ্মচর্য্য	Calcutta.	1100
১৯২২	Nigarnananda Paramhansa, Swami	ব্রহ্মচর্য্য সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়মাবলী (৫ম সংস্করণ, ১৯২০)	Saraswat Math, Kokilamukh, Assam.	2250
১৯২৩-১৩২৪	-	-	-	-
১৯২৫	Nigarnananda Paramhansa, Swami	ব্রহ্মচর্য্য সাধন, (৭ম সংস্করণ) ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯২২	Saraswat Math, Kokilamukh, Assam.	2250
	Sivaprasanna Bhattachary	পুত্রের প্রতি উপদেশ	Calcutta.	1000
১৯২৬	-	সরল ব্রহ্মচর্য্য	Tippera.	1000
	Swarupananda Maha Srimani	প্রবুদ্ধ যৌবন	Tippera.	1000
	Mahendra Chaudhury	ব্রহ্মচর্য্য	Tippera.	1000
	Makhan Brahmachary	ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা	Tangail.	250
	Trigunatit Svami	ব্রহ্মচর্য্য	Calcutta.	1200

১৯২৭	Surendra Nath Kavyatirtha	ব্রহ্মচর্য্য	Chatmohan, Pabna.	1000
	Swami Swarupananda Mahasrinami	বীর্য্যক্ষয়ের প্রতিকার	Pavitrata Prasarini Samiti, Tippera.	1000
	Swarupananda Swami	সরল ব্রহ্মচর্য্য (দ্বিতীয় সংস্করণ)	Brahrnacbari Nirbharananda Akhada, Calcutta.	1000
	Anil Chandra Ghosh	ব্রহ্মচর্য্য ও শক্তি সাধনা	Dacca.	1250
	Vedannnda Swami	ব্রহ্মচর্য্য	Bharat Seva Asram Sangha, Calcutta.	2000
১৯২৮	Swarupananda Swami (Paramahansa)	বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য	Calcutta.	1000
	Vadananda (Swami)	ব্রহ্মচর্য্যম্, (দ্বিতীয় সংস্করণ)	Calcutta.	-
	Vadananda (Swami)	ব্রহ্মচর্য্যম্, (৩য় সংস্করণ)	Calcutta.	-
	Sadananda Bharati	ব্রহ্মচর্য্য	Calcutta.	-
১৯২৯	Mr. Gandhi (translated by Binay Krishna Sen) 1st edition	ব্রহ্মচর্য্য	Calcutta.	500
	Dhyanprakash Bhramhachary	সচিত্র ব্রহ্মচর্য্য ও শরী পালন	Calcutta.	500
১৯৩০	-	-	-	-
১৯৩১	Satipati Vidyabhusan	গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা	Calcutta.	-
১৯৩২	Mr. Gandhi (translated by Binay Krishna Sen)	ব্রহ্মচর্য্য, (৩য় সংস্করণ) দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২৯	Calcutta.	1100
	Svarupananda, (Paramhamsa Swami)	সংযম-সাধনা বা বীর্য্যক্ষয়ের প্রতীকার ৩য় সংস্করণ	Noakhali.	1000
	Svarupananda, (Paramhansa Swami)	ব্রহ্মচারীর সদাচার বা আদর্শ ছাত্র-জীবন, (১ম সংস্করণ)	Noakhali.	1000
	Mr. Gandhi translated Hemendralal Ray	সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার	Calcutta.	2000
	Jagadis Chandra Ghosh	ছাত্রদের কর্ম্মবাণী	Dacca.	1250
১৯৩৩	Kshetradas Banarji	যৌবন পথে	Calcutta.	-
১৯৩৪	Swarupananda Paramahansa	বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য (২য় সংস্করণ), প্রথম সংস্করণ	Noakhali.	1000

		১৯৩১		
	Kali Mohan Sen	স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্য	Dacca.	2250
	Vedananda, Swami	ব্রহ্মচর্য্য, (দ্বিতীয় সংস্করণ) আগের সংস্করণ ১৯২৮	Calcutta (Bharat Seva Sangha).	10000
১৯৩৫	Manmatha Nath Banerjee	চরিত্র গঠন (প্রথম ভাগ)	Dacca.	1500
	Manmatha Nath Banerjee	চরিত্র গঠন (দ্বিতীয় ভাগ)	Dacca.	1500
	Motilal Ray	ব্রহ্মচর্য্য	Calcutta.	1000
	Swarupananda Paramhansa, Swam	আদর্শ ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচারীর সদাচার	Calcutta.	1000
	Swarupananda Paramhansa, Swam	বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য, (৩য় সংস্করণ) ২য় ১৯৩৪	Calcutta.	1000
১৯৩৬	Swarupananda Paramhansa, Swam	সংযম-সাধনা বা বীর্য্যক্ষয়ের প্রতীকার (৫ম সংস্করণ) ৪র্থ সংস্করণ ১৯৩৪	Calcutta.	1250
	Swarupananda Paramhansa, Swam	আত্ম-গঠন বা ব্রহ্মচর্য্য-প্রসঙ্গ	Calcutta.	250
১৯৩৭	Nigamananda Saraswati	ব্রহ্মচর্য্য-সাধন (১১তম সংস্করণ)	Saraswat Math, Assam.	2000
১৯৩৮	Chandra Nath Basu	সংযম শিক্ষা	Calcutta.	1100
১৯৩৯	Chintaharan Chatterjee	"বিবাহ" বা " ঔপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচর্য্য"	Dacca.	1000
	Swarupananda Paramahansa, Swam	আদর্শ ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচারীর সদাচার (৩য় সংস্করণ) দ্বিতীয় ১৯৩৫	Calcutta.	2000

সূত্র - Bengali Library Catalogue of Books, Registered in the Presidency of Bengal. Appendix to The Calcutta Gazette. বিশেষ দ্রষ্টব্য - প্রাপ্ত তথ্য সূত্রে কিছু কিছু মাসের প্রতিবেদন অনুপস্থিত থেকেছে। ফলত এই তালিকাটি চূড়ান্ত বইএর তালিকা হিসেবে গণ্য করা যায় না।

প্রাপ্তি স্থান - Digitised Quarterly Lists PDFs and Metadata, British Library, 2016. DOI: https://doi.org/10.21250/tcq (accessed 1st April, 2022).

প্রাথমিক উৎস

বেসরকারি বাংলা উপাদান

বাংলা বই এবং ইস্তেহার

কাব্যতীর্থ, সুরেন্দ্রনাথ। ব্রহ্মচর্য্য সাধন বিধি। পাবনা : ১৯২৭ খ্রি.।

কুমার পরিব্রাজক, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (সম্পাদনা), ১৩৪৬।

ক্ষত্রিয় সমিতি দশম সম্মিলনী, ১৯২০ খ্রি.।

গাঙ্গুলী, প্রতুলচন্দ্র। বিপ্লবীর জীবনদর্শন, কলকাতা: ১৩৮৩।

গান্ধী, মহাত্মা। বিধবা বিবাহ, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, অভয় আশ্রম। কুমিল্লা: ১৩৩২।

ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার। *বোমার যুগের কাহিনী*। সংকলন - জয়ন্তী মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৬ খ্রি.)।

—। আমার আত্মকথা। কলকাতা : ১৩৩৮।

—। আত্মকথা। কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৪০৩।

—। বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী: ধরপাকড়ের যুগ। কলকাতা : ১৩২৯।

ঘোষ, যোগেন্দ্রমোহন। ব্রহ্মচর্য্য : বালক ও যুবক গণের নৈতিক বিধানার্থে, দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: ১৩১৬।

—। ব্রহ্মচর্য্য, ১৯২২ খ্রি.।

চক্রবর্তী, শিবরাম। ছেলে বয়সে, শিব্রাম অমনিবাস, চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৯৪।

চট্টোপাধ্যায়, কালিপ্রসন্ন। সংসার তরু বা শান্তি-কুঞ্জ, ১৯০০ খ্রি.।

—। কাণাকড়ি, ১২৯৭।

—। ধর্ম্ম প্রচার, ১২৯৩।

—। ভবানী-ঠাকুর, ১২৯৭।

—। সর্ব্বাণী, ১৩০৩।

—। সংসার কোষ, ১৯০০ খ্রি.।

—। সুখের সংসার, ১৯০০ খ্রি.।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। আনন্দমঠ, প্রথম সংস্করণ, সম্পাদক - চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: আনন্দ পাবলিকেসন, ১৯৮৩ খ্রি.।

—। কৃষ্ণচরিত্র, সম্পাদক - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৪।

—। বঙ্কিম রচনাবলী: দ্বিতীয়-খণ্ড। ভূমিকা যোগেশচন্দ্র বাগল। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬১, চতুর্থ মুদ্রণ- ১৩৭৬।

—। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ: উপন্যাস-খণ্ড, সম্পাদক গোপাল হালদার। কলকাতা : সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৪ খ্রি.।

—। ধর্ম্মতত্ত্ব। সম্পাদক - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎ, ১৩৪৮।

চট্টোপাধ্যায়ের, শরৎচন্দ্র। শ্রীকান্ত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিকেসন, ২০১৪।

চৌধুরী, বিজয়কান্ত। ব্রহ্মচর্য্য (নদীয়া : ১৩৩৩)।

চৌধুরী, মহেন্দ্রচন্দ্র। ব্রহ্মচর্য্য, ১৯২৬ খ্রি.।

জ্যোতির্ভূষণ, ললিতমোহন। ব্রহ্মচর্য্য বিজ্ঞান। রংপুর : ১৩৩১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। প্রজাপতির নির্বন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (সুলভ সংস্করণ), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১০।

দত্ত, গুরুসদয়। বাংলায় বীর যোদ্ধা রায়বেঁশে, বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য। কলকাতা : ছাতিম বুক্‌স্‌, ২০০০ খ্রি.।

দাশ, শ্রীভগবত চন্দ্র। বিধবা-বিবাহ, মেদিনীপুর বিধবা-বিবাহ সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীরাসবিহারী ভঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৩১ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৩।

দাস, নরেন। বিপ্লবী আন্দোলনের জিজ্ঞাসা। কলকাতা: সুজন পাবলিকেশনস্‌, ১৯৮৩ খ্রি.।

দাস, পুলিনবিহারী। লাঠিখেলা ও অসি শিক্ষা, ১৩৩১।

দাস, সনাতন। বিধবা-বিবাহ। বরিশাল: ১৩৩৪।

দাস, সুন্দরীমোহন। বৃদ্ধাধাত্রীর রোজনামচা, ১৩৩০।

দাসগুপ্ত, প্রসন্নচন্দ্র। যুবক-বন্ধু, কলকাতা, ১৮৯৭ খ্রি.।

দেউস্কর, সখারাম গণেশ। বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ? আশ্বিন, ১৩১৭।

—। দেশের কথা, ১৩১২ (তৃতীয় সংস্করণ)।

দেব, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ। "বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি, না?" ১৯১০ খ্রি.।

দেবশর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র। ব্রহ্মচর্য্য, ১৩২০।

দেবী, অন্নদাসুন্দরী। ব্রহ্মচর্য্য। বরিশাল: ১৩২৯।

দেবী, সরোজিনী। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা। কলকাতা: ১৩৩২।

নিয়োগী, কৈলাসচন্দ্র। ব্রহ্মচর্য্য। ময়মনসিংহ: ১৩২৯ আনু.।

বটব্যাল, নারায়ণহরি। গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য, (?)।

বনফুল। ঐরাবত, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। কলকাতা: বাণীশিল্প, ১৩৫৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। শহরতলি, রচনাসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।

বন্দোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র। ছাত্রগণের চির-আচরণ ও পরিব্রাজকের উপদেশাবলী। জলপাইগুড়ি: ১৩২৯, দ্বিতীয় সংস্করণ।

— (জলপাইগুড়ি : ১৯২৩ খ্রি.)।

বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। জীবন-প্রবাহ। শ্রীমন্তপুর : ১৯৮৯ খ্রি.।

বসু, চন্দ্রনাথ। "বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র," ত্রিধারা। তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : ১৩১৪।

— ।পৃথিবীর সুখ দুঃখ। কলকাতা, ১৩১৫।

— । সংযম শিক্ষা বা নিম্নতর সোপান। কলকাতা : ১৩১১।

—। হিন্দুত্ব : হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস। কলকাতা: ম্যাডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৮৯২ খ্রি.।

বসু, চুনীলাল। শারীর স্বাস্থ্য-বিধান, ১৯১৩ খ্রি.।

বসু, সুভাষচন্দ্র। ভারত পথিক, সমগ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ১৩৯৫।

বাঙ্গালায় হিন্দু জাতির ক্ষয় এবং তাহার প্রতিকার। টাঙ্গাইল হিন্দু জাতি সংরক্ষিণী সমিতি, টাঙ্গাইল, ময়মনসিং, ১৩৩১।

বিধবা-বিবাহ, কুলিল্লা-বিধবা-বিবাহ – সহায়ক সমিতি কর্তৃক প্রকাশ, ১৩৩৩।

ব্রহ্মচর্য সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পালনের নিয়মাবলী, শ্রীকুমার চিদানন্দ (প্রকাশক), ঢাকা: ১৩১৫।

ব্রহ্মচারী, মাখন। ব্রহ্মচর্য্য, ১৯২৬ খ্রি.।

বিশ্বাস, ব্রজনাথ। ছাত্রজীবন। কলকাতা : ১৮৯২ খ্রি.।

ভট্টাচার্য, আদীশ্বর। ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তার প্রতিকার। কলকাতা: ১৩২২।

ভট্টাচার্য, গিরিজাভূষণ। ব্রহ্মচর্য। ঢাকা: ১৩২৬।

ভট্টাচার্য্য, গিরীশচন্দ্র। ব্রহ্মচর্য্য। তমলুক : ১৯১৭ খ্রি.।

ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রমোহন। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা, (কলকাতা : ১৩১৬) (প্রথম সংস্করণ : ১৩১৫)।

মজুমদার, যামিনীরঞ্জন। ব্রহ্মচর্য্য ও ছাত্রজীবন। কলকাতা : ১৯২১ খ্রি.।

—, ১৩৩৫ (অষ্টম সংস্করণ)।

মুখোপাধ্যায়ের, উপেন্দ্রনাথ। ধ্বংসোন্মুখ জাতি, ১৯০৯ খ্রি. (আনুমানিক)।

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব। সামাজিক প্রবন্ধ, ভূদেব-রচনাসম্ভার, সম্পাদনা – প্রমথনাথ বিশী, কলকাতা: মিত্র ঘোষ, ১৩৬৪।

—। আচার প্রবন্ধ (হুগলী: ১৩০১)।

রক্ষিত, হরিদাস। সমাজ ও বিধবা-বিবাহ। মহেশপুর, ত্রিপুরা: ১৩৩৩।

রঘুনন্দন, স্বামী। ছাত্রজীবন। কলকাতা: ১৩১৮।

রায়, ইন্দুভুষণ। সংঘগুরু শ্রীমতিলাল : জীবন-পঞ্জী। কলকাতা: ১৯৬৬ খ্রি.।

রায়, প্রকাশচন্দ্র। অঘোর-প্রকাশ। বাঁকিপুর: অঘোর পরিবার, ১৯০৭ খ্রি.।

রায়, প্রফুল্লচন্দ্র। ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দুসভা, সভাপতির অভিভাষণ, ২রা মে, ১৯২৫ খ্রি.।

রায়, মতিলাল। আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী। কলকাতা : ১৯৫৭ খ্রি.।

—। জীবনসঙ্গিনী, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : প্রবর্ত্তক পাবলিসার্স, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৭৫।

—। জীবনসঙ্গিনী, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : প্রবর্ত্তক পাবলিসার্স, তৃতীয় সংস্করণ ১৪১৪।

—। বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল, ১৯২৩।

—। স্বদেশী যুগের স্মৃতি, ১৯৩১ খ্রি. (আনু.)।

—। শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন। চন্দননগর: প্রবর্তক সঙ্ঘ, ১৪২৩, তৃতীয় সংস্করণ।

—। হিন্দুত্বের পুনরুত্থান। কলকাতা: ১৩৪০।

—। হিন্দুর জাগরণ, ১৯২৬ (আনু.) খ্রি.।

শর্মা বিশী, শৈলেশনাথ। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা, সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (সাল অনুল্লিখিত)।

শর্মা, হরিশ্চন্দ্র। জীবনরক্ষক। ১২৮২।

শাস্ত্রী, শিবনাথ। আত্মচরিত। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, ২০১৫ খ্রি.।

সমাজ ও বিধবা-বিবাহ, শ্রীহরিদাস রক্ষিত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মহেশপুর, ত্রিপুরা, ১৩৩৩।

সেন, যোগেশচন্দ্র। ব্রহ্মচর্য্য সাধন, ১৯১৭ খ্রি.।

সেন, যোগেশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র সেন। ব্রহ্মচর্য্য-সাধন, ১৩২৪।

সেনগুপ্ত, জগচ্চন্দ্র। ব্রহ্মচারী। ঢাকা : ১৩২৬।

সেনগুপ্ত, শ্যামাচরণ। ব্রহ্মচর্য্য ও বাল্যবিবাহ, ১৩২৩।

সেনগুপ্ত, শ্যামাচরণ। ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষাজীবন। চট্টোগ্রাম: ১৩২৩।

স্বামী, কৃষ্ণানন্দ। নীতি রত্নমালা। কাশী-যোগাশ্রম: ১৩২২, তৃতীয় সংস্করণ।

—। পরিব্রাজকের বক্তৃতা : পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের প্রদত্ত বক্তৃতাবলী। কাশী-যোগাশ্রম: ১৮১৬ শঃ।

—। সাধন-শিক্ষা-সোপান, ১৩৩০।

স্বামী, নিগমানন্দ। ব্রহ্মচর্য্য, ১৯২০ খ্রি.।

হালদার, গোপাল। রূপনারায়ণের কূলে, দ্বিতীয় খণ্ড: যৌবনেররা রাজটীকা। কলকাতা : এইচ্ এল সাহা: ১৯৭৪ খ্রি.।

মাসিক পত্রিকা ও পঞ্জিকা

আয়ুর্ব্বেদ (১৯১৬-১৯২৩)

আর্য্যদর্শন (১৮৮০-১৮৮৫)

ক্ষত্রিয় (১৩২৭-১৩৩৩)

গার্হস্থ্য (১৯১০-১৯১৭)

চিকিৎসক ও সমালোচক (১৮৯৫-১৮৯৬)

চিকিৎসা সম্মিলনি (১৮৮৫-১৮৯৫)

ছাত্র (১৯১৪)

জন্মভূমি (১৮৯০-১৯০৯)

নূতন পঞ্জিকা, (১৩১১)

প্রবর্ত্তক (১৩২৫)

প্রবাসী (১৯০৯-১৯৩৯)

বঙ্গদর্শন (১৯১০)

বেদব্যাস (১৮৮৬-১৮৯৪)

ভারতবর্ষ (১৯১৩-১৯২৮)

ভিষক্-দর্পণ (১৮৯৭-১৯১৩)

মাসিক বসুমতি (১৯২২-১৯৩৯)

স্বাস্থ্য (১৮৯৯-১৯০২)

স্বাস্থ্য সমাচার (১৯১২-১৯২৭)

হিন্দু পত্রিকা (১৩১৩)

প্রকাশিত পত্রিকার সংকলন

ঘোষ, বিনয়। সাময়িক পত্রে বাংলার সামাজ চিত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৬৪।

সরকারি ইংরেজি উপাদান

West Bengal State Archives (Home Political and IB)

A Brief Note of the Prabartak Sangha Chandernagore. File No 165/26. 1926.

Chandannagore Prabartok Sangha, 273/1926, File No. 42-26.

Formation of Akharas in Bengal for Lathi Play, 354/26, 1926.

Hindu Mahasabha, Faridpur, 64/1925, File No 279H/25.

Hindu Mahasabha, Midnapur, 15/1925, File no. 279A/25

Note of Reform of Students Messes and Hostels, 1905 File no 3-L/2-6.

Proceeding of Meetings in Dacca 23/1928, File no 80E/28.

Proceedings of Meetings in Burdwan, 41/1928 File no. 80X/28.

Proceedings of Meetings in Burdwan, 41/1928,80X128.

Report of Bengal Provincial Hindu Conference at Malda, 80Y/28.

Reports and Gazettes

Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal, for 1864-65, Calcutta: 1866

Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal, for 1870-71, Calcutta: 1872.

Calcutta University Commission Report, 1919.

The Calcutta Gazette, 1898 -1939.

The Indian Quarterly Register, July to December, 1924, vol 2.

The Indian Quarterly Register, Jan to June, 1928, vol I.

The Indian Quarterly Register, Jan to June, 1929, vol 1.

The Indian Quarterly Register, July to December, 1929, vol 2.

The Calcutta Municipal Gazette, Volume 18, 1933.

আদমসুমারি

C.J. O'Donnell, Census of India, 1891, Volume III: The Lower Provinces of Bengal: The Report, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1893.

O'Malley, Census of India, 1911, vol. 1, part I.

প্রকাশিত প্রতিবেদনের সংকলন

Samanta, Amiya K. *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939, Vol III*. Calcutta: Government of West Bengal, 1995.

Samanta, Amiya K. *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939, Vol II*. Calcutta: Government of West Bengal, 1995.

বেসরকারি ইংরেজী উপাদান

বই ও পত্রিকা

Modern Review, 1911.

Banerjee, Sir Gooroo Dass. *A Few Thought on Education* (Calcutta : S. K Lahiri & Co, 1910).

Chaudhuri, Nirad C. *The Autobiography of an Unknown Indian* (Berkeley and Los Angeles I: University of California Press, 1968).

Gandhi, M K. *An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth*. Edited by Mahadev H Desai. Ahmedabad: Navajivan Pub. House, 1996.

Ghose, Aurobindo. *Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Vol I*. Popular ed. (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1972).

Mitter, Digambar. *Epidemic Fever in Bengal: Reprinted from Hindoo Patriot* (Calcutta: 1876

Modern Review, 1911.

Mukerji, U. N. *A Dying Race,* 2nd edition (Calcutta: M. Banerjee, 1910).

Sanyashi, Shraddhananda. *Hindu Sangathan : Savior of the Dying Race*, 1926.

Sarkar, Kishori Lal. *A Dying Race, How Dying?* (Calcutta: 1911).

সাহায্যকারী রচনা

অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি সন্দর্ভ

Banerjee, Sudeshna. "The Transformation of Domesticity as Ideology: Calcutta,1880-1947," Unpublished PhD Dissertation. School of Oriental and African Studies, London University, 1997.

Banerjee, Sutanuka. "Unbinding Bodies and Desires: Re-searching the Home, the World and the In between in Nara-Naree, the Only Bengali Journal on Health, Hygiene, Sex (1939-1950)," Unpublished PhD Thesis. Aalborg University, 2014.

Barewick, John. "*Chatrasamaj*: The Social and Political Significance of the Student Community in Bengal c. 1870-1920." Unpublished PhD thesis. University of Sydney, 1986.

Chakrabarty, Bhaswati. "The Second Social Reform Movement: Gender and Society in Bengal 1930's-50's." Unpublished PhD Thesis. University of Calcutta, 2016.

Chowdhury-Sengupta, Indira. "Colonialism & Cultural Identity: The Making of a Hindu Discourse, Bengal 1867-1905." Unpublished PhD thesis. School of Oriental and African Studies, London University, 1993.

বাংলা বই এবং প্রবন্ধ

খস্তগীর, আশিষ। বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা, ১৮০২-১৮৫৬, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

ঘোষ, শৌরীন্দ্রকুমার। সাহিত্যসেবক মঞ্জুষা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৩।

তপোব্রত ঘোষ, গোরা ও বিনয়, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৮৩, চন্দ্রনাথ বসু, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎ, ১৩৫৮।

—। সাহিত্য সাধক চরিতমালা-*৪৩*, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎ, ১৩৫২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশু সাহিত্য। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯১।

—। "চিরকুমার সভা রহস্য," আরেক রকম, দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ যুগ্ম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১৪, ৯১-৯৮।

বসু, স্বপন। উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র, কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০১৮।

ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ। বঙ্গসাহিত্যবিধান, কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০।

মজুমদার, করুণাময়। চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা: ১৯৬০।

সুমিত, সরকার। "কলিযুগের কল্পনা ও ঔপনিবেশিক সমাজ," ইতিহাস চর্চার ধারা: গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্মাননা গ্রন্থ, সম্পাদনা অনিরুদ্ধ রায়, ২৯৪-৩০৬। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫।

ইংরেজি বই এবং প্রবন্ধ

Adhikary, Sayantani. "The *Bratachari* Movement and the Invention of a 'Folk Tradition'." South Asia 38, no. 4 (2015): 656–70.

Ahluwalia, Sanjam. Reproductive Restraints : Birth Control in India, 1877-1947. Urbana: University of Illinois Press, 2008.

Ahmed, Sara. Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.

—. "'Happy Objects'." In The Affect Theory Reader, edited by Melissa Gregg and Gregory J. Seigworth, 29–51. Durham; London: Duke University Press, 2010.

Alter, Joseph S. "Celibacy, Sexuality, and the Transformation of Gender into Nationalism in North India." The Journal of Asian Studies 53, no. 1 (1994): 45–66.

—. "Ayurveda and Sexuality: Sex Therapy and the 'Paradox of Virility'." In Modern and Global Ayurveda : Pluralism and Paradigms, edited by Dagmar Wujastyk and Frederick M Smith, 177–200. New York: State University of New York Press, 2008.

Anooshahr, Ali. "The King Who Would Be Man: The Gender Roles of the Warrior King in Early Mughal History." Journal of the Royal Asiatic Society 18, no. 3 (2008): 327–40.

Arnold, David. "Bureaucratic Recruitment and Subordination in Colonial India: The Madras Constabulary, 1859–1947." In Subaltern Studies 4: Writing on South Asian History and Society, 1–53. New Delhi: Oxford University Press, 1985.

—. "Cholera and Colonialism in British India." Past & Present 113, no. 1 (1986): 118–51.

—. Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India. Delhi: Oxford University Press, 1994.

—. "'An Ancient Race Outworn': Malaria and Race in Colonial India, 1860–1930." In Race, Science and Medicine, 1700–1960, edited by Waltraud Ernst and Bernard Harris, 123–43. London: Routledge, 1999.

Arvin, Maile, Eve Tuck, and Angie Morrill. "Decolonizing Feminism: Challenging Connections between Settler Colonialism and Heteropatriarchy." Feminist Formations 25, no. 1 (2013): 8–34.

Bacchetta, Paola. "When the (Hindu) Nation Exiles Its Queers." Social Text, no. 61 (1999): 141–66.

Bagchi, Amiya Kumar. Private Investment in India, 1900-1939. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.

Bala, Poonam. Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective. New Delhi: Sage Publications, 1991.

Ballhatchet, Kenneth. Race, Sex, and Class Under the Raj: Imperial Attitude and Politics and Their Critics 1793-1905. London: Weidenfeld and Nicolson, 1980.

Bandyopadhyay, Aparna. “Of Sin, Crime and Punishment : Elopement in Bengal, 1929.” In Intimate Others : Marriage and Sexualities in India, edited by Samita Sen, Ranjita Biswas, and Nandita Dhawan, 98–117. Kolkata: Stree, 2011.

Bandyopadhyay, Sekhar. Caste, Culture, and Hegemony : Social Domination in Colonial Bengal. New Delhi: Sage Publications, 2004.

—. Caste, Protest and Identity in Colonial India : The Namasudras of Bengal, 1872-1947. Richmond, Surrey: Curzon, 1997.

—. Caste, Politics, and the Raj : Bengal, 1872-1937. Calcutta: K.P. Bagchi, 1990.

—. “Caste, Widow-Remarriage and the Reform of Popular Culture in Colonial Bengal.” In From the Seams of History: Essays on Indian Women, edited by Bharati Ray, 8–36. Delhi: Oxford University Press, 1995.

Banerjee, Milinda. “The Trial of Derozio, or the Scandal of Reason.” Social Scientist (New Delhi) 37, no. 7/8 (2009): 60–88.

Banerjee, Sikata. Make Me a Man! : Masculinity, Hinduism, and Nationalism in India. Albany, NY: State University of New York Press, 2005.

Banerjee, Sudeshna. “Spirituality and Nationalist Domesticity : Rereading the Relationship.” The Calcutta Historical Journal 19 & 20 (combind) (1997-1998): 173–204.

—. “Valorizing Poverty: Nationalist Discourse on Genteel Poverty in Colonial Bengal.” Journal of History 20 (2002): 64–72.

Banerjee, Sumanta. “Bogey of the Bawdy: Changing Concept of ‘Obscenity’ in 19th Century Bengali Culture.” Economic and Political Weekly 22, no. 29 (1987): 1197–1206.

Banerjee, Swapna M. “Debates on Domesticity and the Position of Women in Late Colonial India.” History Compass 8, no. 6 (2010): 455–73.

—. “Emergent Youth Culture in 19th Century India: A View from Colonial Bengal.” In Lost Histories of Youth Culture, edited by Christine Feldman-Barrett, 199–216. New York: Peter Lang, 2015.

—. “Everyday Emotional Practices of Fathers and Children in Late Colonial Bengal, India.” In Childhood, Youth and Emotions in Modern History: National, Colonial and Global Perspectives, edited by Stephanie Olsen, 221–41. London: Palgrave Macmillan, 2015.

—. Men, Women, and Domestics : Articulating Middle-Class Identity in Colonial Bengal. New Delhi ; Oxford: Oxford University Press, 2004.

Bapu, Prabhu. Hindu Mahasabha in Colonial North India, 1915-1930 : Constructing Nation and History. London ; New York: Routledge, 2013.

Barewick, John. “*Chatra Samaj*: The Significance of Student Community in Bengal. c 1880-1920.” In Mind Body and Society : Life and Mentality in Colonial Bengal, edited by Rajat Kanta Ray, 232–59. Calcutta: Oxford University Press, 1995.

Basu, Swaraj. Dynamics of a Caste Movement : The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947. New Delhi: Manohar, 2003.

Basu, Tapan, Pradip Dutta, Sumit Sarkar, Tanika Sarkar and Sambuddha Sen. Khaki Shorts and Saffron Flags : A Critique of the Hindu Right. Hyderabad: Orient Longman, 1993.

Bayly, Susan. Caste, Society and Politics in India: From the Eighteenth Century to the Modern Age. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Bhattacharya, Niladri. “The Making of Agrarian Policy in British India.” In Colonial State and Agrarian Society, edited by Burton Stein, 113–49. Delhi: Oxford University Press, 1992.

Bhattacharya, Tithi. The Sentinels of Culture: Class, Education and the Colonial Intellectual in Bengal 1848-1885. New Delhi: Oxford University Press, 2005.

Birla, Ritu. Stages of Capital: Law, Culture and Market Governance in Late Colonial India. Durham, NC: Duke University Press, 2010.

Boehmer, Elleke. Stories of Women : Gender and Narrative in the Postcolonial Nation. Manchester: Manchester University Press, 2005.

Boise, Sam de, and Jeff Hearn. “Are Men Getting More Emotional? Critical Sociological Perspectives on Men, Masculinities and Emotions.” The Sociological Review 65, no. 4 (2017): 779–96.

Borthwick, Meredith. The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984.

Bose, Pradip Kumar. “Sones of the Nation: Child Rearing in the New Family.” In Texts of Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal, edited by Partha Chatterjee, 118–44. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995.

Bose, Sugata. Agrarian Bengal : Economy, Social Structure, and Politics, 1919-1947. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Broomfield, J. H. Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal. Berkeley: University of California Press, 1968.

Carroll, Lucy. “Colonial Perceptions of Indian Society and the Emergence of Caste(s) Associations.” The Journal of Asian Studies 37, no. 2 (1978): 233–50.

Carstairs, G Morris. The Twice-Born: A Study of a Community of High-Caste Hindus. London: Hogarth Press, 1958.

Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe : Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.

Chakraborty, Aishika. “‘Constant as the Pole Star’? Debates about Marriage in Nineteenth-Century Bengal.” Proceedings of the Indian History Congress 62 (2001): 767–80.

Chakraborty, Chandrima. Masculinity, Asceticism, Hinduism : Past and Present Imagining of India. Ranikhet: Permanent Black, 2011.

Chakravarty, Uma. “Whatever Happened to the Vedic Dasi? Orientalism, Nationalism and a Script for the Past.” In Recasting Women: Essays in Colonial History, edited by Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, 27–87. New Delhi: Kali for Women, 1989.

—. “Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, Caste, Class and State.” Economic and Political Weekly 28, no. 14 (1993): 579–85.

—. Gendering Caste : Through a Feminist Lens. New Delhi: Sage Publications, 2018.

Chakravarty, Papia. Hindu Response to Nationalist Ferment : Bengal, 1909-1935. Calcutta: Subarnarekha, 1992.

Chatterjee, Amitava, and Souvik Nahar. “The Muscular Monk: Vivekananda, Sports and Physical Culture in Colonial Bengal.” Economic and Political Weekly 49, no. 11 (2014): 25–29.

Chatterjee, Amitava. “The Man Arrives: Breaking Off the Notion of Effeminacy in Colonial Bengal.” International Journal of the History of Sport 32, no. 3 (2015): 409–21.

Chatterjee, Partha. Nationalist Thought and the Colonial World : A Derivative Discourse. London: Zed Books, 1986.

—. “Caste and Subaltern Consciousness.” In Subaltern Studies VI Writings on South Asian History and Society, edited by Ranajit Guha, 169–209. Delhi: Oxford University Press, 1989.

—. “The Nationalist Resolution of the Women’s Question.” In Recasting Women: Essays in Indian Colonial History, edited by Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, 233–52. New Delhi: Kali for Women, 1989.

—. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.

Chatterji, Joya. Bengal Divided : Hindu Communalism and Partition, 1932-1947. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Chowdhry, Prem. “Militarized Masculinities: Shaped and Reshaped in Colonial South-East Punjab.” Modern Asian Studies 47, no. 3 (2013): 713–50.

Chowdhury, Indira. The Frail Hero and Virile History : Gender and the Politics of Culture in Colonial Bengal. Delhi: Oxford University Press, 2001.

Chowdhury-Sengupta, Indira. “The Effeminate and the Masculine: Nationalism and the Concept of Race in Colonial Bengal.” In The Concept of Race in South Asia, edited by Peter Robb, 282–303. Delhi: Oxford University Press, 1997.

Christensen, Ann-Dorte, and Jørgen Elm Larsen. “Gender, Class, and Family: Men and Gender Equality in a Danish Context.” Social Politics 15, no. 1 (2008): 53–78.

—. and Sune Qvotrup Jensen. “Combining Hegemonic Masculinity and Intersectionality.” Norma : International Journal for Masculinity Studies 9 (2014): 60–75.

Cohn, Bernard S. An Anthropologist Among the Historians and Other Essays. Delhi ; New York: Oxford University Press, 1987.

Connell, R. W, and James W Messerschmidt. “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept.” Gender & Society 19, no. 6 (2005): 829–59.

Connell, Raewyn. “Masculinities in Global Perspective: Hegemony, Contestation, and Changing Structures of Power.” Theory and Society 45, no. 4 (2016): 303–18.

—. Masculinities. Cambridge: Polity, 1995.

Constable, Philip. “The Marginalization of a Dalit Martial Race in Late Nineteenth and Early Twentieth Century Western India.” The Journal of Asian Studies 60, no. 2 (2001): 439–78.

Cronin, Richard P. “The Government of Eastern Bengal and Assam and ‘Class Rule’ in Eastern Bengal, 1905-1912.” In Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries, edited by John R. McLane and Rachel Van M. Baumer, 99–117. Occasional Paper No. 25. East Lansing: Asian Studies Center, Michigan State University, 1975.

Dalmia, Vasudha. The Nationalisation of Hindu Traditions : Bharatendu Harischandra and Nineteenth-Century Banaras. New Delhi: Oxford University Press, 1997.

Das, Suranjan. Communal Riots in Bengal: 1905-1947. Delhi: Oxford University Press, 1993.

Datta, Partho. "Ranald Martin's Medical Topography (1837): The Emergence of Public Health in Calcutta." In The Social History of Health and Medicine in Colonial India, edited by Biswamoy Pati and Mark Harrison, 15–30. New Year: Routledge, 2009.

Datta, Pradip Kumar. "'Dying Hindus': Production of Hindu Communal Common Sense in Early 20th Century Bengal." Economic and Political Weekly 28, no. 25 (1993): 1305–19.

—. Carving Block: Communal Identity in Early Twentieth-Century Bengal. New Delhi: Oxford University Press, 1999.

Dawson, Graham. Soldier Heroes: British Adventure, Empire and Imaging of Masculinities. London ; New York: Routledge, 1994.

Deb Roy, Rohan. Malarial Subjects Empire, Medicine and Nonhumans in British India, 1820–1909. Delhi: Cambridge University Press, 2017.

Desai, Akshayakumar Ramanlal. Social Background of Indian Nationalism. 3rd ed. Bombay: Popular Prakashan, 1959.

Dimeo, P. "Football and Politics in Bengal: Colonialism, Nationalism, Communalism." Soccer and Society 2, no. 2 (2001): 57–74.

—. "Colonial Bodies, Colonial Sport: 'Martial' Punjabis, 'Effeminate' Bengalis and the Development of Indian Football." International Journal of the History of Sport 19, no. 1 (2002): 72–90.

Dirks, Nicholas B. Castes of Mind : Colonialism and the Making of Modern India. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.

Dobbin, Christine E. Urban Leadership in Western India : Politics and Communities in Bombay City, 1840-1885. Oxford University Press: London, 1972.

Edwards, James W. "Semen Anxiety in South Asian Cultures: Cultural and Transcultural Significance." Medical Anthropology 7, no. 3 (1983): 51–67.

Engels, Dagmar. "The Age of Consent Act of 1891: Colonial Ideology in Bengal." South Asia Research 3, no. 2 (1983): 107–31.

—. Beyond Purdah? : Women in Bengal, 1890-1939. Delhi: Oxford University Press, 1996.

Enloe, Cynthia H. Bananas, Beaches and Bases : Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley, California: University of California Press, 2000.

Fenech, Louis E. Martyrdom in the Sikh Tradition : Playing the "Game of Love." New Delhi: Oxford University Press, 2000.

Field, H. John. Toward a Programme of Imperial Life : The British Empire at the Turn of the Century. Oxford: Clio Press, 1982.

Foucault, Michel. "'The Crisis of Medicine or the Crisis of Antimedicine?' Translated by Edgar C. Knowlton, Jr, William J. King and Clare O'Farrell." Foucault Studies, no. 1, 2014.

https://pdfs.semanticscholar.org/c355/1944141bc2940a5f557e157de4ca38af013c.pdf (accessed 11 January 2021).

Freitag, Sandria B. "Contesting in Public: Colonial Legacies and Contemporary Communalism." In Making India Hindu : Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, edited by David E Ludden, 211–34. Delhi: Oxford University Press, 2005.

Galasiński, Dariusz. Men and the Language of Emotions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

Ghosh, Anindita. "Revisiting the 'Bengal Renaissance': Literary Bengali and Low-Life Print in Colonial Calcutta." Economic and Political Weekly 37, no. 42 (2002): 4329–38.

—. Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society, 1778-1905. New Delhi: Oxford University Press, 2006.

—. Claiming the City : Protest, Crime, and Scandals in Colonial Calcutta 1860-1920. New Delhi: Oxford University Press, 2016.

Ghosh, Papiya. "The Virile and the Chaste in Community and Nation Making: Bihar 1920's to 1940's." Social Scientist 22, no. 1/2 (1994): 80–94.

Ghosh, Semanti. Different Nationalisms : Bengal, 1905-1947. New Delhi, 2017.

Gordon, Leonard A. Bengal : The Nationalist Movement, 1876-1940. New York ; London: Columbia University Press, 1974.

Gordon, Richard. "The Hindu Mahasabha and the Indian National Congress, 1915 to 1926." Modern Asian Studies 9, no. 2 (2008): 145–203.

Gregg, Melissa, and Gregory J. Seigworth. The Affect Theory Reader. Durham, NC: Duke University Press, 2010.

Guha, Ranajit. "Dominance Without Hegemony and Its Historiography." In Subaltern Studies VI: Writings on South Asian History and Society, edited by Ranajit Guha, 210–309. New Delhi: Oxford University Press, 1989.

—. Dominance Without Hegemony : History and Power in Colonial India. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Guha, Ratnabir. "Native Bodies, Medical Market and 'Conflicting' Medical 'Systems': Venereal Diseases and the 'Vernacularisation' of Western Medical Knowledge in Colonial Bengal." Presidency Historical Review 1, no. 1 (2015): 1–62.

Guha, Supriya. "'The Best Swadeshi': Reproductive Health in Bengal,1840-1940." In Reproductive Health in India: History, Politics, Controversies, edited by Sarah Hodges, 139–166. Hyderabad: Orient Longman, 2006.

Guha-Thakurta, Tapati. "Recovering the Nation's Art." In Texts of Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal, edited by Partha Chatterjee, 63–92. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995.

Gupta, Charu. Sexuality, Obscenity, Community : Women, Muslims, and the Hindu Public in Colonial India. Delhi: Permanent Black, 2001.

—. "Procreation and Pleasure: Writings of a Woman Ayurvedic Practitioner in Colonial North India." Studies in History 21, no. 1 (2005): 17–44.

—. “Anxious Hindu Masculinities in Colonial North India: Shuddhi and Sangathan Movements.” Cross Currents 61, no. 4 (2011): 441–54.

—. “Feminine, Criminal or Manly?: Imaging Dalit Masculinities in Colonial North India.” The Indian Economic and Social History Review 47, no. 3 (2010): 309–42.

—. The Gender of Caste : Representing Dalits in Print. Seattle: University of Washington Press, 2016.

Hacker, Paul. “Aspects of Neo-Hinduism as Contrasted with Surviving Traditional Hinduism.” In Kleine Schriften, edited by L. Schmidthausen, 580–608. Wiesbaden: Franz Steiner, 1978.

Hanlon, Rosalind O. “Recovering the Subject: Subaltern Studies and Histories of Resistance in Colonial South Asia.” Modern Asian Studies 22, no. 1 (1988): 189–224.

Harrison, Mark. “Towards A Sanitary Utopia? Professional Visions and Public Health in India, 1880-1914.” South Asia Research 10, no. 1 (1990): 19–40.

—. Public Health in British India: Anglo-Indian Preventive Medicine 1859–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

—. “Differences of Degree: Representations of India in British Medical Topography, 1820-c. 1870.” Medical History 44, no. S22 (2000): 51–69.

Haynes, Douglas E. “Gandhi, Brahmacharya and Global Sexual Science, 1919–38.” South Asia: Journal of South Asian Studies, 2020.

Haywood, Chris, Thomas Johansson, and Nils Hammarén. The Conundrum of Masculinity : Hegemony, Homosociality, Homophobia and Heteronormativity. New York: Routledge, 2018.

Heehs, Peter. “Foreign Influences on Bengali Revolutionary Terrorism 1902–1908.” Modern Asian Studies 28, no. 3 (1994): 533–56.

—. The Bomb in Bengal : The Rise of Revolutionary Terrorism in India, 1900-1910. New Delhi: Oxford University Press, 1993.

Hodges, Sarah. Contraception, Colonialism and Commerce : Birth Control in South India, 1920-1940. Aldershot: Ashgate, 2008.

Holden, Philip. Autobiography and Decolonization : Modernity, Masculinity, and the Nation-State. Madison: University of Wisconsin Press, 2008.

Hutchins, Francis G. The Illusion of Permanence : British Imperialism in India. Princeton: Princeton University Press, 1967.

Inden, Ronald B. Marriage and Rank in Bengali Culture : A History of Caste and Clan in Middle Period Bengal. Berkeley ; London: University of California Press, 1976.

—. Imagining India. Oxford: Basil Blackwell, 1990.

Jaffrelot, Christophe. The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to the 1990s : Strategies of Identity-Building, Implantation and Mobilisation. London: Princeton University Press, 1996.

Jha, Bhuwan Kumar. “Forging ‘Unity’: Hindu Mahasabha and the Quest for ‘Sangathan’.” Proceedings of the Indian History Congress 68 (2007): 1069–88.

Jones, Kenneth W. Socio-Religious Reform Movements in British India. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Jürgen Habermas. The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1989.

Kabesh, Amal Treacher. Postcolonial Masculinities : Emotions, Histories and Ethics. Farnham, 2013.

Kakar, Sudhir. The Inner World : A Psycho-Analytic Study of Childhood and Society in India. 2nd ed., Delhi ; New York: Oxford University Press, 1981.

Katyal, Akhil. The Doubleness of Sexuality : Idioms of Same-Sex Desire in Modern India. New Delhi: New Text, 2016.

Kaviraj, Sudipta. The Unhappy Consciousness : Bankimchandra Chattopadhyay and the Formation of Nationalist Discourse in India. Delhi: Oxford University Press, 1995.

—. The Invention of Private Life: Literature and Ideas. Ranikhet: Parmanent Black, 2014.

Kiesling, Scott Fabius. "Homosocial Desire in Men's Talk: Balancing and Re-Creating Cultural Discourses of Masculinity." Language in Society 34, no. 5 (2005): 695–726.

Kimmel, Michael S. "Invisible Masculinity." Society 30 (1993): 28–35.

Klein, Ira. "Malaria And Mortality in Bengal, 1840-1921." The Indian Economic & Social History Review 9, no. 2 (1972): 132–60.

—. "Population Growth and Mortality Part I: The Climacteric of Death." Indian Economic and Social History Review 26, no. 4 (1989): 387–403.

—. "Population Growth and Mortality in British India Part II: The Demographic Revolution." Indian Economic and Social History Review 27, no. 1 (1990): 33–63.

—. "Imperialism, Ecology and Disease: Cholera in India, 1850-1950." The Indian Economic and Social History Review 31, no. 4 (1994): 491–518.

Kopf, David. The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1979.

Lal, Ruby. Domesticity and Power in the Early Mughal World : Historicizing the Haram. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Laushey, David M. Bengal Terrorism & the Marxist Left : Aspects of Regional Nationalism in India, 1905-1942. Calcutta: Firma KLM Private Limited, 1975.

Leopold, Joan. "The Aryan Theory of Race." The Indian Economic and Social History Review 7, no. 2 (1970): 271–97.

Man, Paul de. "Autobiography as De-Facement." Modern Language Notes 94, no. 5 (1979): 919–30.

Mandal, Tirtha. The Women Revolutionaries of Bengal, 1905-1939. Calcutta: Minerva Associates, 1991.

Mangan, J. A. "Eton in India: The Imperial Diffusion of a Victorian Educational Ethic." History of Education 7, no. 2 (1978): 105–18.

—. Athleticism in the Victorian and Edwardian Public School : The Emergence and Consolidation of an Educational Ideology. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Mani, Lata. “Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India.” In Recasting Women: Essays in Colonial History, edited by Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, 88–126. New Delhi: Kali for Women, 1989.

Martyn, Mady. Martyn Sahib: The Story of John Martyn of Doon School. New Delhi: Dass Media, 1985.

McGuire, John. The Making of a Colonial Mind : A Quantitative Study of the Bhadralok in Calcutta, 1857-1885. Canberra: Australian National University, 1983.

Meuser, Michael. “Serious Games: Competition and the Homosocial Construction of Masculinity.” Nordic Journal for Masculinity Studies 2, no. 1 (2012): 38–51.

Mitra, Samarpita. Periodicals, Readers and the Making of a Modern Literary Culture: Bengal at the Turn of the Twentieth Century. Leiden; Boston: Brill, 2020.

Mukharji, Projit Bihari. Nationalizing the Body: The Medical Market Print and Daktari Medicine. New York: Anthem Press, 2009.

—. Doctoring Traditions: Ayurveda, Small Technologies, and Braided Sciences. Chicago: University of Chicago Press, 2016.

—. “Vernacularizing the Body: Informational Egalitarianism, Hindu Divine Design, and Race in Physiology Schoolbooks, Bengal 1859-1877.” Bulletin of the History of Medicine 91, no. 3 (2017): 554.

Mukherjee, Ishanee. “Scaling the Barrier: Women, Revolution and Abscondence in Late Colonial Bengal.” Indian Journal of Gender Studies 6, no. 1 (1999): 61–78.

Mukherjee, Sujata. Gender, Medicine, and Society in Colonial India: Women’s Health Care in Nineteenth- and Early Twentieth-Century Bengal. Delhi: Oxford University Press, 2017.

Nandy, Ashis. Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self Under Colonialism. New Delhi: Oxford University Press, 1983.

Naregal, Veena. Language Politics, Elites, and the Public Sphere. Delhi: Permanent Black, 2001.

Newsome, David. Godliness and Good Learning: Four Studies on a Victorian Ideal. London: John Murray, 1961.

O’Hanlon, Rosalind. “Issues of Masculinity in North Indian History: The Bangash Nawabs of Farrukhabad.” Indian Journal of Gender Studies 4, no. 1 (1997): 1–19.

Obeyesekere, Gananath. “The Impact of Ayurvedic Ideas on the Culture and the Individual in Sri Lanka.” In Asian Medical Systems, edited by Charles Leslie, 201—226. Berkeley: University of California Press, 1976.

Omissi, David. “‘Martial Races’: Ethnicity and Security in Colonial India 1858–1939.” War & Society 9, no. 1 (1991): 1–27.

Orsini, Francesca. The Hindi Public Sphere 1920–1940 : Language and Literature in the Age of Nationalism. Delhi: Oxford University Press, 2009.

Palit, Chittabrata. “Popular Response to Epidemics in Colonial Bengal.” Indian Journal of History of Science 43, no. 2 (2008): 277–83.

Pande, Ishita. Medicine, Race and Liberalism in British Bengal: Symptoms of Empire. New York: Routledge, 2010.

—. “Sorting Boys and Men : Unlawful Intercourse, Boy-Protection, and the Child Marriage Restraint Act in Colonial India.” The Journal of the History of Childhood and Youth 6, no. 2 (2013): 332–58.

—. Sex, Law, and the Politics of Age: Child Marriage in India, 1891–1937. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Pandey, Gyanendra. The Construction of Communalism in Colonial North India. Delhi: Oxford University Press, 1990.

—. “Hindus and Others: The Militant Hindu Construction.” Economic and Political Weekly 26, no. 52 (1991): 2997–3009.

Pandit, Mimasha. Performing Nationhood: The Emotional Roots of Swadeshi Nationhood in Bengal, 1905-1912. Delhi: Oxford University Press, 2019.

Patel, Sujata. “Construction and Reconstruction of Women In Gandhi.” In Ideals, Images, and Real Lives : Women in Literature and History, edited by Alice Thorner and Maithreyi Krishna Raj. Mumbai: Orient Longman, 2000.

Pease, Bob. “The Politics of Gendered Emotions: Disrupting Men’s Emotional Investment in Privilege.” Australian Journal of Social Issues 47, no. 1 (2012): 125–42.

Penrose, Walter. “Colliding Cultures: Masculinity and Homoeroticism in Mughal and Early Colonial South Asia.” In Queer Masculinities, 1550–1800 : Siting Same-Sex Desire in the Early Modern World, edited by Katherine O’Donnell and Michael O’Rourke. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Pini, Barbara, and Bob Pease. Men, Masculinities and Methodologies. Genders and Sexualities in the Social Sciences. Basingstoke, Hampshire, 2013.

Prakash, Indra. A Review of the History and Work of the Hindu Mahasabha and Hindu Sangathan Movement. New Delhi: Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha, 1938.

Rai, Saurav Kumar. “Invoking ‘Hindu’ Ayurveda: Communalisation of the Late Colonial Ayurvedic Discourse.” The Indian Economic and Social History Review 56, no. 4 (2019): 411–26.

Ramasubban, Radhika. “Imperial Health in British India, 1857–1900.” In Disease, Medicine and Empire: Perspectives on Western Medicine and the Experience of European Expansion, 38–60. London: Routledge, 1988.

Ramaswamy, Sumathi. The Goddess and the Nation : Mapping Mother India. New Delhi: Zubaan, 2011.

Rao, R. Raj. “Memories Pierce the Heart : Homoeroticism, Bollywood-Style.” Journal of Homosexuality 39, no. 3–4 (2000): 299–306.

Ray, Asok Kumar. Party of Firebrand Revolutionaries : The Dacca Anushilan Samiti, 1906-1918. Calcutta: Minerva Associates (Publications), 1999.

Ray, Kabita. History of Public Health : Colonial Bengal, 1921-1947,. Calcutta: K.P. Bagchi & Co., 1998.

Ray, Rajat Kanta. Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927. Delhi: Oxford University Press, 1984.

—. Exploring Emotional History : Gender, Mentality and Literature in the Indian Awakening. New Delhi: Oxford University Press, 2001.

Raychaudhuri, Tapan. Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal. Delhi: Oxford University Press, 1988.

—. "Love in a Colonial Climate: Marriage, Sex and Romance in Nineteenth-Century Bengal." Article. Modern Asian Studies 34, no. 2 (2000): 349–78.

Reeser, Todd W, and Lucas Gottzén. "Masculinity and Affect: New Possibilities, New Agendas." Norma : International Journal for Masculinity Studies 13, no. 3–4 (2018): 145–57.

Rosselli, John. "The Self-Image of Effeteness: Physical Education and Nationalism in Nineteenth-Century Bengal." Past and Present 86, no. 1 (1980): 121–48.

Roy, Abhik, and Michele L Hammers. "Swami Vivekananda's Rhetoric of Spiritual Masculinity: Transforming Effeminate Bengalis into Virile Men." Western Journal of Communication 78, no. 4 (2014): 545–62.

Roy, Anuradha. "Riding the Wave of Youth Power : Bengal during the 1920's." Journal of History 25 (2007-2008): 50–78.

Roy, Kumkum. The Power of Gender and the Gender of Power : Explorations in Early Indian History. New Delhi: Oxford University Press, 2010.

Samanta, Arabinda. Living with Epidemics in Colonial Bengal 1818–1945. London: Rutledge, 2018.

—. Malarial Fever in Colonial Bengal, 1820-1939: Social History of an Epidemic. Kolkata: Farma KLM Private Limited, 2002.

Sanyal, Hitesranjan. Social Mobility in Bengal. Calcutta: Papyrus, 1981.

Sanyal, Shukla. Revolutionary Pamphlets, Propaganda and Political Culture in Colonial Bengal. Delhi: Cambridge University Press, 2014.

Sarkar, Sumit. The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908. New Delhi: People's Publishing House, 1973.

—. "'Kaliyuga', 'Chakri' and 'Bhakti': Ramakrishna and His Times." Economic and Political Weekly 27, no. 29 (1992): 1543–66.

—. An Exploration of the Ramakrishna Vivekananda Tradition. Socio-Religious Movements and Cultural Networks in Indian Civilization. Shimla: Indian Institute of Advanced Study, 1993.

—. Writing Social History. Delhi: Oxford University Press, 1997.

—. Beyond Nationalist Frame: Relocating Postmodernism, Hindutva, History. Delhi: Permanent Black, 2002.

—. Essays of a Lifetime : Reformers, Nationalists, Subalterns. Albany, NY: State University of New York Press, 2019.

Sarkar, Suvobrata. Let There Be Light : Engineering, Entrepreneurship and Electricity in Colonial Bengal, 1880-1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Sarkar, Tanika. "Hindu Conjugality and Nationalism in Late Nineteenth Century Bengal." In Indian Women : Myth and Reality, edited by Jasodhara Bagchi, 98–115. Hyderabad: Sangam Books, 1995.

—. Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion, and Cultural Nationalism. New Delhi: Parmanent Black, 2001.

Sartori, Andrew. Bengal in Global Concept History : Culturalism in the Age of Capital. Chicago, 2008.

—. “The Transfiguration of Duty in Aurobindo’s Essays on The Gita, Modern Intellectual History.” Article. Modern Intellectual History 7, no. 2 (2010): 319–34.

Sawyer, Erin. “Celibate Pleasures: Masculinity, Desire, and Asceticism in Augustine.” Journal of the History of Sexuality 6, no. 1 (1995): 1–29.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Between Men : English Literature and Male Homosocial Desire. Gender and Culture. New York, NY, 1985.

Sen, Amiya P. Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905 : Some Essays in Interpretation. New Delhi: Oxford University Press, 1993.

Sen, Asok. Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones. Calcutta: Riddhi-India, 1977.

Sen, Dwaipayan. The Decline of the Caste Question : Jogendranath Mandal and the Defeat of Dalit Politics in Bengal. New Delhi: Cambridge University Press, 2018.

—. “Caste in British India: Between Continuity and Colonial Construction, and Beyond.” In The Routledge Handbook of the History of Colonialism in South Asia, edited by Harald and Maria Framke Fischer-Tiné, 9–22. New York: Routledge, 2022.

Sen, Samita. “Honour and Resistance: Gender, Community and Class in Bengal, 1920-1940.” In Bengal: Communities, Development and States, edited by Williem Van Sehendel Sekhar Bandyopadhyay, Abhijit Dasgupta, 209–54. New Delhi: Monohor Publications, 1994.

Sen, Satadru. Colonial Childhoods : The Juvenile Periphery of India, 1850-1945. London: Anthem Press, 2005.

—. “Health, Race and Family in Colonial Bengal.” In Children, Childhood and Youth in the British World, edited by Robinson and Simon Sleight Shirleene, 144–60. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016.

—. “The Conservative Animal: Bhudeb Mukhopadhyay and Colonial Bengal.” The Journal of Asian Studies 76, no. 2 (2017): 363–81.

Shivaramakrishnan, Kavita. Old Potions, New Bottles: Recasting Indigenous Medicine in Colonial Punjab. New Delhi: Orient Blackswan, 2006.

Silvestri, Michael. “The Bomb, Bhadralok, Bhagavad Gita, and Dan Breen: Terrorism in Bengal and Its Relation to the European Experience.” Terrorism and Political Violence 21, no. 1 (2009): 1–27.

Sinha, Mrinalini. Colonial Masculinity: The ‘Manly Englishman’ and the ‘Effeminate Bengali’ in the Late Nineteenth Century. New Delhi: Kali for Women, 1995.

—. “Gendered Nationalism: From Women to Gender and Back Again?” In Routledge Handbook of Gender in South Asia, edited by Leela Fernandes, 13–27. london, NY: Routledge, 2014.

Sinha, Pradip. Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1965.

Sinha, Sandeep. Public Health Policy and the Indian Public: Bengal, 1850-1920. Calcutta: Vision Publications, 1998.

Srikant Botre and Douglas E. Haynes. “Sexual Knowledge, Sexual Anxieties: Middle-Class Males in Western India and the Correspondence in Samaj Swasthya, 1927–53.” Modern Asian Studies 51, no. 4 (2017): 991–1034.

Srinivas, M N. “A Note on Sanskritization and Westernization.” Far Eastern Quarterly 15, no. 4 (1956): 481–96.

Sumathipala, A., S. H. Siribaddana, and Dinesh Bhugra. “Culture-Bound Syndromes: The Story of Dhat Syndrome.” British Journal of Psychiatry 184, no. 3 (2004): 200–209.

Tambe, Ashwini. “Gandhi’s ‘Fallen’ Sisters: Difference and the National Body Politic.” Social Scientist 37, no. 1/2 (2009): 21–38.

Tosh, John. “What Should Historians Do with Masculinity? Reflections on Nineteenth-Century Britain.” History Workshop Journal 38, no. 1 (1994): 179–202.

Trautmann, Thomas R. Aryans and British India. University Press Scholarship Online. Berkeley, Calif. ; London: University of California Press, 1997.

Tripathi, Amalesh. The Extrimist Challenge: India Between 1890 and 1910. New Delhi: Orient Longman, 1967.

Tucker, Richard. “Hindu Traditionalism and Nationalist Ideologies in Nineteenth-Century Maharashtra.” Modern Asian Studies 10, no. 3 (1976): 321–48.

Vance, Norman. The Sinews of the Spirit: The Ideal of Christian Manliness in Victorian Literature and Religious Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Vanita, Ruth, and Saleem Kidwai. Same-Sex Love in India : Readings from Literature and History. Basingstoke: Macmillan, 2000.

Viswanathan, Gauri. Masks of Conquest : Literary Study and British Rule in India. Delhi: Oxford University Press, 1989.

Voix, Raphael. “Social Services, Muscular Hinduism and Implicit Militancy in West Bengal: The Case of the Bharat Sevashram Sangha.” In Cultural Entrenchment of Hindutva: Local Mediations and Forms of Convergence, edited by Pralay Kanungo, Daniela Berti, Nicolas Jaoul, 209–38. New Delhi: Routledge, 2011.

Walsh, Judith E. Domesticity in Colonial India : What Women Learned When Men Gave Them Advice. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004.

Whitaker, Jarrod L. Strong Arms and Drinking Strength: Masculinity, Violence, and the Body in Ancient India. New Delhi: Oxford University Press, 2011.

Wujastyk, Dagmar, and Frederick M Smith. Modern and Global Ayurveda : Pluralism and Paradigms. Albany, 2008.

Wurgaft, Lewis D. The Imperial Imagination : Magic and Myth in Kipling’s India. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1983.

Zwilling, Leonard and Michael J. Sweet. “The Evolution of Third-Sex Construction in Ancient India : A Study in Ambiguity.” In Invented Identities: The Inter Play of Gender, Religion and Politics in India, edited by Julia Mary McGee Leslie, 99–132. (Delhi: Oxford University Press, 2000).

প্রার্থীর স্বাক্ষর